আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর



ভূমিকা

ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাওহীদ। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ }

আমি মানুষ ও জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য। [যারিয়াত/৫৬]

ইমাম বুখারী ﵀ আয়াতে উল্লেখিত (الا ليعبدون) এর ব্যাখ্যায় বলেন (إلا ليوحدون) [সহীহ্ বুখারী] অর্থাৎ আমি মানুষ ও জিনকে কেবলমাত্র আমার তাওহীদের ঘোষণা দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছি। 'তাওহীদ' (توحيد) শব্দটি মূল শব্দ 'ওয়াহিদ' (واحد) থেকে উদ্‌গত যার অর্থ 'এক' আর 'তাওহীদ' অর্থ আল্লাহকে একমাত্র ইবাদতের যোগ্য ও সৃষ্টি জগতের উপর একমাত্র কর্তৃত্বশালী শক্তি হিসাবে মেনে নেওয়া। আর এ উদ্দেশ্যেই এই বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই মানুষের ভাল-মন্দ ও সৎ-অসৎ কর্মের বিচার সম্পন্ন করা হবে। তাওহীদের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে নিতান্ত ভদ্র, মার্জিত স্বভাবের একজন পরোপকারী ও দানশীল ব্যক্তি যদি তাওহীদে বিশ্বাস না করে মৃত্যুবরণ করে তবে তাকে চিরকাল জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিতে অসহনীয় শাস্তি ভোগ করতে হবে, যেমনটি ঘটবে আবু তালিবের ক্ষেত্রে যিনি সারাটা জীবন স্বীয় প্রাণপ্রিয় ভাতিজা মুহাম্মাদ ﷺ এর সমর্থন ও সহযোগিতা করে গেছেন। নিজের জীবনের চেয়েও রসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবন যার নিকট ছিল বেশি প্রিয়। তাওহীদের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ না করার কারণে তাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তিভোগ করতে হবে। [১] অথচ ইসলাম ও মুসলিমদের এক সময়কার প্রধান শত্রু আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভূত কল্যাণ হাসিল করলেন। তাওহীদ এমনই এক পরশ পাথর যার কল্যাণে একজন পাপী মুসলিমও জান্নাতের আশা করতে পারে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة

আমার উম্মতের মধ্যে যে কেউ শিরক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

বলা হলো, যদিও সে চুরি করে বা জিনা করে? তিনি বললেন, যদিও সে চুরি করে বা জিনা করে।

[সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

---

[১] সহীহ মুসলিম; কিতাবুল ঈমান; জাহান্নামে সর্ব নিম্ন শাস্তি কার হবে অধ্যায়ে রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে উল্লেখ করা হয়ছে তিনি বলেন, (أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه) ''জাহান্নামে সর্বনিম্ন শাস্তি ভোগ করবে আবু তালিব''।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَمًا ثُمَّ تُدْرِكُهُمُ الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُونَ

তাওহীদ পন্থী একদল লোককে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেওয়া হবে। এমন কি তারা পোড়া কয়লার মতো হয়ে যাবে। এরপর তাদের উপর অনুগ্রহ করা হবে, ফলে তারা জাহান্নাম হতে বের হবে।

[তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাসান সহীহ]

সুতরাং প্রত্যেক মানুষের উচিৎ তাওহীদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত জানা ও মানার চেষ্টা করা। বর্তমান গ্রন্থে আমরা এবিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করার ইচ্ছা রাখি ইনশা-আল্লাহ। নিম্মোক্ত তিনটি স্তরে আমরা আলোচনা করবো।

১. কিভাবে একজন ব্যক্তি তাওহীদে প্রবেশ করে এবং মুসলিম হিসাবে গণ্য হয়।

২. কি বললে বা করলে একজন ব্যক্তি কাফির হিসাবে গণ্য হয়।

৩. কখন একজন মুসলিমকে কাফির বলা যায়।

দুই ও তিন নং বিষয়দুটিকে অনেকে একই বিষয় মনে করতে পারেন কিন্তু আসলে উভয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে যা যথাস্থানে বিস্তারিত উল্লেখিত হবে ইনশা-আল্লাহ। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় কোনো কুফরী কথা বা কাজ বললে বা করলেই একজন মুসলিমকে কাফির বলা যায় না কেননা কোনো মুসলিমকে কাফির বলার পূর্বে কিছু মূলনীতির আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়। যেমন সে অজ্ঞতার কারণে বা বাধ্য হয়ে কুফরী করেছে কিনা সে যে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত কিনা ইত্যাদি। সুতরাং কোনো কাজ বা কথাকে কুফরী বলে মনে করা এবং তাতে লিপ্ত হওয়ার কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির বলে ঘোষণা করা পৃথক দুটি বিষয় যে সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। [২] মূলত এ কারণেই আমরা বিষয়দুটিকে পৃথক দুটি শিরোনামে লিপিবদ্ধ করেছি। এখন আমরা মূল আলোচনাতে অনুপ্রবেশ করব। ওয়া মা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

---

[২] ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ ﵀ বলেন, (التَّكْفِيرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ قَدْ تَنْتَفِي فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ) '' কাউকে কাফির বলতে হলে কিছু শর্ত রয়েছে এবং কিছু বাধা রয়েছে সেসব কারণে হয়তো কোনো একজন ব্যক্তিকে কাফির বলা সম্ভব নাও হতে পারে। সাধারণভাবে কোনো শ্রেণীকে কাফির বলার অর্থ এই নয় যে উক্ত কাজ যে কেউ করে নির্দিষ্টভাবে তাকে কাফির বলা যায়।'' [মাজমুউল ফাতাওয়া] এ বিষয়ে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

প্রথম অধ্যায়

(১) একজন ব্যক্তি কিভাবে মুসলিম হিসাবে গণ্য হয়

১.(ক) এ সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা:

সাধারণত যারা তাওহীদ সম্পর্কে পুস্তকাদি লেখেন বা আলোচনা করেন তারা কিভাবে একজন মুসলিম কাফির হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেন, একজন কাফির কিভাবে মুসলিম হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেন না। অথচ এ বিষয়টিও সমান গুরুত্বের অধিকারী। ওলামায়ে কিরামের স্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী কোনো কাফিরকে ভুল করে মুসলিম বলে ফেলার তুলনায় কোনো মুসলিমকে ভুল করে কাফির বলে ফেলা হাজারগুণ মারাত্মক অপরাধ। (৩) সে হিসাবে একজন কাফির কখন মুসলিম হিসাবে গণ্য হয় সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন অধিক গুরুত্বের দাবীদার। কেননা এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকলে এমন হতে পারে যে, কোনো একজন কাফির ইসলামে প্রবেশ করার পরও আমরা হয়তো তাকে কাফির মনে করবো। এভাবে একজন মুসলিমকে কাফির মনে করার অপরাধে অপরাধী হবো। আমরা কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই যাতে মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনে বিষয়টির গুরুত্ব কত সুদৃঢ় তা অনুভব করা পাঠকের জন্য সহজ হয়।

রসুলুল্লাহ ﷺ খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে আমীর করে একটি অভিযান বানু জাযিমার দিকে প্রেরণ করলে তিনি তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তারা আসলামনা (اسلمنا) তথা ‘‘আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম’’ এভাবে না বলে (صبأنا) তথা ‘‘আমরা দ্বীন ত্যাগ করলাম’’ এভাবে বলে। খালিদ رضي الله عنه মনে করেন তাদের এই কথার মাধ্যমে তারা মুসলিম হবে না, ফলে তিনি তাদের হত্যা করার আদেশ দেন কিন্তু অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইবনে উমর رضي الله عنه এবং আরো কিছু মুজাহিদ বিষয়টির প্রতিবাদ করেন। তারা তাদের হত্যা করতে অস্বীকার করেন। পরে রসুলুল্লাহ ﷺ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট খালিদ যা করেছে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। [সহীহুল বুখারী]

এখানে দেখা যাচ্ছে কি ধরণের শব্দ ব্যবহার করলে একজন কাফির ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে গণ্য হবে সে বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিমত হয়েছে। আর এ বিষয়ে সঠিক রায়টি অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ার

---

(৩) এ বিষয়ে মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম ক্বাজী ইয়াদ رحمه الله বলেন, (و الخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد) ‘‘এক হাজার জন কাফিরকে ভুল করে (মুসলিম মনে করে) ছেড়ে দেওয়া একজন মুসলিমের (তাকে কাফির মনে করে বা অন্য কোনো কারণে) এক শিঙা পরিমাণ রক্ত ঝরানোর ব্যাপারে ভুল করা অপেক্ষা লঘুতর। [আশ-শিফা]

কারণে খালিদ ﷺ ইসলাম গ্রহণের পরও একদল লোককে হত্যার আদেশ দিয়েছেন।

একইভাবে ওসামা বিন যায়েদ ﷺ যুদ্ধরত অবস্থায় একজন কাফিরকে হত্যা করার জন্য তরবারী উত্তোলন করলে সে ‘‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ পাঠ করে। ওসামা ﷺ এর নিকট মনে হয় এই ব্যক্তি প্রাণ ভয়ে কালেমা পাঠ করছে ফলে এর কালেমা পাঠ করা যথেষ্ট হবে না। এমন উপলব্ধির কারণে তিনি তাকে হত্যা করেন। রসুলুল্লাহ ﷺ এ ঘটনা জানতে পেরে ওসামাকে ভীষণভাবে তিরষ্কার করেন এবং বলেন,

أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ

তুমি তার অন্তর বিদীর্ণ করে দেখলে না কোনো? [সহীহ মুসলিম]

এই হাদীসের ভাষ্য হলো, প্রাণ ভয়ে বা অন্য যে কোনো কারণে কালেমা পাঠ করলে সেই ব্যক্তিকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে এবং তার রক্ত ও সম্পদ সংরক্ষিত বিবেচিত হবে।

এ বিষয়ের সাথে অন্য আরেকটি বিষয় জড়িত। ইসলামী বিধান মতে যে একবার মুসলিম হওয়ার পর আবার কাফির হয়ে যায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। আর মুরতাদের সাথে জন্মগত কাফিরের বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ সাধারণ কাফির যদি মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে এবং বন্দী হয় তবে তার ব্যাপারে খলীফা হত্যা করা, দাস বানানো, মুক্তিপণ গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা মুসলিমদের জন্য বৈধ কিন্তু আবশ্যক নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কখনও মুসলিম হিসাবে গণ্য ছিল এবং পরে কাফির হয়ে গেছে এই ব্যক্তি মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে এবং তওবা করে ফিরে না আসলে তাকে হত্যা করা মুসলিমদের উপর ফরজ হবে। কেননা রসুলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট ভাষায় আদেশ দিয়ে বলেছেন, (مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ) ‘‘যে কেউ তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করো।’’[সহীহ বুখারী] একইভাবে সাধারণ কাফিরদের নিকট হতে জিজিয়া কর গ্রহণ করে কিছু শর্ত সাপেক্ষে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে দেওয়া হবে কিন্তু মুরতাদের ক্ষেত্রে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো সুযোগ নেই। এ ধরণের মাসয়ালা মাসায়েলগত পার্থক্যের কারণে সাধারণ কাফিরের সাথে মুরতাদকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা জরুরী। আর এটা করতে হলে আমাদের জানতে হবে সে পূর্বে মুসলিম হিসাবে গণ্য হওয়ার মতো কিছু বলেছে বা করেছে কিনা। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যদি একদল কাফির মুসলিমদের হাতে বন্দী হয় এবং প্রমাণিত হয় যে, তাদের মধ্যে একজন পূর্বে কালেমা পাঠ করেছিল তবে তার বিষয়টি অন্য নয় জনের তুলনায় ভিন্ন হবে। অন্যদের ব্যাপারে খলীফার বিভিন্ন ইখতিয়ার থাকবে কিন্তু এই ব্যক্তি মুসলিম না হলে তাকে হত্যা করা হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো সুযোগ নেই। এখন যদি দেখা যায় উক্ত ব্যক্তি কালেমা পাঠ করেনি কিন্তু সলাত পড়েছে তবে তার এই সলাত পড়া ইসলাম গ্রহণ করা হিসাবে গণ্য হবে কিনা এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিমত আছে। যদি এটা ইসলাম গ্রহণ করা

বলে গণ্য হয় তবে তার উপর মুরতাদের বিধান প্রযোজ্য হবে আর যদি ইসলাম গ্রহণ করা বলে গণ্য না হয় তবে তার বিধান হবে অন্যান্য সাধারণ কাফিররে মতো। সুতরাং কোন বিষয়কে ইসলাম গ্রহণ করা হিসাবে গণ্য করা হবে বা হবে না সে সম্পর্কে জানার প্রয়োজন রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোনটির উপর ইজমা সম্পাদিত হয়েছে আর কোনটির ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে সেসম্পর্কে জানা এবং মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়গুলোতে সঠিক রায় অবগত হওয়া একান্ত জরুরী।

বর্তমানে যারা মীর্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর অনুসারী তাদের কাফির হিসাবে গণ্য করা হবে নাকি মুরতাদ হিসাবে গণ্য করা হবে সেটাও এই মাসয়ালার সাথেই সংশ্লিষ্ট একটি সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সকল বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে হলে, কিভাবে একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে গণ্য হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীন বিষয়টির উপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন ফিকাহ গ্রন্থে এ বিষয়ক আলোচনা "কিভাবে একজন কাফির মুসলিম হয়" (ما يصير به الكافر مسلما) শিরোনামে উল্লেখিত হয়েছে। আমরা এখানে দলীল প্রমাণ সহ সেসব আলোচনার অবতারণা করবো ইনশা-আল্লাহ।

১.(খ) মূলত তিনটি উপায়ে একজন কাফির ইসলামে দাখিল হয়।

[১] মুখে বা কাজে-কর্মে ইসলামের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে

[২] মুসলিম পিতা-মাতার ঔরসে জন্ম গ্রহণের মাধ্যমে

[৩] না-বালেগ অবস্থায় যুদ্ধে বন্দি হওয়া বা অন্য কোনোভাবে মুসলিমদের হস্তগত হওয়ার মাধ্যমে।

এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটির উপর ওলামায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন তবে এদের শাখা-প্রশাখাতে কিছু দ্বিমত আছে। আমরা এগুলোর প্রত্যেকটির উপর পৃথকভাবে আলোচনা করবো যাতে পাঠক এসকল বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

১.খ.(১) মুখে বা কাজে কর্মে ইসলামের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে।

ইসলাম গ্রহণের স্বাভাবিক ও সরল পন্থাটি হলো স্বেচ্ছায় বোধগম্য ভাষা ও ভঙ্গির মাধ্যমে ইসলামে অনুপ্রবেশের সুস্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া। এর সর্বসম্মত ও সর্বাধিক প্রশিদ্ধ পন্থাটি হলো কালেমা তায়্যেবা তথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" পাঠ করা। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ

আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ না তারা বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

যখন তারা এটা বলবে তাদের রক্ত ও সম্পদ সংরক্ষিত বলে গণ্য হবে। [বুখারী ও মুসলিম]

এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, কালেমার উভয় অংশ তথা ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ’’ সম্পূর্ণ উল্লেখ করলে একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে গণ্য হবেন। তবে কেবল ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ বললে বা শুধু ‘‘মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ’’ বললে মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত আছে। ওলামায়ে কিরামের একটি অংশ বলেছেন কেবল ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ বলার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে না। ইবনে হাযার আল আসকালানী বলেন, (وهو قول الجمهور) অর্থাৎ ‘‘ জমহুর (বেশিরভাগ) ওলামায়ে কিরামের মত এটাই।’’ [ফাতহুল বারী] তিনি আরো বলেন, (الراجح لا بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه) ‘‘ এই মাসয়ালাতে সঠিক মত হলো কেবল মাত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার মাধ্যমে মুসলিম হিসাবে গণ্য না হওয়া। তবে তাকে হত্যা করা হতে বিরত হতে হবে যতক্ষণ না নিশ্চিত হওয়া যায় সে রিসালাতের সাক্ষ্য দেয় কিনা এবং ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধানে বিশ্বাস স্থাপন করে কিনা।’’ [ফাতহুল বারী]

ইমাম নাব্বী ﵀ এ বিষয়ে বলেন,

أَمَّا إِذَا اقْتَصـرَ عَلَى قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ رَسـولُ اللَّهِ فَالْمَشْـهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لايكون مُسْلِمًا وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَكُونُ مُسْلِمًا وَيُطَالَبُ بِالشَّهَادَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ أَبَى جُعِلَ مُرْتَدًّا

যদি কেউ শুধু মাত্র ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ বলে কিন্তু ‘‘মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ’’ না বলে তবে আমাদের ও অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের প্রশিদ্ধ মত হলো সে মুসলিম হবে না। তবে আমাদের মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন, সে মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে এবং তাকে কালেমার বাকী অংশ স্বীকার করতে বলা হবে। যদি সে তা না করে তবে তাকে মুরতাদ হিসাবে গণ্য করা হবে। [শারহে মুসলিম]

যদি কেউ শুধুমাত্র ‘‘মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ’’ বলে এবং ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ না বলে তার ব্যাপারেও ওলামায়ে কিরামের অনুরুপ দ্বিমত রয়েছে।

ইবনে কুদামা ﵀ বলেন,

إذا شهد أن محمدا رسول الله واقتصر على ذلك ففيه روايتان

যদি কেউ শুধু ‘‘মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ’’ বলে তবে তার ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। [আল মুগনী]

এর পর তিনি বর্ণনা দুটি উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো, ঐ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে মনে করা হবে। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ কে নবী হিসাবে মেনে নেওয়ার অর্থই তিনি যে তাওহীদসহ প্রেরিত হয়েছেন তথা ‘‘লা ইলাহা ইল্লাহল্লাহ’’ এর স্বীকৃতি দেওয়া। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় বর্ণনাটি হলো, ইয়াহুদীদের মতো

যারা পূর্ব হতেই এক ইলাহতে বিশ্বাস করে, তাদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ‘‘মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’’ বলাটাই ইসলাম গ্রহণ হিসাবে গণ্য করা হবে। যেহেতু তার ক্ষেত্রে কালেমার একটি অংশ পূর্ব হতেই বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি সে তাওহীদবাদী না হয়, যেমন মূর্তিপূজক বা মাজুসী তবে সম্পূর্ণ কালেমা পাঠ না করা পর্যন্ত তাকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে না। ইবনে কুদামা رحمه الله বলেন,

وهو الصحيح لأن من جحد شيئين لا يزول جحدهما إلا بإقراره بهما جميعا

এই মতটিই সহীহ। কেননা যে ব্যক্তি দুটি বিষয়কে অস্বীকার করে সে দুটি বিষয়কেই স্বীকার না করা পর্যন্ত অস্বীকারকারী বলেই গণ্য হবে। [আলমুগনী]

যে এসব কিছুই বলে না কিন্তু সলাত আদায় করে বা মুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য কোনো কাজ করে তার ব্যাপারেও ভিন্ন মত আছে।

হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম বলেছেন,

أن الكافر إذ صلى بجماعة يحكم بإسلامه

যদি কোনো কাফির জামাতের সাথে সলাত আদায় করে তবে মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে।

[রদ্দুল মুহ্‌তার]

অর্থাৎ তারা একাকী সলাত আদায় করার মাধ্যমে মুসলিম হয় বলে মনে করেন না। তবে একাকী সলাত আদায় করলেও মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা থেকে একটি রেওয়ায়েত আছে।

[দুরার আল হিকাম]

এ বিষয়ে শাফেঈ মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের মত হলো,

إن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه، وان صلى في دار الاسلام لم يحكم بإسلامه، لانه يحتمل أن تكون صلاته في دار الاسلام للمرأة والتقية

যদি সে কাফিরদের রাষ্ট্রে সলাত আদায় করে তবে মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের গন্ডির মধ্যে সলাত আদায় করলে মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে না যেহেতু সম্ভবনা রয়েছে যে, মুসলিমদের ভয়ে সে এমনটি করছে। [শারহে মুহায্‌যাব]

তাদের মত উল্লেখের পর ইবনে কুদামা আল-হাম্বালী رحمه الله বলেন,

واحتمال التقية والرياء يبطل بالشهادتين

লোক দেখানো বা মুসলিমদের ভয়ের ব্যাপারটি কালেমা পাঠ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ার কারণে

সলাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে না। [৪] [আল মুগনী]

শাফেঈ মাযহাবের কিছু ওলামায়ে কিরাম এবং মালেকী মাযহাবের একদল ওলামায়ে কিরাম সলাত আদায় করাকে কোনো অবস্থাতেই মুসলিম হওয়া বলে গণ্য করেন নি, যেহেতু এটা ইসলামের শাখা-প্রশাখার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

ইবনে আরাবী আল-মালেক্বী ﷺ বলেন "যে ব্যক্তি সলাত আদায় করবে তাকে হত্যা করা হবে না যতক্ষণ না লক্ষ্য করা হয় সে কালেমার স্বাক্ষ্য দেয় কি না। তেমন হলে সে মুসলিম আর অন্যথা হলে সে প্রকৃত কাফির (মুরতাদ নয়)। [আহকামুল কুরআন]

অর্থাৎ তিনি সলাত আদায় করাকে ইসলাম গ্রহণ হিসাবে মনে করেন নি। এ বিষয়ে হাম্বালী মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের মত হলো জামাতের সাথে বা একাকী, দারুল ইসলামে বা দারুল হারবে যেখানেই সলাত আদায় করা হোক তা ইসলাম গ্রহণ বলে গণ্য হবে। যদি না এমন হয় যে, সলাত আদায়কারী ব্যক্তি তার কুফরী ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই সলাত আদায় করে থাকে (যেমন বর্তমানে কাদিয়ানিরা)।

[আল মুগনী]

আমরা এ আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের মতামত সুবিস্তারে বর্ণনা করলাম। এখন এবিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত কোনটি তা নির্ধারণের চেষ্টা করবো ইনশা-আল্লাহ।

এ ব্যাপারে মুহাক্কিক ওলামায়ে কিরামের কথা হলো, ব্যক্তি ও অবস্থা ভেদে এগুলো বিভিন্নরকম হতে পারে। ইমাম শাওকানী ﷺ ইমাম বাগাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

الكافر إذا كان وثنيا ثنويا لا يقر بالواحدانية فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع الأحكام ويبرأ من كل دين خالف الإسلام وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق فإن كان كفره بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج إلى أن يرجع عن اعتقاده

কাফির যদি মূর্তিপুজক হয় অর্থাৎ এক ইলাহতে বিশ্বাসী না হয় তবে কেবল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বললেই সে ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে মনে করা হবে। এর পর তাকে ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান মেনে

---

[৪] অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য বা প্রাণের ভয়ে কালেমা পাঠ করলে মুসলিম হয়েছে বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে আলেমরা একমত হয়েছেন। উসামা ﷺ এর হাদীসটি এ ব্যাপারে দলিল যেহেতু তরবারীর সামনে প্রাণের ভয়ে যে ব্যক্তি কালেমা পাঠ করেছিল তাকে হত্যা করার কারণে রসুলুল্লাহ্ ﷺ উসামা ﷺ কে তিরস্কার করে বলেছেন তুমি তার বুক চিড়ে দেখলে না কেনো? এটা প্রমাণ করে যদি সলাত আদায় করা ইসলাম গ্রহণ হিসেবে গণ্য হয় তবে লোক দেখানোর ভয়ে তা করা হয়েছে কিনা সেটা বিবেচ্য বিষয় হওয়ার কথা নয় যেমনটি কালেমা পাঠের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা হচ্ছে না।

নিতে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। আর যেসব কাফিররা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করে কিন্তু রসুলুল্লাহ ﷺ এর নবুয়তে বিশ্বাস করে না তার ক্ষেত্রে "মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" না বলা পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ সম্পন্ন হবে না। তবে যদি সে রসুলুল্লাহ ﷺ কে নবী হিসাবে বিশ্বাস করে কিন্তু মনে করে তিনি কেবল আরবের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন সে মুসলিম হবে না যতক্ষণ না মেনে নেয় যে তিনি সকল জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন। আর যদি (সে এসব কিছু মেনে নেয়) কিন্তু কোনো ফরজ অস্বীকার করা বা কোনো হারামকে হালাল মনে করার কারণে কাফির হয়ে থাকে তবে তার ক্ষেত্রে মুসলিম হওয়ার জন্য শর্ত হলো এই আক্বীদা বিশ্বাস থেকে ফিরে আসার ঘোষণা দেওয়া।

[নীলুল আওতার]

কোনো কাফির আযান দিলে মুসলিম হবে কিনা এ বিষয়ে ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন,

إن كان عيسويا والعيسوية طائفة من اليهود ينسبون إلى عيسى اليهودي الأصبهاني يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم بالعرب فهذا لا يصير بالأذان مسلما لأنه إذا نطق بالشهادتين اعتقد فيها الاختصاص

যদি সে ব্যক্তি ইসাবী সম্প্রদায়ের লোক হয়। ইসাবী সম্প্রদায় হলো ইয়াহুদীদের একটি দল যারা রসুলুল্লাহ ﷺ এর রিসালাতে বিশ্বাস করে কিন্তু তার রিসালাত কেবলমাত্র আরবের জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করে। এই ব্যক্তি আযান দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে না কারণ সে দুই কালোমা [৫] পাঠ করলেও তার ভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাস অনুযায়ীই তা পাঠ করে থাকে। [৬] [শারহে মুহায্যাব]

সাধারণভাবে আরবীতে "আনা মুসলিম" (انا مسلم) তথা "আমি মুসলিম" বা "আসলামতু" (اسلمت) তথা "আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি" এভাবে বললে উক্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে বোঝা যায় কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে এই ধরণের শব্দের মাধ্যমেও ইসলাম গ্রহণ বোঝায় না। বাহরুর রায়েকে এসেছে,

وَلَوْ قَالَ الْكِتَابِيُّ أَنَا مُسْلِمٌ أَوْ أَسْلَمْت لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَدَّعُونَ ذَلِكَ ؛ لِأَنْفُسِهِمْ

যদি কোনো কিতাবী (ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান) ব্যক্তি বলে আমি মুসলিম বা আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তবে সে মুসলিম হয়েছে এমন বলা যাবে না কারণ তারা সাধারণভাবে নিজেদের মুসলিম বলেই দাবী করে।

[বাহরুর রায়েক]

একই কথা বর্তমানে কাদিয়ানীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা নিজেদের মুসলিম মনে করে কিন্তু রসুলুল্লাহ ﷺ কে শেষ রসুল মনে না করার কারণে তারা কাফির হিসাবে চিহ্নিত। অতএব তারা কালেমা পাঠ

---

[৫] অর্থাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও "মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ"

[৬] যখন সে বলে "মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" তখন এই বিশ্বাসেই বলে যে, তিনি কেবল আরবের জন্য রসুল।

করলে বা আমি মুসলিম এভাবে বললেই মুসলিম হিসাবে পরিগনিত হবে না যতক্ষণ না এমন কিছু বলে যাতে প্রকাশিত হয় যে, সে কাদিয়ানী বিশ্বাস পরিত্যাগ করে রসুলুল্লাহ ﷺ এর আনিত ও সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেছে। যেমন কোনো খ্রিষ্টান হয়তো সরাসরি কাদিয়ানী ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করলো। সে এখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" পাঠ করে, সলাত আদায় করে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে এবং বলে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। একই সাথে সে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী মনে করে। তাদের কালেমা পাঠ, সলাত পড়া বা নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করা ইত্যাদি কোনো কিছুই ইসলাম গ্রহণ হিসাবে গণ্য হবে না। এই খৃষ্টানকে মুরতাদও মনে করা হবে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে সে কখনই ইসলামে প্রবেশ করেনি আর যে কখনই ইসলামে প্রবেশ করেনি সে মুরতাদ হিসাবে গণ্য হতে পারে না। এখন যদি সে সঠিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী একজন মুসলিমকে বলে (انا مسلم مثلك) "আমি তোমার মতো মুসলিম"। তবে সে মুসলিম হয়েছে বলে গণ্য হবে [৭] এবং এ ক্ষেত্রে তার রক্ত ও সম্পদ সংরক্ষিত বিবেচিত হবে। এই ঘোষণা দেওয়ার পর যদি পুনরায় কাদীয়ানী ধর্মবিশ্বাস বা অন্য কোনো কুফরী বিশ্বাসে ফিরে যায় তবে সে মুরতাদ হিসাবে পরিগণিত হবে। তাকে হত্যা করা ফরজ হবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا }

﴾ তোমরা যেভাবে ঈমান এনেছো যদি তারাও সেভাবে ঈমান আনে তবেই তারা পথ পাবে। ﴿

[বাকারা/১৩৭]

দেখা যাচ্ছে একই কথা একজনের জন্য ইসলাম গ্রহণ হিসাবে গণ্য হচ্ছে অন্য জনের জন্য হচ্ছে না। এর কারণ হলো মূলত, ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি কেবল মাত্র কালেমা পাঠ করা বা অন্য কোনো কথা ও কাজের সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং উক্ত কথা ও কাজের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি ধরণের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হচ্ছে সেটাই বিবেচ্য বিষয়। যদি সে ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এটা বলে তবে তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে। ইসলাম গ্রহণ করা বলতে বোঝায় আল্লাহ্ ও রসুলকে মেনে নেওয়া এবং ইসলামের যাবতীয় বিধানাবলীকে সত্যায়ন করা। রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

---

[৭] বাহরুর রায়েকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা নিজেদের মুসলিম বলে দাবী করলেও মুসলিম হিসাবে গণ্য না হওয়ার আলোচনার পরেই বলা হয়েছে, (وَلَوْ قَالَ الذِّمِّيُّ لِمُسْلِمٍ أَنَا مُسْلِمٌ مِثْلُكَ يصير مسلما) "যদি কোনো যিম্মী কাফির কোনো মুসলিমকে বলে আমি তোমার মতো মুসলিম তবে সে মুসলিম হবে।

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِى وَبِمَا جِئْتُ بِهِ

আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আর আমার উপর ও আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

[সহীহ মুসলিম]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

ولا بد مع هذا من الايمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه و سلم كما جاء فى الرواية الأخرى لأبى هريرة هي مذكورة فى الكتاب حتى يشهدوا أن لااله الا الله ويؤمنوا بى وبماجئت به

কালেমার স্বাক্ষ্য দেওয়া, সলাত ও যাকাতকে স্বীকার করে নেওয়ার সাথে সাথে রসুলূল্লাহ্ ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সব কিছুকে মেনে নিতে হবে। যেমনটি আবু হুরাইরা ﵁ বর্ণিত ভিন্ন একটি হাদীসে এসেছে যে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে) যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে এবং আমার উপর ঈমান আনে আর আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর ঈমান আনে।

[শারহে মুসলিম]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্, রসুল, কুরআন, আখিরাতসহ ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানকে সত্যায়ন করার ঘোষণা দেয় সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে। এই ঘোষণা দেওয়ার ভাষা বা ভঙ্গি যাই হোক না কেন। আর যে এই অর্থ উদ্দেশ্য করে না সে মুসলিম হিসেবে গণ্য নয় যদিও সে কালিমা পাঠ করে।

এ কারণে কোনো কাফির যদি তামাশার উদ্দেশ্যে বা মুসলিমরা কি বলে তা অন্যকে শোনানোর জন্য কালেমা পাঠ করে তবে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এমন বলা হবে না। [৮] তাকে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে নিতে বাধ্যও করা হবে না। যতক্ষণ না তার বাহ্যিক অবস্থা এমন হয় যাতে বোঝা যায় সে ইসলামে অনুপ্রবেশ করার উদ্দেশ্যেই এটা বলছে। সেক্ষেত্রে তার অন্তরের অবস্থা যাই হোক তাকে দুনিয়ার বিচারে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে। যদি বাহ্যিক অবস্থায় সে ইসলামে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে উক্ত কথা বলেছে বলে বোঝা যায় কিন্তু পরবর্তীতে সে দাবী করে যে আমি অন্যের কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বা

---

[৮] ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন, (في نطقه بالشهادة ثلاثة أحوال أحدها أن يقولها حكاية بأن يقول سمعت فلانا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا لا يصير مسلما بلا خلاف لأنه حاك كما لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر) "যদি কেউ কালেমার স্বাক্ষ্য দেয় তবে এর তিনটি অবস্থা হতে পারে। প্রথমত হতে পারে সে অন্যের কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এটা করছে। যেমন, সে যদি বলে আমি অমুককে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ" বলতে শুনেছি তবে এই ব্যক্তি মুসলিম না হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই কেননা সে অন্যের কথা বর্ণনা করছে। যেভাবে একজন মুসলিম কোনো কাফিরের কথা বর্ণনা করার মাধ্যমে কাফির হয় না। [শারহে মুহায্যাব]

তামাশার ছলে বলেছি তবে তার এই কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। [৯] কেননা এমন সুযোগ দেওয়া হলে প্রতিটি মুরতাদই এই দাবী করবে।

যাই হোক, মুল কথা হলো কেবল মাত্র কালেমা পাঠ করার মাধ্যমে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে না বরং লক্ষ্য করা হচ্ছে তার বাহ্যিক অবস্থা হতে এটা বোঝা যায় কিনা যে তার উদ্দেশ্য ইসলামে অনুপ্রবেশ করা। অর্থাৎ ইসলামকে নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা এবং এর যাবতীয় বিধি-বিধানকে স্বীকৃতি দেওয়া। অতএব, কালেমা পাঠ ছাড়াও অন্য যেসব কথা বা কাজের মাধ্যমে একই উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয় তা ইসলাম গ্রহণ হিসাবে বিবেচিত হবে। এক কথায়, যে কোনো ভাষা বা ভঙ্গির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ ﷺ যে সহজ-সরল দ্বীন সহকারে প্রেরিত হয়েছেন সেই ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার ঘোষণা দিলেই তাকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে এবং এই ঘোষণার পর সে পুনরায় কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া হবে, প্রয়োজনে হত্যা করা হবে।

এ বিষয়ে স্পষ্ট দলীল হলো, উপরে বর্ণিত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ رضي الله عنه এর হাদীসটি যেখানে আমরা দেখেছি বানু জাযিমার ‘‘আমরা দ্বীন ত্যাগ করলাম’’ এই কথাটি ইসলাম গ্রহণ হিসাবে গণ্য হয়েছে। মুসা عليه السلام এর সময়কার জাদুকররা বলেছিল, ‘‘ আমরা মুসা ও হারুনের রবের উপর ঈমান আনলাম।’’ [ত্বহা/৭০] মৃত্যুকালে ফিরআউন বলেছিল, ‘‘বানু ইস্রাঈলরা যে উপাস্যের প্রতি ঈমান এনেছে আমিও তার প্রতি ঈমান আনলাম’’। [১০] [ইউনুস/৯০]

একটি হাদীসে এসেছে, এসেছে একজন ব্যক্তির উপর একটি মুমিন দাস মুক্ত করা ফরজ ছিল। সে রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট কথা বলতে অক্ষম একটি দাসী সহ হাজির হয়ে বলল এই দাসীটি মুক্ত করলে তার দায়িত্ব সম্পন্ন হবে কিনা। রসুলুল্লাহ ﷺ দাসীটিকে প্রশ্ন করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে হাতের ইশারায় আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল। রসুলুল্লাহ ﷺ আবারো বললেন, আমি কে? সে হাত দ্বারা একবার রসুলুল্লাহ

---

[৯] ইবনে কুদামা رحمه الله বলেন, (كل من تلفظ بالاسلام أو أخبر عن نفسه به ثم انكر معرفته بما قال لم يقبل إنكاره وكان مرتدا نص عليه أحمد في مواضع) ‘‘যে কেউ মুখে ইসলামের ঘোষণা দেয় বা নিজেকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেয় এবং পরে এ বিষয়ে কিছু জানতো না বলে দাবী করে তবে তার এই দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না বরং তাকে মুরতাদ হিসাবে গণ্য করা হবে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল رحمه الله বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টভাবে একথা বলেছেন। [আল মুগনী]

সুতরাং বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের স্বীকৃতি দেওয়ার পর অন্য যে কোনো অজুহাতে তা থেকে প্রত্যবর্তন করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

[১০] ফিরআউনের এই কথা ইসলাম গ্রহণের সঠিক বাক্য ছিল কিন্তু মৃত্যুর আগমুহুর্তে ঈমান কবুল হয় না একারণে এটা গ্রহণযোগ্য হয়নি। এ দিকে ইঙ্গিত করে এই আয়াতের পরের আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন, (آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ) ‘‘এখন! অথচ তুমি পূর্বে অমান্য করেছো’’। [সূরা ইউনুস/৯১]

ﷺ এর দিকে তারপর আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বোঝালো আপনি আল্লাহর রসুল। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি একে মুক্ত করতে পারো। [১১]

সুতরাং যেসব কথা ও কাজ কেবল একজন মুসলিমই বলতে বা করতে পারে এবং সেগুলো বলা বা করার মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যায় যে উক্ত ব্যক্তি দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করেছে সেসব কথা ও কাজ ইসলাম গ্রহণ হিসাবে গণ্য হবে। যেমন মুসলিমদের মতো সলাত আদায় করা, হজ্জ পালন করা ইত্যাদি। তবে যদি প্রমাণিত হয় উক্ত ব্যক্তি এসকল কথা ও কাজের মাধ্যমে ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিত্যাগ করে নির্ভেজাল ইসলামে প্রবেশ করেনি বরং তার ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী কাফির অবস্থায়ই এসকল আমল করে থাকে (যেমন বর্তমানে কাদিয়ানীরা) বা সে তামাশার ছলে এটা করছে তবে তার ক্ষেত্রে এগুলো ইসলাম গ্রহণ হিসাবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না সে এমন কোনো বাক্য ব্যবহার করে যাতে বোঝা যায় সে নিজ বিশ্বাস পরিত্যাগ করে রসুলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রচারিত ও সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক অনুসৃত সঠিক ধর্ম বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন করছে।

⇒ কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা।

এ বিষয়টি উপরোক্ত আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্ত ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন যে, যেসকল কাফিরের সাথে আমাদের কোনো চুক্তি নেই বা তারা জিজিয়া প্রদানকারী জিম্মী কাফিরও নয় তাদের হত্যার ভয় দেখিয়ে বা অন্য কোনোভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হলে এটা গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ এই প্রকারে ইসলামের অনুপ্রবেশের পর পুনরায় বের হয়ে যেতে চাইলে তাকে মুরতাদ সাব্যস্ত করা হবে এবং হত্যা করা হবে। এ বিষয়ে দলীল হলো রসুলুল্লাহ ﷺ এর কথা যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। যেখানে বলা হয়েছে,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ

আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ না তারা বলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’

---

[১১] হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদকে দূর্বল বলেন নি অর্থাৎ তিনি হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। যেহেতু তিনি বলেছেন, এই গ্রন্থের যে হাদীসের ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করবো না সেটা আমার নিকট গ্রহণযোগ্য। আল-হাইছামী মাজমুয়ায়ে যাওয়ায়েদে বলেছেন, (رجاله موثوقون) “এই হাদীসের রাবীরা বিশ্বস্ত”। তবে শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে দূর্বল বলেছেন।

এই বর্ণনাটি হতে বোঝা যায় ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমেও একজন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ প্রকাশিত হতে পারে। সলাত, বা অন্যান্য ইবাদতও কখনও কখনও এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। যখন নিশ্চিত ধারণা হয় যে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়া উক্ত ব্যক্তি এ কাজ করতো না। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

যখন তারা এটা বলবে তাদের রক্ত ও সম্পদ সংরক্ষিত বলে গণ্য হবে। [বুখারী ও মুসলিম]

সহীহ মুসলিমের একটি লম্বা হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ কোনো অভিযান প্রেরণ করলে তার আমীরকে উপদেশ দিয়ে বলতেন,

فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ

তাদের তিনটি বিষয়ের দিকে ডাকো। তার মধ্যে যেটিই তারা গ্রহণ করুক তুমিও সেটি গ্রহণ করো।

এই তিনটি বিষয় হলো, (ক) ইসলাম গ্রহণ (খ) জিজিয়া কর আদায় করা (গ) যুদ্ধ করা। সুতরাং যুদ্ধের মাধ্যমে যাদের ইসলাম কবুলে বাধ্য করা হয় তারা মুসলিম বলেই গণ্য হবে।

ওসামা বিন যায়েদের ঘটনাতেও একই বিষয় প্রমাণিত হয়। তিনি যাকে হত্যা করতে উদ্দ্যত হয়েছিলেন সেই কাফির হঠাৎ কালেমা পাঠ করে বসে। ওসামা ؓ মনে করেছিলেন তরবারীর ভয়ে মুসলিম হওয়ার কারণে এই ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু রসুলুল্লাহ ﷺ একারণে তাকে কঠোর তিরস্কার করেন।[১২] এর স্পষ্ট অর্থ হলো, যাকে হত্যা করা ও আক্রমন করা বৈধ[১৩] তাকে যদি হত্যার ভয় দেখানো হয় এবং সে ভীত হয়ে ইসলামে প্রবেশ করে তবে তার এই ইসলাম গ্রহণযোগ্য হবে। পরবর্তীতে সে ইসলাম পরিত্যাগ করলে তাকে মুরতাদ হিসাবে গণ্য করা হবে।

কানযুদ্দাকাইকের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

وَلَوْ أُكْرِهَ الْحَرْبِيُّ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ صَحَّ إِسْلَامُهُ بِالْإِجْمَاعِ

যদি চুক্তিবিহীন কাফিরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। [তাবঈনুল হাকাইক্ব]

---

(১২) সহীহ বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১৩) ইবনুল আরবী ؒ বলেন, (أن المسلم إذا لقي الكافر لا عهد له جازله قتله) "একজন মুসলিম যখন এমন কোনো কাফিরের সাক্ষাত পায় যার সাথে কোনো চুক্তি নেই তবে তার জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ"। [আহকুমুল কুরআন] মোল্লা আলী ক্বারী আল-হানাফী ইমাম আল খাত্তাবী থেকে বর্ণনা করেন (أَنَّ الْأَصْلَ فِي دِمَاءِ الْكُفَّارِ الْإِبَاحَةُ) "কাফিরদের রক্তের ব্যাপারে মুলনীতি হলো তা বৈধ" [মিরকাতুল মাফাতিহ্] অর্থাৎ চুক্তি বা অন্য কোনো কারণে একজন কাফিরের রক্ত নিষিদ্ধ হয় চুক্তি না থাকলে তা বৈধ। অপর দিকে মুসলিমের রক্তের ব্যাপারে মূল নীতি হলো তা নিষিদ্ধ কোনো কারণে (যেমন বিবাহিত অবস্থায় জেনা ইত্যাদি) তা বৈধ হয়। চুক্তি তিন প্রকার হতে পারে [ক] জিজিয়ার চুক্তি [খ] যুদ্ধ বিরতি বা সন্ধিচুক্তি [গ] ইসলামী রাষ্ট্রে অল্প সময়ের জন্য আশ্রয় গ্রহণের চুক্তি। এই সকল চুক্তির কোনোটিই যে কাফিরের সঙ্গে মুসলিমদের নেই তাকে আক্রমণ করা এবং মুসলিম হতে বাধ্য করা বৈধ। এরা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণের পর দুনিয়ার বিচারে মুসলিম হিসাবেই গণ্য হবে। আর তাদের অন্তারের বিষয় আল্লাহর নিকট।

এটা সেই সকল কাফিরের ক্ষেত্রে যাদের সাথে মুসলিমদের কোনো চুক্তি নেই। পরিভাষায় তাদের হারবী (حربي) বা আহলুল হারব (أهل الحرب) বলা হয়। এদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা সম্পূর্ণ বৈধ এবং এভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। পরবর্তীতে তারা ইসলাম থেকে ফিরে যেতে পারবে না। কিন্তু যাদের সাথে মুসলিমদের চুক্তি রয়েছে যেমন, জিম্মী (ذمي), [১৪] মুস্তা'মান (مستأمن) [১৫] ও মুয়াহিদ (معاهد)। [১৬] কোনো মুসলিম এই শ্রেণীর কাফিরদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করলে যেটা বৈধ না হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু এভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে তা ধার্তব্য হবে কিনা সে বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিমত আছে। হাম্বালী ও শাফেঈ মাজহাবের ওলামায়ে কিরামের মতে এটা ইসলাম গ্রহণ হিসাবে গণ্য হবে না। [১৭] হানাফী মাযহাবের গ্রহণযোগ্য মতে এটা ইসলাম গ্রহণ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং এভাবে মুসলিম হওয়ার পর উক্ত কাফিরকে ইসলাম থেকে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। তাবঈনুল হাক্বাইকে বলা হয়েছে,

أُكْرِهَ الذِّمِّيُّ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ يَصِحُّ إِسْلَامُهُ

জিম্মী কাফিরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হলো ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করলো তবে তার এ ইসলাম গ্রহণযোগ্য হবে।

এখানে প্রথম মতটিই সঠিক। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো যাকে বাধ্য করা হয় তার ইসলাম গ্রহণযোগ্য বলতে ওলামায়ে কিরামের উদ্দেশ্য দুনিয়ার বিধানে তাকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে। তার রক্ত ও সম্পদ সংরক্ষিত বিবেচিত হবে। সে যদি পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায় তবে তাকে মুরতাদ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে। আর তার অন্তরের অবস্থা আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া

---

[১৪] ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত কর দিয়ে বসবাস কারী কাফিররা।

[১৫] ইসলাম সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে অল্প সময়ের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে আশ্রয়গ্রহণকারী কাফিররা।

[১৬] নিজেদের ভূখণ্ডে অবস্থান করেই মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করে যেসব কাফিররা।

[১৭] ইবনে কুদামা ﵀ বলেন, (واذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن فأسلم لم يثبت له حكم الاسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الاكراه عنه) "যাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা বৈধ নয় যেমন যিম্মী বা মুস্তা'মান যদি এমন কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় ফলে সে মুসলিম হয় তবে তার এই ইসলাম ধার্তব্য হবে না। যতক্ষণ না তার মধ্যে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সে বাধ্যবাধকতা দূর হওয়ার পরও স্বেচ্ছায় ইসলামের উপর টিকে ছিলো। [আল মুগনী] তিনি বলেছেন ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেঈর মতও একই। তবে আমরা পরে উল্লেখ করেছি যে হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো এটা ইসলাম গ্রহণ বলে গণ্য হবে।

হবে। রসুলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা রয়েছে।

তিনি বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ وحسابه علي الله

আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ না তারা বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। যখন তারা এটা বলবে তাদের রক্ত ও সম্পদ সংরক্ষিত বলে গণ্য হবে। আর তার হিসাব আল্লাহর কাছে।

[বুখারী ও মুসলিম]

অর্থাৎ এভাবে যুদ্ধের মাধ্যমে যাদের কালেমা পাঠ করতে বাধ্য করা হয় তাদের দুনিয়ার বিধানে মুসলিম মনে করা হবে কিন্তু তাদের অন্তরের হিসাব আল্লাহর নিকট। যদি সে প্রকৃতই ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তবে আখিরাতে মুক্তি পাবে। অন্যথায় আল্লাহর দরবারে কাফির হিসাবে গণ্য হবে এবং জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। আমরা আল্লাহর নিকট এ ধরণের পরিনতি হতে আশ্রয় চাই। আমীন।

১.খ.(২) মুসলিম পিতা-মাতার ঔরসে জন্ম নেওয়ার মাধ্যমে।

সমস্ত ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, মুসলিম পিতা-মাতার ঘরে ভূমিষ্ট শিশু মুসলিম হিসাবেই গণ্য হবে। একইভাবে কোনো কাফির দম্পতি মুসলিম হলে তাদের না-বালেগ পুত্র-কন্যারা মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু পিতা মাতার মধ্যে একজন মুসলিম হলে তার বিধান কি হবে সে বিষয়ে দ্বিমত আছে। ইমাম বুখারী কাজী শুরাইহ ও অন্যান্য তাবেঈ থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেছেন,

إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالوَلَدُ مَعَ المُسْلِمِ

যদি পিতা মাতার যে কোনো একজন মুসলিম হয় তবে সন্তান মুসলিম বলে গণ্য হবে। [সহীহ বুখারী]

এবিষয়ে তাদের দলীল হলো, রসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী (الاسلام يعلو ولا يُعلي) "ইসলাম সবার উপরে, ইসলামের উপরে কিছু বিজয়ী হতে পারে না।" [১৮] অর্থাৎ যখন পিতা মাতার মধ্যে একজন কাফির হয় আর অন্যজন মুসলিম হয় তখন যে মুসলিম সেই বিজয়ী হবে এবং সন্তানের উপর তার বিধান প্রয়োগ করা হবে। এটা ইমাম শাফেঈ ও আহমদ ইবনে হাম্বালের মত। ইমাম আবু হানীফার মতও অনুরুপ তবে তিনি বলেছেন পিতা মাতার মুসলিম হওয়ার কারণে যে সন্তানকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হয় সে

[১৮] দারে কুতনী, বুলুগুল মারাম; ইমাম বুখারী হাদীসটিকে মাওকুফভাবে সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন [ফাতহুল বারী-৩/২২০]। শায়েখ আলবানীও হাদিসটিকে হাসান বলেছেন [ইরওয়াউল গালীল-১২৬৮]

বালেগ হওয়ার পর যদি ইসলাম থেকে ফিরে যায় তবে তাকে পুনরায় মুসলিম হতে বাধ্য করা হবে কিন্তু অন্যান্য মুরতাদের মতো হত্যা করা হবে না। ইমাম মালিক ﵀ বলেছেন সন্তান পিতার ধর্মের অনুসারী হবে। যেহেতু সন্তান পিতার পরিচয়ে পরিচিত হয় এবং তার বংশের দিকে সম্পর্কিত হয় [আল মুগনী] সুফইয়ান ছাওরী বলেছেন যখন সে বালেগ হবে তখন তাকে উভয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এ বিষয়ে তার পক্ষে দলীল হলো আবু দাউদে বর্ণিত একটি হাদীস, যেখানে এসেছে একজন পুরুষ মুসলিম হলে তার স্ত্রী মুসলিম হতে অস্বীকার করে। পরে রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উভয়ে তাদের না-বালেগা কন্যার ব্যাপারে বিচারপ্রার্থী হলে রসুলুল্লাহ ﷺ উভয়কে দুই প্রান্তে রেখে বললেন তোমরা তাকে ডাকো। তারা উভয়ে তাকে ডাকলে প্রথমে মেয়েটি তার মায়ের দিকে ঝুকে যায় রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন হে আল্লাহ তাকে হিদায়েত দাও ফলে মেয়েটি তার বাবার দিকে ঝুকে যায়। এর পর রসুলুল্লাহ ﷺ মেয়েটিকে তার বাবার নিকট ফিরিয়ে দেন। ইবনে কুদামা ﵀ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, (فهو في الحضانة لا في الدين) "এটি ছিলো বাচ্চাটিকে লালন পালনের অধিকারের ব্যাপারে ধর্ম অনুসরণের ব্যাপারে নয়"। [আল-মুগনী] এ ধরণের ব্যাখ্যা ছাড়া কোনো উপায়ও নেই। যেহেতু হাদীসটিতে পিতা মুসলিম হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে আর পিতা মুসলিম হওয়ার পরও মায়ের ধর্মে শিশুকে ফিরিয়ে দেওয়ার মতটি বিরল। তাছাড়া যদি মেনে নেওয়া হয় পিতা মুসলিম হলেও সন্তানকে যে কোনো একটি ধর্ম অনুসরণের সুযোগ দেওয়া হবে তবে কোনো মুসলিম কিতাবী মেয়েকে বিবাহ করলে তার সন্তানের ক্ষেত্রে এ ধরণের রায় প্রযোজ্য হবে যা উক্ত মুসলিমের জন্য অপমান ও লাঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং এ বিষয়ে জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতই সঠিক অর্থাৎ পিতা-মাতার যে কোনো একজন মুসলিম হলে সন্তান মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে।

পিতা-মাতা মুসলিম হওয়ার কারণে সন্তানকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করার অর্থ যদি বালেগ হওয়ার পর উক্ত সন্তান ভিন্ন কোনো ধর্মে প্রত্যাবর্তন করে তবে তাকে মুরতাদ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং ইসলামে ফিরে না আসলে হত্যা করা হবে। ইমাম আবু হানীফা ﵀ উক্ত সন্তান বালেগ অবস্থায় কুফরীতে ফিরে গেলে তাকে হত্যা না করে ভিন্ন কোনো উপায়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করার যে মত দিয়েছেন তার কোনো শারয়ী দলীল পাওয়া যায় না। কেননা আমরা হয়তো তাকে মুসলিম মনে করবো নয়তো তা মনে করবো না। যদি সে মুসলিম হয় তবে কুফরীতে ফিরে যাওয়ার কোনো অধিকার তার নেই। ফিরে গেলে মুরতাদ হিসাবে হত্যার যোগ্য হবে। আর যদি সে মুসলিম না হয় তবে তাকে ঐ পন্থায় বাধ্য করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং অন্যান্য কাফিরদের সাথে যে আচরণ করা হয় তার সাথেও একই আচরণ

করা হবে। [১৯]

যদি পিতা-মাতা মুসলিম হওয়ার পর আবার কাফির হয়ে যায় তবে মুরতাদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ঔরসে যেসব সন্তানের জন্ম হয়েছে তারা না-বালেগ অবস্থায় মুসলিম হিসাবেই গণ্য হবে। যদি এরা বালেগ হওয়ার পর পিতা-মাতার ধর্ম অনুসরণ করে তবে এদের মুরতাদ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মুসলিম হতে বাধ্য করা হবে নতুবা হত্যা করা হবে। যে সন্তান মুরতাদ হওয়ার পূর্বে গর্ভে ছিল কিন্তু ভুমিষ্ঠ হয়েছে মুরতাদ হওয়ার পর তার ব্যাপারে দ্বিমত আছে। ইমাম শাফেঈ বলেছেন তাকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে এবং বালেগ অবস্থায় ভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করলে তাকে মুরতাদ হিসাবে গণ্য করা হবে। হাম্বালী মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম বলেছেন তাকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে না যেহেতু জন্ম গ্রহনের সময় তার পিতা-মাতার কেউই মুসলিম ছিলো না। [২০]

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেঈর মতে মুরতাদ পিতা-মাতার ঔরসে জন্ম নেওয়া সন্তান এবং ইমাম আবু হানীফা ﵀ থেকে এক রেওয়ায়েত অনুসারে ঐ সকল সন্তানদের বংশধরেরাও [২১] মুরতাদ হিসাবে গন্য হবে। যেহেতু তাদের উপর তাদের পিতা-মাতার বিধান প্রয়োগ করা হবে। [২২] এই মতটি সঠিক নয় যেহেতু মুরতাদের সন্তানকে মুরতাদ হিসাবে ঘোষণা করলে বর্তমানে যত কাফির আছে সকলেই

---

[১৯] তাছাড়া হত্যার মাধ্যমে ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায়ে যেমন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, দীর্ঘ সময় আবদ্ধ রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে কাউকে মুসলিম হতে বাধ্য করার কোনো নজীর ইসলামে পাওয়া যায় না। বরং রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) "আল্লাহ ﷾ সব ব্যাপারেই অনুগ্রহ করার আদেশ দিয়েছেন অতএব তোমরা কাউকে হত্যা করার সময়ও উত্তম ভাবে হত্যা করো।" [সহীহ মুসলিম] অতএব মুরতাদকে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে তাকে শারিরিক ও মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে মুসলিম হতে বাধ্য করাও বৈধ। উভয় পদ্ধতির মধ্যে বেশ পার্থক্যও রয়েছে যা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্র অনুধাবনে সক্ষম হবে আশা করি।

[২০] ইবনে কুদামা ﵀ পিতা-মাতার মুরতাদ হওয়ার পর যে সন্তান জন্ম নেয় সেই সন্তান সম্পর্কে বলেন, (لأنه ليس بمرتد نص عليه أحمد) "এই সন্তান মুরতাদ নয় এ বিষয়ে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের স্পষ্ট মন্তব্য রয়েছে।" [আল-মুগনী]

[২১] তাবঈনুল হাক্বাইকে বলা হয়েছে, (وَوَلَدُ الْوَلَدِ يُسْتَرَقُّ وَلَا يُقْتَلُ لِمَا ذَكَرْنَا وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يُجْبَرُ رَوَاهَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَبَعًا لِجَدِّهِ) "মুরতাদের সন্তানদের সন্তানকে দাস বানানো হবে। হত্যা করা হবে না তবে তাকে মুসলিম হতে বাধ্য করা হবে কিনা সে বিষয়ে দুটি রেওয়ায়েত আছে একটি রেওয়ায়েত যা হাসান আবু হানীফা হতে বর্ণনা করেছেন তাতে বলা হয়েছে তার দাদার মতোই তাকেও মুসলিম হতে বাধ্য করা হবে।

[২২] এ বিষয়ে শাফেঈ মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের রায় সম্পর্কে ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন, (وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي أم مرتد والأظهر مرتد والله أعلم) "মুরতাদ পিতা-মাতার সন্তানদের ব্যাপারে দ্বিমত হলো তারা সাধারন কাফির নাকি মুরতাদ। তবে অধিক প্রকাশ্য মত হলো তারা মুরতাদ। [রওদাতুত তালিবিন] এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের রায় হলো (وَيُجْبَرُ الْوَلَدُ عَلَى الْإِسْلَامِ تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ يَتْبَعُونَ الْآبَاءَ فِي الدِّينِ) "মুরতাদের সন্তানকে তাদের পিতাদের মতোই ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে যেহেতু সন্তানদের উপর পিতার বিধানই প্রযোজ্য হয়" [তাবঈনুল হাক্বাইক]

মুরতাদ কারণ আমরা নিশ্চিত জানি তাদের পূর্বপুরুষরা কোনো না কোনো যুগে মুসলিম ছিল যেহেতু একসময় পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। অতএব তাদের পূর্বপুরুষরা ইসলাম পরিত্যাগ করার কারণে মুরতাদ হিসাবে গণ্য আর এরা তাদের ঔরসে জন্মগ্রহণের কারণে মুরতাদ হিসাবে গণ্য। [২৩] আর যদি কেউ মুরতাদের ঔরসে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের মধ্যে কেবল প্রথম প্রজন্মকে কাফির বলে [২৪] তবে পরের প্রজন্মের সাথে প্রথম প্রজন্মের সুস্পষ্ট কোনো পার্থক্য না থাকার কারণে সেটা যৌক্তিক হবে না । তাছাড়া মুরতাদ বলা হয় তাকে যে একবার মুসলিম হওয়ার পর আবার কাফির হয়। আর পিতা-মাতা মুরতাদ হওয়ার পর যে সন্তান জন্ম লাভ করেছে এটা নিশ্চিত যে, সে কখনও মুসলিম ছিল না সুতরাং সে কিভাবে মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে!

এই মাসয়ালার ফলাফল হলো, বর্তমানে যারা কাদিয়ানী মতবাদের অনুসারী তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণের পর বা মুসলিমের ঘরে জন্মলাভ করার পর কাদিয়ানী মতবাদের অনুসারী হয়েছে তারা মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে। কাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণের পূর্বে তাদের ঔরসে যেসব সন্তান জন্মলাভ করেছে তারা যদি উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী হয় তবে তারাও মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে কিন্তু মুরতাদ হওয়ার পর যেসব সন্তান জন্ম নিয়েছে এবং বংশ বিস্তার করেছে তারা মুরতাদ নয় বরং সাধারন কাফির। সাধারন কাফির এর অর্থ হলো এদের মুসলিম হতে বাধ্য করা হবে না বরং যারা সকল কাফিরের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ করার পক্ষে [২৫] তারা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের নিকট হতেও জিজিয়া গ্রহণ করবেন কিন্তু শর্ত হলো

---

[২৩] হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কিরামও বিষয়টি স্বীকার করেছেন ফলে তারা মুরতাদের সন্তানদের মধ্যে কেবল প্রথম প্রজন্মকে মুরতাদ মনে করার মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আল-কাশানী বলেন, (وَلَا يُجْبَرُ وَلَدُ وَلَدِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا يَتْبَعُ الْجَدَّ فِي الْإِسْلَامِ ، إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ الْكُفَّارُ كُلُّهُمْ مُرْتَدِّينَ لِكَوْنِهِمْ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ وَنُوحٍ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَيَنْبَغِي أَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ) "মুরতাদের সন্তানের সন্তানকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে না (অর্থাৎ মুরতাদ হিসাবে গণ্য করা হবে না) কেননা যদি এমন হতই তবে তো সকল কাফেররাই মুরতাদ হিসাবে গণ্য হতো যেহেতু তারা সকলে আদম ও নুহ (عليه السلام) এর সন্তান। সে হিসাবে সকল কাফিরের উপর মুরতাদের বিধান প্রয়োগ করা হতো কিন্তু তা করা হয় না।" [বাদায়িউস-সানায়ি]

[২৪] হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের নিকট এটিই সঠিক মত। [উপরের টিকা দ্রষ্টব্যঃ]

[২৫] ইমাম মালিক ﵀ এর এই মত। তবে ইবনে রুশদ বলেছেন কুরাইশ কাফিরের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ না করার ব্যাপারে সকল আলেমরা একমত। এই রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম মালিকও কুরাইশ কাফিরদের নিকট জিজিয়া গ্রহণ না করার পক্ষে। ইমাম আবু হানীফা ﵀ এর মতে আরব মুশরিকরা ছাড়া অন্য সবার নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ করা যায়। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল ও তাদের অনুসারীদের মতে আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-খৃষ্টান) এবং মাজুসী (অগ্নীপূজক) ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ করা যাবে না। দলীল প্রমাণের উপর চিন্তা-গবেষণা করলে তাদের মতটিই সঠিক মনে হয় যেহেতু জিজিয়ার আয়াতে আহলে কিতাবীদের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে আর মাজুসীদের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ) "তাদের সাথে আহলে কিতাবীদের মতো আচরণ করো" [তিরমিযী] এছাড়া অন্যান্য কাফিরদের ব্যাপারে জিজিয়া গ্রহণ করা বৈধ হওয়ার স্পষ্ট কোনো দলীল পাওয়া যায় না। বরং তাদের ক্ষেত্রে "আমাকে মানুষের

এরা মুসলিম পরিচয় দিতে পারবে না ইসলামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো আমলও করতে পারবে না যেমন সলাত, হজ্জ ইত্যাদি। যেহেতু জিজিয়ার চুক্তিসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম চুক্তি হলো কাফিররা ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের স্বকীয়তা প্রকাশ করে এমন আক্বীদা বিশ্বাস, বেশ-ভুষা, ইত্যাদির সাথে সাদৃশ্যতা রাখতে পারবে না। শামের কাফিররা উমর ইবনে খাত্তাবের সাথে যে চুক্তি করেছিল তাতে স্পষ্টই লেখা ছিল,

ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، في قلنسوة، ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكُنَاهم

আমরা মুসলিমদের পোশাক, টুপি, পাগড়ি, সেন্ডেল, চুলের আচড়ানো ইত্যাদি কোনো ব্যাপারের সাথে সাদৃশ্য রাখবো না। তাদের মতো করে কথা বলবো না। তাদের উপনামের মতো নামও দেবো না।

[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

⇒ সকল সন্তান ফিতরাতের উপর জন্মায় এর সঠিক অর্থ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বললে বিষয়টি অনেকের নিকট অস্পষ্ট থেকে যাবে। অনেকে বলতে পারেন রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (كل مولود يولد علي الفطرة فأبواه يهودانه وينصـرانه ويمجسـانه) “প্রতিটি সন্তানই সহজাত প্রবৃত্তির উপর জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী-খৃষ্টান বা মাজুসী বানায়।” [বুখারী ও মুসলিম] এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ মনে করেন প্রতিটি সন্তান মুসলিম হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে। অতএব তাকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে। অথচ আমরা পূর্বে দেখলাম মুসলিম পিতা-মাতার ঔরসে জন্মগ্রহণকারী সন্তানকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে কাফির পিতা-মাতার ঔরসে জন্মগ্রহণকারী সন্তানকে নয়। এর সমন্বয় কিভাবে করা হবে? প্রকৃত বিষয় হলো আখিরাতের বিধানে কাফির-মুশরিকদের সন্তান-সন্ততিদের পরিনতি সম্পর্কে ব্যাপক দ্বিমত থাকলেও এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই যে, দুনিয়ার বিধানে তাদের মুশরিক হিসাবেই গণ্য করা হবে। এর দলীল হলো রসুলুল্লাহ ﷺ কে রাতে হঠাৎ আক্রমন করে অজ্ঞাতসারে মুশরিকদের স্ত্রী ও নাবালেগ সন্তান নিহত হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, (هم منهم) “ওরা ওদের মধ্যেই অন্তভূর্ক্ত”। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে (هم من آباءهم)”তারা তাদের পিতাদের সাথেই”। [মুত্তাফাকুন আলাইহি]

সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে” রসুলুল্লাহ ﷺ এর এই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং সঠিক মতে কাদিয়ানীদের নিকট হতে কোনো অবস্থাতেই জিজিয়া গ্রহণ করা হবে না যেহেতু তারা আহলে কিতাব নয় অগ্নিপূজকও নয়।

ইমাম নাব্বী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন,

لِأَنَّ أَحْكَامَ آبَائِهِمْ جَارِيَةٌ عَلَيْهِمْ فِي الْمِيرَاثِ وَفِي النِّكَاحِ وَفِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

উত্তরাধিকার, বিবাহ, কিসাস, রক্তমূল্য ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের পিতাদের বিধান অনুসারের তাদের বিবেচনা করা হবে। [শারহে মুসলিম]

ইবনে কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وقد منعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين

আলেমরা মুশরিকদের শিশুদের মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হতে নিষেধ করেছেন। [আল-মুগনী]

অর্থাৎ বিবাহ, কিসাস, দাফন-কাফন ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে কাফিরদের সন্তানদের দুনিয়ার বিধানে কাফির হিসেবেই গণ্য করা হবে।

অতএব, ফিতরাতের উপর জন্মাগ্রহণ সংক্রান্ত হাদীসটির অর্থ মুসলিম হিসাবে জন্মগ্রহণ করা নয়। হাদীসটি অনুধাবন করার জন্য অন্য একটি হাদীসের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অভ্যাস ছিলো ফজরের সময় হঠাৎ আক্রমণ করা। তিনি আযানের শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করতেন। আযান শুনলে আক্রমণ করা হতে বিরত থাকতেন। একবার তিনি আযান শুনতে পেলেন। উক্ত ব্যক্তি যখন বলল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, তিনি বললেন (علي الفطرة) "ফিতরাতের উপর" এর পর যখন সে বলল, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" তখন তিনি বললেন, (خرجت من النار) "তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়েছ" [সহীহ মুসলিম]। দেখা যাচ্ছে, "আল্লাহু আকবার" এই স্বাক্ষের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি ফিতরাতের উপর আছে এমন মন্তব্য করা হয়েছে কিন্তু জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এই মন্তব্য করা হয়নি। পরে যখন সে তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছে তখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ হাদীস থেকে বোঝা যায় ফিতরাত অর্থ ইসলাম গ্রহণ করা বা মুসলিম হওয়া নয়। ইমাম নাব্বী রহিমাহুল্লাহ ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করা সংক্রান্ত হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন,

وَقِيلَ مَعْنَاهُ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِقْرَارِ بِهِ فَلَيْسَ أَحَدٌ يُولَدُ إِلَّا وَهُوَ يُقِرُّ بِأَنَّ لَهُ صَانِعًا وَإِنْ سَمَّاهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ أَوْ عَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ مُتَهَيِّئًا لِلْإِسْلَامِ

এই হাদীসের অর্থে বলা হয়েছে প্রতিটি মানব-সন্তান আল্লাহর পরিচয় ও তার স্বীকৃতির উপর জন্মলাভ করে। এমন কেউই নেই যে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। যদিও তাকে হয়তো ভিন্ন নামে ডাকে বা তার সাথে অন্য কোনো ইলাহর পূজা করে। তবে সঠিক কথা হলো হাদীসে ফিতরাত অর্থ প্রতিটি

মানব-সন্তান ইসলাম গ্রহণের জন্য উপযুক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে জন্মলাভ করে। [শারহে মুসলিম]

অর্থাৎ ফিতরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করা অর্থ মুসলিম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করা নয় বরং মুসলিম হওয়ার মতো স্বচ্ছ মন মানসিকতা দিয়ে জন্ম গ্রহণ করা।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই যেহেতু মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, দুনিয়ার বিধানে তাদের মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে না বরং মুশরিক হিসাবেই গণ্য করা হবে। তারা মারা গেলে তাদের জানাযার সলাত আদায় করা যাবে না। যখন তারা বালেগ হয় এবং নিজ ধর্মে টিকে থাকে তখন তাদের মুরতাদ হিসাবে আখ্যায়িত করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না ইত্যাদি। যদি তাদের প্রকৃতই মুসলিম হিসাবে আখ্যায়িত করা হতো তবে বড় হলে তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হতো। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হতো।

১.খ.(৩) যুদ্ধে বন্দি হওয়ার মাধ্যমে।

মুসলিম হিসাবে গণ্য হওয়ার তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো চুক্তিবিহীন কাফিরের সন্তান বা পরিচয়হীন সন্তান না-বালেগ অবস্থায় যুদ্ধের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে মুসলিমদের হস্তগত হওয়া। ইবনে কুদামা ﵀ আল-মুগনীতে বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

ولا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها أن يسبى منفردا عن أبويه فهذا يصير مسلما إجماعا

এর তিনটি অবস্থা রয়েছে। প্রথমত যদি সে পিতা-মাতার সাথে ছাড়া একাকী বন্দি হয় তবে সে মুসলিম হিসাবে গণ্য হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। [আল-মুগনী]

এরপর তিনি অপর দুটি অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি যা বলেছেন তার সার-সংক্ষেপ হলো, যদি পিতা বা মাতার যে কোনো একজনের সাথে না-বালেগ সন্তান বন্দি হয় তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেঈ ﵀ এর মতে সে মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে না। ইমাম মালিকের মতে পিতার সাথে বন্দি হলে মুসলিম হবে না তবে মায়ের সাথে বন্দি হলে মুসলিম হবে যেহেতু সন্তান পিতার পরিচয়ে পরিচিত হয় যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের মতে পিতা ও মাতার যে কোনো একজন অনুপস্থিত থাকলেই বন্দি না-বালেগ শিশু মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে। এ মাসয়ালাতে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেঈর মতই অধিক সঠিক যেহেতু প্রতিটি শিশুকে দুনিয়ার বিধানে তার পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কিত করাটাই মূলনীতি। তাছাড়া রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ

যে কেউ সন্তান আর মায়ের মাঝে পৃথক করে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সাথে তার প্রিয়জনদের পৃথক

করবেন। [তিরমিযী] (২৬)

এই হাদীসের কারণে ওলামায়ে কিরাম একমত যে, বন্দি হওয়ার পর বা বিক্রির সময় মা ও সন্তানের মধ্যে পৃথক করা হবে না। এই মাসয়ালার আলোকে আমরা বলতে পারি তাদের ধর্মেও কোনো পার্থক্য করা হবে না। অর্থাৎ মায়ের সাথে যে সন্তান বন্দি হয় তাকে তার মায়ের ধর্মেই রাখা হবে। পিতার ক্ষেত্রে এ কথা আরো বেশি প্রযোজ্য। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

যদি না-বালেগ শিশু পিতা-মাতা উভয়ের সাথে বন্দি হয় হবে ইমাম আওযাঈ ছাড়া অন্য সকলের মতে উক্ত শিশু তার পিতা-মাতার ধর্মে থাকবে। তাকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে না। [আল-মুগনী]

দারুল ইসলামের গন্ডির মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া পরিচয়হীন শিশুকেও মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে। এভাবে একবার মুসলিম হিসাবে গণ্য হওয়ার পর সে ইসলাম ত্যাগ করে ভিন্ন কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে না। তেমন কিছু করলে তাকে হত্যা করা হবে। (২৭)

(২) উপসংহার

আলোচনা শেষ করার পূর্বে উপরের আলোচনার শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে পাঠকের সামনে উপস্থাপণ করা জরুরী মনে করি। যাতে পাঠক সেগুলো স্মরণ রেখে বর্তমান সময়ে প্রচলিত ও প্রশিদ্ধ কিছু ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন।

২.(ক) কালেমা পাঠ করা সত্ত্বেও কেউ কাফির হতে পারে কি?

অনেকে মনে করেন, যারা কালেমা তায়্যেবা পাঠ করে এবং নিজেদের মুসলিম বলে দাবী করে তারা অন্য কোনোভাবেই ইসলাম থেকে খারিজ হয় না। এ বিষয়ে তারা রসুলুল্লাহ ﷺ এর বেশ কিছু হাদীস পেশ

---

(২৬) ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদিসটি হাসান-গরীব। শায়েখ আলবানীও হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

(২৭) ইবনে কুদামা ﷺ বলেন, (دار الاسـلام يحكم باسـلام لقيطها ومن لا يعرف حاله فيها وإذا كان محكوما باسـلامه أجبر عليه إذا امتنع منه بالقتل كولد المسلمين) "মুসলিমদের দেশে কুড়িয়ে পাওয়া এবং পরিচয়হীন শিশুকে মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হবে আর যেহেতু তাকে মুসলিম হিসাবেই গণ্য করা হবে অতএব পরবর্তীতে ইসলাম পরিত্যাগ করতে চাইলে তাকে হত্যার ভয় দেখিয়ে ইসলামের উপর টিকে থাকতে বাধ্য করা হবে। যেভাবে মুসলিমদের সন্তানদের বাধ্য করা হয়" [আল-মুগনী] । ইবনে মুনযির বলেন, (وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا أن غسـله ودفنه يجب في مقابر المسلمين) "সকল আলেম একমত হয়েছেন যে মুসলিমদের রাষ্ট্রে যে শিশু মৃত অবস্থায় কুড়িয়ে পাওয়া যায় তাকে গোসল দিতে হবে এবং মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে। " [আলইজমা] ইবনে কুদামা এটা উল্লেখের পর বলেন, (وقد منعوا أن يدفن أطفال المشـركين في مقابر المسـلمين) "অথচ মুসলিমদের কবরস্থানে মুশরিকদের শিশুদের দাফন করতে আলেমরা নিষেধ করতেন।" [আল মুগনী] অর্থাৎ তারা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে মুসলিমই মনে করেছেন। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

করে থাকে যেখানে বলা হয়েছে (من قال لا اله الا الله دخل الجنة) "যে কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" কিন্তু উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মুখে বলা বা আল্লাহকে এক ইলাহ হিসাবে মেনে নেওয়া ও মুহাম্মাদ ﷺ কে রসুল হিসাবে বিশ্বাস করার পরও একজন ব্যক্তি কাফির হিসাবে গণ্য হতে পারে। যদি সে কোনো হারামকে হালাল মনে করে বা হালালকে হারাম মনে করে বা অন্য কোনো কুফরী কাজ করে [২৮] উক্ত ব্যক্তি কাফির হিসাবে গণ্য হবে। এই ধরণের ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওলামায়ে কিরামের মতামত হলো তারা কালেমা পাঠ করলেও মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না যে কারণে তারা কাফির হয়েছে তা হতে ফিরে আসে। যেমনটি আমরা পূর্বে ইমাম বাগাবী ইমাম নব্বী, ইবনে কুদামা ইত্যাদি বরেণ্য ওলামায়ে কিরাম হতে বর্ণনা করেছি। আর যেসব হাদীসে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করলে জান্নাতে প্রবেশের ওয়াদা করা হয়েছে সেখানে শর্ত সাপেক্ষেই একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং সকল প্রকারের শিরক ও কুফর হতে বেঁচে থাকে তার ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য। যেমন অন্য একটি হাদীসে এসেছে, (من صلي البردين دخل الجنة) "যে কেউ ফরজ ও আসরের সলাত পড়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" কোনো সন্দেহ নেই যে, এই হাদীসে কেবল এই দুটি সলাত আদায় করে এবং অন্যান্য সলাতগুলো পরিত্যাগ করে জান্নাতে প্রবেশের ওয়াদা করা হচ্ছে না। বরং শিরক কুফর, অন্যান্য সলাত ও যাবতীয় ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকার শর্তেই এই ওয়াদা করা হচ্ছে। সুতরাং একটি আয়াত বা হাদীসকে বিচ্ছিন্নভাবে নয় বরং অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের সমন্বয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২.(খ) কাফিরদের মুসলিম হতে বাধ্য করা যায় কি?

বর্তমানে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ (!!) খুব বড় গলায় প্রচার করেন, কাউকে জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় না। কিন্তু উপরের আলোচনায় যারা মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন তারা দেখেছেন ইসলাম গ্রহণের যে তিনটি পথ ও পন্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার শেষের দুটিতে ব্যক্তির ইচ্ছার কোনোরুপ গুরুত্ব নেই। কেননা কেউ স্বেচ্ছায় মুসলিম পিতা-মাতার ঘরে জন্মলাভ করেনা অথচ পিতা-মাতা মুসলিম হলেই সবেমাত্র ভূমিষ্ট বাচ্চাকেও মুসলিম হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে এবং বালেগ হওয়ার পরও এই বিধান সে মেনে নিতে বাধ্য থাকছে। এটা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ তাকে দেওয়া হবে না। সেটা করতে চাইলে তাকে নিহত হতে হবে। একইভাবে শিশু অবস্থায় যুদ্ধে বন্দি হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম হিসাবে গণ্য হওয়ায় ব্যাপারে উক্ত শিশুর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো গুরুত্ব নেই। ইসলাম গ্রহণের প্রথম পদ্ধতিটি

---

[২৮] এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশা-আল্লাহ।

যদিও মূলত ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল কিন্তু চুক্তিবিহীন কাফিরকে আক্রমন করে মুসলিম হতে বাধ্য করা হলে যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে এটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কিরাম একমত। এ বিষয়ে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণও রয়েছে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এটাও এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ যেভাবে স্বেচ্ছায় হয় একইভাবে বাধ্য-বাধকতার মাধ্যমেও হয়। যারা এটা অস্বীকার করে তারা দলীল প্রমাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং কাফির-মুশরিকদের কর্তৃক প্রচারিত ভ্রান্ত মতাদর্শে প্রভাবিত ও প্রতারিত একদল নির্বোধ গবেষক। এরা কোরআনের কিছু আয়াতকে প্রসঙ্গ ছাড়া উপস্থাপণ করে মানুষকে বোকা বানিয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর বাণী (لا اكراه في الدين) "দ্বীনের মধ্যে কোনো জবরদস্তী নেই।" [বাকারা/২৫৬] বা (لست عليهم بمصيطر) "আপনি তো তাদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নহেন"। [গাশিয়া/২২] বা আল্লাহর বাণী (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) "আপনি কি মানুষকে মুমিন হতে বাধ্য করবেন!" [ইউনূস/৯৯] এ সমস্ত আয়াত থেকে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা হবে না। অথচ অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে কাফিরদের নিকট হতে অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া গ্রহণ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে [তাওবা/২৯], যে ইসলাম ত্যাগ করে তাকে হত্যা করতে বলা হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্রে কাফিরদের ধর্ম প্রকাশ্যে পালন করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। [২৯] এভাবে কুফরীর কারণে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এমনকি রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ না তারা বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই সকল আয়াত ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী বরেণ্য ওলামায়ে দ্বীনের মতামত ও তাদের অনুসৃত পন্থার দিকে। উপরে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি সেগুলোতে ওলামায়ে দ্বীন ঐক্যমত পোষণ করেছেন আর এগুলোর স্বপক্ষে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ রয়েছে সুতরাং কোনো একটি আয়াত বা হাদীসকে প্রসঙ্গ ছাড়া উপস্থাপণ করে সকল দলীল প্রমাণ ও ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমতকে

---

[২৯] ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন, (بَلْ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالصَّحَابَةُ وَسَائِرُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُظْهِرُوا أَعْيَادَهُمْ فِي دَارِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَهَا سِرًّا فِي مَسَاكِنِهِمْ) "অমুসলিম যিম্মিদের উপর উমর ইবনুল খাত্তাব, অন্যান্য সাহাবারা এবং মুসলিমদের সমস্ত খলীফারা এই শর্ত করতেন যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের ধর্মীয় উৎসব সমুহ প্রকাশ্যে পালন করতে পারবে না বরং তাদের বাড়িতে গোপনে পালন করবে।" [মাজমুউল ফাতাওয়া] ইবনে কাছির তার তাফসীরে লেখেন, (ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدًا؛ ولا نمنع أحدًا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس) "(ইয়াহুদীরা চুক্তিতে লিখেছিল) আমরা আমাদের ধর্ম প্রকাশ্যে পালন করবো না, শিরক কুফরের দিকে কাউকে ডাকব না, আমাদের আত্মিয় স্বজনের মধ্যে যে কেউ মুসলিম হতে চায় আমরা তাকে বাধা দেব না। আর এও যে, আমরা মুসলিমদের সম্মান করবো। যদি তারা আমাদের মসলিসে বসতে চায় আমরা উঠে যেয়ে তাদের স্থান করে দেব।" [তাফসীরে ইবনে কাছির; তাওবা/২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়] এ বিষয়ে পরবর্তীতে আরোও আলোচনা এসেছে।

দূরে নিক্ষেপ করা যাবে না। বরং প্রতিটি আয়াতকে তার সঠিক স্থানে প্রয়োগ করতে হবে। ‘‘দ্বীনের মধ্যে জবরদস্তী নেই’’ আয়াতটি যেসব কাফিরদের নিকট হতে জিজিয়া গ্রহণ করা হবে এবং তারা জিজিয়া দিতে সম্মত হবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু যারা জিজিয়া দিতে নারাজ হয় বা জিজিয়ার শর্তসমূহ যেমন নিজের ধর্মকে প্রকাশ্যে পালন ও প্রচার না করা, নতুন কোনো উপাসনালয় নির্মাণ না করা ইত্যাদি মেনে নিতে অস্বীকার করে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একইভাবে যে শিশু মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া বা মুসলিমদের হাতে বন্দি হওয়ার কারণে মুসলিম হিসাবে গণ্য হয় কিন্তু পরবর্তীতে প্রাপ্ত বয়সে উপনিত হয়ে সে কুফরীতে ফিরে যেতে চায় জবরদস্তী না করা সংক্রান্ত আয়াতটি তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। কারণ তাকে এ কাজে বাধা দেওয়া হবে প্রয়োজনে তাকে হত্যা করা হবে। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (من بدل دينه فاقتلوه) ‘‘যে তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করো’’। [সহীহ বুখারী] এই সকল স্থানে বাধ্য-বাধকতা নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত প্রযোজ্য হবে না বরং এখানে বাধ্য করার বিধানই প্রযোজ্য হবে।

কিভাবে একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে গণ্য হয় সে সংক্রান্ত আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করতে চাই। পরবর্তী অধ্যায়ে কি ধরণের কথা ও কাজের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কাফির হিসাবে গণ্য হয় তথা কুফরী কথা ও কাজ সমূহ কি কি সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশা-আল্লাহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈমান ভঙ্গের কারণ তথা শিরক ও কুফর

(১) পূর্ব কথা

এই গ্রন্থের প্রথমেই আমরা তাওহীদ সংশ্লিষ্ট আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করেছি। এক. কিভাবে একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে গণ্য হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। দুই. কিভাবে একজন মুসলিম কাফির হিসাবে গণ্য হয়। এই অধ্যায়ে আমরা এবিষয়ে আলোচনা করবো ইনশা-আল্লাহ্। তিন. একজন মুসলিমকে কাফির বলার ব্যাপারে কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। এই গ্রন্থের শেষের অংশে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি ইনশা-আল্লাহ্।

১.(ক) ঈমান আনার পর বা মুসলিম হওয়ার পর একজন ব্যক্তি কি আবার কাফিরে পরিনত হতে পারে?

বর্তমান সময়ের বহু সংখ্যক লোক মনে করে জন্মসূত্রে বা কালেমা পাঠ করার মাধ্যমে একবার মুসলিম হওয়ার পর কোনো ব্যক্তিকে আর কাফির বলা যায় না। তার আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকে যতটাই বিকৃতি ঘটুক সে চিরকাল মুসলিমই থেকে যায়। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ কেউ মনে করে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণকারী এবং মুসলিম হিসাবে পরিচিত সকলেই একদিন না একদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে যেহেতু রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তাওহীদপন্থী মুসলিমদের কিছুকাল জাহান্নামে শাস্তি দেওয়ার পর পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এটা ঐ সকল ইয়াহুদীদের মতো যারা দাবী করতো,

{ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا }

﴾ আমাদের খুব অল্পদিনই আগুনে শাস্তি দেওয়া হবে। ﴿ [বাকারা:৮০]

পরবর্তীতে আল্লাহ ﷻ বলেন, “হে রসুল, আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে এ বিষয়ে কোনো চুক্তিপত্র গ্রহণ করেছো?”

প্রকৃত সত্য এই যে, আল্লাহ্ ﷻ কোনো নির্দিষ্ট বংশ বা গোত্রের লোকদের জাহান্নাম হতে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশের সনদ প্রদান করেন নি। বরং জান্নাত-জাহান্নামের ব্যাপারটি তিনি মানুষের আমল-আক্বীদার উপর নির্ভরশীল করেছেন। তাই বংশগতভাবে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই একজন ব্যক্তি জান্নাতের সনদ পেয়ে যায় না। সারাটা জীবন কুফরী আক্বীদা-বিশ্বাস ও কর্মকান্ডে লিপ্ত থেকে মুখে কালিমা পাঠ করলেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। বরং সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী আমল করার নামই হলো ঈমান। এই সকল আক্বীদা-বিশ্বাস যে মেনে নেবে, সে মুসলিম হিসাবে বিবেচিত

হবে। তার জন্ম যদি হিন্দু বা খৃষ্টান ঘরেও হয়। একইভাবে যদি মুসলমানের সন্তান বা কালিমা পাঠ করার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণের পরও কেউ এই সকল আক্বীদা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে শিরক-কুফরে লিপ্ত হয় তবে সে কাফিরে পরিনত হবে। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ}

সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে, আর কিছু হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। যাদের চেহারা অন্ধকারচ্ছন্ন হবে, তাদের বলা হবে তোমরা কি ঈমান আনার পর আবার কাফির হয়ে গিয়েছিলে? অতএব তোমরা যে কুফরী করতে তার বিনিময়ে শাস্তি আস্বাদন করো। [আলে-ইমরান/১০৬]

তিনি আরো বলেন,

{ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }

কাফিররা তোমাদের সাথে সংগ্রাম করতেই থাকবে যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীন থেকে তোমাদের ফিরাতে পারে যদি তারা সক্ষম হয়। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এরপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া-আখিরাতে তার সকল আমল বিনষ্ট হবে। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। [বাকারা/২১৭]

এছাড়া আল্লাহ্ ﷻ সকল মুসলিমকে সতর্ক করে বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }

হে ঈমানদাররা তোমরা আল্লাহকে যথাযোগ্য ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [আলে-ইমরান/১০৩]

এই আয়াতে ঈমানদারদের মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর টিকে থাকতে বলা হচ্ছে, যাতে তারা কিয়ামত দিবসে নিজেদের কর্মফল ভোগ করতে পারে।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

যে কেউ তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করো। [সহীহ বুখারী]

এখানে দ্বীন পরিবর্তন করা বলতে ইসলাম পরিত্যাগ করে কাফির হওয়া বোঝানো হয়েছে। যেহেতু অন্য ধর্ম পরিবর্তন করে ইসলাম গ্রহণ করলে কাউকে হত্যা করার প্রশ্নই ওঠে না।

এই সকল আয়াত ও হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ঈমান আনার পরও একজন ব্যক্তি কুফরী আক্বীদা-বিশ্বাস ও কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে কাফিরে পরিনত হতে পারে।

একারণে সমস্ত মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরাম তাদের গ্রন্থাবলীতে কিতাবুর রিদ্দা (كتاب الردة) নামে পৃথক একটি অধ্যায় রেখেছেন, যার অর্থ দ্বীন ত্যাগ করা। যেখানে কিভাবে একজন মুসলিম কাফিরে পরিণত হয় এবং কাফিরে পরিনত হলে তার সাথে কিরুপ আচরণ করতে হয় সে সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ওলামায়ে কিরাম ঈমান আনার পর কাফির হয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে সর্বনিকৃষ্ট কুফরী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন,

وَكُفْرُ الرِّدَّةِ أَغْلَظُ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ

ইসলাম ত্যাগ করে কাফির হওয়া জন্ম সূত্রে কাফিরের তুলনায় নিকৃষ্ট এ বিষয়ে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

ইমাম আন-নাব্বী ﵀ বলেন,

هي أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكماً

এটা (দ্বীন ত্যাগ করে কাফির হওয়া) সর্ব নিকৃষ্ট কুফরী এবং তার বিধানও অধিক কঠিন। [আর-রাওদা]

এসব কিছুর পরও এমন মনে করার কোনো সুযোগ নেই যে, ঈমান আনার পর কেউ কাফির হতে পারে না।

১.(খ) বাহ্যিকভাবে পরহেজগার মনে হয় এমন ব্যক্তিও কাফির হতে পারে।

যখন বিভিন্ন কুফরী কাজ-কর্মের বিবরণ দেওয়া হয় এবং দেখা যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী বা কয়েকবার হজ্জ করা হাজী ব্যক্তিও কুফরীতে লিপ্ত হয়ে কাফিরে পরিনত হয়েছেন, অনেকে অবাক হয়ে বলেন, যারা রাত-দিন আল্লাহর যিকির করে, নামাজ-রোজা ও হজ্জ-যাকাত আদায় করে তাদের তো ঈমান ঠিকই রয়েছে। তারা আবার কিভাবে কাফির হতে পারে! এদের উদাহরণ এমন ব্যক্তির মতো যে ওযু কিভাবে

করতে হয় তা জানে কিন্তু ওযু ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে জানে না। তাই ওযু করার পর বায়ু নির্গত হলে যদি তাকে বলা হয় তোমার তো ওযু ভেঙে গেছে সে বলে আমি তো হাত-পা ঠিক মতোই ধৌত করেছি এখনও আমার হাত-পা ভিজা রয়েছে এ অবস্থায় ওযু কিভাবে ভেঙে যেতে পারে! অনুরুপভাবে যারা কেবল জানেন কালেমা পাঠ করার মাধ্যমে ইসলামে অনুপ্রবেশ করতে হয় এবং নামায-রোজার মাধ্যমে ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে হয় কিন্তু কিসের মাধ্যমে ঈমান ভঙ্গ হয় সে বিষয়ে না জানার কারণে যখন বলা হয় অমুক ব্যক্তি তো কাফির। সে বলে, তার তো মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ি সে তো পরহেজগার ব্যক্তি সে কিভাবে কাফির হতে পারে!

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }

﴾ যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরী করে তার আমল নষ্ট হয় আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ﴿

[মায়েদা/৫]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরী কাজ-কর্মে লিপ্ত হয় তার সকল আমল বিনষ্ট হয়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে যে, একজন ব্যক্তি যত বেশিই আমল করুক বা যত বড় বুযুর্গই হোক শিরক-কুফরে লিপ্ত হলে তার সকল আমল বিনষ্ট হবে। কারো আমলের কারণে শিরক-কুফর ক্ষমা করা হয় না বরং শিরক-কুফরের কারণে সকল আমল বিনষ্ট হয়। এমনকি নবী-রাসুলদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে,

{ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }

﴾ যদি তারা শিরক করতো তবে তাদের সকল আমল বিনষ্ট হতো। ﴿ [আনয়াম/৮৮]

সুতরাং কারো টুপি-দাড়ি বা জোব্বা-পাগড়ি দেখে এমন মনে করার কোন সুযোগ নেই যে, এই ব্যক্তি যতই শিরক-কুফরে লিপ্ত হোক তাকে কাফির বলা যাবে না।

এ বিষয়ে খারেজীদের ঘটনা স্পষ্ট উদাহরণ। তাদের আমল-অনুশীলন বাহ্যিকভাবে এতটাই সুন্দর ছিল যে, স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ ﷺ তার সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে বলেন,

يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

তোমাদের মধ্যে একদল লোক বের হবে যাদের নামায রোজা ও অন্যান্য আমলের তুলনায় তোমাদের

আমল অনেক কম মনে হবে। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না (অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না)। তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে যেভাবে ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়। [সহীহ বুখারী]

মোট কথা একজন ব্যক্তির আক্বীদা-বিশ্বাস খারাপ হলে তার আমল-আখলাক যতই ভাল হোক তার মাধ্যমে তার মুক্তি সম্ভব নয়।

১.(গ) ঈমান ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে জানার গুরুত্ব।

তৃতীয় আরেকদল লোক আছে যারা ঈমান কিসে ভঙ্গ হয় সে বিষয়ে কোনো আলোচনায় শুনতে নারাজ। তাদের কথা হলো, কে মু'মিন কে কাফির সেটা আল্লাহ ঠিক করবেন সে অনুযায়ী তিনি হাশরের দিন বিচার করবেন এতে আমাদের নাক গলানোর দরকার কি?

এ বিষয়ে তাদের মৌলিক ভ্রান্তি হলো, তারা ঈমান ও কুফরের বিষয়টি কেবল আখিরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বলে মনে করে। তারা এ বিষয়ে জানে না যে, একজন ব্যক্তির মু'মিন হওয়া বা না হওয়ার উপর দুনিয়াবী বিভিন্ন বিধান জড়িত। এটি একদিকে যেমন, খেলাফত, ইমামত, হুদুদ ইত্যাদি সামাজিক ও সামষ্টিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অপর দিকে উত্তরাধিকার, খাদ্য-খাবার ও বিবাহ-শাদীর মতো ব্যক্তিগত বিষয়ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

এ বিষয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা হলো কোন কাফির মুসলিমদের নেতা, রাষ্ট্রপতি বা খলীফা হতে পারবে না। আল্লাহ ﷻ মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলেন, (وأولي الأمر منكم) "তোমাদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয়দের মেনে চলো" [নিসা/৫৯] রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। এরপর তিনি একটি শর্ত উল্লেখ করে বলেন, (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا) "যদি না তার মধ্যে কোনো স্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও" [সহীহ্ মুসলিম]

এই সকল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন যে, কোনো কাফির মুসলিমদের উপর নেতৃত্ব পাবে না। যদি কেউ মুসলিমদের উপর নেতৃত্ব পাওয়ার পর কাফির হয়ে যায় তবে তাকে পদচ্যুত করা ফরজ হবে।

ইমাম আন-নাব্বী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل

ক্বাজী ইয়াদ বলেন, ওলামায়ে কিরাম ইজমা করেছেন যে, মুসলিমদের নেতৃত্বের জন্য কোনো কাফিরকে

মনোনিত করা যাবে না এবং যদি (নেতৃত্ব পাওয়ার পর) সে কাফির হয়ে যায় তবে তাকে পদচ্যুত করতে হবে। [শারহে মুসলিম]

একইভাবে কোনো কাফিরের ইমামতীতে জামাতে সলাত আদায় করা হলে তা শুদ্ধ হয় না। [আলমুগনী, শারহে মুহায্যাব ও অন্যান্য।]

দেখা যাচ্ছে খিলাফত ও ইমামতের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিষয়ে ইসলাম কাফিরদের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ রাখে নি। যদি কোন মুসলিম এই পদে আসীন থাকাকালীন কাফির হয়ে যায় তবে তাকে পদচ্যুত করা আবশ্যক। অতএব, কে কখন কাফির হচ্ছে সে বিষয়ে খোঁজ খবর রাখা সাধারন মুসলিমদের উপর একান্ত কর্তব্য। তা না হলে খিলাফতের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ কাফিরদের অধিকারে চলে যেতে পারে এবং সলাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিয়মনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুন তথা হুদুদ (حدود)। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহ প্রদত্ত দন্ডবিধি (হদ) সমূহের মধ্যে কোন একটি দন্ডবিধি কার্যকর করা আল্লাহর জমিনে ৪০ রাত বৃষ্টি হওয়া অপেক্ষা অধিক কল্যাণকর। [ইবনে মাযা] [৩০]

এই সকল হুদুদ সমূহের মধ্যে একটি হলো, মুরতাদ (দ্বীন ত্যাগকারী) কে হত্যা করা। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (من بدل دينه فاقتلوه) " যে কেউ তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর" [সহীহ বুখারী]

সহীহ্ বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ আবু মুসা আল আশআরীকে ইয়ামেনের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন এবং পরবর্তীতে মুয়াজ ইবনে জাবালকে সেখানে প্রেরণ করেন। মুয়াজ ইবনে জাবাল আবু মুসা আল আশয়ারীর নিকট পৌছালে তিনি তার জন্য আসন পেতে দেন এবং বসতে অনুরোধ করেন। মুয়াজ ইবনে জাবাল লক্ষ করলেন সেখানে একজন ব্যক্তিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করে জানতে পারলেন এই ব্যক্তি ইয়াহুদী ছিল পরে ইসলাম গ্রহণ করে এবং পুনরায় ইয়াহুদী ধর্মে ফিরে যায়। তিনি বলেন "আল্লাহ ও রসুলের বিধান মতে এই ব্যক্তিকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বসতে রাজী নয়" আবু মুসা আল-আশয়ারী তাকে বারবার বসতে অনুরোধ করেন আর তিনি একই কথা বলতে থাকেন। এরপর উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়।

---

[৩০] শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। [সহীহ ইবনে মাযা/২০৫৬]

এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ ও রসুলের পক্ষ হতে নির্ধারিত এই বিধানটি কার্যকর করার ব্যাপারে কত কঠোর ছিলেন। কোন কাজের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি দ্বীন পরিত্যাগ করে কাফিরে পরিনত হয় সে বিষয়ে না জানলে বা সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম না হলে এই বিধানটি কার্যকর করা সম্ভব নয়। তাই এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন।

হুদুদ তথা দন্ডবিধির সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি মাসয়ালা হলো, কোনো কাফিরের; বিশেষত মুরতাদের হত্যার বিনিময়ে মুসলমানের কিসাস হয় না। অর্থাৎ যদি কোনো মুসলিম কোন কাফিরকে হত্যা করে তবে তার বিনিময়ে উক্ত মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

কোন কাফিরের বিনিময়ে কোন মুসলিমকে হত্যা করা হবেনা। [সহীহ বুখারী]

এই বিধান সাধারন ভাবে সকল কাফিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি কোনো মুসলিম কোনো কারণ ছাড়াই কোনো কাফিরকে হত্যা করে তবু তার বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে না। [৩১] ক্ষেত্র বিশেষে রক্ত মুল্য আদায় করতে হবে। আর যদি উক্ত কাফির মুরতাদ হয় তবে তো তাকে হত্যা করা শরীয়তের বিধান পালন করারই নামান্তর তাই তাকে হত্যা করলে উক্ত মুসলিম পুরষ্কার প্রাপ্ত হবে। সেক্ষেত্রে উক্ত মুসলিমকে হত্যা বা অন্য কোনো শাস্তির সম্মুখীন করার প্রশ্নই আসে না।

এখন যদি কেউ না জানে যে, কে মুখে ইসলামকে স্বীকার করে নেওয়ার পর নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে গেছে আর কে মুসলিম অবস্থায় টিকে আছে তবে অন্যায়ভাবে একজন মুসলিমকে একজন কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করার মতো অবিচার করে বসতে পারে।

একইভাবে উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে রসুলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

কোনো মুসলিম কাফিরের ওয়ারিস হবে না এবং কোনো কাফির মুসলিমের ওয়ারিশ হবে না।

[সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম]

এই হাদীসের ভিত্তিতে সকল ওলামায়ে কিরামের মত হলো, কোনো কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হবে না

---

[৩১] ইমাম আবু হানিফা ﵀ এর মতে জিম্মী কাফিরকে হত্যা করার বিনিময়ে কোনো মুসলিমের উপর কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে সাধারণ কাফির বা চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে হত্যার বিনিময়ে কোনো মুসলিমকে হত্যা না করার ব্যাপারে তিনি অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের সাথে একমত হয়েছেন। মুরতাদকে হত্যা করার ক্ষেত্রেও সকল আলেম একমত হয়েছেন।

এবং কোনো মুসলিম কোনো কাফিরের ওয়ারিস হবে না। [৩২] এখানে কে কাফির আর কে মুসলিম পার্থক্য করতে সক্ষম না হলে একজনের প্রাপ্য অন্যকে প্রদান করার মতো অবিচার সংঘটিত হতে পারে।

এছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুরতাদের যবেহ করা পশু খাওয়া নিষিদ্ধ, মুরতাদের সাথে মুসলিম ছেলে-মেয়ের বিবাহ নিষিদ্ধ, কাফির অবস্থায় যে মৃত্যু বরণ করে তার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে আল্লাহর নিকট দোয়া করা বা সামষ্টিকভাবে জানাযার সলাত আদায় করা নিষিদ্ধ ইত্যাদি। এসব বিষয় কুরআন-হাদীস ও ওলামায়ে দ্বীনের ঐক্যমতের মাধ্যমে প্রমাণিত।

এই ধরণের অসংখ্য বিধি-বিধান ঈমান ও কুফরের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যারা বলে, কে নাস্তিক-মুরতাদ হয়ে কাফিরে পরিনত হয়েছে আর কে ঈমানের উপর বহাল আছে এটা বলার অধিকার আমাদের নেই। এ বিষয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজনও নেই বরং আল্লাহ আখিরাতে এটার বিচার করবেন তারা জেনে বা না জেনে ইসলামের অর্ধেকের বেশি বিধি-বিধানকেই অস্বীকার করে বা করতে চায়। এই সকল লোকেরা হয়তো পুরোপুরি নির্বোধ অথবা জেনে-শুনে ইসলামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

(২) ঈমান ভঙ্গের কারণ সম্পর্কিত চারটি মূলনীতি।

উপরে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি সেসব কারণে এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে সকল মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম তাদের গ্রন্থাবলীতে কিভাবে ঈমান ভঙ্গ হয় এবং কিসের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মুসলিম থেকে কাফিরে পরিনত হয় সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারা সাধারন মানুষের মাঝে প্রচলিত কথা-কাজ ও রসম-রেওয়াজের উপর ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে এমন অসংখ্য কুফরী ও শিরকী বিষয়ের সন্ধান পেয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কাফিরে পরিনত হয়। ওলামায়ে কিরামের পরিভাষায় ঐসকল কথা ও কাজকে আল-কুফরীয়্যাত (الكفريات), আলফাজুল কুফর (ألفاظ الكفر) ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়, যার অর্থ কুফরী কার্যকলাপসমূহ। এ বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন হানাফী মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরাম। এমনকি অন্যান্য মাযহাবের ওলামায়ে কিরামও এ বিষয়ে হানাফী ওলামায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। ইমাম নাব্বী রحمه الله বলেন,

في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المقتضية للكفر وأكثرها مما يقتضي إطلاق أصحابنا الموافقة عليه

[৩২] কোনো কাফির কোনো মুসলিমের ওয়ারিশ হবে না এ বিষয়ে সন্দেহাতীতভাবে ইজমা প্রমাণিত আছে। তবে কোনো মুসলিম কোনো কাফিরের ওয়ারিশ হবে কিনা সে বিষয়ে সামান্য দ্বিমত আছে। তবে বেশিরভাগ আলেম এ বিষয়ে উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেছেন।

হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের গ্রন্থাবলীতে কুফরী কার্জকলাপ সম্পর্কে সুবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। তার বেশিরভাগের উপর আমাদের মাযহাবের (শাফেঈ মাযহাবের) ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু তারা সেগুলো নিজেদের গ্রন্থাবলীতে কোনো প্রকার আপত্তি উপস্থাপণ না করেই উল্লেখ করেছেন। [আর-রাওদা]

মোট কথা ঈমান ভঙ্গের কারণ সম্পর্কিত আলোচনায় হানাফী ওলামায়ে কিরাম এতটাই অগ্রবর্তী ছিলেন যে, এমনকি শাফেঈ মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম নিজেদের গ্রন্থাবলীতে তাদের মতামত ব্যাপকভাবে সংযোজন করেছেন। শাফেঈ মাজহাবের ফুকাহায়ে কিরামও বিষয়টি সুবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া মালেকী ও হাম্বালী মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরাম তাদের ফিকহী গ্রন্থাবলীতে পৃথক একটি অধ্যায়ে বা অন্য কোনো অধ্যায়ের অভ্যন্তরে এসব বিষয়ে উপাদেয় আলোচনা করেছেন। তারা ঈমান ভঙ্গ হয় এমন কথা-বার্তা ও কার্যকলাপকে তাদের গ্রন্থে উল্লেখ পূর্বক দলীল প্রমাণসহ সুবিস্তারে সেগুলোর বিধান বর্ণনা করেছেন। যে বিষয়টিকে তারা কুফরী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন তার যথাযোগ্য কারণও বর্ণনা করেছেন। কোনো একটি কথা বা কাজকে কুফরী হিসাবে আখ্যায়িত করার জন্য তারা মূলত চারটি মূলনীতি অনুসরণ করেছেন।

১. ইবাদাতু গয়রুল্লাহ্ (عبادة غير الله) তথা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে উপাসনা করা।

২. আল-ইনকার (الانكار) তথা আল্লাহর দ্বীনের কোনো অংশকে অস্বীকার বা অপছন্দ করা।

৩. আল-ইস্তিহ্ঝা (الإستهزاء) তথা আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে তামাশা তাচ্ছিল্য করা।

৪. আর-রিদা বিল কুফ্রি (الرضا بالكفر) তথা কুফরী কাজের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা।

এখন আমরা এই সকল মূলনীতি সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করবো এবং ওলামায়ে কিরামের গ্রন্থাবলী হতে সেগুলোর উদাহরণ পেশ করবো। সেই সাথে আমাদের বর্তমান সময়ে প্রচলিত কোনো বিষয়ের সাথে তাদের পেশকৃত উদাহরণের সাদৃশ্য থাকলে তা সংযোজন করার চেষ্টা করবো। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

২.(ক) ঈমান ভঙ্গের প্রথম কারণ (عبادة غير الله) তথা গয়রুল্লাহর ইবাদত করা।

এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং গয়রুল্লাহ্র ইবাদত না করা ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। যুগে যুগে নবী-রাসুলগণ মানুষকে এ দিকেই আহ্বান করেছেন। সে কারণে এক আল্লাহর ইবাদত করা আবশ্যক হওয়া এবং গয়রুল্লাহর ইবাদত করা শিরক-কুফর হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত দলিল প্রমাণ উল্লেখের প্রয়োজন নেই। যেহেতু কোনো মুসলিমই এ বিষয়ে অজ্ঞ নয়। গয়রুল্লাহর ইবাদত

করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি যে, মুশরিক ও কাফিরে পরিনত হয় সে বিষয়টিও কারো নিকট অজানা নয়। তবে **'ইবাদত'** শব্দের অর্থ কি, কখন একজন ব্যক্তি গয়রুল্লাহর ইবাদত করছে বলে গণ্য হবে এবং কাফিরে পরিনত হবে, সে বিষয়ে বর্তমান যুগে ব্যাপক অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে। মূলত দুটি ভ্রান্তির কারণে বর্তমান যুগের ইসলামী চিন্তাবিদদের একটি বিরাট অংশ 'ইবাদত' শব্দটির সঠিক অর্থ নিরুপণে ব্যর্থ হয়েছেন। তা হলো,

১. ভাষাভিত্তিক অর্থকে চূড়ান্ত জ্ঞান করে ইবাদতের সংজ্ঞায়নের চেষ্টা করা।

২. আল্লাহর ইবাদত সম্পর্কিত সংজ্ঞাকে সরাসরি গয়রুল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

আমরা প্রথমেই **'ইবাদত'** শব্দের অর্থ নির্ণয়ের ব্যাপারে উপরোক্ত দুটি পন্থার ভ্রান্তি তুলে ধরবো এবং পরবর্তীতে ইবাদত শব্দটির সঠিক অর্থ বর্ণনা করবো ইনশা-আল্লাহ্।

২.ক.(১) ভাষাভিত্তিক অর্থ চূড়ান্ত নয়।

আরবী ভাষায় **'ইবাদত'** (عبادة) শব্দটির অর্থ মূলত কারো আদেশের আজ্ঞাবহ থাকা, তার আনুগত্য করা, তার সামনে বিনয়াবনত হওয়া ইত্যাদি। একারণে আরবীতে দাসকে আবদ (عبد) বলা হয়। যেহেতু সে মনিবের আদেশের অধীন। এই অর্থে মু'সা ﷺ ফিরআউনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, (عبدت بني اسرائيل) "তুমি তো বানী ইস্রাঈলকে দাস বানিয়েছো" [শুয়ারা/২২] ফিরআউনের সম্প্রদায় তাচ্ছিল্যের স্বরে বলেছিল, (أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ) "আমরা কি এমন দুজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করবো যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্বে লিপ্ত রয়েছে।" [মু'মিনুন:৪৭] ইমাম আল-বায়দাবী এই আয়াতে ইবাদত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলেন, (خادمون منقادون كالعباد) " কারো সেবাই নিয়োজিত থাকা এবং তার অধীনে থাকা যেভাবে দাসেরা থাকে।" সুতরাং আয়াতে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, বানী ইস্রাঈল ফিরআউনকে রব মেনে নিয়েছিল কেননা তেমন হলে "তারা আমাদের ইবাদত করে" এভাবে বহুবচনে না বলে বলা হতো "তারা ফিরআউনকে ইবাদত করে" যেহেতু কেবল ফিরআউনই মানুষের নিকট একক ইলাহ্ হিসাবে দাবী করতো। যেমনটি সে বলেছে, (مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي) " তোমাদের জন্য আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য আছে বলে আমি মনে করি না।" [ক্বাসাস/৩৮]

অধিক চলাচলের কারণে সমতল হয়ে যাওয়া রাস্তাকে বলা হয় (طريق معبد) তথা অনুগত রাস্তা। যেহেতু সে পথিককে চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে না ফলে পথিক নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামত তার উপর চলা-ফেরা করতে পারে। বিষয়টি যেন এমন যে, উক্ত রাস্তা তার উপর চলাচলকারী পথিকের ইচ্ছার আনুগত্য করছে। একারণে তাকে অনুগত রাস্তা বলা হয়।

যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং সেটা পাওয়ার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে প্রচেষ্টা করে, তাকে উক্ত বস্তুর দাস বলা যায়। যেহেতু সে তার পিছে ছুটে বেড়াচ্ছে। এ কারণে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ) "টাকা-পয়সার পুজারীরা ধ্বংস হয়েছে" [সহীহ বুখারী]। একজন কবি বলেন, (إني أري مال البخيل عنده معبدا) "আমি তো মনে করি কৃপণ তার অর্থ-সম্পদের পূজা করে" এই অর্থে অনেক সময় প্রেমিককে প্রেমিকার পূজারী বলা হয়।

এছাড়া عَبِدَ – يَعْبَدُ ، عَبَدًا وعَبَدَةً অর্থ অপছন্দ করা বা রাগান্বিত হওয়া। ইবনে আছীর রহ. বলেন,

وفي حديث علي [وقيل له : أنْتَ أمَرْتَ بقَتْل عُثْمان أو أعَنْت على قَتْله فعَبِد وضَمِد] أي غَضِب غضَبَ أنَفَة

হযরত আলী رضي الله عنه কে বলা হলো আপনিই তো উছমান رضي الله عنه কে হত্যা করেছেন বা তার হত্যার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। ফলে তিনি বিরক্ত হলেন এবং রেগে গেলেন। [আন-নিহায়া]

এখানে "আবিদা" (عبِد) শব্দটি অপছন্দ করা বা রেগে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো কোনো মুফাস্‌সির আল্লাহর বাণী (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ) "বলুন যদি রহমানের কোনো সন্তান থাকে তবে আমিই প্রথম ইবাদতকারী" [যুখরুফ/৮১] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় 'আবিদ' (عابِد) শব্দের অনুরুপ অর্থ করেছেন। তারা বলেছেন আয়াতের অর্থ হলো, যদি রহমানের কোনো সন্তান থাকে তবে আমিই সেটা প্রথম অপছন্দ করবো। [কুরতুবী]

আরবী ভাষায় ইবাদত শব্দটি এই সকল অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন-হাদীসে এবং আরবী অভিধানে শব্দটি এই সব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, শারয়ী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে একটি শব্দের শাব্দিক অর্থ চূড়ান্ত নয়, যতক্ষন না জানা যায় শরীয়ত সেটার কোন অর্থকে গ্রহণ করেছে। যেমন, শাব্দিকভাবে সলাত অর্থ দোয়া [আল-মুগনী]। এখন শরীয়তে সলাতকে ফরজ করা হয়েছে এবং সলাতের জন্য ওযুকে শর্ত করা হয়েছে। এ অবস্থায় সলাত শব্দের ভাষাভিত্তিক অর্থের উপর নির্ভর করে এমন বলা আদৌ সম্ভব নয় যে, দোয়া বা যিকির করার জন্য ওযুর প্রয়োজন। একারণে ওলামায়ে কিরাম কোন শব্দের শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করলে পাশাপাশি সেটার শারয়ী অর্থ বর্ণনা করে থাকেন। যেহেতু তারা বিলক্ষণ জানতেন যে, শাব্দিক অর্থ চুড়ান্ত নয়।

⇒ গয়রুল্লাহর আনুগত্য ইবাদত বা শিরক নয়।

বর্তমান যুগের কেউ কেউ ইবাদত শব্দের অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উপরোক্ত মূলনীতিটি অনুসরণ করেন না। তারা ভাষাভিত্তিকভাবে ইবাদত শব্দটি এবং তা হতে নির্গত ও উৎসারিত অন্যান্য শব্দ যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে একত্রিত করে তার উপর শিরক-কুফরের বিধান লাগানোর চেষ্টা করেন। এ ধরণের ভ্রষ্ট

চিন্তা-চেতনার ফলে ইবাদত শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে। এ অস্পষ্টতার একটি সহজ উদাহরণ পেশ করা যায়।

উপরে বর্ণিত আলোচনা সাপেক্ষে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইবাদত শব্দটি ভাষাভিত্তিকভাবে আনুগত্য করা বা অনুগত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ মনে করেছে মূলত আনুগত্য করাই হলো ইবাদত। যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করে সে মুশরিক হয়ে যায়।

তাদের এই সংজ্ঞা শুনে কেউ কেউ বলল, তাহলে শরীয়তে নবী-রাসুল, পিতা-মাতা, আলেম-ওলামা ও ন্যায়পরায়ন নেতৃবর্গের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে কেন? যেমনটি আল্লাহ ﷻ বলেন,

{ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ }

আল্লাহ রসুল ও নেতৃবর্গকে আনুগত্য করো। [নিসা/৬৯]

তাদের নিকট এই প্রশ্নটি খুব সহজ মনে হয়। তারা বলে, এদের আনুগত্য করতে তো স্বয়ং আল্লাহ্ই নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এদের আনুগত্য করা তো আল্লাহকেই আনুগত্য করা। যেমনটি তিনি বলেন, (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) "যে কেউ রসুলের আনুগত্য করে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করে।" [নিসা/৮০] অতএব আল্লাহর আদেশে যাদের আনুগত্য করা হয় তাদের আনুগত্যে সমস্যা নেই। এভাবে বিষয়টিকে আরো বেশি জটিল করার জন্য তারা আনুগত্যকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে থাকে।

১. আল্লাহর আদেশে কারো আনুগত্য করা।

২. কাউকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে আনুগত্য করা।

এই জটিল ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের উপর আর একটি সহজ প্রশ্ন উপস্থাপণ করা যায়। তা হলো, যদি কেউ আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য করে যেমন স্বামীর আদেশে স্ত্রী পর-পুরুষের সামনে নৃত্য করে বা নেতার আদেশে অনুসারীরা চুরি-ডাকাতি করে ইত্যাদি। এখন এই প্রকারের আনুগত্যের বিধান কি হবে? এ ধরণের কাজে কাউকে আনুগত্য করতে তো আল্লাহ নির্দেশ দেন নি। তাহলে এই প্রকারের আনুগত্য কারো উদ্দেশ্যে পেশ করা হলে সেটা কি শিরক হবে?

পাঠককে স্মরণ রাখতে হবে যে, কারো নির্দেশে বা নিজের ইচ্ছায় হারাম কাজ করার মাধ্যমে কোন মুসলিম কাফিরে পরিনত হয় না। এটা সমস্ত ওলামায়ে কিরামের ইজমা। কেবলমাত্র খারেজীরা কবীরা গোনাহে লিপ্ত মুসলিমকে কাফির বলতো। একারণে ওলামায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে তাদের বিদয়াতী ও

পথভ্রষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ওলামায়ে কিরামের স্পষ্ট ভাষ্য হলো, আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য করলেই একজন মুসলিম কাফিরে পরিনত হয় না যতক্ষণ না সে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল ভাবতে শুরু করে।

আল্লাহর বাণী,

{ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }

তোমরা যদি মুশরিকদের অনুসরণ করে চলো তবে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।

[আনয়াম/১২১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরবী আল-মালেকী রহ. বলেন,

إِنَّمَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ بِطَاعَةِ الْمُشْرِكِ مُشْرِكًا إِذَا أَطَاعَهُ فِي اعْتِقَادِهِ : الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ ؛ فَإِذَا أَطَاعَهُ فِي الْفِعْلِ وَعَقْدُهُ سَلِيمٌ مُسْتَمِرٌّ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالتَّصْدِيقِ فَهُوَ عَاصٍ . فَافْهَمُوا ذَلِكَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ{}

একজন মুসলিম মুশরিককে আনুগত্য করে কেবল তখন মুশরিকে পরিণত হবে যখন সে উক্ত মুশরিকের (শিরকী) আক্বীদা-বিশ্বাসকে সঠিক হিসেবে মেনে নেবে। আক্বীদা-বিশ্বাসই মূলত কুফরীর মানদন্ড। যদি তার আক্বীদা-বিশ্বাস অক্ষত থাকে এবং সে তাওহীদের উপর টিকে থাকে কিন্তু কাজে কর্মে তাকে অনুসরণ করে তবে সে পাপী হবে। এ বিষয়টি সর্বস্থানে স্মরণ রাখতে হবে। [আহকামুল কুরআন]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়াতে "তারা তাদের সন্যাসী ও পন্ডিতবর্গকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে" [তাওবা/৩১] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অনুরুপ কথা বলেছেন।

উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে হারাম কাজে কারো আনুগত্য করা হলে সেটা শিরক-কুফর হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা কিন্তু এখানে আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে না। এর উত্তরে হয়তো তারা নিজেদের মনগড়া আরেকটি ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমাদের কথা হলো তাওহীদ শিরকের মতো স্পর্ষকাতর বিষয়ে কোনোরুপ অস্পষ্টতা ও জটিলতার অবকাশ নেই। ইবাদত শব্দের অর্থ আনুগত্য এটা ভাষাভিত্তিকভাবে প্রযোজ্য সেটাকে ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তাওহীদ ও শিরকের ব্যাখ্যায় সেটাকে প্রবেশ করালে যেসব প্রশ্নের সৃষ্টি হয় এবং সেসব প্রশ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যে সময় অকারণে ব্যয় হয় তার চেয়ে অনেক সহজে ইবাদত শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং তার উপর নির্ভর করে শিরক-কুফর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা, যত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই করা হোক সিদ্ধান্ত এটাই হবে যে, কারো আনুগত্য করে একজন ব্যক্তি কখনও কাফিরে পরিনত হয় না যতক্ষণ না সে নিজে অন্য

কোনো কুফরী করে। যেমন কারো মত অনুযায়ী হালালকে হারাম মনে করে বা কারো আদেশে মূর্তিপূজা করে ইত্যাদি। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই সব কুফরী কাজ যদি সে কারো আদেশ ছাড়াই নিজের ইচ্ছানুযায়ী করে তবুও সেটা কুফরীই হবে। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, **শিরক-কুফরের সাথে অন্য কারো আনুগত্য করা বা না করার প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই।** অতএব সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোরও কোনো প্রয়োজন নেই।

২.ক.(২) আল্লাহর ইবাদত ও গয়রুল্লাহর ইবাদত একই বিষয়কে বোঝায় না।

'ইবাদত' শব্দটি উচ্চারিত হলেই আমাদের সামনে সলাত-সওম, হজ্জ-যাকাত, যিকির-তেলওয়াত ইত্যাদি যা কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় সেগুলো ভেসে ওঠে। অর্থাৎ সাধারনভাবে ইবাদত বলতে আমরা আল্লাহর ইবাদতকে বুঝে থাকি। তাই যদি কোন মুসলিমকে বলা হয়, নাচ-গান করা কি ইবাদত? সে বলবে, কখনও না। যদি আবার তাকে বলা হয়, মূর্তিপুজারীরা তাদের মন্দিরে পূজার সময় দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য যে নাচ-গান করে থাকে সেটা কি মূর্তির উদ্দেশ্যে উপাসনা বা ইবাদত হিসাবে গণ্য নয় এবং সেটা কি শিরক নয়? তৎক্ষণাৎ সে বলবে, আমি তো আল্লাহর ইবাদত সম্পর্কে কথা বলছি। তার কথা সত্য। মুসলিমরা বহু পূর্ব হতেই ইবাদত শব্দটি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃত নেক আমল ও প্রসংশিত কর্মকান্ড সম্পর্কে ব্যবহার করে আসছে। তাই যখন শুধুমাত্র **'ইবাদত'** শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তখন মানুষ আল্লাহর ইবাদতই বুঝে থাকে গয়রুল্লাহর ইবাদত নয়। তারা বলে, নামায-রোজা ইবাদত, হজ্জ-যাকাত ইবাদত। অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃত ইবাদত। একইভাবে মদ পান করা, নৃত্য করা এগুলো ইবাদত নয়। অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃত ইবাদত নয়। মোটকথা আল্লাহর ইবাদত বোঝানোর জন্য কেবল 'ইবাদত' শব্দটি উচ্চারণ করাই যথেষ্ট অপরদিকে গয়রুল্লাহর ইবাদত বোঝানোর জন্য **'ইবাদত'** শব্দটির আগে বা পরে এমন ইঙ্গিত থাকা প্রয়োজন যার মাধ্যমে বোঝা যায়, এখানে আল্লাহর ইবাদত নয় বরং গয়রুল্লাহর ইবাদত উদ্দেশ্য। যেমন বলা হবে মূর্তির সন্তুষ্টির জন্য নাচ-গান করা মূর্তির ইবাদত।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন,

الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ : مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ فَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ ؛ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ وَالْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ . وَالْجِهَادُ لِلْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْإِحْسَانُ إلَى الْجَارِ وَالْيَتِيمِ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَمْلُوكِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ وَالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَةِ . وَكَذَلِكَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخَشْيَةُ اللَّهِ وَالْإِنَابَةُ إلَيْهِ . وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ وَالصَّبْرُ لِحُكْمِهِ وَالشُّكْرُ لِنِعَمِهِ وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ ؛ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ وَالرَّجَاءُ لِرَحْمَتِهِ وَالْخَوْفُ لِعَذَابِهِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ هِيَ مِنْ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ

ইবাদত হলো, এমন সকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কথা ও কাজ যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং সেগুলোর উপর তিনি সন্তুষ্ট হন। যেমন: সলাত, যাকাত, সওম, হজ্জ, সত্য কথা বলা, আমানত আদায় করা, পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, ওয়াদা পূর্ণ করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা, কাফের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করা। প্রতিবেশী, ইয়াতীম-মিসকীন, পথিক, দাস ও অন্যান্য মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তুর সাথে ভাল আচরণ করা। দোয়া, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং অন্যান্য ইবাদত সমূহ। একইভাবে আল্লাহ ও তার রসুলকে ভালবাসা, আল্লাহকে ভয় করা এবং তার দিকে তওবা করা, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দ্বীন পালন করা, তার বিধানের উপর সবর করা, তার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা, তার রায়ে সন্তুষ্ট থাকা, তার উপর ভরসা করা, তার দয়ার আশা করা এবং তার শাস্তির ভয় করা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় আল্লাহর ইবাদত হিসাবে গণ্য।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

ইবাদতের এই সংজ্ঞাটি পরিপূর্ণ, সুসংবদ্ধ এবং সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু লক্ষ্যনীয় যে, এখানে “আল্লাহর ইবাদত” সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে “গয়রুল্লাহর ইবাদত” সম্পর্কে নয়। সংজ্ঞাটি যে গয়রুল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এটা দুদিক থেকে প্রমাণ করা যায়। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো।

⇒ ১. আল্লাহর ইবাদত নয় এমন বিষয় ক্ষেত্রবিশেষে গয়রুল্লাহর ইবাদত হিসাবে গণ্য হতে পারে।

যেমন নাচ-গান, জিনা-ব্যাভিচার সহ অন্যান্য অশ্লীল বা অশোভন কাজও মূর্তির নিকট পেশ করা হলে তা মূর্তির ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় যদিও সেগুলো আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক নয়। মূর্তি পূজারীরা মূর্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এধরণের কার্জকলাপ প্রদর্শন করে থাকে। এমনকি পৃথিবীর কোথাও কোথাও মূর্তির উদ্দেশ্যে নর বলি ও কুমারী কন্যা উৎসর্গের মতো অমানবিক কর্মকান্ড সংঘঠিত হয়েছে বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব কোনো কিছুই আল্লাহর নিকট সন্তোষজনক বিষয় নয় এগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত হিসেবে পেশও করা হয় না তবু এসব বিষয় মূর্তির উদ্দেশ্যে করা হলে ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়।

সুতরাং কেবলমাত্র নেক-আমল ও সন্তোষজনক কার্যকলাপই ইবাদত হতে পারে অশালীন ও অশোভন কার্যকলাপ নয়। এটা আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু গয়রুল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

তাছাড়া সংজ্ঞাটির প্রথমেই বলা হয়েছে আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন এবং তাতে সন্তুষ্ট হন তাই ইবাদত। আর জানা কথা যে, মূর্তির ইবাদত হিসাবে যা কিছু করা হয় তা শিরক-কুফর হিসেবে গণ্য। আর আল্লাহ

শিরক-কুফরকে পছন্দ করেন না এবং তাতে সন্তুষ্টও হন না। সুতরাং প্রথম থেকেই গয়রুল্লাহর ইবাদত এই সংজ্ঞার আওতাধীন নয়।

⇒ ২. আল্লাহর জন্য পেশ করা হয় এমন অনেক কিছু গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করা শিরক হিসাবে গণ্য হয় না।

♦ *গয়রুল্লাহর নামে কসম করা শিরক নয়।*

আল্লাহর নামে কসম করা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত একটি ইবাদত। রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) “ যে কেউ কসম করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে অন্যথায় চুপ থাকে “ [সহীহ বুখারী]

তিনি আরো বলেন, (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) “যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করে সে শিরক করে” [আবু দাউদ ও তিরমিযী] (৩৩)

ইবনে রজব আল-হাম্বালী ﵀ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় শিরককে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন,

[ক] যার মাধ্যমে ঈমান ভঙ্গ হয়।

[খ] যার মাধ্যমে ঈমান ভঙ্গ হয় না।

এরপর তিনি দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হিসেবে আমলের ব্যাপারে রিয়া করা, গয়রুল্লাহর নামে কসম করা, ইত্যাদি বিষয়কে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ কোনো কোনো আলেম থেকে বর্ণনা করেন,

فان اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان بذلك الإعتقاد كافرا وعليه يتنزل الحديث المذكور وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه

যার নামে কসম করা হচ্ছে যদি সে তাকে আল্লাহর মতো সম্মান প্রদর্শন করে তবে এই ধরণের কসম অবৈধ হবে এবং সে এই বিশ্বাসের কারণে কাফির হবে। এই হাদীসটি তার উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি সে যার নামে কসম করছে তার ব্যাপারে সৃষ্টি হিসেবে তার যতটুকু সম্মান রয়েছে তার উর্দ্ধে কিছুই মনে করে না তবে সে কাফির হবে না যদিও তার এ কসম যথার্থ বিবেচিত হবে না। [ফাতহুল বারী]

---

(৩৩) ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। শায়েখ আলবানী সহীহ বলেছেন। [সিলসিলাতুস সহীহা/২০৪২]

তিনি আরো বলেন,

والتعبير بقوله فقد كفر أو اشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك

"এখানে অন্য কারো নামে কসম করাকে শিরক বা কুফরী হিসাবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে মূলত অধিক কঠোরতা প্রদর্শনের জন্য (এ জন্য নয় যে, এটা আসলেই শিরক বা কুফর)। যারা অন্য কারো নামে কসম করাকে হারাম মনে করেছেন তারা এ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। [ফাতহুল বারী]

ইবনে কায়্যিম ﷀ বলেন,

أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار

গয়রুল্লাহর নামে কসম করার মাধ্যমে কেউ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। তার উপর কাফিরের বিধানও প্রযোজ্য হয় না। [আহ্কামু তারিকিস্ সলাহ্]

মোট কথা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির নামে কসম করা সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে, তাদের কেউ বলেছেন এটা হারাম অন্যরা বলেছেন বরং মাকরূহ। তবে এ ধরণের কসমকে কেউ কুফর বা শিরক বলেন নি।

♦ *কারো সম্মানে দাড়ানো বা কিয়াম করা শিরক নয়।*

একইভাবে আল্লাহ ﷻ বলেন, (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) "তোমরা আল্লাহর জন্য বিনম্রভাবে দাড়াও" [বাকারা/২৩৮] আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নির্দেশের কারণে কিয়াম (قيام) বা দাড়ানো আল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশকৃত একটি ইবাদত হিসাবে গণ্য। এটা রুকু বা সাজদার মতো সলাতের একটি রুকুন যা ছাড়া সলাত শুদ্ধ হয় না। এমনকি সলাতকে কিয়াম (قيام) নামে অভিহিত করা হয়। এসত্ত্বেও গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে দাড়ানো হারাম নাকি বৈধ সে বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও [৩৪] এটা শিরক বা কুফর হিসেবে গণ্য না হওয়ার ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কিরাম একমত।

♦ *রিয়া শিরক বা কুফর নয়।*

এছাড়া অন্যান্য বহু সংখ্যক বিষয় রয়েছে যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পেশ করা হলে ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করা হলে ইবাদত বা শিরক কুফর বলে গন্য হয় না। যেমন, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, সত্য কথা বলা, আমানত রক্ষা করা, যিকির-তিলাওয়াত,

---

[৩৪] এ বিষয়ে আমরা 'আল-ই'লাম বিহুকমিল কিয়াম' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ও প্রতিবেশীর হক আদায় করা ইত্যাদি। এগুলো যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় তখন তা আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে এগুলো উদাহরণ হিসেবে উল্লেখিত রয়েছে। কিন্তু যখন এসব কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্য তথা লোক দেখানোর মাধ্যমে নাম-জোশ বা অন্যান্য দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য করা হয় তখন এটা গয়রুল্লাহর ইবাদত বা শিরক-কুফর হিসেবে গণ্য হয় না বরং রিয়া (رياء) হিসেবে গণ্য হয়।

রিয়াকার ব্যক্তির ব্যাপারে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হলো, যে আমলে রিয়া সংঘঠিত হয় উক্ত আমলের কোন প্রতিদান সে পায় না তবে তার অন্যান্য আমল বিনষ্ট হয় না বিধায় সেগুলোর প্রতিদান সে পাবে। রিয়া একটি অপরাধ। এর বিধান অন্যান্য পাপী ও অপরাধীর মতোই অথ্যাৎ এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ নয়। শাদ্দাশ ইবনে আওস ﵁ বলেন,

كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الرياء الشرك الأصغر

"রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগে আমরা রিয়াকে ছোট শিরক হিসেবে গণ্য করতাম" [৩৫]

[মুস্তাদরাকে হাকিম]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মারফু ভাবেও বর্ণিত আছে যে, তিনি রিয়াকে ছোট শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন। [৩৬]

[মুসনাদে আহমদ, মিশকাত]

ছোট শিরক বলতে সেই বিষয়কে বোঝায় যা একজন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। ইবনে বাত্তাল বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

والرياء ينقسم قسمين: فإن كان الرياء فى عقد الإيمان فهو كفر ونفاق، وصاحبه فى الدرك الأسفل من النار

"রিয়া দুই প্রকার। যদি কেউ রিয়া তথা লোক দেখানোর জন্য ঈমান আনে তবে এটা হলো কুফরী ও নিফাকী। এই ব্যক্তি জাহান্নামের সর্ব নিকৃষ্ট স্তরে থাকবে।

এরপর তিনি বলেন,

وإن كان الرياء لمن سلم له عقد الإيمان من الشرك، ولحقه شىء من الرياء فى بعض أعماله، فليس ذلك بمخرج

---

[৩৫] হাদীসটিকে আজ-জাহাবী তালখীসে সহীহ বলেছেন।

[৩৬] আল হাইছামী বলেন, (رجاله رجال الصحيح) "এর রাবীরা সহীহ"। শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। [সিলসিলাতুস সহীহা/৯৫১]

من الإيمان إلا أنه مذموم فاعله

যদি কেউ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যই শিরক-কুফর পরিত্যাগ করে ঈমান গ্রহণ করে কিন্তু তার কিছু আমলে রিয়া সংঘঠিত হয় তবে এটা তার ঈমানকে ভঙ্গ করবে না। কিন্তু সে তিরষ্কৃত হবে।

এরপর তিনি এর স্বপক্ষে একটি হাদীস উল্লেখ করেন যেখানে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ রিয়াকারের উদ্দেশ্যে বলবেন,

فما كان لى قبلته، وما لم يكن لى تركته

তুমি আমার জন্য যে আমল করেছ তা আমি গ্রহণ করবো আর লোক দেখানোর জন্য যে আমল করেছ তা বর্জন করবো। [হাদীসটি ইমাম তাবারী বর্ণনা করেছেন]

অর্থাৎ রিয়াকারের সব আমল বিনষ্ট হবে না বরং যে আমলে রিয়া সংঘঠিত হয়েছে সেটা পরিত্যাজ্য হবে। আর অন্যান্য আমল গ্রহণযোগ্য হবে। এটা প্রমাণ করে যে, রিয়ার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি কাফিরে পরিনত হয়না। তেমন হলে তার কোন আমলই গ্রহণযোগ্য হতো না।

এসব কিছু উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, (فلا محالة أن هذا الضرب من الرياء، لا يوجب الكفر) "অতএব কোন সন্দেহ নেই যে, এই প্রকার রিয়া [অর্থাৎ আমলের রিয়া] কুফরী হিসাবে গণ্য নয়।"

ইবনে রজব আল-হাম্বালী رحمه الله বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় শিরককে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন,

[ক] যার মাধ্যমে ঈমান ভঙ্গ হয়।

[খ] যার মাধ্যমে ঈমান ভঙ্গ হয় না।

এরপর তিনি দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হিসেবে আমলের ব্যাপারে রিয়া করা, গয়রুল্লাহর নামে কসম করা, ইত্যাদি বিষয়কে উল্লেখ করেছেন।

তিনি আরো বর্ণনা করেন, হাসানকে বলা হলো, রিয়ার মাধ্যমে কি কেউ মুশরিকে পরিণত হয়? তিনি বললেন, না। তবে যে আমলে রিয়া সংঘঠিত হয় উক্ত আমল পরিত্যাক্ত হয়।

যারা আল্লাহর জন্য কৃত ইবাদত অন্যের উদ্দেশ্যে পেশ করা তাকে ইবাদত করা হিসেবে গণ্য করে তাদের মতে রিয়া শিরক-কুফর হওয়া উচিৎ যেহেতু এখানে আল্লাহর জন্য কৃত ইবাদত অন্যের সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রিয়ার মাধ্যমে কোনো মুসলিম কাফির-মুশরিকে পরিনত হয় না। এটা গয়রুল্লাহর ইবাদত বলেও গণ্য নয়। এ বিষয়টি স্পষ্ট প্রমান করে যে, তাদের মূলনীতি সঠিক নয়।

এই সমস্যার সমাধানে কেউ কেউ রিয়াকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। তারা বলেছে, যদি কেউ কোনো আমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে শুরু করে কিন্তু পরে তাতে রিয়া অনুপ্রবেশ করে তবে সেটা ছোট শিরক হিসাবে গণ্য হবে যাতে কেউ কাফির হয় না। আর যদি কেউ শুরু থেকেই লোক দেখানোর জন্য আমল করে তবে সেটা বড় শিরক হিসেবে গণ্য হবে যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কাফিরে পরিনত হয়।

এই বিশ্লেষণটি একটি নব উদ্ভাবিত বিদয়াত যা স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ও ওলামায়ে কিরামের মতমতের সাথে সাংঘর্ষিক।

আমরা উপরে দেখেছি, রসুলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং তার সাহাবায়ে কিরাম রিয়াকে সামগ্রিকভাবে ছোট শিরক হিসেবে গণ্য করেছেন অর্থাৎ এর মাধ্যমে কেউ কাফিরে পরিনত হয় না। ওলামায়ে কিরাম আমলের ক্ষেত্রে রিয়াকে সর্বাবস্থায় ছোট শিরক মনে করেছেন। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত পাওয়া যায় না। ইবনে কায়্যিমের একটি কথাকে উপরোক্ত মতের স্বপক্ষে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়। তিনি কম পরিমান রিয়াকে (يسير الرياء) ছোট শিরক হিসেবে গণ্য করেছেন। [৩৭] কেউ মনে করেছে এর অর্থ বেশি পরিমান রিয়া শিরক হিসেবে গণ্য। [৩৮] সমস্যা হলো এখানে কম বেশির পরিমান কি হবে সেটা ইবনে কায়্যিম ঠিক করে দেন নি। সেই সুযোগে কেউ কেউ কোনো আমলে শুরু থেকে রিয়া উপস্থিত থাকা বা আমল শুরু করার পর রিয়া সৃষ্টি হওয়াকে এর মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে। আমি মনে করি, যদি এখানে ধরেই নেওয়া হয় ইবনে কায়্যিম ছোট শিরকের উদাহরণে কম পরিমান রিয়ার কথা উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন বেশি পরিমান রিয়া কুফরী হিসেবে গণ্য হবে তবে তিনি কম পরিমান রিয়া বলতে আমলের ক্ষেত্রে রিয়া বুঝিয়েছেন আর বেশি পরিমান রিয়া বলতে ঈমান আনার ক্ষেত্রে রিয়া তথা মুনাফিকদের বুঝিয়েছেন যেমনটি আমরা ইবনে বাত্তালের ব্যাখ্যায় লক্ষ্য করেছি। ইবনে কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ অন্য স্থানে বলেন,

وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر وهو شرك العمل كالرياء

কিছু শিরক এমন রয়েছে যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না তাকে বলা হয় ছোট শিরক এটা হলো আমলের মধ্যে শিরক যেমন রিয়া। [আস-সলাত ও হুকমু তারিকিহা]

এ থেকে বোঝা যায় ইবনে কায়্যুম আমলের মধ্যে রিয়াকে শিরকে আসগার মনে করতেন। এর পরও যদি কেউ দাবী করে, ইবনে কায়্যিম লোক দেখানোর জন্য যে আমল শুরু করা হয় সেটাকে কুফরী মনে করতেন তবে আমরা বলব, এটা স্পষ্ট দলিল প্রমান ও ওলামায়ে দ্বীনের মতামতের বিপরীতে একটি

---

[৩৭] ইগাছাতুল লাহ্ফান, মাদারিযুস্ সালিকীন।

[৩৮] শায়েখ উছাইমিন; কওলুল মুফিদ।

বিরল ও অগ্রহণযোগ্য মত।

◆ ***গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে সাজদা সব সময় ইবাদত বোঝায় না।***

সাজদা আল্লাহর জন্য কৃত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সমূহের একটি। এতদসত্ত্বেও গয়রুল্লাহকে সাজদা করা নিশ্চিতভাবে তার ইবাদত করা হিসাবে গণ্য নয়। এ বিষয়ে সর্বাধিক স্পষ্ট প্রমাণ আদম عليه السلام এর উদ্দেশ্যে ফেরেস্তাদের সাজদা এবং ইউসূফ عليه السلام এর উদ্দেশ্যে তার ভ্রাতাদের সাজদা। উভয় ঘটনাই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে। এখানে এমন বলা চলে না যে,

"এ হচ্ছে আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ত যা আমাদের উপর প্রযোজ্য নয়।"

একথা হালাল-হারামের বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেহেতু বিভিন্ন নবীর শরীয়তে হালাল-হারামের বিধান বিভিন্ন রকম হতে পারে কিন্তু গয়রুল্লাহর ইবাদত এমন একটি বিষয় যা সকল শরীয়তেই নিষিদ্ধ ছিল এবং অনাদী ও অনন্ত কাল ধরে সেটা নিষিদ্ধই থাকবে। এ বিষয়ে কুরআনে কারীমে বহু সংখ্যক আয়াত দলীল হিসাবে পেশ করা যায় যেখানে বলা হয়েছে, সকল নবী-রসুল মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে ও তিনি ছাড়া সকল কিছুর ইবাদত পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে সর্বাধিক স্পষ্ট আয়াতটি হলো,

{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ }

﴾ তোমার পূর্বে আমি যে রসূলকেই প্রেরণ করেছি তার প্রতি এই ওহী করেছি যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, অতএব কেবল আমারই ইবাদত করো। ﴿ [আম্বিয়া/২৫]

অতএব, গয়রুল্লাহর ইবাদত করা কোন শরীয়তেই বৈধ ছিল না। সুতরাং সাজদা নিজেই ইবাদত হিসেবে গণ্য হলে কোনো শরীয়তেই তা আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য পেশ করা বৈধ হতো না।

এখানে আরেকটি লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, যেসব ফেরেস্তারা আদম عليه السلام কে সাজদা করেছিল তারা আল্লাহর ইবাদত হিসেবেও সাজদা করে থাকে। [আ'রাফ:২০৬]

একই ভাবে ইউসূফ عليه السلام এর পিতা ইয়াকুব عليه السلام এর বংশধরেরা যারা ইউসুফ عليه السلام এর উদ্দেশ্যে সাজদা অবনত হয়েছিল তারাও ইবাদত হিসেবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাজদা করতো।

আল্লাহ سبحانه وتعالى বলেন,

{وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا}

আর ইব্রাহীম ও ইসরাইল (ইয়াকুব) এর বংশধরদের আমি সুপথ প্রদর্শন করেছি এবং তাদের পছন্দ করেছি। যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় সাজদা অবনত হয়। [মারইয়াম/৫৮]

সুতরাং এমন বলার কোন সুযোগ নেই যে, তাদের শরীয়তে সাজদা আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃত ইবাদত হিসেবে গণ্য হতো না।

এ বিশ্লেষনের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন কিছু ইবাদত হিসেবে পেশ করা হলেই সেটা গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করা গয়রুল্লাহর ইবাদত বা শিরক-কুফর হিসেবে গণ্য হবে এমন নয়।

যারা অন্য কোনো বিবেচনা ছাড়াই সাজদাকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ইবাদত মনে করেন তারা এই দুটি ঘটনাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সাজদা বলতে প্রচলিত সাজদা তথা মাটিতে মাথা ঠেকানো বোঝানো হয়নি বরং সামান্য মাথা নোয়ানো বা এ ধরণের কিছু বোঝানো হয়েছে। আল-কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী তাদের এই মতকে খন্ডায়ন করে। যেহেতু দুটি ঘটনার বর্ণনাতেই সাজদায় পড়ে যাওয়া বা সাজদায় পতিত হওয়ার কথা বলা আছে। আর পতিত হওয়া বা পড়ে যাওয়া বলতে মাটিতে মাথা স্পর্শ করা ছাড়া অন্য কিছু বোঝায় না। আদম ﵇ কে সাজদা করার আদেশ দিয়ে ফেরেস্তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ}

তার উদ্দেশ্যে সাজদায় পতিত হও [হিজর/২৯, সদ/৭২]

ইউসুফ ﵇ এর ঘটনাতে বলা হয়েছে,

{وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا }

তারা তার উদ্দেশ্যে সাজদায় পড়ে গেল। [ইউসুফ/১০০]

তাছাড়া কুরআন বা হাদীসে যখন কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন শব্দটির প্রচলিত অর্থই উদ্দ্যেশ্য হবে এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ কোন কারণ ছাড়া শব্দটির ভিন্ন ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নয়। যারা সাজদা ও ইবাদতকে একই জিনিস মনে করে ভুল করেন, তারা এখানে ভিন্ন ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। যদি তারা সাজদা ও ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতেন তবে তাদের নিকট এই ঘটনা কোন জটিলতা সৃষ্টি করতো না এবং এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ারও কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকতো না। একারণে ইমাম ইবনে

তাইমিয়া ﷺ তাদের মতামত খন্ডায়নের উদ্দেশ্যে সাজদা ও ইবাদতের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কাউকে সাজদা করা হলেই তাকে ইবাদত করা হয় এমনটি নয়। একটু সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা তার কথা বিস্তারিত বর্ণনা করবো ইন-শাআল্লাহ।

কেউ কেউ বলেন, এখানে আসলে আদম عليه السلام বা ইউসুফ عليه السلام কে কিবলা করে আল্লাহকে সাজদা করা হয়েছিল যেভাবে কা'বাকে কিবলা করে আল্লাহকে সাজদা করা হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন,

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْأَغْبِيَاءِ : إِنَّ السُّجُودَ إِنَّمَا كَانَ لِلَّهِ وَجَعْلِ آدَمَ قِبْلَةً لَهُمْ يَسْجُدُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَسْجُدُ إِلَى الْكَعْبَةِ

কিছু নির্বোধ লোক বলেছে সাজাদা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ছিল আর আদম عليه السلام ছিলেন কিবলা স্বরুপ যেভাবে কা'বাকে কিবলা করে সাজাদা করা হয়।

এরপর তিনি সুস্পষ্টভাবে এই মত খন্ডায়ন করে বলেন,

أَنَّ السُّجُودَ كَانَ لِآدَمَ بِأَمْرِ اللَّهِ وَفَرْضِهِ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُسْمَعُ قَوْلُهُ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وُجُوهٌ :أَحَدُهَا: قَوْلُهُ لِآدَمَ : وَلَمْ يَقُلْ : إِلَى آدَمَ

গ্রহণযোগ্য সকল ওলামায়ে কিরামের ইজমা যে, সাজদা আল্লাহর নির্দেশে আদম عليه السلام এর উদ্দেশ্যেই ছিল। এ বিষয়ে বেশ কিছু প্রমাণ দেওয়া যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, (لآدم) "আদমের উদ্দেশ্যে (সাজদা করো)" তিনি (الي آدم) "আদমের দিকে (সাজদা করো)" এমন বলেননি (আদমকে কিবলা করা উদ্দেশ্য হলে আদমের উদ্দেশ্যে সাজদা করো এমন বলার পরিবর্তে আদমের দিকে সাজদা করো এভাবে বলাই সঙ্গত ছিল।)

এর পর তিনি বিস্তারিত দলিল প্রমাণের মাধ্যমে সাজদা ও ইবাদতের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

তিনি বলেন,

وَقَدْ كَانَتْ الْبَهَائِمُ تَسْجُدُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَهَائِمُ لَا تَعْبُدُ اللَّهَ . فَكَيْفَ يُقَالُ يَلْزَمُ مِنْ السُّجُودِ لِشَيْءٍ عِبَادَتُهُ

অবলা জন্তু জানোয়ার রসুলুল্লাহ ﷺ এর উদ্দেশ্যে সাজদা অবনত হতো। এরা তো আল্লাহকেও ইবাদত করে না (অর্থাৎ ইবাদতের বাহ্যিক বিষয়টি তাদের উপর প্রযজ্যই নয়) তাহলে কিভাবে বলা যায় যে, কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে সাজদা করা অর্থ তার ইবাদত করা!

এরপর তিনি রসুলুল্লাহ ﷺ এর ঐ হাদীসটি উল্লেখ করেন যেখানে তিনি বলেন,

وَلَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ لَأَمَرْت الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

আমি যদি কাউকে সাজদা করতে আদেশ করতাম তবে স্ত্রীকে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজদা করতে আদেশ করতাম। [তিরমিযী] (৩৯)

হাদীসটি উল্লেখ করার পর তিনি বলেন,

وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ :لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَعْبُد

রসুলুল্লাহ ﷺ এমন বলেন নি যে, ''আমি যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদত করতে আদেশ করতাম তবে স্ত্রীকে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে ইবাদত করতে বলতাম।''

সবশেষে তিনি সাজদা ও ইবাদতের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য নিরুপণ করে বলেন,

أَمَّا الْخُضُوعُ وَالْقُنُوتُ بِالْقُلُوبِ وَالِاعْتِرَافُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ فَهَذَا لَا يَكُونُ عَلَى الْإِطْلَاقِ إلَّا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحْدَهُ وَهُوَ فِي غَيْرِهِ مُمْتَنِعٌ بَاطِلٌ . وَأَمَّا السُّجُودُ فَشَرِيعَةٌ مِنْ الشَّرَائِعِ إذْ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نَسْجُدَ لَهُ وَلَوْ أَمَرَنَا أَنْ نَسْجُدَ لِأَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ غَيْرِهِ لَسَجَدْنَا لِذَلِكَ الْغَيْرِ طَاعَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

অন্তরের বিনম্রতা, রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের স্বীকৃতি কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে পারে না। তবে সাজদা হলো অন্যান্য বিধি-বিধানের মতো একটি বিধান। আল্লাহ যখন আমাদের তার উদ্দেশ্যে সাজদা করতে আদেশ করেন আমরা তা পালন করি। আবার যদি তিনি সৃষ্টির অন্য কাউকে সাজদা করতে আদেশ করেন আমরা তার নির্দেশ মান্য করার স্বার্থে উক্ত সৃষ্টিকে সাজদা করবো।

[মাজমুউল ফাতাওয়া]

ইউসূফ ﷺ এর উদ্দেশ্যে তার ভাইদের সাজদা করার বিষয়টিকেও ওলামায়ে কিরাম একইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেছেন, এ সাজদা ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছিল না বরং তা ছিল সম্ভাষণ বা সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে।

ইমাম আল-কুরতুবী বলেন,

{ وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة}

সমস্ত মুফাস্‌সিরীনে কিরাম ইজমা করেছেন যে, ইউসূফ ﷺ এর উদ্দেশ্যে সাজদা যেভাবেই করা হোক তা করা হয়েছিল সম্ভাষণ হিসেবে, ইবাদত হিসেবে নয়। [আল-কুরতুবী]

(৩৯) শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। [সহীহা/৩৩৬৬]

ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে কাছীর প্রমুখ মুফাস্‌সিরীনে কিরাম অনুরুপ কথা বলেছেন। তারা এখানে সম্ভাষণের সাজদা ও ইবাদতের সাজদার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা বলেছেন, আদম ﷺ এর যুগ হতে রসুলুল্লাহ ﷺ এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সকল শরীয়তে এ ধরণের সাজদা বৈধ ছিল।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, কারো উদ্দেশ্যে সাজদা করলেই যে তাকে ইবাদত করা হবে এমন নয়। বরং কখনও তা ইবাদতের উদ্দেশ্যে হয় আবার কখনও অন্য উদ্দেশ্যে হয়। ইবাদতের উদ্দেশ্যে গয়রুল্লাহকে সাজদা করা অবশ্যই শিরক ও কুফর হিসেবে চিহ্নিত। এটা ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে অন্তভূর্ক্ত যা কোনো শরীয়তেই পরিবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবলমাত্র সম্ভাষণ ও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যে সাজদা করা হয় সেটা সাধারণ বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্কিত বিষয় যা বিভিন্ন শরীয়তে বিভিন্ন রকম হতে পারে। পূর্ববর্তী শরীয়তে এ ধরণের সাজদা বৈধ ছিল কিন্তু বর্তমানে তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একারণে ওলামায়ে কিরামের ইজমার মাধ্যমে রাজা-বাদশা বা অন্য কাউকে সম্ভাষণের উদ্দেশ্যে সাজদা করা নিষিদ্ধ বা হারাম হিসেবে গণ্য হলেও তাদের বেশিরভাগ এটাকে কুফরী হিসেবে গণ্য করেন নি। যেহেতু কোন কিছু নিষিদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সেটা হারাম প্রমাণিত হয় শিরক বা কুফরী নয়। সকল অবৈধ কার্যকলাপের ব্যাপারেই একথা প্রযোজ্য। যেমন, মদ পান করা, সুদ খাওয়া, জিনা করা ইত্যাদি।

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে এ বিষয়ে হানাফী ওলামা মাশায়েখদের মন্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে,

إذا سجد واحد لهؤلاء الجبابرة ، فهو كبيرة من الكبائر ، وهل يكفر ؟ قال بعضهم : يكفر مطلقا ، وقال أكثرهم : هذا على وجوه إن أراد به العبادة يكفر ، وإن أراد به التحية لم يكفر ، ويحرم عليه ذلك

যখন কেউ এই সকল রাজা-বাদশাদের উদ্দেশ্যে সাজদা করে তবে এটা কবীরা গোনাহ হবে। কিন্তু সে কি কাফির হবে? কেউ কেউ বলেছেন কাফির হবে তবে তাদের বেশিভাগ অংশ বলেছেন, এটা বিভিন্ন রকম। যদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে করে তবে কাফির হবে আর যদি সম্ভাষণের উদ্দেশ্যে করে কাফির হবে না কিন্তু এটা করা অবৈধ হবে।

শাফেঈ মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের মত বর্ণনা করে ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا لا يوجب الكفر وان كان ممنوعا

এভাবে গয়রুল্লাহর জন্য বিনম্রতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সাজদা করা কুফরী নয় যদিও এটা নিষিদ্ধ।

[আল-মাজমু]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া # বলেন,

وَأَمَّا وَضْعُ الرَّأْسِ عِنْدَ الْكُبَرَاءِ مِنْ الشُّيُوخِ وَغَيْرِهِمْ أَوْ تَقْبِيلُ الْأَرْضِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي النَّهْيِ عَنْهُ بَلْ مُجَرَّدُ الِانْحِنَاءِ بِالظَّهْرِ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ

মহান ব্যক্তিদের সামনে (মাটিতে) মাথা রাখা বা মাটিতে চুমা দেওয়া সম্পর্কে সকল ওলামায়ে কিরাম একমত যে, এটা নিষিদ্ধ। বরং গয়রুল্লাহর সামনে সামান্য মাথা নত করাও নিষিদ্ধ।

এরপর তিনি উমর ইবনে আব্দুল আজীজ থেকে বর্ণনা করেন,

قَدْ وَكَّلَ أَعْوَانًا يَمْنَعُونَ الدَّاخِلَ مِنْ تَقْبِيلِ الْأَرْضِ وَيُؤَدِّبُهُمْ إذَا قَبَّلَ أَحَدٌ الْأَرْضَ

তিনি খলীফা থাকা কালীন কিছু লোক নিয়োগ করেছিলেন। যারা দরবারে আগমনের সময় মাটিতে চুমা দিতো তাদের বিরত রাখার উদ্দেশ্যে। তারা ঐ সকল লোকদের প্রহার করতো। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এই সব লোকদের কাফির মনে মনে করেন নি। তেমন মনে করলে তিনি এদের মুরতাদ হিসেবে হত্যা করার নির্দেশ দিতেন।

ইমাম শাওকানী ﷫ গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে সাজদা করা কখন কুফরী হবে সে প্রসঙ্গে বলেন,

فلا بد من تقييده بأن يكون سجوده هذا قاصدا لربوبية من سجد له فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عزوجل وأثبت معه آلاها آخر وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع كثيرا لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه يقبل الأرض تعظيما له فليس هذا من الكفر في شيء

এখানে অবশ্যই একটি শর্ত যুক্ত করতে হবে আর তা হলো, যার উদ্দেশ্যে সাজদা করা হচ্ছে তার রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সাজদা করা। এই ধরণের সাজদা যে করে সে আল্লাহর সাথে শিরক করে এবং তার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু যে শুধুমাত্র সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সাজদা করে যেমন, অনারব রাজা-বাদশাদের দরবারে যারা গমণ করে তারা প্রায়ই করে থাকে। তারা উক্ত রাজা-বাদশাদের সম্মানে তাদের সামনে মাটিতে চুমু দেয়। এর সাথে কুফরীর কোন সম্পর্ক নেই। [আস্‌সাইলুল যায়্যার]

এ ধরণের সাজদা সম্পর্কে আজ-জাহাবী বলেন,

لا يُكَفَّرُ بِهِ أَصْلا، بَلْ يَكُونُ عَاصِيًا فَلْيَعْرِفْ أَنَّ هَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ

এ কারণে সে কাফির হবে না তবে পাপী হবে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এটা নিষিদ্ধ কাজ।

[মু'জামুশ্‌ শুয়ূখ]

উপরে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, সত্য কথা বলা, প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করা, কসম, কিয়াম ইত্যাদি যা কিছুর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা হয় সেগুলো গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করা গয়রুল্লাহর ইবাদত হিসেবে

গণ্য নয়। এমনকি সাজদার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করা সর্বাবস্থায় গয়রুল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়।

এই আলোচনার আলোকে আমরা স্পষ্ট বলতে পারি, আল্লাহর জন্য যা কিছু ইবাদত হিসেবে করা হয় তার কোন কিছু গয়রুল্লাহকে পেশ করা হলেই তা গয়রুল্লাহর ইবাদত তথা শিরক হিসেবে গণ্য হবে এই মন্তব্য যথার্থ নয়।

♦ ***গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করার বিষয়ে ইবাদতের উদ্দেশ্য থাকা বা না থাকার পার্থক্য।***

আল্লাহর নামে ও তার উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা একটি গুরত্বপূর্ণ ইবাদত। আর গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা একটি নিকৃষ্ট হারাম কাজ হিসাবে গণ্য। এধরনের পশুর মাংসও খাওয়া হারাম। আল্লাহ ﷻ যেসব পশুর মাংস হারাম সে সম্পর্কে বলেন, (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) “আর যে পশুকে গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎস্বর্গিত করা হয়” [মায়েদা/৩] রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ) “ যে গয়রুল্লাহর নামে পশু যবেহ করে তার উপর আল্লাহর অভিসাপ” [সহীহ মুসলিম]

এতদসত্ত্বেও ওলামায়ে কিরাম পশু যবেহ করার সময় গয়রুল্লাহর নাম নেওয়া বা গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করার ব্যাপারে ইবাদতের উদ্দেশ্য থাকা বা না থাকার মাঝে পার্থক্য করেছেন। আমরা উপরে সাজদা সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছি গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। অর্থাৎ এটা কখনও ইবাদতের উদ্দেশ্যে হয় আবার কখনও ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে হয়।

যখন গয়রুল্লাহর ইবাদত হিসেবে তার নামে বা তার উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা হয় তখন সেটা নিশ্চত কুফর ও শিরক হিসেবে গণ্য। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই, দ্বিমত হওয়ার সুযোগও নেই। কিন্তু ইবাদতের ইচ্ছা ছাড়া গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা হলে সেটা অবৈধ বা নিষিদ্ধ হলেও কুফরী হবে কিনা সে বিষয়ে ব্যাপক দ্বিমত রয়েছে।

ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন,

واما لذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم او الصليب أو لموسى أولعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولاتحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا

গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা বলতে বোঝায় গয়রুল্লাহর নামে পশু যবেহ করা। যেমন: মূর্তি, ক্রুশ, মুসা عليه السلام, ঈসা عليه السلام, কা’বা শরীফ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে পশু উৎস্বর্গিত করা। এসবই হারাম। এই পশুর মাংসও খাওয়া যাবে না, যবেহকারী মুসলিম বা খৃষ্টান যাই হোক। ইমাম শাফেঈ এ বিষয়ে স্পষ্ট

মত উল্লেখ করেছেন এবং আমাদের মাযহাবের [শাফেঈ মাযহাবের] ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। কিন্তু যদি সে গয়রুল্লাহকে [আল্লাহর মতো] সম্মান প্রদর্শন ও তার ইবাদতের উদ্দেশ্যে এমনটি করে তবে এটা কুফরী হবে। [শারহে মুসলিম]

তিনি শারহে মুহায্যাবে আর-রাফেঈ থেকে আরো স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন, ইবাদতের উদ্দেশ্যে গয়রুল্লাহর জন্য পশু যবেহ করলে বা সাজদা করলে সেটা কুফর হবে কিন্তু ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে এমনটি করলে সেটা কুফর হবে না। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি (আর রাফেঈ) বলেন,

وعلى هذا فإذا قال الذابح باسم الله واسم محمد وأراد أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد فينبغي أن لا يحرم وقول من قال لا يجوز ذلك يمكن حمله على أن اللفظة مكروهة لان المكروه يصح نفي الجواز والاباحة المطلقة عنه قال ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين في أن من ذبح باسم الله واسم رسوله هل تحرم ذبيحته وهل يكفر بذلك وأفضت تلك المنازعة إلى فتنة قال والصواب ما بيناه

এই হিসেবে যদি কেউ যবেহ করার সময় বলে, আল্লাহর নামে ও রসুলের নামে আর তার উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর নামে যবেহ করছি এবং রসুলের নামের বরকত গ্রহণ করছি। তবে এটা অবৈধ না হওয়া উচিৎ। যারা এটাকে বৈধ নয় বলেছে আসলে তাদের উদ্দেশ্য হলো এটা মাকরুহ। কেননা মাকরুহকেও সাধারনভাবে অবৈধ বলা যায় (যেহেতু তা মুবাহ্ বা বৈধ নয়)। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসুলের নামে যবেহ করে তার ব্যাপারে কযবিন নামক এলাকার ফুকাহাদের মাঝে ব্যাপক দ্বিমত হয়েছিল। তার কারণে বড় একটি ফিতনার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে সত্য তাই যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। [শারহে মুহাযযাব]

হানাফী মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যেও গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা যদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে না হয় তবে এটা কুফরী হবে কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত আছে। এই দ্বিমত প্রসঙ্গে ইবনে আবেদীন ﷬ খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

أَيْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، إذْ لَا يُفْتَى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ أَوْ فِعْلِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ خِلَافٌ

এই দ্বিমতটি এ বিষয়ে যে, উক্ত ব্যক্তি আল্লাহর নিকট (আখিরাতের বিধানে) কাফির হবে কিনা। কেননা (দুনিয়ার বিধানে) কোনো মুসলিমকে কাফির হিসেবে ফতোয়া দেওয়া হবে না যদি তার কথা বা কাজকে ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় অথবা সে যা করেছে সেটা কুফরী কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত থাকে।

[রদ্দুল মুহ্তার]

এখানে মূল ব্যাপার হলো, যেসব বিষয় কুফরী হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত আছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে কোনো মুসলিমকে কাফির আখ্যায়িত করে তার জান-মাল অরক্ষিত সাব্যস্ত করা বৈধ নয়। ওলামায়ে

কিরামের নিকট এটিই গৃহীত সিদ্ধান্ত।

জাদু কুফরী কিনা এ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকার কারণে জাদুকরকে হত্যা না করার ব্যাপারটিকে সঠিক হিসাবে আখ্যায়িত করে ইমাম কুরতুবী ﷺ বলেন,

وهذا صحيح، ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف

জাদুকরকে হত্যা না করার ব্যাপারটিই সঠিক, কেননা মুসলিমদের রক্ত হারাম। নিশ্চিত কারণ ছাড়া তা বৈধ হতে পারে না। আর কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলে সেটা নিশ্চিত বিষয় হতে পারে না।

[তাফসীরে কুরতুবী]

সুতরাং ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়াই যদি কেউ গয়রুল্লাহর নামে পশু যবেহ করে তবে তাকে কাফির বলা যাবে না যেহেতু এ কাজ কুফরী কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত আছে। কিন্তু ইবাদতের উদ্দেশ্যে গয়রুল্লাহর নামে পশু যবেহ করলে তা স্পষ্ট শিরক-কুফর হিসেবে গণ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই বিধায় এধরনের কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে একবাক্যে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে।

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ওলামায়ে কিরামের নিকট কারো নামে পশু যবেহ করলে উক্ত ব্যক্তিকে ইবাদত করা বলে গণ্য নয়। বরং পশু যবেহ কখনও ইবাদতের উদ্দেশ্যে হয় আবার কখনও ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে হয়। ইবাদতের উদ্দেশ্যে হলে, সেটা নিশ্চিত শিরক-কুফর হওয়ার ব্যাপারে কোনে দ্বিমত নেই। যেহেতু গয়রুল্লাহর ইবাদত করা শিরক-কুফর হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়া ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে এমনটি করা হলে সেটা কুফর হবে কিনা সেবিষয়ে দ্বিমত রয়েছে।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তার নামে বা তার উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা যে একটি ইবাদত সে বিষয়ে সকল আলেমই একমত। কিন্তু তারা এটা গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করা হলে সর্বাবস্থায় গয়রুল্লাহ ইবাদত হিসেবে গণ্য করেননি। সে কারণেই এ বিষয়ে দ্বিমত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর ইবাদত হিসেবে যা কিছু করা হয় তা গয়রুল্লাহকে পেশ করা অর্থ গয়রুল্লাহর ইবাদত করা এই সংজ্ঞা যথার্থ নয়।

♦ *মাযার বা অন্য কোন স্থানকে ঘিরে তাওয়াফ করা কুফরী নয়।*

বায়তুল্লাহ্ শরীফকে ঘিরে তাওয়াফ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কা'বা ঘর ছাড়া অন্য কোনো স্থানকে ঘিরে তাওয়াফ করা ওলামায়ে কিরামের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ। যদিও তা কোনো নেককার ব্যক্তির কবর বা স্বয়ং রসুলুল্লাহ ﷺ এর রওজা মোবারোক হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ

বিষয়টিকে মাক্রুহ্ বলেছেন হারাম বলেননি, কিন্তু বেশিরভাগ আলেম এটাকে হারাম বলেছেন। তবে তারা কেউই বিষয়টিকে শিরক-কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করেননি। পরবর্তীতে কবরের নিকট নিষিদ্ধ কর্মকান্ড সম্পর্কিত আলোচনাতে এ বিষয়ক বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়টিও প্রমান করে যে, যা কিছু আল্লাহর জন্য ইবাদত হিসাবে পেশ করা হয় গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে সেটা পেশ করা গয়রুল্লাহ্‌র ইবাদত বলে গণ্য হবে এবং শিরক-কুফর হবে এটা সঠিক নয়।

♦ ***গয়রুল্লাহর প্রতি ভয়, ভরসা ও ভালবাসা সর্বাবস্থায় শিরক বা কুফর নয়।***

আল্লাহকে ভয় করা, তার প্রতি ভরসা করা এবং তাকে ভালবাসা ইত্যাদি কাজ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে গণ্য। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ}

﴿ আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা দুজন ইলাহ্ গ্রহণ করো না। তোমাদের ইলাহ্ তো একজনই। অতএব কেবল আমাকেই ভয় করো। ﴾ [নাহল/৫১]

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, (وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) "তারা তাদের রবকে ভয় করে" [রদ/২১] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, (لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ) "আল্লাহ জেনে নিতে চান কে তাকে না দেখে ভয় করে" [মায়েদা/৯৪]

এছাড়া বিভিন্ন আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, (اتقوا الله) "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো" [৪০]

আল্লাহর প্রতি ভরসা করা সম্পর্কে বেশ কিছু আয়াতে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}

﴿ মুমিনদের উচিৎ কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করা। ﴾ [আলে-ইমরান/১২২]

সূরা আনফালের ২ নং আয়াতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, মুমিন তো কেবল তারাই আল্লাহর নাম শোনা মাত্র যাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়। শেষে বলা হয়েছে, "এবং তারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।"

সূরা মায়েদার ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

---

[৪০] বাকারা/১৯০ ও অন্যান্য ৫০ টির অধিক আয়াত।

{وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}

তোমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করো যদি মুমিন হয়ে থাকে।

আল্লাহকে ভালবাসা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে এমন আয়াতের সংখ্যাও কম নয়।

আল্লাহ বলেন, (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ) "মুমিনরা আল্লাহকে অধিক ভালবাসে" [বাকারা/১৬৫]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

{فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ}

আল্লাহ্ এমন এক জাতি আনয়ন করবেন যাদের তিনি ভালবসবেন এবং তারা তাকে ভালবাসবে।

[মায়েদা/৫৪]

এই সকল আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় আল্লাহকে ভালবাসা, তাকে ভয় করা এবং তার প্রতি ভরসা করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

একারণে ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله ইবাদতের সংজ্ঞা প্রদান করার পর উদাহরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

وَكَذَلِكَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخَشْيَةُ اللَّهِ ..... وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ ... وَأَمْثَالُ ذَلِكَ هِيَ مِنْ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ

এভাবে আল্লাহ ও তার রসুলকে ভালবাসা, আল্লাহকে ভয় করা ... তার উপর ভরসা করা এসবই আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য। [আল-উবুদিয়্যা]

এখন যা কিছু আল্লাহর ইবাদত সেটা অন্যকে পেশ করা যদি শিরক হয় তবে অন্য কাউকে ভয় পাওয়া, তাকে ভালবাসা বা তার প্রতি ভরসা করা শিরক হওয়া উচিৎ ছিল। অথচ আমরা জানি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ভয়, ভালবাসা বা ভরসা প্রদর্শন করা হলে সেটা সাধারণ ভাবে কুফরীর পর্যায়ে পড়ে না।

ভয় পাওয়া সম্পর্কে কথা হলো অন্যকে ভয় পাওয়া এবং অন্যের ভয়ে এমনকি ফরজ দায়িত্ব পরিত্যাগ করার অনুমতিও ইসলামে রয়েছে। বিভিন্ন পাপের বর্ণনা দেওয়ার সময় আল্লাহ্ ﷻ বলেছেন, (إلا أن تتقوا منهم تقاة) "যদি তাদের পক্ষ থেকে ভয়ের আশঙ্কা থাকে তবে ভিন্ন কথা" [আলে ইমরান/২৮] (إلا من اكره) "যাকে বাধ্য করা হয় তার ব্যাপারটি ভিন্ন।" [নাহল/১০৬] ইত্যাদি আয়াতে আল্লাহ্ ﷻ অন্যের ভয়ে তার নিজের বিধান পরিত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছেন। এমনকি অন্যের ভয়ে কুফরী করার অনুমতিও

ইসলামে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো যদি অন্যকে ভয় পাওয়া শিরক বলে গণ্য হবে তবে আল্লাহ কি শিরক করার অনুমতি দিয়েছেন?

তাছাড়া আল্লাহ্ ﷻ শত্রুর ভয়ে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

{ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}

﴾ যে কেউ সেদিন (যুদ্ধের দিন) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (পলায়ন করে) কৌশল অবলম্বন ছাড়া এবং নিজ বাহিনীর নিকট ফিরে আসার উদ্দেশ্যে ছাড়া তবে আল্লাহর গজব নিয়ে ফিরে আসে। তার স্থান জাহান্নাম। সেটা খুব নিকৃষ্ট স্থান। ﴿ [আনফাল/১৬]

এ আয়াতে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। হাদীসে এ বিষয়টিকে ৭ টি ধ্বংসাত্মক বিষয় (السبع الموبقات) এর মাধ্যে গণ্য করা হয়েছে। [সহীহ মুসিলম]

এত সতর্কবাণী সত্ত্বেও যদি কেউ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে সে কি কাফিরে পরিনত হবে? এমন বলা কি সঙ্গত হবে যে, সে আল্লাহর শাস্তির তুলনায় মানুষকে বেশি ভয় করেছে এভাবে সে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ইবাদত মানুষকে পেশ করেছে তাই কাফির মুশরিকে পরিনত হয়েছে? এমন বলা সম্ভব নয়। অতএব, আল্লাহকে যা কিছুর মাধ্যমে ইবাদত করা হয় তা অন্যকে পেশ করা ঐ ব্যক্তির ইবাদত করা হিসেবে গণ্য হবে এবং সেটা শিরক ও কুফর হবে এই মতবাদ সঠিক নয়।

ভালবাসার বিষয়টিও অনুরুপ। আল্লাহ্ ﷻ নিজেই নবী-রাসুল, ফেরেশতা ও নেককার ব্যক্তিদের ভালবাসতে আদেশ করেছেন। প্রশ্ন হলো, আল্লাহ কি নিজের জন্য প্রাপ্য ইবাদত অন্যদের উদ্দেশ্যে পেশ করার আদেশ করেছেন? কেউ কেউ বলেন, এখানে তো আল্লাহর নির্দেশে তাদের ভালবাসা হচ্ছে ফলে নবী-রাসূল ও নেককার ব্যক্তিদের ভালবাসা মূলত আল্লাহরই ইবাদত হচ্ছে তাদের নয়। এর বিপরীতে আমাদের কথা হলো, আল্লাহ্ যাকে ভালবাসতে আদেশ দেন নি বরং নিষেধ করেছেন তাকে ভালবাসার বিধান কি হবে? উদাহরণস্বরুপ একজন মুসলিম কোনো জেনাকারী মহিলাকে ভালবাসল এবং তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো সে কি কাফির হবে? একটি লোক হয়তো একদল চরিত্রহীন অসৎ স্বভাবের লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের ভালবাসে। এই ব্যক্তি কি কাফির হবে? এ পর্যায়ে এসে তারা বলেন, আল্লাহর চেয়ে কাউকে বেশি ভালবাসা শিরক। এর জবাবে আমরা বলবো, যা শিরক, তার মধ্যে বেশি কমের পার্থক্য থাকার কথা নয়। কারণ শিরক অর্থ কাউকে অংশ দেওয়া, সেটা সামান্য পরিমান হোক বা বেশি পরিমান হক। যেমন মূর্তির নিকট প্রার্থনা করা শিরক সেটা একবার করুক বা বহুবার করুক। যদি কেউ

পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে আর মূর্তির নিকট একবার প্রার্থনা করে তবু সে মুশরিক। কারণ শিরক অর্থ আল্লাহর ইবাদতে কাউকে অংশ দেওয়া সেটা বেশি পরিমান হোক আর কম পরিমান হোক। একটি ব্যবসায় যখন দুজন পার্টনার থাকে তখন তাদের একজনের অংশ বেশি আর অন্য জনের অংশ কম হলেও বলা হবে তারা একজন আরেকজনের শরীক। তাছাড়া একজন ব্যক্তি যদি স্ত্রী-সন্তানের ভালবাসায় অন্ধ হয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে যেমন সুদ-ঘুষ গ্রহণ করে, চুরি ডাকাতি করে ইত্যাদি। তখন কি এমন বলা হবে যে, ঐ ব্যক্তি স্ত্রী-সন্তানের ভালবাসায় মত্ত হয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে। সুতরাং সে নিজের স্ত্রী-সন্তানকে আল্লাহর চেয়ে অধিক ভালবাসে অতএব সে মুশরিক? এটা যদি বলা না যায় তাহলে বিষয়টি কি অস্পষ্ট হয়ে গেল না? তাওহীদের ক্ষেত্রে এ ধরণের অস্পষ্ট বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে।

ভরসার ব্যাপারে অনুরুপ কথা প্রযোজ্য। বর্তমানে বেশিরভাগ মুসলিমকে দেখা যায় বিপদ-আপদে আল্লাহর কথা পুরোপুরি ভুলে যায়। রোগ-বালাই হলে, আল্লাহর কাছে একবারও দোয়া করে না বরং ডাক্তারের কাছে ছুটে যায় এবং বিভিন্নভাবে রোগ সেরে দেওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করে। এক্ষেত্রে তারা আল্লাহর চেয়ে ডাক্তারের উপর বেশি ভরসা করে এমন মনে হলেও এর উপর নির্ভর করে তাদের কাফির-মুশরিক হিসেবে গণ্য করার সুযোগ নেই।

মোট কথা ভয়, ভালবাসা, ভরসা ইত্যাদি বিষয় আল্লাহর জন্য পেশ করা ইবাদত হিসেবে গণ্য হলেও অন্য কারো উদ্দেশ্যে পেশ করা তার ইবাদত করা হিসেবে গণ্য নয়। এটা শিরক কুফরও নয়। যতক্ষণ না এর সাথে অন্য কোনো শিরক-কুফর যুক্ত থাকে। এটা প্রমাণ করে যে, যা কিছু আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত হিসেবে পেশ করা হয় তা অন্যের উদ্দেশ্যে পেশ করা তার ইবাদত করা হিসেবে গণ্য নয়।

উপরের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি, মূর্তির উদ্দেশ্যে কৃত নাচ-গান ও অন্যান্য অশ্লীল এবং অশোভন কার্যকলাপ মূর্তির উদ্দেশ্যে কৃত ইবাদত ও স্পষ্ট শিরক হিসেবে গণ্য। অপর দিকে তাওয়াফ, রুকু-সাজদা বা পশু যবেহ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও অনেক সময় গয়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করা ইবাদত তথা শিরক কুফর হিসেবে গণ্য হচ্ছে না। এতদূর অবগত হওয়ার পর পাঠকের মনে ইবাদত শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট ও অত্যাধিক জটিল মনে হতে পারে। এখন এমন একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন যা এই জটিল সমস্যা নিরসন করে ইবাদত শব্দটির সঠিক অর্থ নির্ণয়ে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি ধাপে আলোচনা করবো ইনশা-আল্লাহ।

⟹ প্রথম ধাপ: ইবাদত অর্থ দোয়া বা প্রার্থনা করা।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

প্রার্থনাই হলো ইবাদত। [আবু দাউদ ও তিরমিযী] (৪১)

এরপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন,

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}

তোমাদের রব বলেছেন, আমার নিকট প্রার্থনা করো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। আর যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা লাঞ্চিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। [মু'মিন/৬০]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, (الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ) "দোয়া (প্রার্থনা) হলো ইবাদতের প্রাণ" [তিরমিযী]

এই হাদীসটির সনদ দূর্বল তবে তা আগের হাদীসের মূলভাবের সাথে সমার্থপূর্ণ।

মোট কথা, ইবাদতের সাথে প্রার্থনা বা দোয়ার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য হতে পারে না। একারণে প্রার্থনাকে ইবাদতের প্রাণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে "প্রার্থনাই আসলে ইবাদত।"

আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ইবাদতের সাথে প্রার্থনা বা দোয়ার এ ধরণের সম্পর্কের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

আল্লাহ ﷻ বলেন, কিয়ামতের দিন মুশরিকদের প্রশ্ন করা হবে;

{أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ}

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের শিরক করতে তারা কোথায়?

তারা বলবে,

{قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا}

তারা তো হারিয়ে গেছে। না, না। আমরা কারো নিকট প্রার্থনা করতাম না।

---

(৪১) ইমাম তিরমিযী বলেন, (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) "এই হাদিসটি হাসান সহীহ", হাকিম মুস্তাদরাকে বলেন, (هذا حديث صحيح الإسناد) "এই হাদিসটির সদন সহীহ", শায়েখ আলবানীও সহীহ বলেছেন [সহীহু আবি দাউদ/১৩১২]।

[মু'মিন/৭৩,৭৪]

দেখা যাচ্ছে, যারা আল্লাহর সাথে শিরক করতো তারা শিরক করা বলতে গয়রুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করাই বুঝতো। একারণে যখন তাদের প্রশ্ন করা হবে তোমরা যাদের শরীক হিসেবে সাব্যস্ত করতে তারা কোথায়? তারা অস্বীকার করে বলবে, আমরাতো কারো নিকট প্রার্থনা করতাম না।

ইব্রাহীম ﵇ তার সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, (مَا تَعْبُدُونَ) "তোমরা কিসের ইবাদত করো? তারা বললো, (قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا) "আমরা কিছু মূর্তির ইবাদত করে থাকি।" তখন তিনি তাদের বললেন, (هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ) "যখন তোমরা তাদের নিকট প্রার্থনা করো তারা কি শোনে? [শোয়ারা/৭০-৭২]

এখানে দেখা যাচ্ছে, ইব্রাহীম ﵇ প্রথমেই তাদের প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কিসের ইবাদত করো?" তারা যখন বললো, আমরা মূর্তির ইবাদত করি। তিনি বললেন, তোমরা যখন প্রার্থনা করো তারা কি শোনে? এ থেকে বোঝা যায়, ইবাদত করা বলতে কোনো কিছুর নিকট প্রার্থনা করাই বোঝায়।

অন্য একটি আয়াতে এসেছে, ইব্রাহীম ﵇ বললেন, (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) "আমি তোমাদের পরিত্যাগ করছি এবং তোমরা যা কিছুর নিকট প্রার্থনা করো তাদেরও পরিত্যাগ করছি। [মারইয়াম/৪৮] এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ ﷻ বলেন, (فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) "যখন তিনি তাদের পরিত্যাগ করলেন এবং তারা যা কিছুর ইবাদত করতো সেগুলো পরিত্যাগ করলেন ..." [মারইয়াম/৪৯]

দেখা যাচ্ছে, ইব্রাহীম ﵇ যাদের নিকট প্রার্থনা করা হয় তাদের পরিত্যাগ করলেন আর এই বিষয়টিকেই আল্লাহ ﷻ যাদের ইবাদত করা হয় তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বলে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি গয়রুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা পরিত্যাগ করলে গয়রুল্লাহর ইবাদত করা পরিত্যাগ করা হয়েছে বলে গণ্য হয়। বিপরীত দিক থেকে বললে, গয়রুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করাই মূলত গয়রুল্লাহর ইবাদত করা। রসুলুল্লাহ ﷺ এর ভাষায় "প্রার্থনাই হলো মূলত ইবাদত"।

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো- **"প্রার্থনার উপস্থিতি ছাড়া কোনো কিছু ইবাদত হিসাবে গণ্য হতে পারে না"** এই কথাটি আল্লাহর ইবাদত এবং গয়রুল্লাহর ইবাদত উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উপরে গত হয়েছে, আল্লাহর ইবাদত বলতে আমরা সলাত-সওম, হজ্জ-যাকাত, দোয়া-যিকির ইত্যাদি কাজকর্মকে বুঝিয়ে থাকি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই সব কাজকর্মের বাহ্যিক কাঠামোটিই ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করে এবং জান্নাত পাওয়া ও জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে যখন এই সব কাজ-কর্ম করা হয় তখন তা আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। এধরণের নিয়ত

বা সংকল্প না থাকলে কোনো কাজকেই ইবাদত বলা যায় না। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (انما الأعمال بالنيات) ‘সকল আমলই নিয়তের উপর নির্ভরশীল’ [বুখারী ও মুসলিম]। একথার স্পষ্ট অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করেছে তার আমলই আল্লাহর ইবাদত বলে গৃহীত আর যার এই নিয়ত নেই তার আমল আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গৃহীত নয়।

অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রার্থনা ছাড়া বাহ্যিক কোনো আমলই যে, ইবাদত হিসেবে গণ্য নয় এর উদাহরণ হিসেবে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করা যায়। একজন ব্যক্তি রমজান মাসের কোন এক দিনে রোজার নিয়ত করলো না। কিন্তু ঘটনাক্রমে সারাটা দিন তাকে না খেয়ে থাকতে হলো। তার এই না খেয়ে থাকা কোনো অবস্থাতেই ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। যদিও এখানে রোজার বাহ্যিক কাঠামো অক্ষতরুপে বিদ্যমান রয়েছে। একইভাবে একজন ব্যক্তি জামাতের সাথে সলাত আদায়ের সময় ওযু ভঙ্গ হলে যদি লজ্জার কারণে সলাত পরিত্যাগ না করে শেষ পর্যন্ত সলাতের যাবতীয় নিয়মনীতি অনুসরণ করে এবং সলাত সম্পন্ন করে তবু সলাতের এই বাহ্যিক কাঠামোকে ইবাদত বলা যায় না। খেলার মাঠে অনেক সময় ছোট ছেলে-মেয়েরা এক প্রকার খেলা করে, যেখানে একজন সম্পূর্ণ রুকুর আকৃতিতে হাটুতে হাত দিয়ে মাথা নত করে থাকে আর বাকীরা লাফিয়ে তার পিঠের উপর দিয়ে পার হয়ে যায়। এই রুকুকে আল্লাহর ইবাদত বলা যায় না কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট কিছুই প্রার্থনা করছে না। একইভাবে এটাকে গয়রুল্লাহর ইবাদতও বলা যায় না যেহেতু এখানে গয়রুল্লাহর নিকট কোনো কিছু প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মা-বোনেরা উনুন জালানোর সময় আগুণের সামনে মাথা নত করে ফু দেয়। বাহ্যিক ভাবে এটা অগ্নিউপাসকদের মতো আগুনকে সাজদা করা হচ্ছে এমন মনে হলেও আসলে এটা অগ্নি উপাসনা বলে গণ্য নয়। যেহেতু এখানে আগুনের নিকট কোনো কিছু প্রার্থনা করা হচ্ছে না। যারা আগুনের নিকট প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে সাজদা করে বা অন্য কোনো আচার-অনুষ্ঠান পালন করে তাদের বলা হয় অগ্নিপূজক। আমাদের মা-বোনেরা আগুনের সামনে শতবার মাথানত করলেও তারা অগ্নিপূজক হিসেবে গণ্য নন। কারণ তারা আগুনের কোনো ক্ষমতায় বিশ্বাসী নন এবং আগুনের নিকট ভাল-মন্দ কোনো বিষয়ে প্রার্থনাও করেন না।

সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে বলা যায়, সলাত-সওম, রুকু-সাজদা ইত্যাদি বিষয়সমূহের বাহ্যিক কাঠামোই ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। তবে যখন কোনো প্রবল-পরাক্রমশালী মহা শক্তিমানের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে কল্যাণ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এগুলো পেশ করা হয় তখন এগুলো ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। তা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে এগুলো ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। অপরদিকে প্রার্থনার উদ্দেশ্যে কৃত ছোট বড় যে কোনো কাজই ইবাদত হিসেবে গণ্য। এ কারণে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সত্য কথা বলা, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক

বস্তু সরিয়ে ফেলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ইত্যাদি বিষয় আল্লাহর ইবাদত হিসাবে গণ্য। একইভাবে মূর্তির সন্তুষ্টির জন্য মন্দির পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা বা সুন্দর পোশাক পরিধান করা, মন্দিরে সঙ্গীত ও নৃত্য প্রদর্শন করা ইত্যাদি বিষয় মূর্তির ইবাদত ও শিরক হিসেবে গণ্য।

⇒ দ্বিতীয় ধাপ: সাধারন প্রার্থনা ইবাদত বা শিরক নয় বরং অদৃশ্য ও অতিলৌকিক শক্তির নিকট প্রার্থনা করাই মূলত ইবাদত।

আমরা উপরে স্পষ্ট বলেছি, প্রার্থণার উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয় তাই ইবাদত। এখানে একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সব ধরণের প্রার্থনা ইবাদত বা শিরক কুফর নয়। উদহারণ স্বরুপ ভিক্ষুকের ভিক্ষা প্রার্থণা করা, ডাক্তারের নিকট রোগীর চিকিৎসা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এই সকল প্রার্থনা শিরক বা কুফর না হওয়ার কারণ হলো, এগুলো নিতান্ত স্বাভাবিক ও প্রকাশ্য বিষয়। আল্লাহর নিকট যে পন্থা ও পদ্ধতিতে প্রার্থনা করা হয় তার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যেহেতু আল্লাহ ﷻ হলেন লোক চক্ষুর আড়ালে এক অদৃশ্য শক্তি। তার নিকট যখন কেউ প্রার্থনা করে তখন অতিপ্রাকৃতিক ও অদৃশ্যভাবেই তা করে থাকে। এ পন্থা ও পদ্ধতিতে আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট প্রার্থনা করা যেতে পারে না। এখন অন্য কোনো অদৃশ্য ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস করা এবং তার নিকট মঙ্গল-অমঙ্গলের ব্যাপারে প্রার্থনা করা অর্থ আল্লাহর এই ক্ষমতায় অংশী সাব্যস্ত করা তথা শিরক করা। আল্লাহ ﷻ বলেন, (انما الغيب لله) ''অদৃশ্যলোক কেবল আল্লাহরই জন্য'' [ইউনুস/২০] (لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ) ''আল্লাহ দেখে নিতে চান, কে তাকে না দেখে ভয় করে'' [মায়েদা/৯৪] সমস্ত ওলামায়ে কিরাম ইজমা করেছেন যে, দুনিয়ার বাহ্যিক বিষয়সমূহ একজন আরেক জনের নিকট প্রার্থনা করা যায় কিন্তু অদৃশ্য ও অতিলৌকিক বিষয়ে কারো নিকট প্রার্থনা করা হলে তা তার ইবাদত করা হিসেবে গণ্য হবে যা শিরক।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন,

فَمَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ وَيَسْأَلُهُمْ جَلْبَ الْمَنَافِعِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ مِثْلَ أَنْ يَسْأَلَهُمْ غُفْرَانَ الذَّنْبِ وَهِدَايَةَ الْقُلُوبِ وَتَفْرِيجَ الْكُرُوبِ وَسَدَّ الفاقات : فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ

যারা ফেরেস্তা বা নবী-রসুলকে মাধ্যম বানিয়ে তাদের উপর ভরসা করে, তাদের নিকট মঙ্গল কামনা করে এবং অমঙ্গল থেকে আশ্রয় চায়, যেমন তাদের নিকট গোনা মাফের জন্য প্রার্থনা করে বা অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করে অথবা বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করে, তবে এই ব্যক্তি কাফির হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত মুসলিমরা ইজমা করেছেন। [মাজমুউল ফাতাওয়া]

গায়েবী বা অদৃশ্য ও অতিলৌকিক প্রার্থনা বলতে দুটি বিষয়কে বোঝায়।

◆ *ক) যার নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে সে অদৃশ্য হওয়া।*

যেমন ফেরেস্তা-জ্বিন বা মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ}

আমি সেদিন তাদের সকলকে একত্রিত করে ফেরেস্তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, এরা কি তোমাদের ইবাদত করতো? তারা বলবে, আপনি এ থেকে পবিত্র। আপনিই তো আমাদের বন্ধু, তারা নয়। তারা তো জ্বিনদের ইবাদত করতো। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ জ্বিনদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।

[সাবা/৪০,৪১]

''তারা জ্বিনদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল'' এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বর্ণিত আছে তারা জ্বিনদের বিভিন্ন অতিলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করতো বা তাদের আল্লাহর কন্যা বলে মনে করতো ইত্যাদি।

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

{وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا}

ব্যাপার এই যে, একদল মানুষ একদল জ্বিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতো। এর মাধ্যমে জ্বিনদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পায়। [জ্বিন/৬]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে, জাহিলী যুগে কেউ কেউ ভ্রমণরত অবস্থায় কোথাও রাত কাটানোর ইচ্ছা করলে জ্বিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতো,

أعوذ بسيد هذا الوادي من شر مافيه

আমি এই অঞ্চলের জিনদের সর্দারের নিকট এখানকার সকল বিপদ-আপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। [তাফসীরে তাবারী]

ফখরুর-রাজী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, যখন তারা কোনো এলাকায় পৌঁছাতো তারা জিনদের উদ্দেশ্যে বলতো,

نعوذ برب هذا الوادي من أن يصيبنا آفة يعنون الجن

আমরা এই এলাকার প্রভুর নিকট যে কোনো প্রকার বিপদ-আপদ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। [তাফসীরে কাবীর]

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله كفر وشرك

কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর পরিবর্তে জিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা কুফর ও শিরক।

[তাফসীরে কুরতুবী]

উল্লেখ্য যে, জিনদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরীনে কিরাম আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করে থাকেন। তারা বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা ভ্রমণ করার সময় পথিমধ্যে কোনো এলাকাতে রাত কাটানোর ইচ্ছা করলে বলতো, আমি এই এলাকার সর্দার জিনের নিকট তার সম্প্রদায়ের মধ্যকার দুষ্টু জিনদের ক্ষতি হতে আশ্রয় কামনা করছি। অনেকের নিকট মনে হতে পারে, জিনদের নিকট এই প্রকারের সাহায্য কামনা করা শিরক-কুফর হিসেবে গণ্য। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, একদল জিনের বিরুদ্ধে অন্য আরেকদল জিনের সহযোগিতা চাওয়া শিরক কুফর হতে পারে না। যেহেতু এখানে জিনদের নিকট এমন কিছু চাওয়া হচ্ছে যা তারা দিতে সক্ষম এবং এমনভাবে চাওয়া হচ্ছে যেভাবে তারা শুনতেও সক্ষম।

ইবনে তাইমিয়া ﷬ বলেন,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَخْدِمُهُمْ فِي أُمُورٍ مُبَاحَةٍ إِمَّا إِحْضَارِ مَالِهِ أَوْ دَلَالَةٍ عَلَى مَكَانٍ فِيهِ مَالٌ لَيْسَ لَهُ مَالِكٌ مَعْصُومٌ أَوْ دَفْعِ مَنْ يُؤْذِيهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا كَاسْتِعَانَةِ الْإِنْسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فِي ذَلِكَ

কেউ কেউ জিনদের মাধ্যমে বৈধ উপকার গ্রহণ করে থাকে। যেমন তার হারিয়ে যাওয়া সম্পদের খোঁজ পাওয়া, এমন কোনো পরিত্যক্ত সম্পদের খোঁজ পাওয়া যার কোনো নির্দিষ্ট মালিক নেই বা কোনো আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে কোনো মানুষের সহযোগিতা গ্রহণ করার মতো জিনদের সাহায্য নেওয়াও বৈধ। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

ইবনে আসাকির ﷬ বর্ণনা করেন, আবু ইয়াকুব আল-আজরাঈ যিনি দামেশকের একজন নেককার আবেদ ও খ্যাতিমান আলেম ছিলেন কোনো একটি রোগের কারণে নিজের সাথে সর্বদা একটি পাত্র রাখতেন যাতে তিনি প্রসাব করতেন। একসময় পাত্রটি তার প্রয়োজন হলো কিন্তু সেসময় সেটি তার নিকট এগিয়ে দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। তখন তিনি বললেন,

أسأل من حضر من إخواننا المسلمين من الجن أن يناولنيها فنولها

এখানে যেসব জিন উপস্থিত আছে আমি তাদের নিকট চাচ্ছি যেনো তারা পাত্রটি আমার নিকট হাজির করে। ফলে পাত্রটি তার নিকটবর্তী হয়। [তা'রীখে দামেশক]

পরবর্তীতে আমরা রূপক অর্থে প্রার্থনা সম্পর্কিত শিরোনামে এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা পেশ করেছি। সেখানে আমরা প্রমাণ করেছি যে, যদিও এখানে বিষয়টি অদৃশ্য কারো নিকট প্রার্থনা বলে মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে তেমন নয় বরং যার নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে তার উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং

তার নিকট যা চাওয়া হচ্ছে সে তা দিতেও সক্ষম। অতএব এখানে শিরকের কিছু নেই। যার নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে তার উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা থাকাই যথেষ্ট্য হবে। নিশ্চিতভাবে উপস্থিত থাকতে হবে এমন নয়। যেমন নির্জন বনভূমিতে পথ হারিয়ে যদি কেউ চিৎকার করে বলে "আমাকে রক্ষা করো" তবে এটা কুফরী হবে না। যদিও তার চোখের সামনে কোনো মানুষ নেই। কারণ এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, তার শব্দ যতদূর পৌছাবে তার মধ্যে কোনো মানুষ উপস্থিত থাকবে এবং রক্ষা করতে ছুটে আসবে। একারণে বিষয়টি শিরক হবে না, বাস্তবে কেউ সাহায্য করতে আসুক বা না আসুক।

এই বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বলা যায়, জিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক হবে যদি তাদের নিকট এমন কিছু প্রার্থনা করা হয় যা কেবল আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রনাধীন। যেমন যাবতীয় বালা-মুসিবত ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে জিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। জিনেরা ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতির মালিক নয়। রোগ-বালাই থেকে মুক্তি দেওয়ার মালিকও তারা নয়। অতএব তাদের নিকট এগুলো প্রার্থনা করা শিরক বলে গণ্য হবে। একইভাবে যদি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে নির্দিষ্ট কিছু জিনের নাম ধরে কোনো কিছু প্রার্থনা করা হয় তবে সেটা নির্জন প্রান্তরে বিপদে পড়ে কোনো একজন পীরের নাম ধরে প্রার্থনা করার মতো শিরক বলে গণ্য হবে। কারণ জিনেরাও মানুষের মতো সর্বত্র বিরাজমান নয়। তারা সবকিছু শুনতে বা দেখতেও সক্ষম নয়। অতএব, বিপদে পড়ে যে জিন এখানে হাজির আছে সে আমাকে সাহায্য করুক এমন বলা আর নির্দিষ্ট একটি বা কয়েকটি জিনের নাম ধরে "হে অমুক, তুমি আমাকে সাহায্য করো" এমন বলার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। কাফিররা যে নির্দিষ্ট কিছু জিনের নিকট প্রার্থনা করতো এর স্বপক্ষে উপরে উল্লেখিত আয়াতটিতে সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ্ ﷻ বলেন, (رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن) "কিছু মানুষ কিছু জিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতো।" এখানে নির্দিষ্ট কিছু মানুষ নির্দিষ্ট কিছু জিনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতো এমন বলা হয়েছে। সাধারণভাবে যে জিন হাজির আছে তার নিকট প্রার্থনা করতো এমন নয়।

আর যে কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির নাম ধরে নির্দিষ্টভাবে সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক এতে কোনো সন্দেহ নেই। সে জিন বা মানুষ যাই হোক না কেন। মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা বা বহু দূরে অবস্থিত পীর-মাশায়েখের নিকট কোনো বিষয় প্রার্থনা করা এই পর্যায়ের শিরকী কর্মকান্ডের মধ্যে অন্তভূর্ক্ত। এক্ষেত্রে কি প্রার্থনা করা হচ্ছে তা লক্ষ্য করা হবে না। যদি একটি সূচ পরিমান বস্তুও অদৃশ্য ও অনুপস্থিত শক্তির নিকট প্রার্থনা করা হয়, তবে সেটা গায়েবী প্রার্থনা বলে গণ্য হবে এবং শিরক হবে।

♦ ***খ) যে বিষয়ে প্রার্থনা করা হচ্ছে তা অদৃশ্য ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয় হওয়া।***

যদি প্রার্থনার বিষয়বস্তু এমন হয় যা নিজেই অদৃশ্যলোকের বিষয়, তবে যার নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে সে জীবিত বা এমনকি সামনে হাজির থাকলেও এটা শিরক কুফর বলে গণ্য হবে। যেমন: সামনে উপস্থিত পীরের নিকট সন্তান বা সম্পদ কামনা করা, ব্যবসায় আয়-উন্নতি, ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ-শান্তি ইত্যাদি বিষয়ে প্রার্থনা করা। এ ধরণের বিষয় কারো নিকট প্রার্থনা করা হলে সেটা শিরক বা কুফর হিসেবে গন্য হবে।

⇒ তৃতীয় ধাপ: রূপক অর্থে আহ্বান শিরক নয়।

উপরে আমরা দেখেছি অদৃশ্য ও অনুপস্থিত শক্তির নিকট প্রার্থনা করা শিরক হিসেবে গণ্য। উপস্থিত ব্যক্তির নিকটও অদৃশ্যলোকের কোনো বিষয় প্রার্থনা করা শিরক হিসেবে গণ্য।

এখানে একটি বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, অনেক সময় মানুষ এমন শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করে যেটা অদৃশ্য শক্তির নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে বলে মনে হয় কিন্তু আসলে তাদের কথার উদ্দেশ্য তেমনটি নয়।

উদাহরণস্বরুপ, আমরা বাংলা ভাষায় অনেক সময় দুঃখ পেলে বা বিপদ-আপদে পতিত হলে, ও-মা!, মা-গো ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকি। এমনকি কারো মা মারা গেলে বা বহু দূরদেশে অবস্থান কালেও সে এমনটি বলে থাকে। বাহ্যিকভাবে মনে হয় এই ব্যক্তি তার মৃত বা অনুপস্থিত মাকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করছে কিন্তু আসলে তা নয়। একারণে এটা শিরক কুফর নয়। যেহেতু এই ব্যক্তি আসলে তার মায়ের অতিলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী নয়। এখানে তার উদ্দেশ্যও সেটা নয়।

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, উমর ﵁ এর খেলাফত কালে কোনো এক এলাকার গভর্ণর একজন ব্যক্তিকে শুলে চড়িয়ে হত্যা করার রায় দিলে সে বলতে থাকে, (يا عمراه، يا عمراه) হে উমর, হে উমর। এভাবে সে মারা যায়। পরবর্তীতে উমর ﵁ এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি উক্ত গভর্নরকে তিরষ্কার করেন।

ইবনে কাছীর ﵀ 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'তে বর্ণনা করেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরামের গোপন সংকেত ছিল: (يا محمداه) "হে মুহাম্মাদ"।

হুসাইন ﵁ নিহত হলে তার উদ্দেশ্যে যয়নাব নামক তার এক বোন শোকবার্তা রচনা করেন এভাবে,

يا محمداه، يا محمداه * صلى عليك الله

وملك السماء * هذا حسين بالعراه

مزمل بالدماء، مقطع الاعضاء

يا محمداه وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة،

হে মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ আপনার উপর দরুদ ও সালাম

।আপনি আসমানের মালিক হয়েছেন অথচ হুসাইন আজ খোলা প্রান্তরে পড়ে আছে

।রক্ত তাকে ভিজিয়ে দিয়েছে আর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কেটে ফেলা হয়েছে

।হে মুহাম্মাদ, আপনার কন্যাদের বন্দি করা হয়েছে আর আপনর সন্তানদের হত্যা করা হয়েছে

ইবনে কাছির ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

রসুলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর ফাতিমা ؓ বলছিলেন,

يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهْ، مَنْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ، مَأْوَاهْ يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ،

হে আমার পিতা, রবের ডাকে যিনি সাড়া দিয়েছেন। হে আমার পিতা, জান্নাতুল ফিরদাউস যার স্থান। হে আমার পিতা, আমরা জিব্রাঈলের নিকট শোকবার্তা পৌছে দিচ্ছি। [সহীহ বুখারী]

এখানে দেখা যাচ্ছে ফাতেমা ؓ তার পিতার মৃত্যুর পর পিতাকে আহ্বান করছেন এবং অদৃশ্য জিব্রাঈল ফেরেস্তার নিকট শোক বার্তা পৌছে দিচ্ছেন।

ইবনে আবি শায়বা তার মুসান্নাফে, বাজ্জার তার মুসনাদে এবং বাইহাক্বী শুয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন আল্লাহর কিছু ফেরেস্তা রয়েছে যারা গাছের পাতা গণনা করে। যদি কেউ নির্জন প্রান্তরে কোনো সমস্যায় পড়ে সে যেন বলে, (اعينوا عباد الله) ‘‘ওহে আল্লাহর বান্দারা আমাকে সাহায্য করো’’ আল্লাহর ইচ্ছায় সে সহযোগিতা পাবে।

আল-হাইছামী মাজমায়ে যাওয়ায়েদে বলেন, (رجاله ثقات) ‘‘এই হাদীসের রাবীরা বিশ্বস্ত।’’ তবে এই হাদীসের রাবী ‘উসামা ইবনে যায়েদ’ সম্পর্কে রিজালশাস্ত্রবিদ মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। তাছাড়া হাদীসটি কেউ কেউ বর্ণনা করেছে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কথা হিসেবে মারফু’ভাবে আর কেউ বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাসের কথা হিসেবে মাওকুফভাবে। তবে এই হাদীসের উপর পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের আমল রয়েছে।

ইমাম বায়হাকী ؒ বলেন,

هذا موقوف على ابن عباس ، مستعمل عند الصالحين من أهل العلم لوجود صدقه عندهم فيما جربوا . وبالله التوفيق

হাদীসটি ইবনে আব্বাস হতে মাওকুফভাবে বর্ণিত। তবে নেককার ওলামায়ে কিরাম এটার উপর আমল করেছেন। যেহেতু তারা পরীক্ষা করে এটির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা। [আল-আদাব]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল ﵀ বলেন,

حججت خمس حجج منها ثلاث راجلاً، أنفقت في إحدى هذه الحجج ثلاثين درهماً، وضللت في بعضها عن الطريق وأنا ماش فجعلت أقول: يا عباد الله دلوني الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقفت عليه

আমি পাঁচবার হজ্জ করেছি, তার মধ্যে তিনবার করেছি পায়ে হেটে। একবার হজ্জে আমি ৩০ দিরহাম খরচ করেছিলাম, আর অন্য একটি হজ্জে আমি হাটতে হাটতে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি তখন বলতে শুরু করলাম, ''হে আল্লাহর বান্দারা আমাকে পথ দেখিয়ে দাও'' আমি এমন বলতে বলতে পথ পেয়ে গেলাম। [মাসায়েলে ইমাম আহমদ]

অর্থাৎ পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম এই প্রকারের আহ্বানকে শিরক মনে করেননি। বিষয়টি অনেকের নিকট অবোধগম্য হতে পারে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে এখানে প্রকৃত পক্ষেই শিরকের অস্তিত্ব নেই। আমরা পূর্বেই বলেছি শিরক হবে গায়েবী শক্তির নিকট প্রার্থনা করলে বা এমন কিছু প্রার্থনা করলে যা আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। উপরোক্ত ঘটনাতে এধরনের কিছু প্রার্থনা করা হয়নি, যার নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে সে দৃষ্টির অগোচরে হলেও অনুপস্থিত নয় এবং তার নিকট যা চাওয়া হচ্ছে তাও তার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব নয়। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, যার নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে তাকে দেখা যাচ্ছে না বা সে আদৌ উপস্থিত আছে কিনা এবং ডাক শুনে সাড়া দেবে কিনা তা পরিষ্কারভাবে জানা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এ কারণে বিষয়টি শিরকে পরিনত হয় না। উদাহরণস্বরুপ কেউ একজন যদি নির্জন প্রান্তরে বা সমুদ্রের গভীরে হারিয়ে যায়। আশে-পাশে বহুদূর পর্যন্ত কোনো জন-মানব তার চোখে পড়েনা। তবু কেউ থাকলে শুনবে এই আশায় চিৎকার করে বলে ''আমাকে উদ্ধার করো বা আমাকে সাহায্য করো'' তবে এটা শিরক হবে না। যেহেতু এ সম্ভাবনা রয়েছে যে দৃষ্টির আড়ালে অবস্থানরত কোনো মানুষ এর ডাক শুনে ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করবে। যদিও সে নিশ্চিত নয় যে আসলেই কেউ আছে কিনা এবং তার ডাক শুনছে কিনা বা শুনলেও সাড়া দেবে কিনা। পরবর্তীতে কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির নিকট দোয়া চাওয়া বৈধ কিনা সে প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

মোট কথা, এই সব আহ্বান শিরক নয় যতক্ষণ না যাকে আহ্বান করা হচ্ছে প্রকৃত অর্থেই তার অদৃশ্য ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হয় এবং সে কারণে তার নিকট প্রার্থনা করা হয়।

এ বিষয়ে পৃথক ভাবে আলোচনার উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল লোকদের সতর্ক করা যারা কোনো মুসলিমকে "হে রসুল" বা "ইয়া রসুলুল্লাহ্" বলতে শুনলেই সেটাকে শিরকী আহ্বান হিসাবে গণ্য করে। এরা নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো যে কোনো বিষয়কে শিরক-কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করে সেটা পুরো মুসলিম উম্মাহর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

⇒ ইবাদতের সংজ্ঞায়ন ও তার বিশ্লেষণ

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা ইবাদত শব্দটিকে এভাবে সজ্ঞায়ন করতে পারি;

" অতিপ্রাকৃতিক ও অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস করা এবং সেই শক্তির নিকট মঙ্গল কামনা করে বা অমঙ্গল হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে তার সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু করা হয় তাই ইবাদত।"

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো,

১. এখানে প্রার্থনা করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কিছু ইবাদত হিসেবে গণ্য হতে পারে না যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২. প্রার্থনার বিষয়টি অতিপ্রাকৃতিক ও অদৃশ্য শক্তির নিকট হওয়া শর্ত করা হয়েছে যেহেতু স্বাভাবিক ও সাধারন প্রার্থনা শিরক হিসেবে গণ্য নয়।

৩. অতিপ্রাকৃতিক ও অদৃশ্য শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপণ করা শর্ত করা হয়েছে যাতে রূপক অর্থে আহ্বান করা এর মধ্যে শামিল না হয়। যেহেতু কারো অদৃশ্য ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল ভাষার প্রয়োগ হিসাবে রূপকভাবে আহ্বান করা হলে সেটা শিরক হয় না।

২.ক.(৩) কিছু প্রশ্নের জবাব।

উপরে আমরা ইবাদত শব্দের যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি, সে আলোকে বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ পূর্বক উত্তর প্রদানের চেষ্টা করবো ইনশা-আল্লাহ।

⇒ মক্কার মুশরিকরা কি রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক করতো?

আল্লাহ আমাদের রব। তিনি আকাশ-পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলো পরিচালনা করে থাকেন। তিনি ক্ষুধার্তকে অন্ন দেন। গ্রীস্মের রোদ্রতাপে উত্তপ্ত জমিনে বৃষ্টি বর্ষন করেন। রোগীকে

আরোগ্য দান করেন। মহাবিশ্বের সকল কিছুর উপর তার নিয়ন্ত্রন রয়েছে। তার নির্দেশ ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না। এই প্রভাব ও প্রতাপশালী ক্ষমতাকে বলা হয় রুবুবিয়্যাত (ربوبية)।

উলুহিয়্যাত (ألوهية) বা উবুদিয়্যাত (عبودية) হলো, এই রবের কার্যাবলী ও ক্ষমতাকে স্বীকার করে তার সামনে মাথা নত করা বা আকুল আবেদনে প্রার্থনা করা। একেই বলা হয় ইবাদত।

কারো ক্ষমতায় বিশ্বাস না করে কেউ তার সামনে মাথা নত করে না। অর্থাৎ রবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি ছাড়া কেউ কাউকে ইবাদত করবে না এটাই স্বাভাবিক। একারণে আমরা ইবাদতের সংজ্ঞায় বলেছি, **"অতিলৌকিক শক্তির নিকট প্রার্থনার উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয় তাই ইবাদত"।**

এই সংজ্ঞার উপর একটা আপত্তি উপস্থাপিত হতে পারে। আমাদের সময়ে ব্যাপকভাবে প্রশিদ্ধি লাভ করেছে যে, মক্কার মুশরিকরা আল্লাহকে রব বলে বিশ্বাস করতো। তারা এটা স্বীকার করতো, তিনিই বৃষ্টিদাতা, রিযিকদাতা, মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক। তিনি সমস্ত নিয়ামতের ধারক-বাহক ও আরশের অধিপতি। এক কথায় তারা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের উপর বিশ্বাসী ছিল। রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে তারা শিরক করতো না। তাদের শিরক ছিল কেবল উলুহিয়াযাতের ব্যাপারে। অর্থাৎ তারা স্বীয় উপাস্যদের অতিলৌকিক ক্ষমতাতে বিশ্বাস করতো না কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যে সাজদা অবনত হওয়া বা অন্যান্য ইবাদত পেশ করার মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত হয়েছিল। এর মাধ্যমে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, অতিলৌকিক ও অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস না করলেও কাউকে ইবাদত করা সম্ভব।

এ বিষয়ে তারা বেশ কিছু আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করে থাকে, যেমন আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ}

যদি তুমি তাদের প্রশ্ন করো আকাশ পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? কে চন্দ্র সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা বলবে আল্লাহ। এর পরও এরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? [আনকাবুত/৬১]

{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ}

যদি তাদের প্রশ্ন করো আকাশ থেকে কে বৃষ্টি বর্ষণ করে এরপর পৃথিবীকে মৃত্যুর পর জীবীত করেন? তারা বলবে আল্লাহ। [আনকাবুত/৬৩]

এছাড়া সূরা মু'মিনুনের ৮৪ থেকে ৮৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা আল্লাহকে আরশের মালিক, সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্বশীল ও সেগুলোর পরিচালক হিসেবে বিশ্বাস করতো।

এই সকল আয়াতকে এক তরফা উপস্থাপণ করে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়, মক্কার মূর্তিপুজকরাও

আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে কাউকে শরীক করতো না এবং তারা তাদের দেবতাসমূহ সম্পর্কে অতিলৌকিক কোন ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিল না। অথচ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এমন অসংখ্য দলিল-প্রমাণ রয়েছে যেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, মূর্তিপূজকরা তাদের মূর্তিগুলোর অতিলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে বলে মনে করতো।

আদ জাতি তাদের রসুল হুদ ﷺ কে বলেছিল,

{إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ}

আমরা তো মনে করি আমাদের কোনো এক ইলাহ্ তোমার অমঙ্গল চেয়েছে। [হুদ/৫৪]

অর্থাৎ তারা তাদের উপাস্য মূর্তিসমূহের ব্যাপারে গায়েবীভাবে কারো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতা আছে বলে মনে করতো।

মক্কার মুশরিকরা রসুলুল্লাহ ﷺ কে তাদের মূর্তিসমূহের ভয় প্রদর্শন করতো। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ}

তারা তো আপনাকে গয়রুল্লাহর ভয় প্রদর্শন করে। [যুমার/৩৬]

মুফাস্সিরীনে কিরাম বলেন,

فإنهم قالوا له إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا بعيبك إياها

মুশরিকরা রসুলুল্লাহ ﷺ কে ভয় দেখিয়ে বলতো তুমি যে আমাদের উপাস্যদের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করো একারণে তারা তোমাকে বিকলঙ্গ করে ছাড়বে। [বাইদাবী, জালালাইন ও অন্যান্য]

ইব্রাহীম ﷺ এর সম্প্রদায়ও তাকে অনুরুপ ভীতি প্রদর্শন করলে তিনি বললেন,

{وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ}

তোমরা যা কিছুকে শরীক করো আমি তাদের কিভাবে ভয় করবো অথচ তোমরা আল্লাহর সাথে শিরক করার ব্যাপারে ভয় করো না। [আনয়াম/৮১]

এছাড়া মক্কার মুশরিকরা যাদের ইলাহ্ বা উপাস্য হিসেবে বিশ্বাস করতো ও তাদের ইবাদত করতো তাদের সম্পর্কে তারা যে আক্বীদা পোষণ করতো তা খন্ডায়ন করে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا}

তারা যেমনটি বলে সে অনুযায়ী যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ থাকতোই তবে তারা আরশের

অধিপতি মহান আল্লাহর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। ﴾ [ইসরা/৪২]

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, মহান আরশের অধিপতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য অন্যান্য ইলাহদের কিছু না কিছু শক্তি-সামর্থের প্রয়োজন রয়েছে। মক্কার মুশরিকরা যদি তাদের দেবতা সমূহের কোনো ক্ষমতায় বিশ্বাস না-ই করতো তবে একথা মোটেও সঙ্গত হতো না যে, "তাদের কথামতো যদি কোনো ইলাহ থাকতো তবে সে মহান আল্লাহর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো।" একখন্ড মাটি ও এক টুকরো পাথরের পক্ষে তো আল্লাহর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব নিশ্চিত বলা যায় যে, মক্কার মুশরিকরা তাদের উপাস্যসমূহকে কেবল মাটি ও পাথরের খন্ড মনে করতো না বরং তাদের ব্যাপারে অতিলৌকিক ও অসম্ভব ক্ষমতাতে বিশ্বাস করতো।

অন্য একটি আয়াতে অনুরুপ কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}

﴿ আকাশ ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ্ থাকতো তবে উভয়ের মধ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। তারা যা বলে আরশের অধিপতি মহান আল্লাহ তা হতে পবিত্র। ﴾ [আম্বিয়া/২২]

অর্থাৎ একাধিক ইলাহ থাকলে প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করতো এবং একজন অন্য জনকে পরাজিত করার চেষ্টা করতো। যেভাবে দুনিয়ার রাজা-বাদশারা করে থাকে। একারণে আসমান ও জমিনে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। অন্য একটি আয়াতে বিষয়টির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে,

{مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}

﴿ আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। তার সাথে অন্য কোনো ইলাহও নেই। যদি তেমন হতো তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে পড়তো এবং একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতো। তারা যা বলে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। ﴾ [মু'মিনুন/৯১]

এই সকল আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, মুশরিকরা তাদের উপাস্য সমূহকে রুবুবিয়্যাতের ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী মনে করতো। তাদের সেই বিশ্বাসকে খন্ডায়ন করার জন্যই উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করা হয়েছে।

সীরাতের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাতেও তাদের এই আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়:

মক্কা বিজয়ের পর রসুলুল্লাহ ﷺ খালিদ ইবনে ওয়ালিদ رضي الله عنه ও মুগীরা ইবনে শো'বা رضي الله عنه কে প্রেরণ করেন

ছাকীফ গোত্রের 'লাত' নামক মূর্তি ধ্বংস করার জন্য। তখন ছাকীফ গোত্রের সকলে একত্রিত হয় এমনকি পর্দার অভ্যন্তরের মেয়েরা পর্যন্ত বাইরে বের হয়ে আসে। তাদের ধারণা ছিল লাতকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে না, সে ঠিকই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে। মুগীরা ইবনে শো'বা ﵁ তাদের সাথে তামাশা করার জন্য একটি কৌশল করেন। তিনিই মূর্তির গায়ে প্রথম আঘাত করেন, তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এমন ভাব করতে থাকেন যাতে লোকেরা মনে করে মূর্তি তার উপর আক্রমন করেছে। ছাকীফ গোত্রের লোকেরা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে চিৎকার করে উল্লাস করতে থাকে এবং গর্বভরে বলে ওঠে, (قتلته الربة) "আমাদের দেবী তাকে হত্যা করেছে" এরপর তারা অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে বলল, তোমাদের মধ্যে কার সাহস আছে মূর্তি ধ্বংসের জন্য এগিয়ে যাও। মুগীরা ইবনে শো'বা ﵁ তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

إنما هي لكاع حجارة ومدر، فاقبلوا عافية الله واعبدوه

এই মূর্তি তো কিছু মাটি ও পাথরের সমষ্টি মাত্র। তোমরা একে পরিত্যাগ করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো এবং তাকেই ইবাদত করো।

এর পর তিনি মূর্তিটির উপরে ঝাপিয়ে পড়েন। তার সাথে অন্যান্য মুসলিমরাও মুর্তিটিকে আঘাত করতে থাকে। এভাবে একটি একটি করে মূর্তিটির পাথরসমূহ ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছিল। তখন মূর্তির রক্ষক বলে, "সব ধ্বংস হলেও মূর্তির ভিত ধ্বংস করা যাবে না, সেটা রাগান্বিত হয়ে এদের ধ্বংস করে ফেলবে"। মুগীরা ইবনে শো'বা ﵁ এটা শুনে বললেন, আমি তাহলে আগে ভিত ধ্বংস করে নিই। এরপর সেটার ভিত্তিমূলে আঘাত করে তা ধ্বংস করা হয়। এমনকি তার মাটি পর্যন্ত খুঁড়ে বের করে ফেলা হয়। এরপর ছাকীফ গোত্র নিরব হয়ে যায়। [ইবনে কাছীরের সীরাতে নাব্বী]

একইভাবে আমর ইবনুল আস ﵁ কে প্রেরণ করা হয় হুযাইল গোত্রের 'সুওয়া' নামক মূর্তি ধ্বংস করার জন্য। তখন মূর্তির রক্ষক বলে, তুমি একে ধ্বংস করতে পারবে না কারন সে আত্মরক্ষা করবে। আমর ইবনুল আস ﵁ বলেন "তুমি এখনও পর্যন্ত এই ভ্রান্তির মধ্যে আছো?" এরপর তিনি মূর্তিটিকে ধ্বংস করে ফেলেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে বলেন, "কেমন দেখলে?" সে বলে "আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম"।

এই ঘটনাটিতে আমরা দেখছি মূর্তিপূজারী যখন বুঝতে পারল মূর্তির আসলেই কোন ক্ষমতা নেই, সাথে সাথে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে মুসলিমে পরিনত হলো। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যতদিন মূর্তির মধ্যে অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করবে ততদিন সেটার পূজা করবে আর যখনই বুঝতে পারবে এর কোন ক্ষমতা নেই তখন তাকে পরিত্যাগ করবে এটাই স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধির দাবী। মূর্তির অকার্যকরতা অনুধাবনের পর মুসলিম হয়ে যাওয়ার বহু ঘটনা রয়েছে।

মক্কা বিজয়ের পূর্ব মুহুর্তে যখন আবু সুফিয়ান মুসলিম হয়ে যায় সে ঘটনায় বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ﷺ আবু সুফইয়ানকে বললেন,

يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَك أَنْ تَعْلَمَ أَنّهُ لَا إلَهَ إلّا اللّهُ؟

হে আবু সুফইয়ান, তুমি কি এখনও বুঝতে পারোনি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই?

উত্তরে আবু সুফইয়ান বলেন,

وَاَللّهِ لَقَدْ ظَنَنْت أَنْ لَوْ كَانَ مَعَ اللّهِ إلَهٌ غَيْرُهُ لَقَدْ أَغْنَى عَنّي شَيْئًا بَعْدُ

আল্লাহর কসম আমি তো মনে করি যদি অন্য কোনো ইলাহ্ থাকতোই তবে তারা এই অবস্থায় আমার কোনো কাজে আসতো। [তিবরানী; মু'জামুল কাবীর]

এছাড়া আমর ইবনে জামুহ্ যখন দেখলেন তার পূজনীয় মূর্তিটি কিছু যুবক চুরি করে তার গলায় একটি মৃত কুকুর ঝুলিয়ে নর্দমাতে ফেলে দিয়েছে তিনি মুসলিম হয়ে গেলেন এবং বললেন,

لو كنت ربا ما كنت أنت والكلب وسط بئر في قرن

যদি তুমি রবই হতে তবে তুমি এবং একটি কুকুর একত্রে নর্দমার মাঝে পড়ে থাকতে না। [ইবনে হিশাম]

আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা মুসলিম হওয়ার পর তার বন্ধু আবু-দারদার বাড়িতে গমণ করে সকল মূর্তি ভেঙে দেন। আবু দারদা প্রথমে রাগান্বিত হলেও পরে চিন্তা করেন, যদি এই সকল মূর্তির কোনো ক্ষমতা থাকতো তবে তারা নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হতো। এরপর তিনি মুসলিম হয়ে যান।

[মুস্তাদরাকে হাকীম]

এমন প্রচুর সংখ্যক ঘটনা উল্লেখ করা যায় যেখানে একজন মূর্তির উপাসক নিজের মূর্তির অক্ষমতা প্রমাণিত হতে দেখে মূর্তি পূজা হতে ফিরে এসেছে। এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, তারা যতদিন মূর্তি পূজা করতো মূর্তির ক্ষমতায় বিশ্বাস করার কারণেই তা করতো। তাই যখনই প্রমাণিত হতো সেগুলো অকর্মার ঢেঁকি তখন তারা সেসব পরিত্যাগ করতো। অতএব, মুশরিকরা রুবুবিয়্যাতে শিরক করতো না এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়।

♦ ***মুশরিকদের পক্ষ থেকে আল্লাহকে মহাবিশ্বের পরিচালক, সৃষ্টিকর্তা, বৃষ্টিদাতা, রিযিকদাতা ইত্যাদি হিসেবে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ কি?***

উপরের আলোচনাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, মুশরিকরা তাদের উপাস্যসমূহকে রুবুবিয়্যাতের বিভিন্ন

গুনাবলী ও ক্ষমতায় ক্ষমতাবান বলে বিশ্বাস করতো। এখন প্রশ্ন হলো, যেসব আয়াতে তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, বৃষ্টিদাতা, রিযিকদাতা, মহাবিশ্বের সকল কিছুর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে বিশ্বাস করতো বলে বলা হয়েছে তার অর্থ কি? কয়েকটি দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা করলে এই প্রশ্নটির খুব সহজ সমাধান পাওয়া যায়।

১. আয়াতে বলা হচ্ছে যখন তাদের প্রশ্ন করা হয়, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা কে? বৃষ্টিদাতা কে? কে মহাবিশ্বের পরিচালক? ইত্যাদি তারা বলে, আল্লাহ্। এখানে তারা কী বলে সেটা বলা হয়েছে কিন্তু তারা যা বলে সেটাই যে তারা বিশ্বাস করে একথা একবারও বলা হয়নি। যেমন অন্য আয়াতে শয়তান সম্পর্কে বলা হয়েছে সে বলে,

{إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ}

সে বলে আমি তো মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। [হাশর/১৬]

এখানে শয়তান কী বলে সেটা বলা হচ্ছে। এই আয়াত কখনও এমন প্রমাণ করে না যে, শয়তানের এই দাবী সত্য। যে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ধ্যানে রাত-দিন কাজ করে যাচ্ছে সে যদি বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি তবে সেটা হাস্যকর কথা ছাড়া আর কি হতে পারে! একইভাবে যারা আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে, তাদের নিকট সন্তান, সম্পদ, আয়-উপার্জন, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রার্থনা করে তারা যদি বলে আমরা এক আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচালক হিসেবে মনে করি, তবে সে দাবী সত্য হিসেবে কিভাবে মেনে নেওয়া যায়? আসলে তাদের এ দাবী সত্য হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য নয় বরং এ দাবীর অযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রমাণ করার জন্যই আল-কুরআনে তা বর্ণনা করা হয়েছে। তাইতো এই সব আয়াতের শেষে তাদের তিরষ্কার করে বলা হয়েছে, (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) “তবে এরা যাচ্ছে কোথায়?” [আনকাবুত/৬১, যুখরুফ/৮৭] , (فَأَنَّى تُسْحَرُونَ) “তবে তোমাদের কিসে প্রতারিত করছে?” [মু’মিনুন/৮৯] অর্থাৎ যদি সত্যিই তোমরা “সকল ক্ষমতা আল্লাহর” এটাই বিশ্বাস করো তবে অন্যান্য দেব-দেবীর নিকট মঙ্গল-অমঙ্গলের বিষয়ে প্রার্থনা করো কেন?

বাস্তবতা হলো, আল্লাহ ﷻ আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে তার একত্ববাদের বহু নিদর্শন বিদ্যমান রেখেছেন। তিনি বলেন,

{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ}

আমি আসমান-জমিনে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে এমন সব নিদর্শন দেখাবো যাতে তারা নিশ্চিত বুঝতে পারে যে এটাই সত্য। [ফুসসিলাত/৫৩]

এছাড়া রুহের জগতে সমস্ত আদম সন্তান হতে স্বীকৃতি গ্রহণ করার জন্য বলেছেন, (ألست بربكم) ‘‘আমি কি তোমাদের রব নয়?’’ তারা বলেছে হ্যাঁ। প্রত্যেকের অন্তরে এই স্বীকৃতি গেঁথে রয়েছে।

সর্বপরি যুগে যুগে নবী-রসূল আগমন করে মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। যারা তাদের মেনে নিয়েছে তারা পৃথিবীতে বসবাস করেছে। আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো নুহ عليه السلام, হুদ عليه السلام, শুয়াইব عليه السلام ও লুত عليه السلام এর সম্প্রদায়। এভাবে পৃথিবীকে বারবার কুফর-শিরকের কলুষতা হতে পবিত্র করা হয়েছে।

এইসব নানাবিধ কারণে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার মহাপরাক্রমশালী ক্ষমতাকে সরাসরি অস্বীকার করা সচারাচর কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না। এমনকি খোদ নাস্তিকরাও অনেক সময় সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার সাহস পায় না। বর্তমানে এমন কিছু মুসলিমনামধারী নেতা-নেত্রী আছে যারা জান-প্রাণ দিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে, আল্লাহর বিধানকে বর্বর ও অসভ্য আইন হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং তা পরিত্যাগ করে মানবরচিত বিধান প্রবর্তন করে। যদি এদের প্রশ্ন করা হয় তোমরা কি আল্লাহ-রসুল, কুরআন-হাদীস মানো না? তারা হ্যাঁ সূচক উত্তর দেবে। এই মৌখিক দাবীকে তাদের অন্তরের বিশ্বাস মনে করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি হতে পারে!

মক্কার মুশরিকরা তাদের অন্তরে তাদের উপাস্যসমূহকে আল্লাহর সমপর্যায়ের বা ক্ষেত্র বিশেষ তার চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান মনে করতো কিন্তু সেটা মুখে প্রকাশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেহেতু তারা জানতো বিষয়টি দলিল প্রমান ও যুক্তি-বুদ্ধির বিপরীতে। একারণে তারা এবিষয়ে কৌশল অবলম্বন করতো। মুখে বলতো সকল ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই কিন্তু কাজে কর্মে ঠিকই নিজেদের বিশ্বাস মতো মূর্তির নিকট প্রার্থনা করতো। এদের মুখের দাবীর মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে সেটাকে তাদের প্রকৃত বিশ্বাস মনে করাটা কখনও যৌক্তিক হতে পারে না।

২. মুশরিকদের পক্ষ থেকে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, বৃষ্টিদাতা, রিযিকদাত ইত্যাদি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, মুশরিকরা সর্বোচ্চ শক্তি হিসাবে এবং সমস্ত শক্তির উৎস হিসেবে আল্লাহকেই মানতো কিন্তু তারা মনে করতো তাদের দেব-দেবী সমূহ আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের স্বীয় ক্ষমতাতে শরীক করেছেন এবং তাদের উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা এবং সেই ক্ষমতার বলে কাউকে উপকার বা ক্ষতি করার স্বাধীন ক্ষমতা দান করেছেন। একারণে তারা তাদের উপাস্যসমূহের নিকট মঙ্গল-অমঙ্গলের ব্যাপারে প্রার্থনা করতো। যেহেতু মঙ্গল বা অমঙ্গল করার স্বাধীন ক্ষমতা তাদের রয়েছে বলে মনে করতো কিন্তু এই সকল ক্ষমতার প্রকৃত মালিক ও এগুলোর উৎস হিসেবে আল্লাহকেই স্বীকার করতো। একারণে তারা কা’বা শরীফ তাওয়াফ করার সময় বলতো,

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَإِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

হে আল্লাহ, আমরা হাজির হয়েছি। আপনার কোন শরীক নেই, তবে এমন শরীক ছাড়া আপনি যার মালিক এবং সে যা কিছুর মালিক আপনি সেসবেরও মালিক। [সহীহ মুসলিম]

বর্তমানে যারা কবর পূজা করে তারাও অনুরুপ আক্বীদা বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। যেমন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির ভক্তরা বলে থাকে, আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতা রসুলকে প্রদান করে নিজে খালি হয়ে গেছেন। একইভাবে রসুল সে ক্ষমতা খাজা মইনুদ্দিনকে প্রদান করে নিজে খালি হয়ে গেছেন। কিন্তু খাজা সে ক্ষমতা পেয়ে আজমীরে লুকিয়ে পড়েছে।

যদি এই সব কবরপুজারীদের নিকট প্রশ্ন করা হয় সৃষ্টি করেছেন কে? বৃষ্টি দেন কে? তারাও বলবে, আল্লাহ্। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা খাজা মইনুদ্দিনের কোনো ক্ষমতা আছে বলে মনে করে না বরং এর অর্থ হলো, এসব ক্ষমতার মালিক মূলত আল্লাহ তবে তিনি তার কোনো কোনো প্রিয় বান্দাকে এসব ক্ষমতার কিছু অংশ প্রদান করেছেন। ফলে সে স্বাধীনভাবে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এভাবে তারা আল্লাহকে সর্বোচ্চ ও মহাশক্তিমান রব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরও অন্যকে তার রুবুবিয়্যাতের বিভিন্ন ক্ষমতায় শরীক করে থাকে। মক্কার মুশরিকদের অবস্থাও অনুরুপ ছিল।

৩. আল্লাহ ﷻ কে সমস্ত কিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক হিসেবে মেনে নেওয়ার পরও মক্কার মুশরিকরা কেনো মঙ্গল-অমঙ্গলের ব্যাপারে গয়রুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতো এর আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, তারা নিজেদের মূর্তিদের আল্লাহর একনিষ্ঠ প্রিয় বান্দা মনে করতো এবং এই সম্পর্কের ফলে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে তারা মানুষের বিভিন্ন উপকার ও ক্ষতি করতে পারে এমন মনে করতো। তারা বলতো,

{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}

﴾ আমরা তো কেবল একারণে তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। ﴿ [যুমার:৩]

ইবনে কাছির رحمه الله কাতাদা, সুদ্দী প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন,

{ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى } أي: ليشفعوا لنا، ويقربونا عنده منزلة

"তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে" এর অর্থ তারা আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে এবং আমাদের তার নিকট প্রিয়ভাজনে পরিনত করবে। [ইবনে কাছির]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

{هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ}

এরা আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফায়াত (সুপারিশ) করবে। [ইউনুস/১৮]

এ দুটি আয়াত একই অর্থ বহন করে। অর্থাৎ মূর্তি পূজারীদের বিশ্বাস ছিলো তাদের উপাস্যসমূহ আল্লাহর উপর এমন প্রভাব রাখে যে, তারা সুপারিশ করে আল্লাহর নিকট থেকে যে কারো জন্য মঙ্গল বা অমঙ্গল আনয়ন করতে পারে।

ইবনে কাছির রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم، وما ينوبهم من أمر الدنيا، فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به

তারা তাদের ইবাদত করতো যাতে তারা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে তাদের জন্য বিজয়, রিযিক বা দুনিয়াবী বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। কেননা তারা আখিরাতের বিষয় অস্বীকার করতো।

[তাফসীরে ইবনে কাছির]

মোট কথা, উপাস্য সমূহের সুপারিশের মাধ্যমে আখিরাতে উপকৃত হওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না বরং উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় কল্যাণ লাভ এবং বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া।

এখানে লক্ষ্যনীয় হলো, মুশরিকরা তাদের উপাস্যদের নিকট যে ধরণের শাফায়াত বা সুপারিশ আশা করতো তা রুবুবিয়্যাতের ক্ষমতায় শরীক করা হিসেবেই গণ্য। যেহেতু তারা মনে করতো তাদের উপাস্যসমূহ আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীতে আল্লাহর নিকট শাফায়াত করে কিছু আদায় করে দিতে সক্ষম। তাদের এই ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস খন্ডায়ন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শাফায়াতের সুনির্দিষ্ট নিয়াম-নীতি ও শর্তাবলী বর্ণনা করেছেন। মুসলিমরা ঐ সকল নিয়ামনীতি ও শর্তের অধীনে নবী-রসুল, ফেরেস্তাকুল বা নেককার বান্দারা আল্লাহর নিকট শাফায়াত বা সুপারিশ করবে বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদের এ বিশ্বাস শিরক-কুফর হিসেবে গণ্য হয় না। আর ঐ সকল শর্তাবলীকে উপেক্ষা করার কারণে মুশরিকরা তাদের উপাস্যদের ব্যাপারে যে ধরণের শাফায়াতে বিশ্বাস করে তা শিরক হিসেবে গণ্য। নিম্নে ঐ সকল শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হলো,

ক) আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। যত বড় বুযর্গই হোক কেউ স্বেচ্ছায় কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না এবং আল্লাহ অনুমতি দেওয়ার আগ পর্যন্ত মুখ খুলতে সাহস করবে না। এ বিষয়ে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি লম্বা হাদীস স্পষ্ট দলিল। যেখানে বলা হয়েছে মানুষ কিয়ামতের দিন নিজেদের দুরাবস্থা অনুধাবন করে প্রথমে আদম আলাইহিস সালাম এর নিকট যাবে এবং তাকে

আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে অনুরোধ করবে। তিনি বলবেন, এ কাজ আমার দিয়ে হবে না। আমি তো নিজেই একটি অপরাধ করেছি সে বিষয়ে চিন্তিত রয়েছি। এভাবে তারা নূহ্ ﵇, ইব্রাহীম ﵇, মুসা ﵇ ও ঈসা ﵇ এর নিকট যাবে। কিন্তু তারা তাদের ফিরিয়ে দেবেন। শেষে তারা মুহাম্মাদ ﷺ এর নিকট আসবে। তিনি তাদের ফিরিয়ে দেবেন না কিন্তু সরাসরি সুপারিশ করার সাহসও করবেন না। বরং সাজদায় পড়ে যাবেন এবং অতি উত্তম ভাষায় আল্লাহর প্রসংশা করবেন। তখন আল্লাহ তাকে শাফায়াতের অনুমতি দিয়ে বলবেন,

يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ

হে মুহাম্মাদ, আপনি মাথা উত্তোলন করুন। আপনি বলুন, আপনার কথা শোনা হবে। আপনি প্রার্থনা করুন, আপনার প্রার্থনা পুরা করা হবে। আপনি শাফায়াত করুন, আপনার শাফায়াত গ্রহণযোগ্য হবে।

এই অনুমতি পাওয়া পর তিনি সুপারিশ করবেন।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ}

﴾ কে আছে যে, তার অনুমতি ছাড়া তার নিকট সুপারিশ করতে পারে! ﴿ [বাকারা/২৫৫]

খ) যাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে, সে যার-তার জন্য সুপারিশ করবে না বরং সুপারিশের যোগ্য ব্যক্তিকেই সুপারিশ করবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا}

﴾ তার সামনে কেউ কথা বলার সাহস করবে না, সে ছাড়া যাকে আল্লাহ অনুমতি দেন। তবে সেও যথাযোগ্য কথাই বলবে। ﴿ [নাবা/৩৮]

অর্থাৎ যারা সুপারিশ পাওয়ার যোগ্য কেবল তাদের জন্যই তারা সুপারিশ করবেন। সুপারিশের অযোগ্য লোকদের বিশেষত কাফির-মুশকিকদের জন্য তারা সুপারিশ করবেন না। উপরের হাদীসটির শেষের অংশে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ ﷺ শাফায়াতের মাধ্যমে সকলকে বের করে আনবেন। কেবল সে ছাড়া যার উপর আল-কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে চিরকাল জাহান্নামে থাকা নির্ধারিত হয়ে গেছে। মোট কথা, আল্লাহ যাকে সুপারিশের যোগ্য মনে করেন না তার জন্য কেউ সুপারিশ করবে না।

গ) কোনো একজন নবী বা ওলী কারো জন্য সুপারিশ করলেই যে আল্লাহ সেটা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন এমনটি নয়। বরং সুপারিশ করার পরও আল্লাহ ﷻ যে কারো সুপারিশকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করবেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ}

আল্লাহ যার ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া অন্য কারো জন্য সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না। [সাবা/২৩]

{ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا}

সেদিন কারো জন্য সুপারিশ কাজে আসবে না কেবল সে ছাড়া যার ব্যাপারে আল্লাহ সুপারিশের অনুমতি দেন এবং সে সুপারিশ গ্রহণ করেন। [তহা/১০৯]

এই ধরনের শাফায়াত বা সুপারিশে বিশ্বাস করা হলে সেটা শিরক-কুফর হিসেবে গণ্য হতে পারে না। যেহেতু এখানে গয়রুল্লাহর উপর কোন ক্ষমতা অর্পণ করা হয় না। কিন্তু মুশরিকরা তাদের উপাস্যদের ব্যাপারে যে সুপারিশে বিশ্বাস করতো তা এসব শর্তের অধীন ছিল না। তারা মনে করতো তাদের উপাস্যসমূহ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে তাকে কোনো কাজে বাধ্য করতে পারে। একারণে আল্লাহ যার অমঙ্গল চান এমন ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করে তারা তার মঙ্গল সাধন করতে পারে। এই ধারনার বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহর অবাধ্যতা ও শিরক-কুফরে লিপ্ত হওয়ার পরও স্বীয় উপাস্যদের সুপারিশের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়ার আশা করতো।

তাদের এই বিশ্বাস খন্ডায়নের জন্যই মূলত উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।

ইবনে কাছির ﵀ বলেন,

وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين وغيرهم، كلهم عبيد خاضعون لله، لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم، يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه

আল্লাহ ﷻ এটা ঘোষণা করেছেন যে, আকাশে যেসব ফেরেস্তা আছে সকলে আল্লাহর অধীনস্ত বান্দা মাত্র। তারা আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতীত কারো জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম নয়। তারা রাজা-বাদশাদের মন্ত্রী-পরিষদের মতো নয় যারা রাজার নিকট পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে সুপারিশ করে। [তাফসীরে ইবনে কাছির]

মোট কথা মক্কার মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল তাদের উপাস্যরা মহান আল্লাহর এতটাই প্রিয়পাত্র বা তার উপর এতই বেশি প্রাভাবশালী যে, তারা কোনো সুপারিশ করলে আল্লাহ্ সেটা কার্যকর করতে বাধ্য, তার পছন্দ হোক বা না হোক। অতএব, ঐ সকল উপাস্যদের সন্তুষ্ট করতে পারলে আল্লাহ যতই অসন্তুষ্ট হোক তাতে কোনো সমস্যা হবে না। এই বিশ্বাসের কারণে তারা আল্লাহ ﷻ কে পরিত্যাগ করে ঐ সকল

উপাস্যের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতো। তাদের নিকট দুনিয়ার বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রার্থনা করতো। বিপদ-আপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতো।

এভাবে আল্লাহকে সকল ক্ষমতার উৎস হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার পরও তার উপর অন্য কেউ প্রভাব রাখে এমন বিশ্বাস করার কারণে তারা ঐ সকল উপাস্যের পূজা-উপাসনা করতো এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ যদি আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হন তবু আমরা এই সকল উপাস্যের সুপারিশে মুক্তি পাবো। তারা বলতো আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন, বৃষ্টি দেন, রিযিক দেন, সন্তান দেন ইত্যাদি কিন্তু নিজেদের উপাস্যদের নিকট ঐ সকল বিষয় প্রার্থনা করতো কারণ তারা মনে করতো আল্লাহ যদি আমাদের এগুলো দিতে নাও চান তবু আমাদের উপাস্যরা তার নিকট থেকে (সুপারিশের মাধ্যমে বা প্রভাব খাটিয়ে) জোর করে আদায় করে দেবে। **এটিই হলো শাফায়াত বা সুপারিশ সম্পর্কে মুসলিম ও মুশরিকদের বিশ্বাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।**

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই প্রকার প্রভাব ও প্রবল ক্ষমতাতে বিশ্বাস করাটা নিশ্চয় উপস্যসমূহের গায়েবী ও অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতাতে বিশ্বাস করা বলেই গণ্য। আর এই অদৃশ্য ও অতিপ্রকৃতিক ক্ষমতাকেই বলে রুবুবিয়্যাত। সুতরাং যারা নিজেদের উপাস্যদের ব্যাপারে এই ধরনের আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণ করতো তারা মূলত মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে অসীম ক্ষমতায় স্বীয় উপাস্যদের শরীক সাব্যস্ত করতো।

উপরোক্ত আলোচনা স্বাপেক্ষে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, মক্কার মুশরিকরা তাদের উপাস্যসমূহের ব্যাপারে অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করতো এবং এটাও প্রমাণিত হয় যে, কারো অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতায় বিশ্বাস না করে তার ইবাদত করা সম্ভব নয়। যেহেতু ইবাদত অর্থই হলো অদৃশ্যের বিষয়ে প্রার্থনা করা। কারো অদৃশ্য ক্ষমতায় বিশ্বাস না করলে তার নিকট অদৃশ্য বিষয়ে প্রার্থনা করার প্রশ্ন আসে না অর্থাৎ তার ইবাদত করার প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

⇒ কারো কথা অনুযায়ী হালালকে হারাম মনে করা বা হারামকে হালাল মনে করা কি তার ইবাদত করা নয়?

ইবাদতের ভাষাভিত্তিক অর্থ আনুগত্য করা। এ হিসেবে কেউ কেউ গয়রুল্লাহর আনুগত্যকে শিরক হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। পূর্বে গয়রুল্লাহর আনুগত্য ইবাদত বা শিরক নয় এই শিরোনামে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি কারো আনুগত্য করলেই একজন ব্যক্তি কাফিরে পরিনত হয় না। এমন কি কারো নির্দেশে হারাম কাজ করা হলেও সেটা শিরক-কুফর হিসেবে গণ্য নয় যতক্ষণ না উক্ত ব্যক্তি হারাম কে হালাল জ্ঞান করে। অতএব যখন সে হালালকে হারাম জ্ঞান করবে বা

হারামকে হালাল মনে করবে তখন তাকে কাফির বলা হবে। আমরা এটাও বলেছি যে, হালালকে হারাম মনে করা বা হারামকে হালাল মনে করা নিজেই একটি কুফরী (যে বিষয়ে আমরা ঈমান ভঙ্গের দ্বিতীয় মূলনীতিতে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ)। কোনো ব্যক্তি অন্য কারো নির্দেশে হারামকে হালাল মনে করুক বা কারো নির্দেশ ছাড়াই স্বেচ্ছায় এটা করুক উভয় ক্ষেত্রে তা কুফর হিসেবে গন্য। সুতরাং এখানে আনুগত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই যৌক্তিক নয়। এর চেয়েও বেশি অযৌক্তিক বিষয়টিকে ইবাদতের প্রকৃত অর্থের মধ্যে গণ্য করা। কেননা এতে করে ইবাদত শব্দের অর্থ সম্পর্কে ব্যাপক অস্পষ্টতা ও জটিলতার সৃষ্টি হয় যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

এতদসত্ত্বেও কিছু লোক মনে করে, কারো কথা অনুযায়ী হারামকে হালাল মনে করা বা হালালকে হারাম মনে করা প্রকৃত অর্থেই উক্ত ব্যক্তির ইবাদত করা বোঝায়?

এর স্বপক্ষে তারা কুরআনের এই আয়াতটি উপস্থাপণ করে থাকে।

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}

﴾ তারা তাদের পন্ডিতবর্গ ও সন্যাসীদের আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে ﴿
[তাওবা/৩১]

এই আয়াতের সাথে তারা একটি হাদীসও বর্ণনা করে থাকে। আদী ইবনে হাতীম তাঈ ﵁ বলেন, আমি এই আয়াতটি শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ কে বললাম তারা তো তাদের ইবাদত করতো না।

রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

"إِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ وحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلالَ، فَاتَّبَعُوهُمْ، فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ"

তারা হারামকে হালাল করতো এবং হালালকে হারাম করতো আর এরা তাদের এব্যাপারে অনুসরণ করতো এটাই হলো তাদের ইবাদত করা।

উপরোক্ত আয়াত ও এই হাদীস অনুযায়ী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, কারো অনুসরণে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল মনে করা হলে সেটা উক্ত ব্যক্তির ইবাদত হিসেবে গণ্য।

তারা এও দাবী করে যে, ফিরআউন এই অর্থেই নিজেকে রব দাবী করেছিল। এরা বলে থাকে ফিরআউন কোনো অতিপ্রাকৃত ও অদৃশ্য ক্ষমতার দাবী করেনি। তার রব দাবীর উদ্দেশ্যেও এটি নয়। বরং যেহেতু সে আইন-কানুন প্রদান করতো এবং মিশরবাসীর উপর রাজত্ব করতো তাই সে এই অর্থে নিজেকে রব দাবী করেছে, অতিপ্রাকৃতিক অর্থে নয়। এ মতের স্বপক্ষে তারা যুক্তি দিয়ে বলে,

ক) ফিরআউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা নিশ্চয় এতটা বোকা ছিল না যে, তারা তাদের চোখের সামনে জন্ম নেওয়া একজন সাধারন মানুষের ব্যাপারে অদৃশ্য ও অতিলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করবে বা আকাশ পৃথিবীর পরিচালনায় তার কোন অংশ আছে বলে মনে করবে।

খ) কুরআনে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ}

ফিরআউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃত্বস্থানীয়রা বলল, আপনি কি মুসা ও তার সম্প্রদায়কে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যসমূহকে পরিত্যাগ করে? [আ'রাফ/১২৭]

তাদের কথা হলো যদি ফিরাউন অতিপ্রাকৃত অর্থে নিজেকে রব দাবী করেই থাকবে তবে সে আবার অন্য উপাস্যের উপাসনা করবে কেন?

এই সকল যুক্তি প্রমানের মাধ্যমে প্রমান করা হয় যে, হালাল-হারামের ব্যাপারে কারো আনুগত্য করা হলে তাকে প্রকৃত অর্থেই রব মেনে নেওয়া বা প্রকৃত অর্থেই ইবাদত করা হয়। এ হিসেবে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে যে, যদি অতিপ্রাকৃতিক শক্তির নিকট প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কিছু ইবাদত বলে গণ্য না হয় তবে হালাল-হারামের ক্ষেত্রে কারো আনুগত্য করা কিভাবে তার ইবাদত করা হিসেবে গণ্য হচ্ছে?

কারো কথা অনুযায়ী হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা যে উক্ত ব্যক্তির ইবাদত হিসেবে গণ্য নয় সে আলোচনা পূর্বেই গত হয়েছে। তবে তারা যেসব যুক্তি-প্রমানের মাধ্যমে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে এখানে আমরা তার পুর্নাঙ্গ জবাব প্রদান করার চেষ্টা করবো ইনশা-আল্লাহ।

◆ ***"ইয়াহুদী-খ্রষ্টানরা তাদের পন্ডিত ও সন্যাসীবর্গকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে" আয়াতের ব্যাখ্যা।***

আমরা প্রথমেই বলবো, সূরা তাওবার আয়াতটির তাফসীরে বর্ণিত আদী ইবনে হাতিম তাঈ رضي الله عنه এর হাদিসটি বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। উপরে যে রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করা হয়েছে তা সেসব রেওয়ায়েতের একটি মাত্র। যেখানে বলা হচ্ছে,

إِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ وحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحلالَ، فَاتَّبَعُوهُمْ، فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ

তারা হারামকে হালাল করতো এবং হালালকে হারাম করতো আর এরা তাদের এ ব্যাপারে অনুসরণ করতো এটাই হলো তাদের ইবাদত করা। [তিবরানী; মু'জামে কাবীর, তাফসীরে ইবনে কাছীর]

তিরমিযী ﷺ বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ নিজে বলেন,

أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ

তারা তো তাদের ইবাদত করতো না তবে তারা যখন কিছু হালাল করতো তারা তা মেনে নিতো আবার তারা কিছু হারাম করলে তাও মেনে নিতো।

দুটি রেওয়ায়েতের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রথম রেওয়ায়েতটি প্রমান করে যে, তাদের এই কর্মকান্ড ইবাদত হিসেবে গণ্য। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি প্রমান করে এটা ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। হাদীসটির সনদের ব্যাপারেও ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে। ইমাম তিরমিযী ﷺ নিজেই হাদীসটিকে গরীব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শায়েখ আলবানী অবশ্য হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এই অবস্থায় দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

১. সনদের সমস্য বা অর্থগত বৈপরিত্বের কারণে হাদীসটি পরিত্যাগ করা এবং আয়াতটির অর্থ সম্পর্কে পৃথকভাবে চিন্তা করা।

সে ক্ষেত্রে আয়াতটির বিভিন্ন রকম অর্থ হতে পারে। তাফসীরে বাহরে মুহীতে বলা হয়েছে,

وقيل : علم سبحانه أنهم يعتقدون الحلول ، وأنه سبحانه تجلى في بواطنهم فيسجدون له معتقدين أنه الله الذي حل فيهم وتجلى في سرائرهم ، فهؤلاء اتخذوهم أرباباً حقيقة.

কেউ কেউ বলেছে, আল্লাহ ﷻ জানতেন, তারা তাদের পন্ডিত-পুরোহিতদের ব্যাপারে এমন আক্বীদা রাখতো যে, তাদের আত্মা আল্লাহর সাথে মিশে যায়। এবং আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রকাশিত হন। একারণে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সাজদা অবনত হতো কিন্তু তারা মনে করতো এ সাজদা মূলত আল্লাহর জন্য যিনি এদের মধ্যে হাজির হয়েছেন। এরা প্রকৃত অর্থেই তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

এর পর তিনি এই মতের স্বপক্ষে বলেন,

ومذهب الحلول فشا في هذه الأمة كثيراً ، وقالوا بالاتحاد. وأكثر ما فشا في مشائخ الصوفية والفقراء في وقتنا هذا ، وقد رأيت منهم جماعة يزعمون أنهم أكابر. وحكى أبو عبد الله الرازي أنه كان فاشياً في زمانه ، حكاه في تفسيره عن بعض المروزيين كان يقول لأصحابه : أنتم عبيدي ، وإذا خلا ببعض الحمقا من أتباعه ادعى الآلهية.

আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়ার মতবাদ এই উম্মতের মেধ্য ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি [তাদের কেউ কেউ] আল্লাহ ও সৃষ্টি একই এই মতবাদ প্রচার করেছে। বর্তমানে এটা সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্তার লাভ করেছে সুফী ও ফকীরদের মাঝে। আমি তো তাদের কাউকে কাউকে দেখেছি নিজেকে বড় ক্ষমতাধর হিসেবে দাবী করতে। আবু আব্দিল্লাহ আর-রাজি বলেন, তার সময়েও এটা ব্যাপকহারে বিরাজমান ছিল।

তিনি তার তাফসীরে বর্ণনা করেন কোনো কোনো সুফী তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলতো তোমরা আমার বান্দা। কোন নির্বোধ ব্যক্তিকে একা পেলে তার সামনে নিজেকে ইলাহ্ দাবী করে বসতো।

এরপর তিনি স্পষ্ট করে বলেন,

وإذا كان هذا مشاهداً في هذه الأمة ، فكيف يبعد ثبوته في الأمم السابقة

যদি এই উম্মতের মধ্যে এমন আক্বীদা-বিশ্বাস পাওয়া যায় তবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে এটা থাকা কেনো অসম্ভব হবে! [বাহরে মুহীত]

আমি বলবো, তিনি ঠিকই বলেছেন। কেননা রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের পদে পদে অনুসরণ করবে। সে হিসেবে এটাও সম্ভব যে এই প্রকারের আক্বীদা বিশ্বাস তাদের থেকেই এই উম্মতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। তাছাড়া আমরা জানি বর্তমানে খৃষ্টানরা তাদের পাদ্রীদের সম্পর্কে এমন আক্বীদা রাখে যে তারা পাপ থেকে মুক্ত করতে এবং জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিতে সক্ষম। একারণে তারা পাদ্রীদের নিকট পাপমুক্তি প্রার্থনা করে থাকে। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কাল থেকেই তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল।

২. আদী ইবনে হাতিম তাঈ এর হাদীসটি সর্বসাকুল্যে গ্রহণযোগ্য ধরে নিয়ে এবং তার আলোকে সূরা তাওবার আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের সর্বপ্রথমে এমন একটি ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে যার মাধ্যমে এর অর্থগত বৈপরিত্ব দূর হয়।

উপরে আমরা দেখেছি হাদীসটির একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে পন্ডিত-পুরোহিতদের কথা অনুযায়ী হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম মনে করা তাদের ইবাদত করা হিসেবে গণ্য। অন্য রেওয়ায়েত স্পষ্ট বলা হচ্ছে, এটা ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। উভয় রেওয়াতের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় যে, যেখানে বলা হচ্ছে এটা ইবাদত সেখানে রূপক অর্থে তা বলা হচ্ছে প্রকৃত অর্থে নয়। যেমন সুন্দরী নারীকে বলা হয় চাঁদ এবং বীরপুরুষকে বলা হয় সিংহ। এটা যেহেতু প্রকৃত অর্থে ইবাদত নয় তাই অন্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে তারা তাদের ইবাদত করতো না। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে তারা তাদের ইবাদত করতো না। উসুলবিদ ওলামায়ে কিরামের বলেন কোনো শব্দকে তার রূপক অর্থে ব্যবহার করা হলে সেখানে হ্যাঁ বা না উভয়ই বলা যায়। যেমন যদি বলা হয় আলী (রা:) কি সিংহ? কেউ বলতে পারে হঁযা তিনি সিংহ এ উদ্দেশ্যে, তিনি বীর। অন্য কেউ বলতে পারে, না তিনি সিংহ নন। তার উদ্দেশ্য হলো তিনি প্রকৃত অর্থেই সিংহ নন।

মুফাসসিরগণ তাওবার আয়াতটির ব্যাখ্যায় এ কথাই বলেছেন।

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

قال أهل المعاني: جعلوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب حيث أطاعوهم في كل شي، ومنه قوله تعالى:" قالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً أي كالنار

ভাষাবিদরা বলেছেন, তারা তাদের পন্ডিতবর্গ ও সন্যাসীদের রবের মতো মর্যাদা প্রদান করেছে যেহেতু তারা প্রতিটি বিষয়ে তাদের আনুগত্য করেছে। যেভাবে আল্লাহ বলেন, "যুল কারনাইন বলল তোমরা ফু দাও, এমন কি তা (লোহা) আগুন হয়ে গেল। [কাহফ/৯৬] অর্থাৎ আগুনের মতো হয়ে গেল। [তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম বাগাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

فإن قيل: إنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان؟ قلنا: معناه أنهم أطاعوهم في معصية الله واستحلوا ما أحلّوا وحرّموا ما حرّموا، فاتخذوهم كالأرباب

যদি কেউ বলে, তারা তো তাদের পন্ডিত ও সন্যাসীদের ইবাদত করতো না। আমরা বলব, এখানে অর্থ হলো, তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করতো এবং তাদের কথা মতো হারামকে হালাল জ্ঞান করতো আর হালালকে হারাম করতো। এভাবে তারা তাদের রবের মতো গন্য করেছিল।

এছাড়াও আদি ইবনে হাতিম তাঈ যে বললেন, "তারা তো তাদের ইবাদত করতো না" এ থেকেও প্রমাণিত হয় এখানে ইবাদত শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা ইবাদত শব্দের প্রকৃত অর্থ আদি ইবনে হাতিম তাঈ এর নিকট অজানা থাকা সম্ভব নয়। যেহেতু তিনি আরবী ভাষা-ভাষী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। আর কোনো সাধারন আরবের নিকটও ইবাদতের মতো গরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ অজানা থাকতে পারে না। তবে কোনো শব্দ যখন রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন অনেকের নিকট সেটা অবোধগম্য মনে হতে পারে যেমন, হয়েছিল এই আয়াতে।

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}

যতক্ষণ না কালো সুতা হতে সাদা সুতা পৃথক হয়ে যায় ততক্ষণ আহার করতে থাকো।

[বাকারা/১৮৭]

এই আয়াতে সাদা সুতা ও কালো সুতা বলতে আকাশের সাদা ও কালো রেখাকে বোঝানো হয়েছে। এধরনের রূপক অর্থে প্রয়োগের কারণে অনেক সাহাবী ব্যাপারটি অনুধাবনে সক্ষম হননি। ফলে তারা নিজেদের বালিশের নিচে সাদা ও কালো সুতা রেখে তা পার্থক্য না করা পর্যন্ত পানাহার করতেন। কিন্তু নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, সুতা শব্দটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হলে কেবল বদ্ধ উম্মাদ ও দুধের শিশু ছাড়া

আর কারো নিকট তা অবোধগম্য হতো না।

অতএব, আদি ইবনে হাতিম ﷺ এর হাদীসটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলেও তার মাধ্যমে কেবল এটিই প্রমাণিত হয় যে, কারো নির্দেশে হালালকে হারাম মনে করা বা হারামকে হালাল মনে করার বিষয়টি উক্ত ব্যক্তিকে ইবাদত করার মতোই তবে প্রকৃত অর্থেই ইবাদত নয়।

♦ *ফিরআউন কি অর্থে নিজেকে রব দাবী করেছিল?*

এখন ফিরআউনের রব দাবী করা সম্পর্কে কথা হলো, পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে,

{فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى}

সে (ফিরআউন) বলল, আমি তোমাদের বড় রব। [নাযিআত/২৪]

অন্য আয়াতে এসেছে সে বলেছিল,

{يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي}

হে পরিষদবর্গ তো তোমাদের জন্য আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ আছে বলে আমি জানি না। [ক্বসাস/৩৮]

এই সকল স্পষ্ট আয়াত বিদ্যমান থাকার কারণে কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া সকল মুফাস্সিরীনে কিরাম এ মত পোষণ করেছেন যে, ফিরআউন অতিপ্রাকৃতিক অর্থে নিজেকে রব বা ইলাহ দাবী করেছিল। কুরআনের কারীমের স্পষ্ট অর্থ এ মতকেই প্রতিষ্ঠিত করে। তবে কেউ কেউ ফিরআউনের এ দাবীকে অতিপ্রাকৃতিক অর্থের পরিবর্তে জাগতিক অর্থে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তারা বলেছেন, ফিরআউন যে মিশরের উপর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব করতো এবং তার আদেশ-নির্দেশ মিশরের আইন বলে গণ্য হতো তার রব দাবীর উদ্দেশ্যে এটিই।

এ বিষয়ে তারা যুক্তি উপস্থাপণ করে বলে,

মিশরের লোকেরা এতটা নির্বোধ ছিল না যে, তাদের সামনে জন্ম নিয়েছে এবং বেড়ে উঠেছে এমন একজন মানুষকে আকাশ-পৃথিবীর উপর কর্তৃত্বশীল মনে করবে বা তার কোনো অতিপ্রাকৃতিক ও অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস করবে।

এ ধরনের যুক্তি অজ্ঞতাপ্রসূত। যেহেতু আমাদের চোখের সামনে মানুষ মানুষকে রব হিসেবে গ্রহণ করার এমন বহু উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে ঈসা ﷺ কে ইলাহ মনে করা।

এছাড়াও তাসাউফপন্থীদের মধ্যে কিছু কিছু ভন্ড প্রতারক এধরণের দাবী করেছিল বলে প্রমাণিত আছে। এদের ডাকে বহু সংখ্যক নির্বোধ লোক সাড়াও দিয়েছিল। নুহ্ ﷤ এর সম্প্রদায় ওয়াদ, ইয়াগুছ, ইয়াউক, সুওয়া ও নাছর নামক যেসব মূর্তির ইবাদত করতো তারাও মুলত তাদের মধ্যকার কিছু নেককার ব্যক্তি যাদের মৃত্যুর পর তারা তাদের মূর্তি নির্মাণ করেছিল।

সর্বোপরি মূর্তিপূজারীরা যেসব মূর্তির উপাসনা করে এবং বিশ্ব-ব্রক্ষ্মান্ডের পরিচালনায় তাদের কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে তারা নিজের হাতেই তাদের নির্মাণ করে এবং তাদের অক্ষমতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে। এর পরও তারা তাদের উপাসনা করে থাকে।

শয়তান মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে পরাজিত করে বাতিল ধর্ম বিশ্বাসের আবির্ভাব ঘটায়। তাই যুক্তি দ্বারা কাফির-মুশরিকদের কার্যকলাপকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মুলত একারণেই আল্লাহ্ ﷻ বলেছেন,

{أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}

ওরা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং তদাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ওরা তো উদাসীন। [আ'রাফ/১৭৯]

তারা আরো বলেন, আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ}

ফিরআউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃত্বস্থানীয়রা বলল, আপনি কি মুসা ও তার সম্প্রদায়কে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যসমূহকে পরিত্যাগ করে? [আ'রাফ/১২৭]

প্রশ্ন হলো ফিরআউন যদি অতিপ্রাকৃতিক অর্থে নিজেকে রব দাবী করতো তবে সে আবার অন্য ইলাহর উপাসনা কেন করতো?

এর সহজ ও স্বাভাবিক উত্তর হলো, যুগের পর যুগ ধরে দেখা গেছে যখন কোনো সৃষ্টির উপর রুবুবিয়্যাতের গুণ আরোপ করা হয় তখন অন্য কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির সাথে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়। মক্কার মুশরিকদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তারা যেসব মূর্তির ইবাদত করতো সেগুলো আল্লাহর নিকট তাদের জন্য সুপারিশ করবে বলে বিশ্বাস করতো। অর্থাৎ তারা সেসব মূর্তিকে আল্লাহর প্রিয়ভাজন বলে মনে করতো। নুহ্ ﷤ এর সম্প্রদায় এমন কিছু লোককে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে যারা নেককার বান্দা ছিল। খৃষ্টানরা ঈসা ﷤ কে আল্লাহর পুত্র মনে করে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। যারা ফেরেস্তাদের বা জিনদের ইবাদত করতো তারা আল্লাহর সাথে তাদের বংশগত সম্পর্ক দাবী করতো।

এই আলোকে এটা স্পষ্ট বলা যায় যে, ফিরআউন নিজেকে অন্য কোনো মহাশক্তিধর স্রষ্টার প্রিয়ভাজন মনে করতো এবং তার পক্ষ থেকে নিজেকে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলে দাবী করতো। আর এ হিসেবে মানুষ তাকে উপাসনা করতো। তাফসীরের গ্রন্থসমূহতে এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। কেউ বলেছেন, সে সূর্যের উপাসনা করতো। কারো মতে সে উপাসনা করতো কিছু মূর্তির। অন্য অনেকে বলেছেন, সে উপাসনা করতো গাভীর।

আল-কুরতুবী ﷺ বলেন,

قال الحسن: كان فرعون يعبد الأصنام، فكان يعبد ويعبد

হাসান বলেন, ফিরআউন মূর্তির উপাসনা করতো ফলে সে নিজেও ইবাদত করতো আবার অন্যরা তার ইবাদত করতো। [তাফসীরে কুরতুবী]

এ ব্যাখ্যার পর এ সংশয়ের কোনো অবকাশ থাকে না যে, ফিরআউন অতিপ্রাকৃতিক অর্থে নিজেকে ইলাহ দাবী করলে সে নিজেই অন্য ইলাহর উপসনা কেন করতো?

কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ এবং সে আলোকে জমহুর মুফাস্সিরিনে কিরামের মতামত পরিত্যাগ করার জন্য এসব যুক্তি প্রমান যথেষ্ট নয়। বরং এর বিপরীতে শক্ত যুক্তি উপস্থাপণ করে বলা যায়, যদি ফিরআউনকে কেবলমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতার নিয়ন্ত্রন ও দেশের আইন প্রনয়নের কারণে রব বলা হয়ে থাকে তবে সে ছাড়া অন্যান্য রাজা-বাদাশা ও নেতা-নেত্রীদের ব্যাপারে একথা কেন বলা হয়নি? যুগে যুগে আল্লাহ ﷻ বহু সংখ্যক নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন আর প্রতিটি নবী-রাসুলই কোনো না কোনো অহংকারী নেতা বা বাদশার সাথে মোকাবিলা করেছেন। তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে কুরআনে বিস্তারিত বর্ণনাও এসেছে। বারবার বলা হয়েছে, (قال الملأ من قومه) ''তাদের সম্প্রদায়ের নেতারা বলল'' [আ'রাফ/৬০] (قال الملأ الذين كفروا من قومه) ''তার সম্প্রদায়ের ঐ সকল নেতারা বলল যারা কুফরী করেছিল'' [আরাফ/৬৬] (قال الملأ الذين استكبروا من قومه) ''তার সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা বলল'' [আরাফ/৭৫]

এইসকল নেতারা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে নবী-রসুলদের বিরুদ্ধে যাওয়ার পরামর্শ দিতো। আর সে নির্দেশে তাদের সম্প্রদায় নবী-রাসূলদের মোবারোক দা'ওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। এক কথায় তারা তাদের নেতাদের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহর পক্ষ হতে আনীত বিধান অস্বীকার করতো। তা সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনে এই সকল নেতাদের রব বা ইলাহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়নি কেনো? আর ফিরআউনের ক্ষেত্রে কেনই বা ব্যতিক্রম করা হলো?

সা'বার রাণী বিলকিসকে তার সম্প্রদায় অত্যাধিক সম্মান প্রদর্শন করতো। এমনকি সে যখন তাদের

নিকট সুলাইমান ﷺ এর চিঠি সম্পর্কে পরামর্শ চেয়েছিল তারা বলল,

{نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ}

❮ আমরা তো অত্যাধিক শক্তিশালী এবং প্রচন্ত যুদ্ধবাজ তবে সিদ্ধান্ত আপনার অতএব দেখুন আপনি কি নির্দেশ দেবেন। ❯ [নামল/৩৩]

অর্থাৎ তারা রাণীর নির্দেশে এমনকি নবী সুলাইমানের সাথে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত ছিল। এবং জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করেই তার নির্দেশ মেনে চলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল।

একজন মহিলার এতটা কর্তৃত্ব ও সম্মান পাওয়াটা একটু অস্বাভাবিকই ছিল। সে কারণে হুদহুদ পাখি যখন সাবার লোকদের সম্পর্কে সুলাইমান ﷺ কে অবহিত করছিল তখন প্রথমেই শুরু করে এভাবে,

{إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ}

❮ আমি দেখেছি, একজন মহিলা তাদের উপর রাজত্ব করে। তার একটি বড় সিংহাসনও রয়েছে। ❯ [নামল/২৩]

এর পর হুদহুদ বলে,

{وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ}

❮ আমি দেখেছি সেই মহিলা এবং তার সম্প্রদায় আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদা করে। ❯ [নামল/২৪]

প্রশ্ন হলো হুদহুদ পাখি সাবার লোকদের শিরক সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার সময় ‘‘তারা রাণী বিলকিসকে রব মনে করে’’ এমন কথা কেন বলল না?

এভাবে ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবো, ফিরআউন এবং নমরুদ ছাড়া অন্য কোনো শাসক সম্পর্কে খোদায়ী দাবী করার কথা বলা হয়নি। এমনকি যেসব লোক মিথ্যা নুবুয়ত দাবী করেছিল। যেমন প্রথম যুগের মুসাইলামাতুল কায্যাব আর নিকট অতীতের মীর্যা গোলাম কাদিয়ানী। তাদের অনুসারীরা তাদের কথামতো ইসলামী শরীয়তের বহু সংখ্যক হালালকে হারাম জ্ঞান করেছে এবং বহুসংখ্যক হারামকে হালাল জ্ঞান করেছে। তা সত্ত্বেও একথা বলা হয়নি যে, তারা রব দাবী করেছিল বরং বলা হয় তারা নবী দাবী করেছে।

এরপরও যদি কেউ জেদ ধরে বলে ফিরআউনের রব দাবী আসলে শাসন ক্ষমতা অর্থেই ছিল তবু মূল

বিষয় অবপরিবর্তীত থেকে যায়। কেননা সেক্ষেত্রে ফিরআউনের রব দাবী পাদ্রী-পুরোহিতদের রব হিসেবে গ্রহণ করার মতো রূপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা প্রমাণ করেছি যে, হালাল-হারামের ক্ষেত্রে কারো আদেশ-নিষেধ মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তাকে রব হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি মূলত রূপক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়।

এ বিষয়টিও স্পষ্ট প্রমান করে যে, প্রকৃত অর্থে রব ও ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা বা ইবাদত করা অর্থ কারো রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দেওয়া এবং সে বিশ্বাস মতে তার নিকট প্রার্থনা করা।

♦ *মানুষ মানুষের রব হয়ে যায় কিভাবে?*

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}

বলুন হে আহলে কিতাবীরা এসো এমন একটি কথার দিকে যাতে আমরা ও তোমরা সমান। তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদত করবো না। তার সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং একে অপরকে রব হিসেবে গ্রহণ করবো না। [আলেইমরান/৬৪]

এই আয়াতে বলা হয়েছে, ''আমরা একে অপরকে রব হিসেবে গ্রহণ করবো না'' অর্থাৎ আমরা একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে রব হিসেবে গ্রহণ করবো না। এই কথাটি অনেকের নিকট জটিল মনে হয়। তারা বলেন, মানুষ কিভাবে মানুষের রব হতে পারে? এই প্রশ্নের সূত্র ধরেই অনেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন- একজন মানুষ আরেকজন মানুষের উপর কর্তৃত্ব করে, রাজা-বাদশারা প্রজাদের উপর বিভিন্ন ইসলামবিরোধী আইন-কানুন চালু করে আর প্রজারা তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এটাই হলো মানুষ মানুষকে রব হিসেবে মেনে নেওয়া। যেহেতু এখানে মানুষ মানুষকে রব মেনে নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে মূর্তিকে নয় অতএব, কারো অতিপ্রকৃতিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করা এবং তার নিকট গায়েবীভাবে প্রার্থনা করার বিষয়টি এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে না। যে বিষয়টি তারা প্রথমেই ভুলে যায় তা হলো, মূর্তিকে রব মেনে নেওয়া আর মানুষকে রব মেনে নেওয়া আসলে একই জিনিস। যেহেতু পৃথিবীতে যতগুলো মূর্তির পূজা করা হয়েছে তার বেশিরভাগই কোনো না কোনো মানুষের প্রতিকৃতি। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত নূহ্ عليه السلام এর সম্প্রদায় প্রথম কিভাবে শিরক শুরু করে তার বর্ণনাতে এসেছে, ''কিছু নেককার লোক মারা গেলে তারা তাদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য তাদের মূর্তি নির্মাণ করে। পরবর্তী প্রজন্ম ঐ সকল মূর্তির পূজা-উপাসনা শুরু করে।'' ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন,

صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي العَرَبِ بَعْدُ

নূহ ﷺ এর সম্প্রদায়ের ঐ সকল মূর্তি পরবর্তীতে আরব মুশরিকদের মাঝে স্থানান্তরিত হয়।

[সহীহ্ বুখারী]

এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় তা হলো, উপরোক্ত আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্ ﷻ তাদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলেছেন,

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ}

ইয়াহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র আর খৃষ্টানরা বলে ঈসা আল্লাহর পুত্র। [তাওবা/৩০]

অর্থাৎ তারা ঈসা ﷺ ও উযাইর ﷺ কে আল্লাহর স্বত্ত্বার সাথে শরীক করতো। এভাবে তারা কিছু মানুষকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের এই শিরকী আক্বীদা-বিশ্বাস পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে তাদের ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। [সূরা নিসা/১৭১]

মোট কথা যুগে যুগে মানুষ অন্য মানুষের অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে তাদের পূজা-উপসনা করেছে। কাউকে জীবীত অবস্থায় পূজা করা হয়েছে, কারো মৃত্যুর পর তার কবরে হাজির হয়ে বা হার প্রতিকৃতি নির্মাণ করে পূজা-উপাসনা করা হয়েছে। এভাবে মানুষ মানুষকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং মানুষ মানুষকে রব হিসেবে গ্রহণ করলে সেটা কেবল রাজা-বাদশাদের আইন-কানুনের উপর প্রয়োগ করা এবং রাষ্ট্রীয় আইনে ইসলামের বিপরীত কিছু চালু করাই মূলত রব হয়ে বসা এই ধারনার প্রচার করা সুবিবেচনা নয়। যেহেতু আমরা উপরে "ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের পন্ডিত ও পুরোহিতদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল" এই আয়াত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমাণ করেছি, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা বা কারো নির্দেশে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া কুফরী নয়। আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে অন্য কারো নির্দেশকে উত্তম মনে করা কুফরী। তবে এটা প্রকৃত অর্থে তাকে ইবাদত করা বা ইলাহ ও রব মেনে নেওয়া হিসেবে গণ্য নয়। রূপক অর্থে এক্ষেত্রে রব শব্দের প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে।

⇒ যে ব্যক্তি মূর্তির ক্ষমতায় বিশ্বাস না করে কেবল সামাজিক সহৃদতার খাতিরে বা দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করার জন্য মূর্তির সামনে সাজদা করে এটা কি মূর্তিকে ইবাদত করা বলে গণ্য নয় এবং এই ব্যক্তিকে কি কাফির বলা হবে না?

এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, কোনো কিছুকে কুফরী বলা এবং সে কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলা

অর্থ এই নয় যে কাজটি গয়রুল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হতে হবে। একইভাবে কোন কাজকে ইবাদত না বলার অর্থ এই নয় যে কাজটির মাধ্যমে কেউ কাফির হতে পারে না। যেহেতু কেবল মাত্র গয়রুল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমেই মানুষ কাফির হয় এমনটি নয় বরং গয়রুল্লাহর ইবাদত ছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে যা একজন ব্যক্তিকে কাফিরে পরিনত করে। পূর্বে আমরা বলেছি ঈমান ভঙ্গের চারটি মূলনীতি রয়েছে। গয়রুল্লাহর ইবাদত করা তার মধ্যে একটি মাত্র। এছাড়াও আরো তিনটি মূলনীতি রয়েছে তা হলো, হালালকে-হারাম ও হারামকে হালাল মনে করা, আল্লাহর দ্বীনের কোনো অংশ নিয়ে তামাশা করা ও কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা। **সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি গয়রুল্লাহর ইবাদত নাও করে কিন্তু অন্য তিনটি মূলনীতির যে কোন একটির অধীনে সে কাফিরে পরিনত হয় তবু তাকে কাফির বলা হবে। যদিও বলা হবে না যে, সে কারো ইবাদত করেছে।** যেমন, কেউ যদি ঘৃণাভরে কুরআন ছুড়ে ফেলে তবে তাকে কাফির বলা হবে যদিও সে গয়রুল্লাহর ইবাদত করেনি।

এ বিষয়টি বুঝে নেওয়ার পর আমরা বলব, ওলামায়ে কেরাম স্বেচ্ছায় নিজেকে কাফির হিসেবে পরিচয় দেওয়া বা কুফরীর পরিচয় বহন করে এমন কোন কাজে লিপ্ত হওয়াকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বিষয়টিকে ‘‘রিদা বিল কুফরী’’ তথা কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা হিসেবে গণ্য করেছেন। আর কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা কুফরী হিসেবে গণ্য। যেমনটি ঈমান ভঙ্গের চারটি মুলনীতি প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি ইনশা-আল্লাহ।

এই মূলনীতি অনুযায়ী যে কেউ এমন কোনো কাজে লিপ্ত হয় যা স্পষ্টভাবে কুফরীর প্রতীক হিসেবে গণ্য এবং কুফরীর পরিচয় বহন করে ফলে একজন কাফির ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তা করা সম্ভব নয় তবে উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে।

ইবনে হাযার আল-আসক্কালানী رحمه الله বলেন,

ولم يحكم عليه بكفر الا أن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم

তাকে (মুসলিমকে) কাফির বলা হবে না যতক্ষণ না সে এমন কোনো কাজে লিপ্ত হয় যা তার কুফরীর প্রমান বহন করে- যেমন, মূর্তির উদ্দেশ্যে সাজদা করা। [ফাতহুল বারী]

কাজি ইয়াদ رحمه الله বলেন,

و كذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر من كافر و إن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل كالسجود للصنم و للشمس و القمر و الصليب و النار و السعي إلى الكنائس و البيع مع أهلها بزيهم : من شد الزنانير و فحص الرؤوس فقد أجمع المسلمون أن هذا [الفعل] لا يوجد إلا من كافر و أن هذه الأفعال

علامة على الكفر و إن صرح فاعلها بالإسلام

আমরা এমন প্রত্যেককে কাফির বলব, যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যে বিষয়ে মুসলিমদের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে যে, ঐধরণের কাজ কেবল কাফিররাই করতে পারে। যাদিও উক্ত কাজ যে করছে সে উক্ত কাজ করার পরও বাহ্যিকভাবে ইসলাম পালন করে। **যেমন মূর্তি, চন্দ্র, সূর্য, ক্রুশ, আগুন, ইত্যাদির সামনে সাজদা করা**। ইয়াহুদী বা খৃষ্টানদের পোশাক পরে তাদের উপাসনালয়ে গমণ করা, খুষ্টানদের মত ঝিনার (এক প্রকারের ফিতা) পরিধান করা বা মাথার চুলে বেড় দেওয়া। কেননা মুসলিমরা ইজমা করেছেন যে, এসব কাজ কেবল কাফির ছাড়া কেউ করতে পারে না। আর এসব কাজ কুফরীর আলামত। যদিও উক্ত ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইসলামের দাবি করে। [আশ শিফা]

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয়টি হলো, যে ব্যক্তি রুবুবিয়্যাতের বিশ্বাস ছাড়াই মূর্তির উদ্দেশ্যে সাজদা করবে তাকে কাফির হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে কিন্তু এর কারণ হিসাবে এমন বলা হচ্ছে না যে, এই ব্যক্তি মূর্তির ইবাদত করেছে বরং বলা হয়েছে সে এমন একটি কাজ করেছে যা কুফরীর প্রমান বহন করে এবং কুফরীর প্রতীক হিসেবে গণ্য। সেই সাথে আরো কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো এই পর্যায়ের কুফরীর মধ্যে গণ্য যেমন ক্রুশ পরিধান করা, মুশরিকদের মতো সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা ইত্যাদি। এসব বিষয় কাফিরদের সংস্কৃতি এবং তাদের ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণে কুফরী হিসেবে চিহ্নিত, ইবাদত হওয়ার কারণে নয়।

অতএব, যে ব্যক্তি মূর্তি বা অন্য কোনো উপাস্যের সামনে সাজদা অবনত হয় সে যদি উক্ত উপাস্যের অদৃশ্য ক্ষমতায় বিশ্বাস করে তবে তা ইবাদত হবে এবং শিরক ও কুফর হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি সে উক্ত উপাস্যের রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাস না করে বরং সমাজ রক্ষা বা অন্য কোনো কারণে ঐ সকল উপাস্যের সামনে মাথা নত করে তবে সেটা ইবাদত করা বলে গণ্য হবে না কিন্তু কুফর হিসেবে গণ্য হবে যেহেতু এটা কাফিরদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা-উপাসনার সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্য রাখে। আর এধরণের সাদৃশ্য রাখা উম্মতের ইজমা অনুসারে কুফরী হিসেবে গণ্য।

এ পার্থক্যটি স্পষ্ট বুঝে নিতে হবে। যেহেতু এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা না থাকলে এমন একটি গোলোযোগের সৃষ্টি হবে যার সামাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। যদি কেউ মনে করে মূর্তির সামনে সাজদা করা কুফরী হওয়ার কারন হলো, এখানে আল্লাহর জন্য যে ইবাদত করা হয় তা অন্যের উদ্দেশ্যে পেশ করা হচ্ছে তবে এটা সঠিক হবে না যেহেতু আমরা পূর্বে দেখেছি আল্লাহর জন্য যা কিছু ইবাদত হিসেবে পেশ করা হয় তা গয়রুল্লাহকে পেশ করা শিরক-কুফর বা ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। এমন কি সাজাদার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যকে পেশ করা কুফরী নয়।

২.ক.(৪) তাবাররুক ও তাওয়াস্‌সুলের সঠিক বিধান

যারা ইবাদত বলতে কেবল বহ্যিক কিছু আচার-অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম বুঝে থাকে, এর সাথে অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাস থাকা এবং প্রার্থনা করার বিষয়টি শর্ত করে না তারা তাবাররুক সম্পর্কে অত্যাধিক কড়াকড়ি করে থাকে। যেহেতু তাবার্‌রুকের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে এমন আচরণ করা হয় ভিতরের বিশ্বাস বাদ দিলে যা অনেক সময় মূর্তিপূজারী বা কবরপূজারীদের কার্যকলাপের মতো মনে হতে পারে। উদাহরণস্বরুপ কবরপূজারী কবরে চুম্বন করে আবার কোনো মুসলিমও অনেক সময় কোনো নেককার ব্যক্তির কবরে বা স্বয়ং রসুলুল্লাহ ﷺ এর কবরে চুম্বন করতে পারে। যারা উভয়ের অন্তরস্থ উদ্দেশ্য ও আক্বীদা-বিশ্বাসকে বিবেচনা করবে না তাদের নিকট উভয় চুম্বন সমান মনে হবে। তাই তারা উভয় স্থানে শিরক-কুফরীর ফতোয়া দেবে। কিন্তু ওলামায়ে কিরামের নিকট উভয় চুম্বনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু কবর পূজারী কবরে শায়িত ব্যক্তির অদৃশ্য ক্ষমতায় বিশ্বাসী। একারণে সে সরাসরি তাকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে তার নিকট হতে কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে তার কবরে চুম্বন করে থাকে। অপর দিকে যে মুসলিম নেককার ব্যক্তির কবরে চুম্বন করে বা স্বয়ং রসুলুল্লাহ ﷺ এর কবরে চুম্বন করে তার অন্তরে এধরনের বদ-আক্বীদা বিদ্যমান নেই। তবে যেহেতু নেককার ব্যক্তিকে সম্মান দেওয়া অর্থ আল্লাহকেই সম্মান দেওয়া অনুরুপভাবে রসুলকে ভালবাসা অর্থ আল্লাহকেই ভালবাসা তাই সে তাদের কবরে চুম্বন করেছে। এখানে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া বা সরাসরি তার নিকট হতেই কল্যাণ হাসিল করা ছাড়া তার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। এই পার্থক্যের কারণে প্রথম ব্যক্তি কাফির হওয়ার ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কিরাম একমত কিন্তু তারা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কাফির মনে করেন নি। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির এই কাজ বৈধ হবে কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে যেহেতু এ ধরণের কাজ অনেক সময় শিরকী আক্বীদা-বিশ্বাসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অন্তরের উদ্দেশ্য বিবেচনা না করে কেবল বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান বিবেচনা করার কারণে কেউ কেউ তাবার্‌রুক ও তাওয়াস্‌সুলকে স্বয়ং শিরক-কুফর মনে করে এবং এর মাধ্যমে মুসলিমকে কাফির বলে। যারা এতটা কঠোরতা অবলম্বন করে না তারা বিষয়টি শিরক-কুফরের নিকটবর্তী ও নিকৃষ্ট হারাম মনে করে থাকে।

অন্য কিছু লোক তাওহীদ ও শিরক-কুফরের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা না করার কারণে তাবাররুক ও তাওয়াস্‌সুলের মধ্যে এমনভাবে লিপ্ত হয় যাতে মুসলিমদের আক্বীদা-বিশ্বাস হুমকীর সম্মুখীন হয়।

এই উভয় ভ্রান্তির মাঝে সত্য ও সঠিক সিদ্ধান্তটি কি সেটা আমাদের সুস্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে।

⇒ তাবাররুকের বিধান

তাবাররুক (التبرك) শব্দটি মূল শব্দ বারাকা (بركة) হতে উদ্ভুত। বারাকা (بركة) অর্থ কল্যাণ আর তাবাররুক (التبرك) অর্থ কল্যাণ অর্জন করা বা কামনা করা। পরিভাষায় কোনো কল্যাণময় বস্তু, স্থান, সময় বা নেককার ব্যক্তির সংস্পর্ষে থাকাকে কল্যাণময় মনে করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট মঙ্গল কামনা করাকেই তাবাররুক বলা হয়।

লিসানুল আরবে বলা হয়েছে (وتَبَرّكْتُ به أي تَيَمَّنْتُ به) “ আমি তার মাধ্যমে বরকত কামনা করেছি এর অর্থ আমি তার মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করেছি। “

♦ *নবী-রাসুল বা নেককার ব্যক্তিদের মাধ্যমে তাবাররুক হাসীল করা বৈধ।*

শরীয়তের দলীল প্রমাণের আলোকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী-রাসুলদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলীর মাধ্যমে তাবাররুক গ্রহণ করা উত্তম কাজ হিসেবে গণ্য। আসহাবে কিরাম ও পরবর্তী নেককার লোকেরা রসুলুল্লাহ ﷺ এর ব্যবহৃত যে কোনো বস্তু নিজের সংগে রাখতে পারাটা সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করতেন। এ বিষয়ে অসংখ্যা হাদীস বর্ণিত আছে,

ইবনে শিরীন رحمه الله বলেন,

قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه و سلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها

আমি উবাইদাকে বললাম, আমাদের নিকট রসুলুল্লাহ ﷺ এর কিছু চুল আছে যা আমরা আনাস رضي الله عنه বা তার পরিবারের নিকট হতে পেয়েছি। তিনি বললেন, আমার নিকট রসুলুল্লাহ ﷺ এর একটি চুল থাকাটা দুনিয়া ও এতে যা কিছু আছে তা অপেক্ষা প্রিয়। [সহীহ বুখারী]

অন্য হাদীসে এসেছে,

فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به

রসুলুল্লাহ ﷺ আসলেন এবং ওযু করলেন তখন মানুষ তার ওযুর অবশিষ্ট পানি গ্রহণ করে তা নিজেদের শরীরে মাখতে শুরু করল। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

আবু জুহাইফা رضي الله عنه বলেন,

ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه و سلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه

আমি দেখলাম বেলাল رضي الله عنه রসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্য ওযুর পানি নিয়ে আসলেন, সাহাবারা তার অবশিষ্ট অংশ পাওয়ার জন্য প্রতিযোগীতা শুরু করল। কেউ সামান্য কিছু পেলেই তা গায়ে মেখে নিতেন। আর যদি

কেউ না পেতো তবে অন্য কারও ভেজা হাত হতে তা গ্রহণ করতো। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

বুখারী শরীফে হুদাইবিয়ার হাদীসে বর্ণিত আছে,

فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه و سلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه

আল্লাহর কসম রসুলুল্লাহ ﷺ যদি থুথু ফেলেন, তা কোনো না কোনো সাহাবীর হাতে পড়তো আর তারা তা মুখে ও শরীরে মেখে নিতেন। আর যখন তিনি আদেশ করতেন, তারা তা পালন করার জন্য প্রতিযোগীতা করতেন। তিনি যখন ওযু করতেন তার ওযুর অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রায় সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার মত অবস্থা হতো। [সহীহ বুখারী]

কোনো একজন মহিলা সাহাবী رضي الله عنه রসুল্লাহ ﷺ কে সুন্দর পাড় বিশিষ্ট একটি চাদর উপহার দিলে রসুলুল্লাহ ﷺ তা গ্রহণ করলেন এমন অবস্থায় যে, চাদরটি তার প্রয়োজন ছিল। পরে তিনি তা পরিধান করে বের হলে একজন সাহাবী رضي الله عنه তার কাছে চাদরটি প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দিয়ে দেন। অন্যান্য সাহাবীরা উক্ত সাহাবাকে তিরষ্কার করলে তিনি বলেন,

رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه و سلم لعلي أكفن فيها

আমি এই চাদরটির বরকত আশা করেছি যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ তা পরিধান করেছেন। আমি চাই আমার মৃত্যুর পর এই চাদরটি আমার কাফন হোক। [বুখারী ও মুসলিম]

জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ رضي الله عنه এর নিকট হতে রসুলুল্লাহ ﷺ চার দিনারের বিনিময়ে একটি উট ক্রয় করেছিলেন কিন্তু মূল্য পরিশোধের সময় রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে এক কিরাত বেশি দিয়েছিলেন। জাবির رضي الله عنه বলেন,

لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه و سلم

রসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে যে এক কিরাত বেশি দিয়েছিলেন তা কখনই আমি কাছ ছাড়া করি না।

[বুখারী ও মুসলিম]

জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ رضي الله عنه বলেন,

قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه و سلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه و سلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال (حي على أهل الوضوء البركة من الله) . فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه بركة

আমি রসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ছিলাম, এমতাবস্থায় আসরের সলাতের সময় হয় অথচ আমাদের নিকট

কোনো পানি ছিল না, অবশিষ্ট কিছু পানি ছাড়া। সেটুকু একটি পাত্রে রেখে রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি পাত্রের ভিতর হাত প্রবেশ করালেন এবং হাতের আঙ্গুলিগুলো বিছিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, যাদের ওযুর প্রয়োজন আছে তারা আমার নিকট এসো, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে বরকতময় পানি। জাবির ﷺ বলেন, আমি দেখছিলাম রসুলুল্লাহ ﷺ এর আঙ্গুলির ভিতর হতে পানি নির্গত হচ্ছিল। মানুষ ঐ পানি হতে ওযু করলো এবং পান করলো আমি যতদুর সম্ভব বেশি বেশি পান করার চেষ্টা করলাম কারণ আমি বুঝতে পারছিলাম যে এটা বরকতময় পানি। [সহীহ বুখারী]

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে রসুলূল্লাহ একদিন উম্মে সুলাইমের ঘরে নিদ্রারত ছিলেন। উম্মে সুলাইম এসে দেখলেন রসুলুল্লাহ্ ﷺ ঘেমে গেছেন। তিনি একটি কাচের পত্রে রসুলুল্লাহ ﷺ এর ঘাম গুলো তুলে নিচ্ছিলেন। রসুলুল্লাহ ﷺ এটা দেখে বললেন তুমি কি করছো? উম্মে সুলাইম বললেন, (يَا رَسُولَ اللهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا) "আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য আমরা এর বরকত কামনা করছি হে আল্লাহর রসুল" এটা শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (أصبت) তুমি ঠিকই করেছো।

এসকল দলীল প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কারণে সকল ওলামায়ে কিরাম একমত যে, রসুলুল্লাহ ﷺ এর ব্যবহৃত বস্তুর মাধ্যমে তাবাররুক হাসীল করা যায়। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন বিতর্ক নেই। তবে রসুলুল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে তাবাররুক গ্রহণ করা বৈধ কিনা সে বিষয়ে মতাদ্বন্দ আছে।

এ বিষয়ে যারা আলোচনা করেছেন তাদের বেশিরভাগের মতে নেককার ব্যক্তির মাধ্যমেও তাবাররুক হাসীল করা বৈধ। তারা এবিষয়ে ঐ সকল হাদীসমূহকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন,

ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم

এই হাদীসে নেককার লোকদের পরিত্যক্ত বস্তু তাদের ব্যবহৃত পানি, খাবার, পোশাক ইত্যাদির মাধ্যমে তাবাররুক হাসীল করা বৈধ প্রমাণিত হয়। [শারহে মুসলিম]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে,

وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة

রসুলুল্লাহ ﷺ সালিহ্ عليه السلام এর উষ্ট্রী যে হ্রদে পানি পান করতো সেখান থেকে পাানি পান করতে আদেশ দেন।

এ হাদীস প্রসঙ্গে ইমাম আল-কুরতুবী ﷺ বলেন,

أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يستقوا من بئر الناقة دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين، وإن تقادمت أعصارهم

রসুলুল্লাহ ﷺ যে উষ্ট্রীর হ্রদ হতে পানি পান করতে আদেশ করেছেন এটা প্রমান করে যে, নবী ও নেককার ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী দ্বারা বরকতের আশা করা যায় যদিও তারা বহু পূর্ব যুগের হয়ে থাকে। [তাফসীরে কুরতুবী]

ইতবান ইবনে মালিক ﷺ রসুলুল্লাহ ﷺ কে তার বাড়িতে একটি স্থানে সলাত আদায়ের জন্য অনুরোধ করেন যাতে তিনি সে স্থানটিকে সলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করেন। [সহীহ বুখারী]

এ হাদীস সম্পর্কে ইবনে হাযার আসক্কালানী ﷺ বলেন,

فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين

।এই হাদীস নেককার লোকদের মাধ্যমে তাবাররুক হাসীল করার স্বপক্ষে দলীল

[ফাতহুল বারী]

উপরে জাবির ﷺ হতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ ﷺ এর হাত হতে নির্গত বরকতময় পানি বেশি বেশি পান করেছেন।

ইমাম বুখারী কিতাবুল আশরিবা (كتاب الأشربة) বা পানীয় অধ্যায়ে বরকতময় পানি পান করার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে বাত্তাল ﷺ বলেন,

وفيه من الفقه: أن الإسراف فى الطعام والشراب مكروه إلا الأشياء التى أرى الله فيها بركة غير معهودة وآية قائمة بينة، فلا بأس بالاستكثار منها، وليس فى ذلك سرف ولا كراهية، ألا ترى قول جابر: ﴿فجعلت لا آلو ما جعلت فى بطنى منه﴾ أى لا أقصر عن جهدى فى الاستكثار من شربه

এই হাদীস হতে বোঝা যায় সাধারনত খাবার বা পানীয় অতিরিক্ত গ্রহণ করা মাকরুহ কিন্তু যখন কোনো কিছুতে অস্বাভাবিক কল্যাণ পরিলক্ষিত হয় বা স্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায় তখন উক্ত বস্তু বেশি গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। এতে কোনো অপব্যয় হবে না, এটা মাকরুহও হবে না। আপনি কি জাবির ﷺ এর কথা লক্ষ্য করছেন না? তিনি বললেন, আমি উক্ত পানি আমার পেটে প্রবেশ করা হতে ক্লান্ত হচ্ছিলাম না। অর্থাৎ যতদুর সম্ভব পান করার চেষ্টায় সামান্যও ত্রুটি করছিলাম না। [শারহে বুখারী]

দেখা যাচ্ছে ইবনে বাত্তাল ﷺ যে কোনো প্রকার বরকতময় খাবার এমনকি বেশি গ্রহণ করাতেও দোষ

মনে করছেন না।

এই সকল ওলামায়ে কিরাম কোনো নেককার ব্যক্তি বা এমনকি সম্মানিত বস্তু হতে তাবাররুক হাসীল করা বৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

অন্য কিছু আলেম বলেছেন এটা নিষিদ্ধ বরং ক্ষেত্র বিশেষে শিরক বা কুফর। এদের মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া অন্যতম। এরা উপরোক্ত হাদীসমূহকে রসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্য খাস মনে করেছেন। ফলে তিনি ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে এগুলো প্রযোজ্য নয় বলে মত দিয়েছেন। হাদীসগুলো রসুলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে খাস হওয়ার স্বপক্ষে তাদের যুক্তি হলো সাহাবায়ে কিরাম রসুলুল্লাহ্ ﷺ ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে তাবাররুক গ্রহণ করেছেন বলে প্রমান পাওয়া যায়নি। একইভাবে তাবেঈনরাও সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে তাবাররুক গ্রহণ করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটা প্রমাণ করে যে, তারা বিষয়টিকে রসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্য খাস মনে করতেন।

জমহুর ওলামায়ে কিরামের স্বপক্ষে এ সংশয়ের সুস্পষ্ট জবাব হলো,

♦ ***রসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়াবলীর মাধ্যমেও তাবাররুক গ্রহণ করার প্রমান রয়েছে।***

ক. উপরে আমরা দেখেছি, সালেহ্ عليه السلام এর উষ্ট্রী যে হ্রদে পানি পান করতো রসুলুল্লাহ ﷺ সেখান থেকে পানি পান করতে আদেশ করেন। এটা রসুলুল্লাহ ﷺ ছাড়াও অন্যান্য সম্মানিত বিষয় বা বস্তুর মাধ্যমে বরকত হাসীল করা যায় এর স্বপক্ষে প্রমান।

খ. সহীহ্ মুসলিম বর্ণীত আরেকটি হাদীসে এসেছে,

মিকদাদ رضي الله عنه একবার ক্ষুধার তাড়নায় রসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্য সংরক্ষিত দুধ পান করে নেন। পরে রসুলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসলে তিনি কি পান করবেন এই চিন্তা করে ভীষণ অনুতপ্ত হন। রসুলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসে যখন দেখলেন পাত্রে কিছুই নেই তিনি বললেন,

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِى وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِى

হে আল্লাহ আমাকে যে খাওয়াবে তুমি তাকে খাওয়াও। আর আমাকে যে পান করাবে তুমি তাকে পান করাও।

এ দোয়া শোনার পর মিকদাদ رضي الله عنه ছাগলগুলোর দিকে রওয়ানা হোন। তিনি দেখতে পান সেগুলোর বাট দুধে পরিপূর্ণ অথচ পূর্বে তাতে কিছুই ছিল না। তিনি দুধ দোহন করে রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট নিয়ে

গেলেন। রসুলুল্লাহ ﷺ পান করে তাকে দিলেন। তিনি পান করার পর হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন। রসুলুল্লাহ ﷺ কারণ জানতে চাইলে তিনি সব খুলে বললেন। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

مَا هَذِهِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ أَفَلاَ كُنْتَ آذَنْتَنِى فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا

এটা তো আল্লাহর রহমত ছাড়া কিছু নয়। তুমি কেনো আগে আমাকে বললে না, তাহলে আমি তোমার অন্য দুজন সাথীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতাম তাহলে তারাও এই রহমত পেতো।

মুসনাদে আহমদের রেওয়াতে এসেছে,

هذه بركة نزلت من السماء أفلا أخبرتني حتى أسقى صاحبيك

এটা তো আকাশ হতে নাযিল হওয়া একটি বরকত। তুমি কেনো আগে আমাকে বললে না? তাহলে আমি তোমার অন্য দুজন সাথীকেও পান করাতাম।

মিকদাদ رضي الله عنه বললেন,

إذا شربت البركة أنا وأنت فلا أبالي من أخطأت

যখন আমি আর আপনি এই বরকত পান করেছি তখন কে করলো না তাতে আমার কোনো পরওয়া নেই।

এখানে রসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই আশ্চর্যজনকভাবে যে দুধ নির্গত হয়েছে সেটাকে স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ ﷺ বরকতের বিষয় বলে গণ্য করেছেন এবং ঘুম থেকে জাগিয়ে হলেও সেটা অন্যদের পান করানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।

গ. বুখারীর এক বর্ণনাতে এসেছে আবু বকর رضي الله عنه এর বাড়িতে কিছু মেহমান আগমন করেন। আর তিনি রসুলুল্লাহ رضي الله عنه এর নিকট রাতে খেয়ে দেরি করে আগমন করেন। বাসায় ফিরে তিনি মেহমানদের খাবার দেওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তার স্ত্রী বলেন, মেহমানরা আপনাকে ছাড়া খেতে অস্বীকার করছেন। তিনি বললেন আপনারা খান। তারা সকলে যখন খাবার খাচ্ছিলেন তখন খাবারের পরিমান যেনো বেড়ে যাচ্ছিল। সকলের খাওয়া শেষ হলে তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, কি ব্যাপার! তার স্ত্রী বললেন,

لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات

কি আশ্চর্যের কথা এ দেখি আগের চেয়ে তিন গুন বেশি।

পরে তারা উক্ত খাবার রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট প্রেরণ করলেন এবং সকাল পর্যন্ত ওখানেই ছিল।

এই হাদীসে খাবার বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাতে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না তবু সাহাবায়ে

কিরাম এটাকে বরকতময় মনে করেছেন এমনকি সেটা রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট প্রেরণ করেছেন।

ঘ. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর থেকে তিবরানী বর্ণনা করেন,

وكان رسول الله يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين لم

রসুলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের ওযু করার স্থান থেকে পানি আনতে বলতেন তারপর তিনি সেটা পান করতেন। তিনি মুসলিমদের হাতের বরকত আশা করতেন। [৪২]

এই হাদীসটি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমান যে, অন্যদের হাতের বরকত আশা করা বৈধ।

এ ছাড়া আরো বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় আল্লাহ ﷻ নবী-রাসুল ছাড়াও অন্যান্য নেককার বান্দার বরকতে তার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের কল্যাণের ফয়সালা করে থাকেন।

সহীহ বুখারীর অন্য একটি হাদীস এ বিষয়ে দলীল। সেখানে একজন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে শোনার উদ্দেশ্য ছাড়াই কোনো এক ইলমী মজলিসে বসে। আল্লাহ ﷻ ওখানে উপস্থিত মুমীন বান্দাদের ওসীলায় তাকে ক্ষমা করে দেন ফেরেস্তারা বললেন, অমুক তো শুনার উদ্দেশ্যে আসে নি। আল্লাহ ﷻ বললেন,

قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم

ওরা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের সাথে কেউ বসলে খালি হাতে ফেরে না।

সহীহ্ মুসলিমে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখিত আছে, যে বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে খুন করার পর তওবা করার ইচ্ছা করলে একজন আলেম তাকে কিছু নেককার লোকের সংস্পর্শে যেতে উপদেশ দেন। সে সেদিকে রওয়ানা হয় কিন্তু পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে দেখা যায় সে নিজের এলাকা অপেক্ষা ঐ সকল নেককার লোকদের এলাকার দিকে বেশি নিকটবর্তী ছিল। এ কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। যদি সে ঐ সকল নেককার লোকদের নিকট পৌছে যেত তবে তার অবস্থা কিরুপ হতো! এ বর্ণনাতেও একদল নেককার লোকদের বরকতে কারো কল্যাণ করার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অন্য একটি হাদীসে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يأتي على الناس زمان يغزون فيقال فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فيقولون نعم فيفتح عليهم ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فيقولون نعم فيفتح لهم

---

[৪২] হাইছামী বলেন, (رجاله موثقون) “এর রাবীরা বিশ্বস্ত” এবং শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন [সিলসিলায়ে সহীহাহ্-২১১৮]

মানুষের উপর এমন একটি সময় আসবে যখন তারা যুদ্ধে বের হবে তাদের বলা হবে তোমাদের মধ্যে কি রসুলুল্লাহ ﷺ এর কোনো সাহাবী আছে? তারা বলবে হঁযা ফলে তারা বিজয়ী হবে। পরে তারা যুদ্ধে বের হবে তাদের বলা হবে তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যারা কোনো সাহাবীকে দেখেছে? তারা বলবে হঁযা ফলে তাদের বিজয় দান করা হবে। [সহীহ্ বুখারী]

সুতরাং কেবল রসুলুল্লাহ ﷺ এর মাধ্যমে ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে বরকত হাসীল হতে পারে না বা বরকত হাসীল করা ঠিক নয় একথা অযৌক্তিক।

একটি বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, বরকত হাসীল করা অর্থ কোনো সৃষ্টিকে ইলাহ্ মনে করা নয়। বরং এর অর্থ হলো, মহান আল্লাহর নিকট তার প্রিয় বান্দাদের সম্মানের খাতিরে কিছু অর্জন করার চেষ্টা করা। অতএব, যার মাধ্যমে তাবাররুক হাসীল করা হচ্ছে তাকে নবী-রাসুল হতে হবে এটা শর্ত নয় বরং আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়াই যথেষ্ট্য।

⇒ তাওয়াস্সুলের বিধান

তাওয়াস্সুল শব্দটি এসেছে ওসীলা (وسيلة) হতে যার অর্থ মাধ্যম। কারো নামের বরকতে আল্লাহর নিকট দোয়া কবুলের আশা করাই হলো তাওয়াস্সুল। এ হিসেবে তাওয়াস্সুল তাবার্রুকেরই একটি অংশ। যেহেতু এখানে কোনো কিছুর মাধ্যমে বা বরকতে আল্লাহর নিকট কল্যাণ কামনা করা হচ্ছে। সুতরাং উপরে তাবাররুকের বৈধতা সম্পর্কে যা কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তা তাওয়াসসুলের বৈধতার ব্যাপারেও দলীল।

তাবাররুকের মতো তাওয়াস্সুলের ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে। ইমাম নাব্বী, ইবনে হাযার আসক্কালানী, ইমাম যাহাবী, ইমাম শাওকানী প্রমুখ ওলামায়ে কিরামের মতে এটা বৈধ। অপরদিকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম শাতেবী প্রমুখের মতে এটা বৈধ নয়। ইয্যুদ্দিন আব্দুস সালাম বলেছেন, কেবল মাত্র রসুলুল্লাহ ﷺ এর ব্যাপারে তাওয়াস্সুল বৈধ অন্য কারো ব্যাপারে নয়।

রসুলুল্লাহ ﷺ এর কবরের নিকট দাড়িয়ে করণীয় কাজসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন,

وَيَتَوَسَّلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَتَشَفَّعُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ

নিজের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ﷺ কে ওসীলা করা এবং আল্লাহর নিকট তাকে মাধ্যম করা। [আল-ইদাহ্]

ইমাম শাওকানী এ বিষয়ে ‘আদ-দুররুন নাদীদ’ নামক পৃথক একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। সেখানে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এবং অন্যান্য নেককার ব্যক্তিদের

ওসীলায় দোয়া করার বৈধতা প্রমাণ করেছেন। তিনি যা বলেছেন তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো,

أن التوسل الي الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم ومزاياهم الفاضلة إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله فإذا قال القائل اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم

আমলদার ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দোয়া করা মূলত তাদের আমল ও নেক বৈশিষ্ট্যেকে মাধ্যম করা। যেহেতু কেবল আমলের মাধ্যমেই একজন শ্রেষ্ঠত্ব পেয়ে থাকে। যখন কেউ বলে, "হে আল্লাহ আমি অমুক আলিমের ওসীলায় আপনার নিকট দোয়া করছি" তখন অর্থ দাড়ায়, সে যে ইলম অর্জন করেছে তার ওসীলায় দোয়া করছি।

এরপর তিনি আমলের মাধ্যমে দোয়া করার প্রমাণ হিসেবে ইমাম বুখারী বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে, তিনজন ব্যক্তি পাহাড়ের গুহায় আটকে গেলে তারা নিজ নিজ আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ্ তাদের মুক্তি দেন।

এই হাদীসটির কারণে নিজের আমলের ওসীলায় আল্লাহর নিকট দোয়া করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। ইমাম শাওকানী উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কারো ওসীলায় দোয়া করা অর্থ তার আমলের ওসীলায় দোয়া করা। অতএব সেটাও বৈধ হওয়া উচিৎ।

♦ ***নিজের নেক আমলের পরিবর্তে অন্য কোনো নেককার ব্যক্তির ওসীলায় আল্লাহর নিকট দোয়া করা কি অপ্রাসঙ্গিক?***

অনেকে আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারেন হাদীসে নিজের আমলের মাধ্যমে দোয়া করার কথা বলা হচ্ছে, অন্যের আমলের মাধ্যমে নয়। তারা বলেন, একজন ব্যক্তি বিপদে পড়ে যদি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলে, "হে আল্লাহ আমি এই এই আমল করেছি অতএব আমাকে মুক্ত করো" সেটা তো যৌক্তিক বিষয় যেহেতু এখানে যে আমল করেছে সেই দোয়া করছে। কিন্তু এর পরিবর্তে যদি বলে, "হে আল্লাহ অমুক রাত-দিন নফল সলাত আদায় করে, সে একজন নেককার লোক তাই আমাকে মুক্ত করো।" তবে সেটা অপ্রাসঙ্গিক নয় কি? নিজের মুক্তির সাথে অন্য কারো আমলের কি সম্পর্ক?

বিভিন্নভাবে এর উত্তর দেওয়া যায়। যথা,

ক) যে প্রার্থনা করছে এবং যার ওসীলায় প্রার্থনা করা হচ্ছে যদি উভয়ের মাঝে কোনো প্রকার বংশ সম্পর্ক, বন্ধুত্ব বা কমপক্ষে পরিচয় থাকে তবে এটা আর অপ্রাসঙ্গিক বলে গণ্য হবে না। কারন আল্লাহ ﷻ দুনিয়া ও আখিরাতে নেককার পিতা-মাতার মাধ্যমে সন্তানের উপকার করে থাকেন।

সূরা কাহফে মুসা عليه السلام ও খিযির عليه السلام এর কাহিনী প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, খিযির عليه السلام আল্লাহর আদেশে

একটি ভগ্নপ্রায় প্রাচীর বিনা পারিশ্রমিকে বিনির্মাণ করেন। মুসা ﷺ এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন,

{وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي}

প্রাচীরটি ছিল এই শহরের দুজন এতীম বালকের। এর নিচে তাদের জন্য সংরক্ষিত গুপ্তধন ছিল। এদের উভয়ের পিতা নেককার ছিল। তাই তোমার রব চেয়েছেন ওরা যেনো বড় হয়ে নিজেদের গুপ্তভান্ডার অধিকার করে। এটা তোমার রবের দয়া। আমি তো এটা স্বেচ্ছায় করি নি। [কাহফ/৮২]

এখানে দেখা যাচ্ছে, নেককার পিতার মৃত্যুর পরও তার ওসীলায় দুনিয়াতে সন্তানের সম্পদ হেফাজত করা হচ্ছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ}

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের পরবর্তী বংশধরেরাও তাদের অনুসরণে ঈমান আনে আমি তাদের (জান্নাতের একই স্তরে) সম্মিলিত করবো। [তুর/২১]

আয়াতের অর্থ হলো, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তদি ইত্যাদি সম্পর্কের লোকেরা যদি আমলের ব্যাপারে একে অপরের সমান নাও হয় তবু যার আমল বেশি তার সাথে অন্যদের একই স্তরে রাখা হবে। শর্ত হলো সবাইকে মুমিন হতে হবে। এভাবে একজনের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা আখিরাতে অন্যের কল্যাণ করবেন।

সুতরাং যদি কেউ নিজের পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির ওসিলায় আল্লাহর নিকট দোয়া করে। তবে তা অবশ্যই যৌক্তিক হবে।

যদি কেউ বলে, "হে আল্লাহ আমার বাবা বা চাচা বড়ই নেককার ছিল তুমি তার ওসীলায় আমার দোয়া কবুল করো" তবে তা অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে না।

আত্মীয়-স্বজনের মতো পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সহচর বা অনুচর ইত্যাদি যে কোনো পরিচিত ব্যক্তি যদি অত্যাধিক নেককার হয় তবে তার জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পর তার ওসীলায় দোয়া করাতে কোনো অপ্রাসিঙ্গকতা নেই।

উদাহরণ স্বরুপ একদল মুজাহিদ বিভিন্ন রণক্ষেত্রে একসাথে জিহাদরত ছিল। এদের মধ্যে একজন ব্যক্তি বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেল। এখন বাকীরা যদি তার ওসীলায় প্রার্থনা করে বলে- "হে

আল্লাহ, ওমুক তো এই এই আমল করেছে, আর আমরা তার সাহচর্য পেয়েছি, অতএব তুমি আমাদের দোয়া কবুল করো তবে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।" কারণ একজন নেককার ব্যক্তির সাহচর্য পাওয়াও নেক নসীব হিসেবে গণ্য। এ বিষয়ে পূর্বে বেশ কিছু দলিল প্রমাণ গত হয়েছে। একজন ব্যক্তির কারণে পুরা সেনাদলকে বিজয় দেওয়া, একদল লোকের সাহচর্য পাওয়ার কারণে ক্ষমা চাইনি এমন একজন লোকও ক্ষমা পেয়ে যাওয়া, নেককার লোকদের বাসস্থানের দিকে অধিক নিকটবর্তী হওয়ার কারণে একজন ব্যক্তির তওবা কবুল হওয়া ইত্যাদি ঘটনা সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

খ) কারো ওসীলায় দোয়া করা অর্থ কেবল উক্ত ব্যক্তির নেক আমলকে অবলম্বন করাই বোঝায় এমন নয়। বরং এর মাধ্যমে যে দোয়া করছে তারও কিছু নেক আমল হয়। যেমন,

সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান নেওয়া এবং তার তুলনায় নিজেকে ছোট মনে করা। হাদীসে এসেছে, (من تواضع لله رفعه الله) " যে কেউ আল্লহর জন্য ছোট হয় আল্লাহ তাকে বড় করেন" [মিশকাত]

এখন যদি কেউ বলে- "হে আল্লাহ অমুক শহীদ, বা অমুক পরহেজগার ব্যক্তির ওসীলায় আমাকে ক্ষমা করো" তবে এর অর্থ কেবল এই যে, এই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে উত্তম মনে করছে এবং নিজেকে তার তুলনায় ছোট মনে করছে। জ্ঞানী ও নেককার ব্যক্তির মর্যাদা স্বীকার করা এবং বিনয় প্রকাশার্থে নিজেকে ছোট মনে করা উভয়ই নেক কাজ।

এছাড়া দোয়ার মধ্যে কারো ওসীলা করার স্পষ্ট অর্থ হলো, যে ব্যক্তি দোয়া করছে সে উক্ত ব্যক্তিকে ভালবাসে ও পছন্দ করে। সত্যিকার নেককার ব্যক্তিকে ভালবাসা ও তাকে পছন্দ করাও একটি নেক আমল।

অতএব, যখন কেউ দোয়ার মধ্যে কারো নামে ওসীলা করে প্রকারান্তরে সে যেন এমনই বলে যে, হে আল্লাহ অমুক আমার চোখে আমার নিজের চেয়েও বেশি সম্মানিত, আমি তাকে ভালবাসি ও পছন্দ করি। অতএব, তুমি আমার দোয়া কবুল করো। অর্থাৎ অন্য কারো ওসীলায় দোয়া করা হলেও তার মধ্যে যে দোয়া করছে তার নিজের কিছু আমলও রয়েছে, যার ওসীলায় আল্লাহ তার দোয়া কবুল করবেন বলে আশা করা যায়। মোট কথা, যে কোনো নেককার ব্যক্তির ওসীলায় দোয়া করল সে যেন নিজের আমলের ওসীলায়-ই দোয়া করল। আর নিজের আমলের মাধ্যমে দোয়া করা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। সুতরাং এ অর্থে অন্য কারো নামে ওসীলা করাও বৈধ হবে।

যদি কেউ বলে, "হে আল্লাহ আমি তোমার নবীর ওসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি।" এই ব্যক্তির

ইচ্ছা যদি এমন হয় যে, আমি তোমার নবীর উপর ঈমান এনেছি এবং তোমার নবীকে ভালবাসী সে ওসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। এই ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন,

مَنْ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى فَهُوَ مُصِيبٌ فِي ذَلِكَ بِلَا نِزَاعٍ

।যদি কারো উদ্দেশ্য এমন হয় তবে সে ঠিকই করেছে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

দেখা যাচ্ছে সামগ্রিকভাবে তাওয়াসসুলকে অবৈধ বলার পরও ইবনে তাইমিয়া এই দৃষ্টিকোন থেকে তাওয়াস্সুলকে বৈধ বলে স্বীকার করেছেন।

সাধারন মুসলিমরা যখন কারো ওসীলায় প্রার্থনা করে তখন তারা তাকে ইলাহ্ বা রব মনে করে এমন কখনও নয়। এমনও নয় যে, তারা মনে করে অমুক ব্যক্তির ওসিলায় দোয়া করলে আল্লাহ তা কবুল করতে বাধ্য। বরং আল্লাহর নিকট তার যে সম্মান সেটার স্বীকৃতি দান করে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ করে আর এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। যেহেতু নেককার ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা-সম্মান করা ও তাদের ভালবাসা অপরাধ নয় তাই এই প্রকারের তাওয়াসসুল অবৈধ হতে পারে না।

গ) সর্বোপরি একথা স্মরণ রাখতে হবে যেম ওসীলার বিষয়টি কেবল যে ওসীলা করছে আর যাকে ওসীলা করছে উভয়ের আমলের সাথেই সম্পৃক্ত নয়। বরং যাকে ওসীলা করছে আল্লাহর নিকট তার সম্মান ও মর্যাদাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একজন নেককার ব্যক্তির সম্মানের খাতিরে যেমন তার পুত্র-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনদের দুনিয়া আখিরাতে কল্যাণ করা হয়, একইভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তার কোন প্রিয় বান্দার ওসীলায় দোয়া করে তবে তিনি উক্ত ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষার্থ সে দোয়া কবুল করতে পারেন। সুতরাং আমলের বিষয়টি ছাড়াও আল্লাহর নিকট কোনো ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদাকেও ওসীলা করা যেতে পারে।

রসুলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে তার চাচা আবু তালিব একটি কবিতাতে বলেন,

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للارامل

তার চেহারার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। তিনি ইয়াতিমের আশ্রয় স্থল এবং বিধবাদের মাথা গোজার ঠায়।

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে ইবনে উমর ﵁ বলেন,

رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মাঝে মাঝে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর চেহার দিকে দৃষ্টি দিলে আমার এই কবিতাটি মনে পড়তো।

এরপর তিনি কবিতার উক্ত অংশটি আবৃতি করেন। [সহীহ্ বুখারী]

আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতার উদ্দেশ্যে একবার উক্ত কবিতাটি আবৃতি করলে তিনি বলেন,

ذاك والله رسول الله صلى الله عليه و سلم

আল্লাহর কসম, এটা তো রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্য। [মুসনাদে আহমাদ]

ইবনে হাযার আসক্কালানী ﵀ ফাতহুল বারীতে বর্ণনা করেন, একবার একজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া চাইলে তিনি দোয়া করেন এবং সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এটা দেখে রসুলুল্লাহ্ ﷺ খুশি হয়ে বলেন,

لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه من ينشدنا قوله

যদি আবু তালিব বেঁচে থাকতো তবে আজ তার চক্ষু শীতল হতো। কে আমাকে তার রচিত কবিতাটি শোনাবে?

তখন আলী ﵁ উঠে দাড়ান এবং উপরোক্ত কবিতাটি আবৃতি করেন।

ইবনে হাযার আসক্কালানী ﵀ বলেন,

وإسناد حديث أنس وان كان فيه ضعف لكنه يصلح للمتابعة

হাদীসটির সনদে কিছু দূর্বলতা থাকলেও অন্যান্য হাদীসের সমর্থক হিসেবে উল্লেখ করা যায়। [ফাতহুল বারী]

মোট কথা রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর চেহারার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনার বিষয়টি রসুলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং তার সাহাবারা নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় মনে করেন নি। আর চেহারা বলতে আল্লাহর নিকট তার যে, সম্মান বা মর্যাদা সেটাই উদ্দেশ্য। সুতরাং কারো সম্মান বা মর্যাদাকে ওসীলা করার মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু নেই।

♦ ***হযরত উমর ﵁ এর সময় সাহাবয়ে কিরাম রসুলুল্লাহ ﷺ এর পরিবর্তে আব্বাস ﵁ এর ওসীলায় দোয়া করেছিলেন কেনো?***

যারা তাওয়াসসুলকে অবৈধ বলেন তারা একটি ঘটনার মাধ্যমে দলীল পেশ করে থাকেন।

একবার অনাবৃষ্টির সময় উমর ﵁ বললেন,

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون

হে আল্লাহ আমরা আমাদের নবী ﷺ এর মাধ্যমে আপনার নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম, আপনি আমাদের

বৃষ্টি দিতেন। আর এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি, আপনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। [সহীহ বুখারী]

তাদের কথা হলো, যদি মৃত ব্যক্তিকে ওসীলা করে দোয়া করা জায়েজ হতো তবে উমর ﵁ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম রসুলুল্লাহ ﷺ এর পরিবর্তে তার চাচা আব্বাস ﵁ কে ওসীলা করতেন না। যেহেতু অপেক্ষাকৃত উত্তম ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা যৌক্তিক হতে পারে না।

বাহ্যত দৃষ্টিতে এ দাবি যৌক্তিক মনে হলেও এর প্রকৃত ব্যাখ্যা এই যে, উমর ﵁ এখানে আব্বাস ﵁ কে ওসীলা করা বলতে তার মাধ্যমে দোয়া করা বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় তিনি দোয়া করতেন আর সকলে আমীন বলতো। তিনি এখন বিদ্যমান নেই, তাই তার স্থানে তার চাচা আব্বাস দোয়া করবে আর সকলে আমীন বলবে।

সুতরাং উমর ﵁ এর কথার উদ্দেশ্য হলো, রসুলুল্লাহ ﷺ জীবিত থাকলে তিনিই দোয়া করতেন কিন্তু তিনি বিদ্যমান না থাকাই তা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তার নিকটবর্তী ও পিতৃস্থানীয় আব্বাস ﵁ এর মাধ্যমে আমরা দোয়া করছি। হে আল্লাহ, আমাদের দোয়া কবুল করো।

এভাবে দেখলে হাদীসটির ভাবার্থের মধ্যে মৃত ব্যক্তির নামের ওসীলা করা বা না করার ব্যাপারে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। যেহেতু এখানে আলোচনা করা হচ্ছে এমন একটি বিষয়ে যা কেবল জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং হাদীসটির মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে মাধ্যম করা বা ওসীলা করা অবৈধ প্রমাণিত করার কোন যৌক্তিতা নেই।

তাছাড়া এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়। সাহাবায়ে কিরাম আব্বাস ﵁ এর মাধ্যমে ওসীলা করলেন কেন? আব্বাস ﵁ অপেক্ষা অধিক মর্যাদার সাহাবা কি বিদ্যমান ছিল না?

উম্মতের ইজমা যে, উমর ﵁, আলী ﵁ এবং প্রথমযুগের মুহাজির ও আনসাররা মর্যাদার দিক হতে আব্বাস ﵁ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তবু তাদের উপস্থিতিতে তাদের পরিবর্তে আব্বাস ﵁ কে কেন ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করা হলো?

এর উত্তর হলো যেহেতু আব্বাস ﵁ রসুলুল্লাহ ﷺ এর চাচা ছিলেন এবং তার নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তাই তাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। একারণে উমর ﵁ বলেছেন,

وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا

এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। [সহীহ্ বুখারী]

আব্বাস ﷺ নিজেই বলেছেন,

وقد توجه القوم بي إليك لمكانى من نبيك

তোমার নবীর নিকট আমার যে সম্পর্ক তারা তো সেকারণেই আমাকে মাধ্যম করে তোমার নিকট প্রার্থনা করছে .... [ফাতহুল বারী]

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্র একথা বুঝতে সক্ষম হবেন যে, এই ঘটনাতে মূলত রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে পরিত্যাগ করা হয়নি বরং পরোক্ষভাবে তাকেই ওসীলা করা হয়েছে। যেহেতু রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে সম্পর্কের কারণেই তার চাচা আব্বাস ﷺ কে ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সম্পর্কের বিষয়টি বাদ দিলে অন্য কোন দিক থেকে আব্বাস ﷺ মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। সুতরাং যারা মনে করে এখানে রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে পরিত্যাগ করে আব্বাস ﷺ কে ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তারা ভূল বুঝেছেন। আসলে এখানে রসুলুল্লাহ ﷺ কে পরিত্যাগ করা হয়নি বরং রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে সম্পর্ক রাখার উদ্দেশ্যে অন্যান্য সকল মুহাজির ও আনসার সাহাবীকে পরিত্যাগ করে আব্বাস ﷺ কে ওসীলা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সুতরাং এই ঘটনাতে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর মৃত্যুর পর তাকে ওসীলা হিসাবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়না বরং এর বিপরীতে রসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত যে কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দোয়া করার ফযিলতই প্রামনিত হয়। যেমন সহীহ্ বুখারীতে উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত আছে তিনি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কিছু চুল একটি পাত্রে সংরক্ষিত রেখেছিলেন।

وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ

মানুষের দৃষ্টি লাগলে বা অন্য কোনো সমস্য হলে তারা তার নিকট পানির পাত্র পাঠাতেন। [সহীহ্ বুখারী]

ইবনে হাযার আসক্কালানী ﷺ বলেন,

والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء بها فتحصل له بركتها

অর্থাৎ যে কেউ রোগাক্রান্ত হতো সে উম্মে সালমার নিকট একটি পানির পাত্র পাঠাতো তিনি তার মধ্যে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর চুলগুলো ধৌত করে পানির পাত্রটি ফিরিয়ে দিতেন। পরে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আরোগ্যের আশায় সেই পানি পান করতো বা সেই পানি দ্বারা গোসল করতো। ফলে সে এর বরকত লাভ করতো। (সুস্থ হয়ে যেত)। [ফাতহুল বারী]

সহীহ্ মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আসমা ﷺ একটি কাপড়ের দিকে ইশারা করে বললেন,

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا

রসুলুল্লাহ্ ﷺ এই কাপড়টি পরিধান করতেন। রোগীদের উদ্দেশ্যে আমরা এই কাপড়টি ধৌত করে (তার পানি তাকে পান করিয়ে) থাকি। এর মাধ্যমে আমরা তার আরোগ্য কামনা করি।

এই দুটি সহীহ্ হাদীসে দেখা যাচ্ছে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর মৃত্যুর পরও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট রোগ মুক্তি কামনা করা বা অন্য কোনো কল্যাণ আশা করা সম্পূর্ণ বৈধ।

এখন চিন্তার বিষয় হলো, রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নাম কি তার সাথে স্পর্কিত ও সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় হিসেবে গণ্য নয়?

যে পোশাকটি রসুলুল্লাহ ﷺ এর শরীরে কয়েকদিন স্থান পেয়েছিল সে পোষাকটির ওসীলায় যদি রোগমুক্তি কামনা করা বৈধ হয় তবে যে নাম রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর জন্মের পর হতে তার পরিচয় বহন করেছে, যে নাম ধরে আল্লাহ ﷻ তাকে ডেকেছেন, কুরআনে তা উল্লেখও করেছেন এবং সারা বিশ্ববাসীর জন্য প্রতি ওয়াক্ত সলাতের আযানে যে নাম উচ্চারণ করা আবশ্যক করেছেন সেই নামের ওসীলায় আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করা কিভাবে বিদয়াত ও শিরক হবে !! আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সুপথ প্রদর্শন করুন। আমীন।

⇒ তাবাররুক ও তাওয়াস্সুলের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও এর কুফল।

উপরে আমরা একদল লোকের কথা উল্লেখ করেছি যারা তাবাররুক ও তাওয়াস্সুলকে পুরোপুরি বিদয়াত ও শিরকী কর্মকান্ড হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। বিভিন্ন দলীল প্রমাণের আলোকে আমরা তাদের মতবাদ খন্ডায়ন করেছি। এদের বিপরীতে এমন একদল লোকও আছে যারা এ ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে থাকে। এরা সদা-সর্বদা পীর-মাশায়েখ ও ওলী-বুযর্গদের মাধ্যমে বরকত হাসিলের চেষ্টায় ব্যাস্ত থাকে। পীর-পীর করে এরা জগৎ অস্থীর করে তোলে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় পীর-বুযর্গদের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ্ ﷻ কখনও কারো কল্যাণ করেন না। ফলে সরাসরি আল্লাহর নিকট দোয়া করে লাভ নেই। আর পীর-বুযর্গদের মাধ্যমে দোয়া করা হলে তা কখনও ব্যর্থ হয় না। অতএব তাদের ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। এদের কেউ কেউ তো সরাসরি বলে বসে, পীর না ধরলে পরকালে কেউ পার হতে পারবে না। বলাবাহুল্য যে, এই ধরণের আক্বীদা-বিশ্বাস শিরকের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সাধারন মুসলিমদের ঈমানী চেতনাকে হুমকির সম্মুখীন করে। প্রকৃতপক্ষে তাবাররুক-তাওয়াসসুল তথা নবী-রাসুল বা নেককার ওলী আওলিয়াদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণ হাসিলের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করার মাধ্যমেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিরকের উদ্ভব ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত নুহ্ عليه السلام এর সম্প্রদায়ের ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

নুহ্ ﷺ যখন রসুল হিসেবে আগমন করেন তখনকার লোকেরা ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নাছর ইত্যাদির উপাসনা করত। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন,

أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ، أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ

এগুলো হলো নুহ্ ﷺ এর সম্প্রদায়ের কিছু নেককার ব্যক্তির নাম। যখন তারা মারা যায় তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায়কে উক্ত ব্যক্তিদের মূর্তি নির্মাণ করে তাদের আবাসস্থালে তা স্থাপন করতে এবং সেসব মূর্তিকে তাদের নামেই নামকরণ করতে আদেশ করে। তারা তাই করে কিন্তু তখনও সেসব মূর্তির ইবাদত করা শুরু হয়নি। পরবর্তীতে যখন ঐ যুগ শেষ হলো এবং জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটলো তখন পরের প্রজন্ম তাদের ইবাদত করা শুরু করলো। [সহীহ্ বুখারী]

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, একটি প্রজন্ম কেবলমাত্র কিছু নেককার লোকের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনার্থে তাদের মূর্তি নির্মাণ করে, যাতে সেটা দেখে তাদের আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। কিন্তু এই কারণে পরবর্তী প্রজন্ম শিরকে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়। আর এসবই ছিল শয়তানের কলা-কৌশল। একদল জ্ঞানী লোক যেহেতু সরাসরি শিরকে লিপ্ত হবে না তাই তাদের মাধ্যমে সে এমন কিছু করিয়ে নিয়েছে যার কারণে অজ্ঞ লোকেরা ফিতনায় পড়ে যায়। সন্দেহ নেই যে, এ অপরাধের কিছু দায়ভার প্রথম প্রজন্মের উপর বর্তাবে। যেহেতু তাদের উচিৎ ছিল সর্তকতা অবলম্বন করা এবং পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ না করা।

স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ ﷺ তার উম্মতকে এ ধরণের অতিরঞ্জন করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله

তোমরা আমার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করো না যেভাবে খৃষ্টানরা ইসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করেছে। আমি তো আল্লাহর বান্দা মাত্র অতএব তোমরা বলো আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। [সহীহ বুখারী]

ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে অতিরঞ্জনের কারণে খৃষ্টানরা শেষ পর্যন্ত তাকে আল্লাহর পুত্র মনে করে শিরকে লিপ্ত হয়েছে। এ রাস্তা বন্ধ করার জন্য রসুলুল্লাহ ﷺ তার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

আলী ﷺ কে রসুলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। তাকে বলেন,

أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

তোমার সামনে যে ছবিই পড়বে তুমি তা মুছে ফেলবে এবং যে কবরই তুমি দেখবে সেটা মাটি সমান করে দেবে। [সহীহ্ মুসলিম]

এখানে দেখা যাচ্ছে কেউ কবর পূজা শুরু করতে পারে এ আশঙ্কায় কবরকে মাটি সমান করে দেওয়া হচ্ছে।

এই হচ্ছে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কর্মপন্থা যার উপর সাহাবায়ে কিরাম প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব, প্রতিটি মুসলিমের উচিৎ তাবাররুক-তাওয়াস্‌সুলের ব্যাপারে এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করা যাতে তাবাররুকের নামে ব্যক্তিপূজা শুরু না হয়ে যায়। এ লক্ষ্যে ত্রিমুখী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১. যিনি অন্যের মাধ্যমে বরকত হাসিলের চেষ্টা করছেন বা অন্য কারো ওসীলায় দোয়া করছেন তার আক্বীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ হতে হবে। নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতে হবে যে, কল্যাণ তো আল্লাহর নিকটই কামনা করা হচ্ছে আর প্রার্থনাও করা হচ্ছে তারই সমীপে এবং এটিই মূল বিষয়। এখানে কাউকে মাধ্যম করা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে কিন্তু তা চুড়ান্ত বা নিশ্চিত নয় এবং সেটাই মূল উদ্দেশ্য নয়। কোন নেককার ব্যক্তি বা ওলী-বুযুর্গের ওসীলায় দোয়া করলেই যে তা নিশ্চিত কবুল হবে এমন নয় আবার তাকে মাধ্যম না করলে যে দোয়া কবুল হবে না তাও নয়। অমুক ব্যক্তির ওসীলায় দোয়া করা হলে আল্লাহ তা ফিরিয়ে দিতে পারবেন না এমন শিরকী আক্বীদা-বিশ্বাস যেন কোন ক্রমেই তার অন্তরে স্থান না পায়। কেননা এটা মুশকিরা তাদের উপাস্যসমূহরে ব্যাপারে যে ধরনের শাফায়াত আশা করতো তার সাথে হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ। আমরা এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করেছি এবং শাফায়াত সম্পর্কে ইসলামের সঠিক আক্বীদা বর্ণনা করেছি।

২. যাকে ওসীলা করা হচ্ছে বা যার মাধ্যমে বরকত হাসিলের চেষ্টা করা হচ্ছে তার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা যাতে তার অন্তরে অহংকার সৃষ্টি না হয়। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে একজন ব্যক্তি আরেকজনের মুখের সামনে প্রসংশা করলে রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ

সর্বনাশ! তুমি তো তার মাথা কেটে ফেললে, তুমি তো তার মাথা কেটে ফেললে।

চিন্তা করার বিষয় হলো, সামান্য প্রসংশার কারণে যদি কারো অবস্থা এমন হয় তবে কারো সামনে তার মাধ্যমে বরকত হাসিল করা বা তাকে ওসীলা করে আল্লাহর নিকট দোয়া করা হলে তার অবস্থা কিরুপ হতে পারে! তাই সর্বোত্তম পন্থা হলো, যাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে তার নিকট বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করা। কারো মাধ্যমে বরকত হাসিল করার জন্য বিষয়টি তাকে জানানো শর্ত নয়। যেহেতু কল্যাণ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসবে অতএব তিনি জানলেই যথেষ্ট। হয়তো একজন বিশুদ্ধ চিত্ত আমলদার ব্যক্তি বা প্রশিদ্ধ আলেমে দ্বীন অথবা যুদ্ধ বিজয়ী মুজাহিদের হাত স্পর্শ করে আপনি আল্লাহর নিকট

কল্যাণ আশা করেন। আপনি তার নিকট গমণ করে হাতে হাত মেলান আর অন্তরে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন যেনো তিনি এই হাতের বরকতে আপনার কল্যাণ করেন। এমন বলার প্রয়োজন নেই যে, হে অমুক আপনার হাতখানা দিন আমি সেটার মাধ্যমে বরকত হাসিল করবো। কেননা হতে পারে আপনার এ কথার কারণে তার অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হবে ফলে সেও ক্ষতিগ্রস্থ হবে আপনিও ক্ষতিগ্রস্থ হবেন।

৩. যিনি কারো মাধ্যমে তাবাররুক হাসীল করছেন তার উচিৎ সাধারন লোকদের আক্বীদা-বিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখা। নুহ্ ﷷ এর ঘটনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি একদল লোক মূর্তি নির্মাণ করল কিন্তু তারা তার পূজা করেনি কিন্তু পরবর্তীতে অজ্ঞ লোকেরা সেগুলোর পূজা শুরু করে। এমনও হতে পারে যে সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসের একজন ব্যক্তি কাউকে ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করল এবং তার বরকতে আল্লাহর নিকট কল্যাণ আশা করল। সে শিরক বা বিদয়াত কিছুই করেনি। কিন্তু সাধারন মানুষ তাকে এটা করতে দেখে তাতে বল্গাহীনভাবে লিপ্ত হলো এবং এক পর্যায়ে তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস পরিবর্তীত হয়ে শিরক-কুফরের উদ্ভব হলো। তাই বিশেষ করে অনুসরণীয় আলেম ওলামাদের উচিৎ যেখানে সেখানে এবং যার তার সামনে তাবাররুক-তাওয়াস্সুল গ্রহণ না করা। সাধারন মানুষকে ব্যাপকভাবে এতে লিপ্ত হতে দেওয়াও সমিচীন নয়। কেননা তাবাররুক-তাওয়াস্সুলের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে শিরক-কুফরে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে এটা সম্পূর্ণরুপে পরিত্যাগ করাও অনেকাংশে কল্যাণকর।

উপরোক্ত আলোচনা স্বাপেক্ষে আমরা বলতে পারি তাবাররুক-তাওয়াস্সুলের সাথে কিছু উপকারী ও কল্যাণময় বিষয় জড়িত আছে। আবার এর কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। এখানে বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থা হলো এ বিষয়ে এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যার মাধ্যমে একই সাথে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ হাসিল করা সম্ভব হয় এবং এর ক্ষতিকর দিক হতে রক্ষা পাওয়া যায়। উপরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা সে ধরণের একটি পদ্ধতিই চিত্রিত করতে চেয়েছি আর আল্লাহই তাওফীকদাতা।

♦ ***কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা।***

এই বিষয়টিও তাবাররুক ও তাওয়াস্সুলের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি মাসয়ালা যে বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। আল্লাহর নিকট কল্যাণ পাওয়ার আশায় নবী-রাসুল বা নেককার লোকদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর দেশে সফর করা যাবে কিনা সে বিষয়ে তারা মতপার্থক্য করেছেন।

এ বিষয়ে রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন,

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতাম এখন তোমরা তা করতে পারো। [সহীহ

মুসলিম]

অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে,

نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِى زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً

আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতাম এখন তোমরা তা করতে পারো। কারন তা যিয়ারত করার মধ্যে উপদেশ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। [আবু দাউদ, তিরমিযী ইত্যাদি]

এই হাদীসে সাধারনভাবে কবর যিয়ারত করতে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যেহেতু তাতে উপকার রয়েছে। এখানে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কোন সীমা বেধে দেওয়া হয়নি। তবে অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে,

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه و سلم ومسجد الأقصى

তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে ভ্রমন করা যাবে না। তা হলো, মসজিদে হারাম মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা। [বুখারী ও মুসলিম]

যারা কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা অবৈধ বলেছেন তারা এই হাদীসটিকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করেছেন। তারা এই হাদীসটিকে অবলম্বন করে এমনটি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবর জিয়ারতকেও নিষিদ্ধ ও বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। এদের মধ্যে অধিক নির্বোধ লোকেরা পূর্ববর্তী যে সকল ওলামায়ে দ্বীন কবর জিয়ারতের জন্য সফর করা বৈধ বলেছেন তাদের তিরষ্কার করে থাকে। তারা এই হাদীসটিকে নিজেদের স্বপক্ষে অকাট্য দলীল হিসেবে দাবী করে। অথচ হাদীসটি কবর জিয়রতের বিষয়ে আলোচনা করছেনা। আকারে ইঙ্গিতেও এখানে কবর জিয়ারত সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এখানে যা বলা হয়েছে তা হলো তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে ভ্রমণ করা যাবে না। যদি হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা হয় তবে উক্ত তিনটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমণ করা যাবে না এমন প্রমাণিত হয় তা কবর জিয়ারত, ব্যাবসা-বানিজ্য, বনভোজন ইত্যাদি যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন। এখন প্রশ্ন হলো, যারা এই হাদীসটিকে কবর জিয়ারত নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল মনে করেন তারা অন্যান্য ভ্রমনকেও নিষিদ্ধ বলেন না কেন? এতোসব ভ্রমণ বাদ দিয়ে কেবল কবরের কথা তাদের মনে কেন ভেসে উঠলো?

মোটকথা হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে সকল প্রকারের সফরই নিষিদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু জানা কথা যে এমনটি হতে পারে না। একারণে ওলামায়ে কিরাম হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেননি বরং ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন।

ইবনে হাযার আসক্কালানী ﷺ এ বিষয়ে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো, "তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমন করা যাবে না" এ কথাটি যদি সকল স্থানের উপর প্রয়োগ করা হয় তবে সকল প্রকারের ভ্রমণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন ব্যাবসা, আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাত, ইলম অর্জন জিহাদ করা ইত্যাদ উদ্দেশ্যেও কোথাও ভ্রমণ করা যাবে না এমন প্রমাণিত হয়। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে এমন উদ্দেশ্যে নয়। এ হাদীসে এসব বিষয়ের উল্লেখ নেই এগুলো এখানে উদ্দেশ্যও নয় বরং এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মসজিদের কথা। অতএব, হাদীসটির উদ্দেশ্য হলো, তিনটি মসজিদ পৃথিবীর সকল মসজিদ অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সেখানে সলাত আদায় করাও অন্যান্য মসজিদে সলাত আদায় অপেক্ষা অধিক ফযিলতপূর্ণ (বিভিন্ন হাদীসে এ ফযিলতের কথা বর্ণিত আছে)। সুতরাং অধিক পুরস্কার পাওয়ার আশায় এই তিনটি মসজিদে সলাত আদায়ের নিয়তে সফর করা যায় কিন্তু পৃথিবীর অন্য সকল মসজিদে সলাত আদায়ের পুরস্কার সমান। সেগুলোর একটির তুলনায় অন্যটির বেশি মর্যাদা নেই। তাই সলাত আদায়ের নিয়তে অন্য কোথাও সফর করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অন্য যে কোনো বৈধ উদ্দেশ্যে কোথাও ভ্রমন করতে বাধা নেই। এর স্বপক্ষে আরো একটি বর্ণনা উল্লেখ করা যায়।

বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত আছে, আবু হুরাইরা ﵁ তুর পাহাড়ে গমণ করে সেখানে সলাত আদায় করেন। পথে আাবু বছরা আল-গিফারী ﵁ এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি বলেন, (من أين أقبلت) তুমি কোথা থেকে আসছো? তিনি বলেন, (من الطور صليت فيه) "আমি তুর পাহাড় থেকে আসছি। আামি সেখানে সলাত আদায় করেছি।" এটা শুনে তিনি বলেন, যদি আমি পূর্বে জানতে পারতাম তবে তোমাকে নিষেধ করতাম। কেননা রসুলুল্লাহ ﷺ তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন। [৪৩]

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো তুর পাহাড় বা অন্যান্য নিদর্শনাবলী পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা অবৈধ বিবেচিত হতে পারে না।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ}

❮ আপনি বলুন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেছেন এরপর পুনরায় তিনি সৃষ্টি করবেন। ❯ [আনকাবুত/২০]

সুতরাং আবু হুরাইরা কেবলমাত্র তুর পাহাড় পরিদর্শনের জন্য ভ্রমণ করলে আবু বাছরা তাকে নিষেধ

---

[৪৩] মুসনাদে আহমাদ। আলহাইছামী বলেন, (رجال أحمد ثقات أثبات) "মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত রেওয়ায়েতটির রাবীরা বিশ্বস্ত"।

করতেন না। কিন্তু যেহেতু আবু হুরাইরা ﵁ সেখানে সলাত আদায়ের জন্য ভ্রমণ করেছিলেন তাই আবু বছরা ﵁ তাকে নিষেধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।

ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ উল্লেখ করেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী ﵁ কে তুর পাহাড়ে সলাত আদায় করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে সলাত আদায় করতে চাই তার জন্য মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং আমার এই মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হওয়া উচিৎ নয়।

এই হাদীসের রাবী শাহর (شہر) এর মধ্যে কিছু দূর্বলতা রয়েছে। কিন্তু ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ বলেছেন, তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের মূল ভাবধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

মোট কথা, এখানে সলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমণ করার ব্যাপারে অনুৎসাহিত করা হচ্ছে কিন্তু অন্য কোনো বৈধ উদ্দেশ্যে যে কোন স্থানে ভ্রমণ করার ব্যাপারে এখানে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। যেমন: ব্যাবসা-বানিজ্য, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাত, আত্মীয়-স্বজন বা নেককার লোকদের কবর জিয়ারত করা ইত্যাদি।

কেউ কেউ হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো, ভ্রমন করলে এই তিনটি মসজিদেই করা উচিৎ। যেহেতু এতে পরিপূর্ণ পুরষ্কার পাওয়া যাবে। সুতরাং এখানে অন্য কোথাও ভ্রমণ করতে নিষেধ করা হচ্ছে না বরং এই তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইমাম নাব্বী ﵀ এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করেছেন।

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে স্পষ্ট বলা যায় "তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ভ্রমন করা যাবে না" এই হাদীসটি বিশেষভাবে কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার বিপক্ষে ব্যবহার করাটা নিরোপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক নয়। যদি নিষেধ করতেই হয় তবে ব্যাবসা-বানিজ্য, দেখা-সাক্ষাত ইত্যাদি যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন স্থানে ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। আর যদি সেটা সম্ভব নাই হয় তবে স্বতন্ত্রভাবে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষিদ্ধ করা হবে কেন? এখানে কি কবর জিয়ারতের ব্যাপারে আকারে-ইঙ্গিতেও কিছু বলা হয়েছে?

যদি কেউ বলে "ব্যাবসা-বানিজ্য, ইলম অর্জন, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-স্বাক্ষাত, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্ ইত্যাদি বিষয়ে ভিন্ন দলীল রয়েছে তাই সেগুলো নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন নয়। আমরা বলব,

কবর যিয়াতের ব্যাপারেও রসুলুল্লাহ ﷺ এর স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেন,

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত করো।

[সহীহ্ মুসলিম]

দেখা যাচ্ছে, কবর যিয়ারতে বৈধতা ও ফযিলতের বিষয়টিও ভিন্ন দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত। অতএব, এ বিষয়টিও নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন নয়।

এসকল বিষয় বিবেচনা করেই বেশিরভাগ ওলামায়ে দ্বীন নেককার ব্যক্তির কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ বলেছেন। বিশেষ করে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবর জিয়ারতের বিষয়টিকে তারা সর্বোত্তম নেক আমল সমূহের মধ্যে অন্যতম হিসেবে গণ্য করেছেন।

বদরুদ্দীন আল আইনী رحمه الله বলেন,

وليس في هذه الرواية منع شد الرحل لغيرها

এই হাদীসে উক্ত তিনটি স্থান ছাড়া অন্য কোনো স্থানের দিকে ভ্রমন করা হতে নিষেধ করা হয়েছে এমন নয়। [উমদাতুল কারী]

ইমাম আন নাব্বী رحمه الله বলেন,

أبو محمد الجويني من أصحابنا يحرم شد الرحال إلى غيرها وهو غلط

আমাদের মাযহাবের আলেম আবু মুহাম্মাদ আল জুওয়াইনী বলেছেন, এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো দিকে ভ্রমন করা হারাম। তার এই মত ভ্রান্ত। [শারহে মুসলিম]

অন্য এক স্থানে তিনি বলেন,

واختلف العلماء في شد الرحال وأعمال المطى إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو حرام وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره امام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره قالوا والمراد أن الفضيلة التامة انما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة والله أعلم

এই তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে ভ্রমন করা, যেমন: নেককার ব্যক্তিদের কবরে গমণ করা বা অন্য কোনো ফজিলতপূর্ণ স্থানে যাওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে আলেমগণ ইখতিলাফ করেছেন। আমাদের মাযহাবের আবু মুহাম্মাদ আল জুওয়াইনী বলেছেন, এটা হারাম, কাজি ইয়াদ এই মতের দিকেই ঝুকেছেন কিন্তু আমাদের মাযহাবের আলেমদের নিকট সেই মতই সঠিক যা বলেছেন ইমামুল হারামাইন

এবং অন্যান্য গ্রহণযোগ্য আলেমরা যে, এধরনের ভ্রমণ হারামও নয় মাকরুহও নয়। তারা বলেছেন, হাদীসটির উদ্দেশ্য হলো উক্ত তিনটি মসজিদের পরিপূর্ণ শ্রেষ্টত্ব রয়েছে (অর্থাৎ উক্ত তিনটি স্থানে ভ্রমণের সওয়াব বেশি) আর আল্লাহই ভাল জানেন। [শারহে মুসলিম]

ইবনে হাযার ﵀ এ বিষয়ে ইমাম নব্বীর কথার কাছাকাছি কথা বলেছেন এবং বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম এই যে, যারা এই তিনটি স্থান ছাড়া অন্য সকল স্থানের দিকে ভ্রমণ করা হারাম বলেন তাদের মতে এটাই দাড়াই যে, রসুলুল্লাহ ﷺ এর কবর জিয়ারত করতে ভ্রমণ করাও হারাম। অথচ ইজমা সম্পাদিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ ﷺ এর কবর জিয়ারত করতে ভ্রমণ করা সর্বোত্তম নেক আমল সমূহের একটি। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ অবশ্য এক্ষেত্রে ভিন্ন মত গ্রহন করেছেন এবং ইমাম মালিকের একটি কথা নিজের পক্ষে ব্যবহার করেছেন। যেখানে ইমাম মালিক (زرت قبر النبي) "আমি নবীর কবর যিয়ারত করেছি" একথা বলা অপছন্দ করেছেন, ইবনে হাযার ﵀ এর উত্তরে বলেন,

وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ ادبا لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال واجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع والله الهادي إلى الصواب

এর জবাবে মালেকী মাযহবের গ্রহণযোগ্য আলেমরা বলেছেন, তিনি এই শব্দটিকে অপছন্দ করেছেন মাত্র মূল কবর জিয়ারতকে নয়। কেননা তা আল্লাহ ﷻ এর নিকটবর্তী হওয়ার সর্বত্তম মাধ্যম সমূহের একটি এবং তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। আর আল্লাহই সঠিক পথের দিশা দিতে পারেন। [ফাতহুল বারী]

মোটকথা জমহুর আলেমের মতে দূরে বা কাছে অবস্থিত কোনো নেককার ব্যক্তির কবর জিয়ারত করতে দোষ নেই। তবে আল জুওয়াইনী, কাজি ইয়াদ, ইমাম ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ ওলামায়ে কিরামের মতে তা হারাম।

পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, এখানে জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতই সঠিক যারা কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ বলেছেন। যেহেতু রসুলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে কোনোরুপ দূরত্বের পার্থ্যক্য ছাড়াই সাধারনভাবে কবর জিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং তার বিপক্ষে ভিন্ন কোন দলীল পাওয়া যায় নি। যে হাদীসটিকে এর বিপরীতে উপস্থাপণ করা হয়েছে সেখানে এ বিষয়ে কোন দলীল নেই। অতএব, কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষিদ্ধ বলার কোন গ্রহণযোগ্য কারণ নেই।

◆ ***কবর জিয়ারতে নিষিদ্ধ কর্মসমূহ***

উপরে আমরা দেখেছি, তাবাররুক ও তাওয়াস্‌সুলের ব্যাপারে অতিরঞ্জনের কারণে ক্ষেত্র বিশেষে শিরকের উদ্ভব ঘটতে পারে। তাই সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। মৃত ব্যক্তি এবং তার কবরের ব্যাপারে এ ধরণের সতর্কতা অবলম্বন আরো বেশি জরুরী। যেহেতু জীবিত ব্যক্তির তুলনায় মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে অতিরঞ্জনে শিরকের আশঙ্কা বহুগুণে বেশি। একারণে রসুলুল্লাহ্ ﷺ তার মৃত্যুশয্যায় বারবার সতর্ক করে বলেন,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর অভিসাপ। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সাজদার স্থানে পরিনত করেছিল। [সহীহ্ মুসলিম]

নবী ও ওলী-আওলিয়াদের কবর সম্পর্কে এ ধরনের সতর্কীকরণের কারণ হলো এ ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিরকের উৎপত্তি ঘটেছে। একারণে রসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে সাধারনভাবে কবর জিয়ারতকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন মুসলিমদের ঈমানী চিন্তা-চেতনা পরিপক্ক হলো তিনি তাদের এ বিষয়ে অনুমতি দিয়ে বলেন,

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতাম এখন তোমরা তা করতে পারো। [সহীহ মুসলিম]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর এই সতর্কীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে উম্মতের উলামায়ে কিরাম মৃত ব্যক্তি ও তার কবর সম্পর্কে সবার্ধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। রসুলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট অনুমতি বিদ্যমান থাকার কারণে তারা কবর জিয়ারত করা বৈধ বলেছেন। কিন্তু সাধারন মানুষের ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষনের তাগিদে তারা মৃত ব্যক্তি ও তার কবর সংক্রান্ত বেশ কিছু কর্মকান্ড থেকে সাধারন মমানুষকে সতর্ক করেছেন। নিচে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হলো।

♦ ***কবরকে কেন্দ্র করে বাৎসরিক 'ওরস' বা উৎসব করা নিষিদ্ধ।***

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (ولا تجعلوا قبري عيدا) "তোমরা আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিনত করো না" [আবু দাউদ] [88]

---

[88] হাদীসটি ইমাম নাব্বী রিয়াদুস্ সালেহীনে উল্লেখ করেছেন এবং সহীহ্ বলেছেন। শায়েখ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন [সহীহু আবি দাউদ/১৭৯৬]।

বছরের একটি বিশেষ দিনে কোনো কবরকে ঘিরে উৎসব করাকে বর্তমানে **'ওরস'** বলা হয়ে থাকে। উপরোক্ত হাদীসের আলোকে এটা স্পষ্ট নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। তাই মুসলমানদের এ থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

ইমাম মানাবি ﵀ বলেন,

يؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة ويقولون هذا يوم مولد الشيخ ويأكلون ويشربون وربما يرقصون منهي عنه شرعا وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, যারা ওলী-বুযর্গদের কবরে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হয় আর বলে, এটা শায়েখের জন্মদিন এবং খায় ও পান করে, হয়তো একটু নাচা-নাচিও করে। এসবই শরীয়তে নিষিদ্ধ কর্ম। ন্যায় পরায়ন বাদশার উচিৎ এসব লোকদের হুমকি-ধামকি দিয়ে এ কাছ থেকে বিরত রাখা।

[ফাতহুল ক্বদীর]

♦ ***কবরে চুম্বন করা বা বরকতের উদ্দেশ্যে হাত দ্বারা স্পর্শ করা মাকরুহ্।***

রসুলুল্লাহ ﷺ এর কবর জিয়ারতের সময় করণীয় ও বর্জনীয় প্রসঙ্গে ইমাম নাব্বী ﵀ লেন,

لاَ يَجُوزُ أَنْ يُطَافَ بِقَبْرِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَيُكْرَهُ إِلْصَاقُ الْبَطْنِ وَالظهْرِ بِجِدَارِ الْقَبْرِ قَالَهُ الْحَلِيميُّ وَغَيْرُهُ، وَيُكْرَهُ مَسحهُ بِالْيَدِ وَتَقْبِيلُهُ بَلْ الأَدَبُ أَنْ يَبْعُدَ مِنْهُ كَمَا يَبْعُدُ مِنْهُ لَوْ حَضَرَ في حَيَاتِهِ - صلى الله عليه وسلم - هذَا هُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ الّذِي قَالَهُ الْعُلَمَاءُ وَأَطْبقُوا عَلَيْهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَغْتَرَّ بِكَثِيرِ مِنَ الْعَوَامّ في مُخَالَفَتِهِمْ ذلِكَ فَإِنْ الاقْتِدَاءَ وَالْعَمَلَ إِنَّمَا يَكُونُ بِأَقْوَالِ الْعُلَماءِ وَلاَ يلتفتُ إلى مُحْدَثَاتِ العَوَامِ وجهالاتهم

রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবরকে ঘিরে তওয়াফ করা বৈধ নয়। নিজের পিঠ বা পেট কবরের প্রাচীরে স্পর্শ করানোও বৈধ নয়। হালীমী এটা বলেছেন। (কবরের প্রাচীরকে) হাত দিয়ে স্পর্শ করা বা চুমু দেওয়া মাকরুহ্। বরং এক্ষেত্রে ভদ্রতা হলো কিছুটা দুরুত্ব বজায় রেখে দাড়ানো। রসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দাশায় যেভাবে তার সম্মানে কিছুটা দুরুত্ব বজায় রাখতে হতো (তার শরীরে শরীর স্পর্শ করে নয়)। এটিই সঠিক মত যা ওলামায়ে কিরাম বলেছেন এবং এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। বেশিরভাগ মূর্খ লোকেরা এর বিপরীতে যা কিছু করে তুমি তাতে প্রতারিত হয়ো না। কেননা অনুসরণ করতে হবে কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিদের আর অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা যা কিছু বিদয়াত আবিষ্কার করে তা হতে দূরে থাকতে হবে।

এরপর তিনি বলেন,

وَمَنْ خَطَرَ بِبَالِهِ أَنَّ الْمَسْحَ بِالْيَدِ وَنَحْوِهِ أَبْلَغُ في الْبَرَكَةِ فَهُوَ مِنْ جَهَالَتِهِ وَغَفْلَتِهِ لأَن الْبَرَكَةَ إِنَّمَا هِيَ فِيمَا وَافَقَ

الشَّرْعَ وَأَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ، وَكَيْفَ يَبْتَغِي الفضلَ في مُخَالَفَةِ الصَّوابِ

যার অন্তরে এমন ধারনা সৃষ্টি হয় যে, রসুলুল্লাহ ﷺ এর কবরে হাত দ্বারা স্পর্শ করলে বা এই ধরনের কিছু করলে বেশি বরকত (কল্যাণ) হবে এটা তার অজ্ঞতা ও মূর্খতা বলে গণ্য। বরং বরকত তো তার মধ্যে যা শরীয়ত সম্মত ও ওলামায়ে দ্বীনের মতামতের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। [আল-ইদাহ্]

ইবনে হাযার আল-হাইতামী رحمه الله বলেন,

ইমাম নাব্বীর কথা "এর উপর (কবরে হাত বা অন্য কিছু স্পর্শ করা, চুমু দেওয়া ইত্যাদি কর্মকান্ড অপছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে) সকল ওলাময়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ইবনে জামায়া এবং অন্যান্যরা এ কথার উপর আপত্তি উত্থাপণ করেছেন। যেহেতু ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল رحمه الله এ সম্পর্কে বলেছেন "এতে কোন সমস্যা নেই।" [৪৫] আর আত-তাবারী رحمه الله ও আবিস্ সাইফ رحمه الله বলেছেন, "রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবরে চুম্বন করা এবং তা স্পর্শ করা বৈধ। আলেম-ওলামা ও নেককার ব্যক্তিরা এর উপরই আমল করেছেন।" [৪৬] সুবাকী বলেছেন, "কবরে চুম্বন না করা এবং কবরকে স্পর্শ না করার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় নি।" এরপর তিনি আবু মারওয়ানের হাদীসটি উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে, মারওয়ান একদিন দেখলেন একজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবরে মুখ লাগিয়ে আছে। তিনি তার কাঁধ ধরে বললেন, "তুমি কি জানো তুমি কি ভয়ানক কাজ করছো?" উক্ত ব্যক্তি বলল, হ্যা আমি জানি? বলে ঘুরে দাড়ালো। তখন দেখা গোলো তিনি আবু আয়্যুব আল-আনসারী رضي الله عنه।

এর পর তিনি বললেন,

جئت رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم آت الحجر

আমি তো পাথরের নিকট আসি নি আমি এসেছি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট।

[মুস্তাদরাকে হাকিম]

এসব আপত্তি অভিযোগ উল্লেখ করার পর ইবনে হাযার হাইতামী رحمه الله ইমাম নাব্বী رحمه الله এর পক্ষ হতে সেগুলোর জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

কবরে চুম্বন করা ও স্পর্শ করা সম্পর্কে আহমাদ ইবনে হাম্বাল যে বলেছেন "এতে কোন সমস্যা নেই" এখানে সমস্যা নেই বলতে উদ্দেশ্য হলো এটা হারাম নয়। এখানে এটা উদ্দেশ্য নয় যে এটা মাকরুহ্ বা

---

[৪৫] আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিযাল।

[৪৬] বদরুদ্দীন আইনী উমদাতুল ক্বারীতে এ মত বর্ণনা করেছেন।

অপছন্দনীয় নয়। যেহেতু যেটা হারাম নয় সে ক্ষেত্রেও "সমস্যা নেই" কথাটি প্রয়োগ করা যায়। [৪৭]

ইবনে জারীর তাবারী যে, বলেছেন, "রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবরে চুম্বন করা এবং তা স্পর্শ করা বৈধ। আলেম-ওলামা ও নেককার ব্যক্তিরা এর উপরই আমল করেছেন।" এখানে **"এর উপর আমল করেছেন"** বলতে তারা সকলে কবরে চুম্বন করা বা স্পর্শ করার উপর আমল করেছেন এমন নয় বরং কবরে চুম্বন করা বৈধ তারা এর উপর মত দিয়েছেন।" আর বৈধ বলতে এখানে নিষিদ্ধ বা হারাম নয় এটা বোঝানো হয়েছে। এটা যে মাকরুহ্ (অপছন্দনীয়) নয় এমন বোঝানো হয় নি।

এরপর তিনি বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মাধ্যমে প্রমান করেছেন, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মধ্যে কবর স্পর্শ করা বা চুম্বন করার আমল প্রচলিত ছিল না।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন (ما أعرف هذا) এটা আমার নিকট পরিচিত নয়। আছরাম বলেন,

رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه و سلم يقومون من ناحية فيسلمون

আমি দেখেছি, মদীনার আলেমরা রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবর স্পর্শ করতেন না বরং একটু দূরে দাড়িয়ে সালাম দিতেন। [৪৮]

এসব বর্ণনা করার পর ইবনে হাযার হাইতামী ﵀ বলেন,

إذ كيف يليق بالعلماء والصلحاء أن يبتدعوا مثل ذالك المؤدي الي مفاسد؟

ওলামায়ে কিরাম ও নেককার ব্যক্তিদের ব্যাপারে কিভাবে এটা যৌক্তিক হতে পারে যে তারা এ ধরণের ধ্বংসাত্মক বিদয়াত সৃষ্টি করবেন। [আল-জাওহার আল-মুনাজ্জাম]

এরপর আবু আয়্যুব ﷛ এর হাদীসটি সম্পর্কে বলেন,

والحديث المذكور ضغيف، وبتسليم صحته فيجوز أن يكون السلف أجمعوا علي ذالك بعد انقراض الصحابة رضي الله عنهم، أي لمصلحة فطم الناس عن ذالك المؤدي التمكين منه الي علي مفاسد من العوام لا تنحصر كما هو

---

[৪৭] এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, আহমাদ ইবনে হাম্বালের এই কথাটি হাদীস শাস্ত্রের রাবীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। তাকে বাহ্যত বোঝা যায় আহমাদ ইবনে হাম্বাল ﵀ এর উদ্দেশ্য হলো, এমন কাজ যে করে তার হাদীস গ্রহণ করা যায়। সুতরাং এ কথার মাধ্যমে এমন প্রমাণ করা যায় না যে, তিনি এ ধরণের কাজে লিপ্ত হওয়া মাকরুহ মনে করেন নি। যেহেতু মাকরুহ কাজে লিপ্ত ব্যক্তির হাদীসও গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া পরবর্তীতে আহমাদ ইবনে হাম্বাল ﵀ থেকে এ বিষয়টি অপছন্দ করার বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে তিনি কবর স্পর্শ ও চুম্বন করাকে অপছন্দই করেছেন তবে এটা যেহেতু হারাম বা কবীরা গোনাহ্ নয় তাই যে এমনটি করে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে বলে মত দিয়েছেন।

[৪৮] ইবনে কুদামাও এটা আল-মুগনীতে বর্ণনা করেছেন।

ظاهر

হাদীসটি দূর্বল। [৪৯] যদি সেটাকে সহীহ্ ধরেও নিই তবু এমন বলা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামের যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তারা মানুষকে এমন সব কাজ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন যাতে লিপ্ত হলে সাধারণ মানুষের আক্বীদা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে যেমনটি স্পষ্ট বোঝা যায়। .... আর সুবাকী যে বলেছেন বিষয়টির উপর ইজমা সম্পাদিত হয়নি এর অর্থ হলো প্রথম যুগে ইজমা সম্পাদিত হয়নি (কিন্তু পরবর্তীতে আলেমরা একমত হয়েছেন)।

এসব কিছু বর্ণনা করার পর ইবনে হাযার হাইতামী ﵀ ইমাম নব্বীর কথাকে সত্যায়ন করে বলেন,

فما قاله المصنف أي النووي صحيح لا مطعن فيه

অতএব ইমাম নব্বী ﵀ যা বলেছেন (কবর স্পর্শ করা ও চুম্বন করা অপছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম একমত) এটা পুরোপুরি সত্য কথা। যার উপর কোনো আপত্তি উথাপন করা যায় না।

[আল-জাওহার আল-মুনাজ্জাম]

ইবনে কুদামা ﵀ বলেন,

ولا يستحب التسمح بحائط قبر النبي صلى الله عليه و سلم ولا تقبيله

রসুলুল্লাহ ﷺ এর কবরের প্রাচীর স্পর্শ করা বা তাতে চুম্বন করা উত্তম কাজ নয়। [মুগনী]

ইমাম গাজ্জালী ﵀ বলেন,

فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود

কবর স্পর্শ করা ও তাতে চুম্বন করা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের অভ্যাস। [এহ্ইয়া উলুমিদ্দিন]

ক্বাদী ইয়াদ ﵀ বলেন, (ولا يمس القبر بيده) “হাত দ্বারা রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবরকে স্পর্শ করবে না।”

[আশ-শিফা]

মোল্লাহ্ আলী ক্বারী ﵀ বলেন,

ولا يمسحه ولا يقبله فإن ذلك من عادة النصارى

---

[৪৯] ইমাম আজ-জাহাবী তালখীসে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন। তবে এই হাদীসের রাবী কাছীর ইবনে যায়েদ (كثير ابن زيد) সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরামের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। আল-হাইছামী বলেন, (وثقه أحمد وغيره وضعفه النسائي وغيره) “ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যরা তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন এবং নাসাঈ ও অন্যান্যরা তাকে দূর্বল বলেছেন। একারণে ইবনে হাযার হাইতামী ﵀ হাদীসটি দূর্বল হওয়ার মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

কবর স্পর্শ করবে না এবং তাতে চুম্বন করবে না কেননা এটা খৃষ্টানদের অভ্যাস।

[মিরকাতুল মাফাতিহ্]

♦ ***কবরকে ঘিরে তাওয়াফ করা বৈধ নয়।***

পূর্বে ইমাম আন-নাব্বী ﷺ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন,

لاَ يَجُوزُ أَنْ يُطَافَ بِقَبْرِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم

রসুলুল্লাহ ﷺ এর কবরকে ঘিরে তওয়াফ করা বৈধ নয়।

[আল-ইদাহ এবং আল-মাজমু শারহুল মুহায্যাব্]

ইমাম সুয়ূতী ﷺ কবরের নিকট কৃত বিদয়াত কাজসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

وطوافهم بالقبر الشريف، ولا يحل ذلك. وكذلك إلصاقهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر، وتقبيلهم إياه بالصندوق الذي عند رأس النبي ومسحه باليد. وكل ذلك منهي عنه

এবং রসুলুল্লাহ ﷺ এর কবরকে ঘিরে তাওয়াফ করা। এটা বৈধ নয়। তার কবরের দেওয়ালে পিঠ ও পেট স্পর্শ করানো বা রসুলুল্লাহ ﷺ এর মাথার নিকট যে বাক্সটি আছে তাতে চুম্বন করা ও সেটা হাত দ্বারা স্পর্শ করার বিধানও একই। এসবই নিষিদ্ধ কর্মকান্ড।

[আল-আমরু বিল ইত্তিবা ওয়ান-নাহ্উ আনিল ইবতিদা']

হাম্বালী মাযহাবের কোনো কোনো আলেম কবরকে ঘিরে তাওয়াফ করাকে মাকরুহ্ বলেছেন।

ইমাম শারফুদ্দিন বলেন,

ويكره المبيت عنده وتجصيصة وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره

কবরের নিকট রাত কাটানো, কবরকে পাঁকা করা, সজ্জিত করা, কবরের উপরিভাগে মাটি দ্বারা মানুষের আকৃতি নির্মান করা, কবরে চুম্বন করা এবং কবরকে ঘিরে তাওয়াফ করা ইত্যাদি মাকরুহ্।

[কাশফুল কিনা]

হাম্বালী মাযহাবের অন্যান্য ফুকাহায়ে কিরাম এই মতটির বিরোধীতা করেছেন। তারা বলেছেন কবরকে ঘিরে তাওয়াফ করা নিঃসন্দেহে হারাম।

এমনকি ইমাম শারফুদ্দিন নিজেই তার উপরোক্ত গ্রন্থের ভিন্ন এক স্থানে শায়েখ তাকীউদ্দিন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন,

ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا

কা’বা ঘর ছাড়া অন্য যে কোনো স্থানে তাওয়াফ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে (হাম্বালী মাজহাবে) ঐক্যমত রয়েছে। [কাশফুল কিনা]

মুস্তাফা ইবনে সা’দ আস-সুয়ূতী ﷬ বলেন,

(وَكَذَا) يَحْرُمُ (طَوَافٌ بِهَا) ، أَيْ : الْقُبُورِ ، (خِلَافًا لَهُ) ، لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " (هُنَا) حَيْثُ صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ صَرَّحَ بِالْحُرْمَةِ

একইভাবে রসুলুল্লাহ ﷺ এর কবরকে ঘিরে তওয়াফ করা হারাম। ইকনা গ্রন্থের লেখক (শায়খ শারফুদ্দিন) যে বলেছেন এটা মাকরূহ তা গ্রহনযোগ্য নয়। তবে তিনি নিজেই অন্য স্থানে এটাকে স্পষ্ট হারাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। [মাতালিবু উলিন-নাহী]

মানছুর ইবনে ইউনুস ﷬ বলেন, (ويحرم الطواف بها) “রসুলুল্লাহ ﷺ এর কবরকে ঘিরে তওয়াফ করা হারাম” [আর-রওদ আল-মুরাব্বা]

মালেকী মাযহাবের ফকীহ্ ইবনুল হাজ ﷬ বলেন,

فَتَرَى مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ يَطُوفُ بِالْقَبْرِ الشَّرِيفِ كَمَا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ الْحَرَامِ وَيَتَمَسَّحُ بِهِ وَيُقَبِّلُهُ وَيُلْقُونَ عَلَيْهِ مَنَادِيلَهُمْ وَثِيَابَهُمْ يَقْصِدُونَ بِهِ التَّبَرُّكَ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ الْبِدَعِ

তুমি দেখবে, অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবরের চারিদিকে তাওয়াফ করে যেভাবে কা’বা শরীফের চারিদিকে তাওয়াফ করা হয়। তারা কবরকে স্পর্শ করে থাকে এবং কবরে চুম্বন করে। তাবাররুকের উদ্দেশ্যে কবরের উপরে নিজেদের রুমাল ও পোশাক-আশাক বিছিয়ে রাখে। এসবই বিদয়াতী কর্মকান্ড। [আল-মাদখাল]

♦ ***কবর জিয়ারতে গিয়ে নিজের জন্য দোয়া করা বা কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট দোয়া চাওয়ার বিধান।***

কবর জিয়রতে যেয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার বৈধতার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু কোনো নেককার ব্যক্তির কবরে হাজির হয়ে নিজের জন্য দোয়া করা বা সেখানে দোয়া করাতে অধিক ফজিলত মনে করা বৈধ কিনা সে বিষয়ে কেউ কেউ দ্বিমত করেছেন। একইভাবে মৃত ব্যক্তির নিকট নিজের জন্য দোয়া চাওয়ার ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷬ কবরের নিকট নিজের জন্য দোয়া করা বা মৃত ব্যক্তির নিকট নিজের জন্য দোয়া চাওয়া উভয় বিষয়কে বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি বলেন,

وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَصْدُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقَبْرِ مَشْرُوعًا لَفَعَلَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ

এটা জানা কথা যে, যদি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবরের নিকট নিজের জন্য দোয়া করা বৈধ হতো তবে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনরা এটা করতেন। [মাজমুউল ফাতাওয়া]

যদি কেউ বলে হে আল্লাহর রসুল আমার জন্য দোয়া করুন বা আমার জন্য শাফায়ত করুন অথবা অন্য কোনো নবী, মৃত ওলী বা অদৃশ্য ফেরেস্তাদের নিকট দোয়া বা সুপারিশ চায় তবে সেটা অপছন্দ করে তিনি বলেন,

فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ مِنْ فِعْلِ النَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَمَنْ ضَاهَاهُمْ مِنْ مُبْتَدِعَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ؛ لَيْسَ هَذَا مِنْ فِعْلِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ وَلَا مِمَّا أَمَرَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ

এসব কিছু খৃষ্টান ও অন্যান্য মুশরিকদের এবং এই উম্মতের ঐ সকল বিদয়াতীদের কার্যকলাপ যারা তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এটা প্রথম যুগের মুহাজির ও আনসারদের এবং তাদের অনুসারী পরবর্তী যুগের আইম্মায়ে কিরামের পন্থা নয়। [মাজমুউল ফাতাওয়া]

অন্য এক স্থানে তিনি বলেন,

وَلِهَذَا اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَلِمُ قَبْرًا مِنْ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِهِ وَلَا يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عِنْدَهُ وَلَا قَصْدُهُ لِلدُّعَاءِ عِنْدَهُ أَوْ بِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ كَانَتْ مِنْ أَسْبَابِ الشِّرْكِ وَعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ

একারণে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন যে, নবী-রাসুল বা অন্য কারো কবরকে চুম্বন বা স্পর্শ করা যাবে না। সেখানে সলাত আদায় করা, নিজে দোয়া করা বা তার ওসীলায় দোয়া করা যাবে না। কেননা এসব কাজ শিরক ও মূর্তিপূজার দিকে নিয়ে যায়। [মাজমুউল ফাতাওয়া]

যারা কেবলমাত্র ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ এবং তার অনুসারী পরবর্তী যুগের কিছু আলেম-ওলমা ছাড়া অন্য কারো মতামত উল্লেখ করেন না, উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে হয়তো স্বীকারও করেন না তারা এই সকল উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে এসব বিষয়ে ব্যাপক কড়াকড়ি করে থাকেন। এদের মধ্যে অতি-উৎসাহী কিছু ব্যক্তি অধিক কড়াকড়ি করে বলেন, এসব কাজ স্পষ্ট শিরক-কুফর হিসেবে গণ্য যা একজন মুসলিমকে কাফিরে পরিনত করে। বলা বাহুল্য যে, ইবনে তাইমিয়া নিজেও এ রায় দেন নি। তার মতামত থেকে বড়জোর বিষয়টি নিষিদ্ধ ও বিদয়াত প্রমাণিত হয়, শিরক-কুফর নয়।

ইবনে তাইমিয়া ﵀ এবং তার সমমতের কিছু সংখ্যক আলেম-ওলামা ছাড়া অন্যান্য সকল মুহাদ্দিস ও ফুকাহায়ে কিরাম এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তারা রসুলুল্লাহ্ ﷺ ও অন্যান্য নেককার ব্যক্তির কবরের নিকট নিজের জন্য এবং সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য দোয়া করা উত্তম মনে করেছেন। রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবরে হাজির হয়ে তার নিকট দোয়া বা শাফায়াত চাওয়াকেও তারা বৈধ মনে করেছেন।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ নিজে তার সাহাবাদের কবর জিয়ারতের সময় যে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন তাতে কবরবাসীর জন্য জিয়ারতকারী ও অন্যান্য সমস্ত মুসলিমদের জন্য দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন।

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ "

রসুলূল্লাহ ﷺ তাদের কবরস্থানে গমণ করে এই কথা বলতে বলেন, ‘‘ওহে মুসলিম কবরবাসীরা তোমাদের উপর সালাম, আমরাও একদিন তোমাদের সাথে মিলিত হবো। তোমাদের জন্য এবং আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করছি। [সহীহ্ মুসলিম]

এই হাদীস কবর স্থানে গমণ করে কবরবাসীর জন্য দোয়া করা এবং সেই সাথে নিজের জন্য ও সারা বিশ্বের মুসলিমদের দোয়া করার ফযিলত প্রমাণ করে।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবর জিয়ারত করার সময় করনীয় সম্পর্কে ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন,

ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَوْقِفِهِ الأَوَّلِ قبَالَ وَجْهِ رسولِ الله صـ وَيَتَوَسَّلُ بِهِ في حَقّ نَفْسِهِ وَيَتَشَفَّعُ بِهِ إِلَى رَبّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

এরপর সে রসুলুল্লাহ ﷺ এর চেহারার নিকট দাড়াবে এবং তার নিজের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ﷺ কে ওসীলা করে দোয়া করবে। [আল-ইদাহ্]

ইমাম আজ-জাহাবী বিভিন্ন জনের জীবনী প্রসঙ্গে বলেছেন,

وقبره يزار، ويتبرك به

তার কবর বরকতের উদ্দেশ্যে জিয়ারত করা হয়। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা]

তিনি মা'রুফ আল-কারখীর জীবনী প্রসঙ্গে বলেন,

وعن إبراهيم الحربي قال: قبر معروف الترياق المجرب يريد إجابة دعاء المضطر عنده لان البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء،

ইব্রাহীম আল হারবী বলেন, মা'রুফের কবর পরীক্ষিত স্থান। তার উদ্দেশ্য হলো সেখানে বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির দোয়া কবুল করা হয় যেহেতু পবিত্র স্থানসমূহতে দোয়া বেশি কবুল হয়ে থাকে।

[সিয়ারু আ'লামিন নুবালা]

ইমাম আব্দুর রহমান আল-জাওজী তার ‘সিফাতুস্ সফওয়া’ নামক কিতাবে অনুরুপ কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে হিব্বান رحمه الله তার ‘ছিকাত’ নামক গ্রন্থে আলী ইবনে মুসা আর-রিদার কাহিনী প্রসঙ্গে বলেন,

من سادة أهل البيت وعقلائهم

তিনি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এ বংশধরদের নেতৃস্থানীয় ও জ্ঞানী ব্যক্তি।

এরপর বলেন,

وقبره بسنا باذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قبر الرشيد قد زرته مرارا كثيرة وما حلت بي شدة في وقت مقامى بطوس فزرت قبر على بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه ودعوت الله إزالتها عنى إلا أستجيب لي وزالت عنى تلك الشدة وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك أماتنا الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه و سلم الله عليه وعليهم أجمعين

তার কবর রয়েছে ‘নুকান’ শহরের বাহিরে সানাবাজ নামক স্থানে রশীদের কবরের পাশে। আমি বেশ কয়েকবার তার কবর জিয়ারত করেছি। বাতুসে অবস্থানকালীন আমার কোনো সমস্যা হলে আমি আলী ইবনে মুসা আর-রিদার কবর জিয়ারত করে আল্লাহর নিকট উক্ত সমস্যা নিরসন করার দোয়া করতাম। এতে আমার সমস্যা দূরীভূত হতো। এটা আমি বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখেছি। আল্লাহ আমাদের তার রসুল এবং তার রসুলের বংশধরদের ভালবাসার উপর টিকে থেকে জীবন অতিবাহিত কররা তৌফিক দিন।

♦ *মৃত ব্যক্তির নিকট নিজের জন্য দোয়া চাওয়া।*

এটা হলো কবরের নিকটে গমন করে নিজের জন্য দোয়া করা সম্পর্কে। অনুরুপভাবে মৃত ব্যক্তির নিকট নিজের জন্য দোয়া চাওয়ার ব্যাপারেও বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরামের মতামত রয়েছে।

ইমাম নাব্বী ﵀ রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবরের নিকট নিজের জন্য দোয়া করার পরামর্শ দিয়ে বলেন,

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يقُولُ مَا حَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنِ الْعُتْبِيِّ مُسْتَحْسِنِينَ لَهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَبْرِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ أَعْرَابِيّ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكَ يا رسول الله سَمِعْت الله يقُولُ: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مُسْتَشْفِعاً بِكَ إِلَى رَبِّي

এখানে উত্তম একটি দোয়া রয়েছে যা আমাদের মাযহাবের ওলামায়ে-কিরাম বর্ণনা করেছেন এবং পছন্দ করেছেন। আল-উতবী বলেন, আমি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবরের নিকট বসে ছিলম এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক আগমন করে বলে, হে আল্লাহর রসুল আপনার উপর সালাম। আমি আল্লাহর কিতাবে পেয়েছি তিনি বলেছেন, ‘‘যখন তারা অন্যায় করে তখন যদি আপনার নিকট এসে নিজেদের জন্য ক্ষমা চায় এবং আপনি তাদের জন্য ক্ষমা চান তবে আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ করতেন’’ [নিসা/৬৪] আমি তো আপনার নিকট এসেছি আমার গোনা সমূহের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা চাইতে এবং আপনার মাধ্যমে আমার রবের নিকট সুপারিশ করতে।

আল-উতবী বলেন, এরপর উক্ত গ্রাম্য ব্যক্তি চলে গেলে আমার হালকা নিদ্রা আসে তখন আমি রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন, উক্ত গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট যাও এবং তাকে বলো যে, তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। [আল-ইদাহ্]

অনুরুপ ঘটনা আল-কুরতুবী, ইবনে কাছীর ও অন্যান্য মুফাস্সিরীনে কিরাম বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হাযার আল-আসক্কালানী ফাতহুল বারীতে অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله استسق لامتك فإنهم قد هلكوا

উমর ؓ এর সময় অনাবৃষ্টি হলে একজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কবরের নিকট গমণ করে বলে হে আল্লাহর রসুল আপনার উম্মতের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন তারা তো ধ্বংস হয়ে গেল।

ইবনে হাযার আসক্কালানী বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ্।

বরেণ্য ওলামায়ে কিরাম এই সকল ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং সমর্থন করেছেন। বিষয়টি অনেকের নিকট অবোধগম্য মনে হতে পারে। আমরা পূর্বে বলেছি গায়েবী শক্তির নিকট প্রার্থনা করা শিরক। একইভাবে শিরক হবে যদি কেউ কারো নিকট এমন কিছু প্রার্থনা করে যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দিতে সক্ষম নয়। মৃত ব্যক্তির কবরে হাজির হয়ে তার নিকট দোয়া প্রার্থনা করা এই দুটির কোনোটির মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত নয়। যেহেতু এমন প্রমাণ রয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি জীবিতদের কথা শুনতে পায়।

রসুলূল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ، إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ آتاه ملكان

যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় আর তার সাথীরা ফিরে যায় তখন সে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া অবস্থাতেই দুজন ফেরেস্তা আগমন করে। [বুখারী ও মুসলিম]

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তি এমনকি তার আশে পাশের লোকদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বদরে নিহত কাফিরদের একটি গর্তে নিক্ষেপের পর তাদের নাম ও পিতার নাম উল্লেখ করে বলেন, হে অমুক, হে অমুক তোমরা কি তোমাদের রবের ওয়াদার সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছো? একথা শুনে কেউ কেউ বলল, (تدعو أمواتا) "আপনি কি কিছু মৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করছেন?" রসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, (مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لاَ يُجِيبُونَ) "তোমরা তাদের তুলনায় বেশি শুনতে পাও না। তবে তারা উত্তর দিতে পারে না" [সহীহ্ বুখারী]

আয়েশা ﷺ এই হাদীসটির ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন এর অর্থ হলো,

إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ

তারা এখন বুঝতে পারছে যে আমার কথা সত্য।

যেহেতু আল্লাহ্ ﷻ বলেছেন, (أنك لا تسمع الموتي) "আপনি তো মৃতকে শোনাতে সক্ষম নহেন" [নামল-৮০] এছাড়া অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ﷻ বলেন, (وما أنت بمسمع من فى القبور) "যে কবরে আছে আপনি তো তাকে শোনাতে সক্ষম নন।" [ফাতির/২২]

এই সকল আয়াতের ভাবার্থের উপর নির্ভর করে আয়েশা ﷺ মনে করেছেন মৃত ব্যক্তি কখনও জীবিত ব্যক্তির কথা শুনতে পায় না। কিন্তু অন্যান্য সকল সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী আইম্মায়ে কিরাম এই সকল হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের উপর ভিত্তি করে এই মত দিয়েছেন যে, আল্লাহর ইচ্ছায় মৃত ব্যক্তি জীবিতদের কথা শুনতে পায়। উভয় আয়াতের পূর্বাপর বিষয়বস্তুর উপর চিন্তা-গবেষণা করলে তাদের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়।

সূরা ফাতিরের আয়াতটির সম্পূর্ণ অংশ এমন,

{ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ }

❮ জীবিত আর মৃত সমান নয়। আল্লাহ যাকে খুশি শোনাতে পারেন কিন্তু যে কবরে আছে আপনি তো তাকে শোনাতে সক্ষম নন। ❯ [ফাতির/২২]

এ আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, যদিও রসুল তার নিজ চেষ্টায় মৃতকে শোনাতে সক্ষম নন। তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে জীবিত বা মৃত যে কাউকে শোনাতে সক্ষম।

এ প্রসঙ্গে ইবনে বাত্তাল অনুরুপ কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

فإنك لا تسمع الموتى بطاقتك وقدرتك، إذ كان خالق السمع غيرك، ولكن الله هو الذى يُسمعهم

আপনি তো নিজ ক্ষমতায় মৃতকে শোনাতে সক্ষম নন যেহেতু আপনি শ্রবণ শক্তি সৃষ্টি করতে পারেন না। তবে আল্লাহই তাদের শোনাবেন। [শারহে বুখারী]

কেউ কেউ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু মৃত ব্যক্তি কথা শোনে ও বুঝতে পারে কিন্তু সাড়া দিতে পারে না তাই তার শোনাকে না শোনা হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে এবং কাফিরকে তার সাথে তুলনা করা হয়েছে যেহেতু সে শোনে কিন্তু ডাকে সাড়া দেয় না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়াতে এই ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে মুফাসসিরীনে কিরামের ঐক্যমত রয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে এ দুটি আয়াতে কাফিরকে মৃতের সাথে তুলনা করা হয়েছে যেহেতু সে কথা শোনে কিন্তু অনুসরণ করে না ও জওয়াব দেয় না। এ বিষয়টিও উপরোক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকেই সঠিক প্রমান করে যেহেতু কাফিররা প্রকৃত অর্থেই কিছুই শোনে না এমন নয় বরং তারা শোনে কিন্তু সাড়া দেয় না। মৃতদের ব্যাপারটিও অনুরুপ যেহেতু তারা শোনে কিন্তু উত্তর দিতে পারে না। তাই তাদের অবস্থার সাথে কাফিরদের অবস্থার তুলনা করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসটিও একই বিষয় প্রমাণ করে যেহেতু সেখানে বলা হয়েছে,

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لاَ يُجِيبُونَ

তোমরা তাদের তুলনায় বেশি শুনতে পাও না তবে তারা উত্তর দিতে পারে না। [সহীহ্ বুখারী]

সুতরাং হাদীস ও আয়াতের ভাবার্থের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল,

هَلْ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ كَلَامَ زَائِرِهِ وَيَرَى شَخْصَهُ ؟

মৃত ব্যক্তি কি তাকে জিয়ারত করতে আসা ব্যক্তির কথা শুনতে পায় ও তাকে দেখতে পায়?

তিনি এ বিষয়ে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়ে বিস্তারিত দলিল প্রমাণের মাধ্যমে বিষয়টি প্রমান করেছেন।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

ইবনে আব্দিল বার ﵀ বলেন,

ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " مَا مِنْ رَجُل يَمُرّ بِقَبْرِ أَخِيهِ كَانَ يَعْرِفهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّم عَلَيْهِ إِلَّا رَدَّ اللَّه عَلَيْهِ رُوحه حَتَّى يُرَدّ عَلَيْهِ السَّلَام "

রসুলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন এমন কোনো মুমিনের কবরের পাশ দিয়ে যায় যাকে সে দুনিয়াতে চিনতো এবং তাকে সালাম দেয় আল্লাহ তার রুহ ফিরিয়ে দেন ফলে সে উক্ত ব্যক্তির সালামের জবাব দেয়।

ইবনে তাইমিয়া মাযমুয়ায়ে ফাতাওয়াতে এবং ইবনে কায়্যিম আত-তাহ্যিবে এটা উল্লেখ করেছেন। এটা উল্লেখ করার পর ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন,

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ صَاحِبُ الْأَحْكَامِ

ইবনুল মুবারক ﵀ বলেছেন, এটা রসুলুল্লাহ ﷺ এর কথা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে এবং আহকামের লেখক আব্দুল হক এটাকে সহীহ্ বলেছেন।

আব্দুর রাজ্জাক ﷺ তার মুছান্নাফে বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরা ﷺ একবার এক ব্যক্তিকে কবরস্থ ব্যক্তির উদ্দেশ্য সালাম দিতে বললে সে বলে, আমি কি মৃত ব্যক্তিকে সালাম দেবো? আবু হুরাইরা ﷺ বলেন,

إن كان رآك في الدنيا يوما قط إنه ليعرفك الآن

যদি সে দুনিয়াতে কখনও তোমাকে দেখে থাকে তবে আজ তোমাকে চিনতে পারবে।

এ বিষয়ে আরো একটি চমকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে। আবু আয়্যুব আল-আনসারী ﷺ বলেন, যখন মুমিন ব্যক্তির রুহ কবজ করা হয় তখন তার পরিচিত অন্যান্য মৃত ব্যক্তিরা তার নিকট এসে দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে। তারা বলে, (مَا فَعَلَ فُلَانٌ وَمَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ هَلْ تَزَوَّجَتْ) ‘‘অমুক অমুকের কি খবর, অমুক কি বিয়ে করেছে’’ ইত্যাদি।

ঘটনাটি ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইবনুল মোবারোকের বরাতে উল্লেখ করেছেন। [মাযমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

উপরোক্ত দলিল-প্রমাণের আলোকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তি জিয়ারতকারীর কথা শুনতে পায়। এমন বর্ণনাও রয়েছে যাতে প্রমাণিত হয় মৃতরা জীবিতদের জন্য দোয়া করে থাকে।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم

আমার জীবিত অবস্থা তোমাদের জন্য কল্যাণময়। যেহেতু তোমরা আমার সাথে কথা বলছো আমিও তোমাদের সাথে কথা বলছি। আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য কল্যাণময় যেহেতু তোমাদের আমল আমার নিকট পেশ করা হবে যদি আমি ভাল কিছু দেখি তবে আল্লাহর প্রশংসা করবো আর যদি খারাপ কিছু দেখি তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো। [মুসনাদে বায্যার]

একই হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এগুলো সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। তবে বহু সংখ্যক মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন,

হাইছামী বলেন, (رجاله رجال الصحيح) ‘‘হাদীসের রাবীরা সহীহ’’ [মাযমুয়ায়ে যাওয়ায়েদ] সুয়ুতী খাসায়েসুল কুবরা নামক গ্রন্থে হাদীসটির সনদকে সহীহ বলেছেন। ইবনুল ইরাক্বী হাদীসটির সনদকে উত্তম বলেছেন।

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে এটা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির নিকট দোয়া চাওয়া হলে সে সেটা শুনতে পায় এবং তার প্রতিদানে সে দোয়া করতেও সক্ষম। যেভাবে মৃত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া হলে সে তার উত্তর দিয়ে থাকে।

যদি কেউ বলে মৃত ব্যক্তি নিশ্চিত শুনছে কিনা বা সে আদৌ দোয়া করছে কিনা এটা তো জানা সম্ভব হচ্ছে না।

তাকে বলা হবে যে বিষয় ঘটার সম্ভাবনা আছে সেটা চাওয়া হলে তা শিরকের পর্যায়ে পড়ে না। সেটা বাস্তবে ঘটুক বা না ঘটুক। উদাহরণ সরুপ নির্জন বনভূমি বা খোলা মরুভূমির মধ্যে হরিয়ে গিয়ে একজন ব্যক্তি কেউ শুনলে শুনবে এ আশায় চিৎকার করে বলল "আমাকে রক্ষা করো, আমাকে রক্ষা করো"। এটা শিরক নয়। যেহেতু এটা সম্ভব যে তার ডাক দূরবর্তী কারো কানে গিয়ে পৌছাবে আর সে এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। যদিও এমন হতে পারে যে, তার ডাক কারো কানে পৌছাবে না অথবা কেউ শুনেও হয়তো তাকে উদ্ধার করতে আসবে না। তবু এটা শিরক হবে না। যা ঘটা অসম্ভব নয় এমন কিছু প্রার্থনা করা শিরক হতে পারে না যদিও সেটা না ঘটে।

এই বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায় মৃত ব্যক্তির কবরে হাজির হয়ে তার নিকট দোয়া প্রার্থনা করার মধ্যে শিরকের কোন উপাদান নেই।

এ পর্যায়ে কেউ হয়তো বলবে, বিষয়টি নিজে শিরক নয় তা ঠিক কিন্তু এটার অনুমতি দিলে তা শেষ পর্যন্ত শিরকের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তাই শিরকের পথ বন্ধ করার নিমিত্তে এটা থেকে মানুষকে নিষেধ করা উচিৎ। অনেকে অবাক হয়ে বলতে পারেন, উম্মতের ওলামায়ে কিরাম শিরকের পথ বন্ধ করার জন্য কবর স্পর্শ করা বা কবরে চুম্বন করা ইত্যাদি কাজ হতে মানুষকে নিষেধ করেছেন। তারা কবরে উপস্থিত হয়ে মৃত ব্যক্তির নিকট দোয়া চাওয়ার অনুমতি কিভাবে দিলেন?

এ সংশয়ের নিরসন এভাবে করা যায় যে, শিরক হলো গয়রুল্লাহর ইবাদত করা। আর ইবাদত হলো কাউকে অদৃশ্যের উপর স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বশীল মনে করে তার নিকট কোনো কিছু প্রার্থনা করা। কারো কবর স্পর্শ করা, চুম্বন করা বা কবরের মাটিতে মাথা ঠোকানো ইত্যাদির মাধ্যমে কল্যাণ লাভের চেষ্টা করা হলে, যদিও এগুলোর মাধ্যমে অন্তরে আল্লাহর নিকটই কল্যাণ চাওয়া হয় তবু অন্তরের ইচ্ছার পরিবর্তে এইসব বাহ্যিক কার্যকলাপই অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকদের বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে আস্তে আস্তে মানুষের অন্তরের ইচ্ছা পরিবর্তীত হয়ে উক্ত কবরওয়ালার প্রতি তীব্র আকর্ষন সৃষ্টি হয় এবং অতিভক্তির বশবর্তী হয়ে একপর্যায়ে সরাসরি তার নিকট হতেই কল্যাণ কামনা করার মতো শিরকী আক্বীদা বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। যেমনটি নুহ্ عليه السلام এর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ঘটেছে। অপরদিকে যখন কবরকে বাহ্যিকভাবে কোনো সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করা হয় না। কেবল সেখানে গমণ করে নিজের জন্য দোয়া করা হয় বা কবরওয়ালার নিকট দোয়া চেয়ে বলা হয় আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য দোয়া করুন তখন এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই। অতএব দোয়াও করতে হবে কেবল তারই নিকট।

জীবিত অবস্থায় বা মৃত অবস্থায় নবী-বা ওলী কারো কোন ক্ষমতা নেই। তারা বড়জোর আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোয়া করতে পারে এর বেশি কিছু নয়। সকল ক্ষমতার অধিকারী মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। এ কথার মধ্যে শিরকের কোনো উপাদান নেই বরং এখানে তাওহীদের স্বীকৃতিই বিদ্যমান। একারণে বিচক্ষণ ওলামায়ে কিরাম এটাকে নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন মনে করেন নি।

◆ *স্বয়ং কবরওয়ালার নিকট প্রার্থনা করা স্পষ্ট শিরক।*

উপরে আমরা মৃতের নিকট নিজের জন্য দোয়া চাওয়ার বিধান সম্পর্কে এটা প্রমাণ করেছি যে, এটা বৈধ। কিন্তু এমন কিছু লোক রয়েছে যারা সরাসরি মৃত ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রার্থনা করে থাকে। এ বিষয়টি স্পষ্ট শিরক ও কুফর যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ}

﴾ ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আহ্বান করে তারা তো নিজেরা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং ওদেরই সৃষ্টি করা হয়। আর তারা মৃত, জীবিত নয়। কখন যে ওদের পুনরায় জীবিত করা হবে সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। ﴿ [নামল/২০,২১]

ইমাম শাওকানী رحمه الله রসুলুল্লাহ ﷺ কে ওসীলা করে দোয়া করার বৈধতা বর্ণনা করার পর বলেন,

যে নিকৃষ্ট কাজটি অনেকেই করে থাকে তা হলো বহুসংখ্যক সাধারন লোক এবং কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি কবরে শায়িত বা জীবিত ব্যক্তিকে এমন বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান মনে করে যা আল্লাহর ছাড়া কেউ দিতে সক্ষম নয়। তাদের অন্তরের এই আক্বীদার ফলস্রুতিতে তারা মুখ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করে থাকে।

তাদের কার্যকলাপের আরো কিছু বর্ণনা দেওয়ার পর তিনি বলেন,

وهذا إذا لم يكن شركا فلا تدري ما هو الشرك وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر

এটা যদি শিরক না হয় তবে তুমি শিরক খুঁজে পাবে না। আর যদি এটা কুফরী না হয় তবে দুনিয়াতে কুফরী বলতে কিছু নেই। [আদ্দুররুন-নাদীদ]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন,

فَمَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ وَيَسْأَلُهُمْ جَلْبَ الْمَنَافِعِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ مِثْلَ أَنْ يَسْأَلَهُمْ غُفْرَانَ الذَّنْبِ وَهِدَايَةَ الْقُلُوبِ وَتَفْرِيجَ الْكُرُوبِ وَسَدَّ الفاقات : فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ

যারা ফেরেস্তা বা নবী-রাসুলকে মাধ্যম বানিয়ে তাদের উপার ভরসা করে, তাদের নিকট মঙ্গল কামনা করে এবং অমঙ্গল থেকে আশ্রয় চায়, যেমন: তাদের নিকট গোনা মাফের জন্য প্রার্থনা করে বা সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করে অথবা বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করে তবে এই ব্যক্তি কাফির হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত মুসলিমরা ইজমা করেছেন। [মাজমুউল ফাতাওয়া]

যারা মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করে তাদের অবস্থা দুরকম হতে পারে।

১। হয়তো তারা প্রকৃত পক্ষেই মৃত ব্যক্তির গায়েবী ক্ষমতায় বিশ্বাস করে যেমনটি তাদের কার্যকলাপ হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। আর এমন হলে সেটা যে স্পষ্ট শিরক তাতে কোনো মুসলিম সন্দেহ পোষন করতে পারে না।

২। এদের কেউ কেউ দাবী করে আমরা আসলে এসকল মৃত ব্যক্তিদের কোনো ক্ষমতা আছে তা মনে করি না, প্রকৃত অর্থে তাদের নিকট প্রার্থনাও করি না। কিন্তু কেবল বরকতের উদ্দেশ্যে শাব্দিক ভাবে তাদের আহ্বান করে থাকি। পূর্বে আমরা রূপক অর্থে আহ্বান করা সংক্রান্ত আলোচনায় যেসব দলিল প্রমাণ উল্লেখ করেছি এরা এক্ষেত্রে সেগুলো উল্লেখ পূর্বক নিজেদের শিরকী কর্মকান্ডকে বৈধ প্রমাণের চেষ্টা করে।

তারা একটি বিষয় ভুলে যায় যে, কোন একটি কথার মাধ্যমে বক্তা তার অন্তরে কি উদ্দেশ্য করছে কেবল সেটিই বিবেচ্য বিষয় নয় বরং সকল মানুষ সেটার কি অর্থ বোঝে সেটাই বিবেচ্য বিষয়। রূপক অর্থে আহ্বান বলতে আমরা ঐ সকল বিষয়কে বুঝিয়েছি যেগুলো সকলের নিকট পরিচিত ও প্রশিদ্ধ। যদি কেউ রোগে শোকে কাতর হয়ে মাগো মাগো করে চিৎকার করে ওঠে এবং তার মা এর পূর্বে মারা গিয়ে থাকে তবু সেটা শিরক-কুফর হবে না কেননা এটা স্পষ্ট বোধগম্য যে এখানে উক্ত ব্যক্তি তার মায়ের নিকট প্রকৃতই প্রার্থনা করছে না। যেহেতু কেউই নিজের মাকে উপাসনা করে না। ফলে এই কথাটি কুফরীর প্রমাণ বহন করে না। কিন্তু যদি কেউ মূর্তির উদ্দেশ্যে এধরণের আহ্বান করে তবে তার অন্তরে আক্বীদা যাই থাক সে কাফির হবে কেননা মূর্তিকে আহ্বান করা মূর্তিপূজারী ছাড়া অন্য কারো কাজ নয়। ফলে এটা কুফরীর প্রতীক ও কাফিরদের পরিচয় হিসেবে গণ্য আর এ ধরণের বিষয়ে লিপ্ত হলে একজন ব্যক্তি কাফিরে পরিনত হবে তার আক্বীদা যাই হোক না কেন। পূর্বে আমরা দেখেছি কাজী ইয়াদ ﵀ এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের ইজমা উল্লেখ করেছেন। যারা কবরওয়ালার নিকট সরাসরি প্রার্থনা করে আর বলে, আমাদের আক্বীদা তাওহীদ অনুযায়ীই আছে, আমরা এদের কোনো ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করি না। তাদের বিশ্বাস যদি সত্যিই সঠিক থাকে তবু তারা কাফির হবে যেহেতু মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা

করা মুশরিকদের কাজ এবং কুফরী আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিচায়ক। যে এটা করবে তার কাজের মাধ্যমেই তার আক্বীদার পরিচয় পাওয়া যাবে তার মুখের দাবীকে মোটেও গুরুত্ব দেওয়া হবে না। যেহেতু কুফরী কথা মুখে উচ্চারণ করাও কুফরী অন্তরের আক্বীদা বিশ্বাস যাই থাক। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

⇒ ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-তুমারের বিধান

এ বিষয়টিও তাবাররুক ও তাওয়াস্সুলের বিধানের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। যেহেতু এখানে কুরআনের আয়াত বা অন্য কোনো উত্তম যিকিরের ওসীলায় রোগ হতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা হয়। এর তিনটি পদ্ধতি রয়েছে।

১। দোয়া-কালাম পাঠ করে রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা।

২। দোয়া পড়ে পানিতে ফুঁ দেওয়া এবং সেই পানি রোগীকে পান করানো বা রোগীর শরীরে মাখিয়ে দেওয়া।

৩। দোয়া-কালাম লেখা কাগজ তাবীজে ভরে রোগীর শরীরে লটকিয়ে দেওয়া।

নিম্নে এই সকল বিষয় সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনার করা হলো।

♦ ***দোয়া-কালাম পাঠ করে রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা।***

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِـــرْكٌ) "ঝাড়-ফুঁক, জাদু-টোনা ও তাবীজ-তুমার শিরক" (৫০)

অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

তোমরা ঝাড়-ফুঁকের সময় যেসব মন্ত্র পাঠ করো তা আমাকে পড়ে শোনাও যদি তার মধ্যে কোনো শিরক না থাকে তবে সমস্যা নেই। [সহীহ্ মুসলিম]

এছাড়া রসুলুল্লাহ ﷺ এর উপর এক ইয়াহুদী জাদু করলে জিব্রাঈল (আঃ) নিজে তাকে ঝাড়-ফুঁক করেন। তিনি বলেন,

---

(৫০) আবু দাউদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। শায়েখ আলবানী সহীহ বলেছেন [সহীহা/২৯৭২]

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، وَاللهُ يَشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ

আমি তার জন্য আপনাকে আল্লাহর নামে ঝাড়ফুক করছি। আপনার মধ্যে যা কিছু রোগ আছে আল্লাহ তা থেকে মুক্ত করবেন। [সহীহ্ মুসলিম]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর একজন সাহাবী একবার কোনো একজন ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিলে তার রোগ সেরে যায়। এবং এর বিনিময়ে তাকে ১০০ ছাগল উপহার দেয়। রসুলুল্লাহ্ ﷺ এটা শুনে খুশি হয়ে বলেন,

وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ

সে কিভাবে জানলো যে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা যায়! তোমরা ছাগলগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও আমার জন্যে একটি অংশ রেখো। [মুসলিম]

এই সকল হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, যে হাদীসে ঝাড়-ফুঁককে শিরক বলা হয়েছে সেখানে সকল প্রকার ঝাড়ফুঁক উদ্দেশ্য নয় বরং যেসব ঝাঁড়-ফুঁকের মধ্যে শিরক কুফর রয়েছে কেবল সেগুলো উদ্দেশ্য। যেহেতু অন্য হাদীসে বলা হয়েছে। (لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ) "ঝাঁড়ফুকে কোনো সমস্যা নেই যদি তাতে শিরক না থাকে"। একারণে ওলামায়ে কিরাম শর্ত স্বাপেক্ষ ঝাড়-ফুঁককে বৈধ বলেছেন।

ইবনে হাযার আসক্কালানী ﵀ বলেন,

وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى

উলামায়ে কিরাম ইজমা করেছেন যে, তিনটি শর্তের উপর ভিত্তি করে ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ। ১. সেটা আল্লাহর কালাম, তার নাম ও গুনাবলীর মাধ্যমে হতে হবে। ২. আরবী ভাষায় হতে হবে বা এমন ভাষায় হতে হবে যার অর্থ বোধগম্য। ৩. এমন বিশ্বাস বিদ্যমান থাকতে হবে যে, ঝাড়-ফুঁক স্বয়ংক্রীয়ভাবে কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না বরং আল্লাহর ইচ্ছায় তা কাজ করে। [ফাতহুল বারী]

উপরে বর্ণিত হাদীস সমূহের মূলভাব এবং ওলামায়ে কিরামের বক্তব্যের বিষয়বস্তু থেকে এটা অনুধাবন করা যায় যে, কেবল মাত্র কুরআনের আয়াত বা হাদীসে প্রমাণিত দোয়াই নয় বরং যে কোন ভাষায় আল্লাহর নাম গুনাবলী বা প্রসংশা সম্বলিত দোয়ার মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা যেতে পারে। যেহেতু রসুলূল্লাহ ﷺ স্পষ্ট বলেন, "শিরক নয় এমন যে কোন কিছুর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করতে দোষ নেই।" [মুসলিম] তাছাড়া ওলামায়ে কিরামে বোধগম্য যে কোনো উত্তম কথা দ্বারা ঝাড়-ফুক করা বৈধ মনে করেছেন।

ঐ হাদীসের মধ্যেও এ বিষয়ে প্রমাণ রয়েছে যেখানে একজন সাহাবী নিজে থেকেই সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঝাড়-ফুঁক করেন এবং তার ঝাড়-ফুঁকে রোগী সুস্থ হয়। পরে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ

সে কিভাবে জানলো যে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা যায়! তোমরা ছাগলগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নাও আমার জন্য একটি অংশ রেখো। [মুসলিম]

এটা প্রমাণ করে যে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত ব্যক্তিকে এটা শিক্ষা দেন নি। অন্য বর্ণনাতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর এই প্রশ্নে উক্ত ব্যক্তি বলেন,

يا رسول الله شيء ألقي في روعي

হে আল্লাহর রসুল এটা আমার অন্তরে জাগ্রত হয়েছিল। [দারে কুতনী]

এটা প্রমাণ করে যে, নিজের চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে যে কোনো আয়াত বা দোয়াকে ঝাড়-ফুঁকের জন্য বাছায় করা যায়। আমরা এ বিষয়টি উল্লেখ করলাম কারণ কেউ কেউ এ বিষয়ে কড়াকড়ি করে বলে থাকে কুরআন বা হাদীসে বর্ণিত নেই এমন কিছুর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে না।

♦ ***দোয়া পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে বা কুরআনের আয়াত লিখে পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি রোগীকে পান করানো বা রোগীর শরীরে মাখিয়ে দেওয়া।***

আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে এমন বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ্ ﷺ দোয়া পাঠ করে মাটি ও পানিতে ফুঁ দিয়ে তা ছাবিত ইবনে কায়েসের শরীরে ঢেলে দেন। শায়েখ আলবানী বলেছেন হাদীসটি দূর্বল।

জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ বর্ণনা করেন রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে নাশরা (জ্বিনের আছর থেকে বা অন্য কেনো রোগ থেকে মুক্ত করার জন্য মন্ত্র পাঠ করা পানি দ্বারা রোগীর শরীর ধৌত করা) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে। তিনি বলেন, (هو من عمل الشيطان) ''এটা তো শয়তানী কর্মকান্ড'' [৫১] [আবু দাউদ]

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

واختلف العلماء في النشرة، وهى أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه، فأجازها سعيد بن المسيب . قيل له: الرجل يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر ؟ قال: لا بأس به، وما ينفع لم ينه عنه. ولم ير مجاهد أن تكتب آيات من القران ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع. وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض

---

[৫১] শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন [সহীহা/২৭৬০]।

"নুশরা" বৈধ কিনা সে বিষয়ে আলেমরা মতপার্থক্য করেছেন। আর তা হলো আল্লাহর নাম বা কুরআন পাঠ করে সেটা পানি দ্বারা ধৌত করে উক্ত পানি রোগীকে পান করানো বা রোগীর শরীরে মাখানো। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব এটাকে বৈধ বলেছেন। তাকে বলা হলো একজন ব্যক্তির উপর জাদু করার ফলে সে স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারে না তার জন্য কি 'নুশরা' করা বৈধ হবে? তিনি বললেন এতে কোন সমস্যা নেই। উপকারী কোনো বিষয় হতে নিষেধ করা হবে না। তবে মুজাহিদ কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ করে সেটা ধৌত করা পানি রোগীকে পান করানো পছন্দ করেন নি। আয়েশা ﵂ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে পানি ভর্তি পাত্রে ফুঁ দিয়ে তা রোগাগ্রস্থের উপর ঢেলে দিতেন।

তিনি আরো বলেন,

ومنعها الحسن وإبراهيم النخعي، قال النخعي: أخاف أن يصيبه بلاء، وكأنه ذهب إلى أنه ما محى به القرآن فهو إلى أن يعب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء

হাসান ও ইব্রাহীম আন-নাখঈ ﵀ এটাকে নিষেধ বলেছেন। তিনি বলেছেন আমার তো মনে হয় এমন করলে রোগ আরো বেশি হবে। সম্ভবত তিনি মনে করেছেন যেহেতু এখানে কুরআন (পানি দ্বারা) মুছে ফেলা হচ্ছে তাই (এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে) রোগ মুক্তি হওয়ার পরিবর্তে রোগ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভবনায় বেশি। [তাফসীরে কুরতুবী]

ইবনে মুফলিহ্ ﵀ বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালকে প্রশ্ন করা হলো,

فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْقُرْآنَ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ يَسْقِيهِ لِلْمَرِيضِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ مِنْهَا قُلْت لَهُ فَيَغْتَسِلُ بِهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ

কোনে ব্যক্তি যদি একটি পাত্রে কুরআনের আয়াত লিখে পরে তাতে পানি ঢেলে রোগীকে পান করায় তবে এটা কেমন হবে? তিনি বললেন কোনো সমস্যা নেই। তাকে আবার প্রশ্ন করা হলো, যদি সে ঐ পানি দিয়ে গোসল করে তবে কেমন হবে। তিনি বললেন এ বিষয়ে আমি কিছু শুনি নি।

আল-খাল্লাল বলেন, উক্ত পানি দ্বারা গোসল করা অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ হলো গোসলের সময় শরীরের বিভিন্ন স্থানে পানি প্রবেশ করে যেখানে কুরআন পাঠ করা পানি পৌছানো উচিৎ নয়।

তবে উক্ত পানি দ্বারা হাত মুখ ধৌত করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আহমদ ইবনে হাম্বল ﵀ থেকে বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বালের ছেলে সালিহ্ বলেন,

رُبَّمَا اعْتَلَلْتُ فَيَأْخُذُ أَبِي قَدَحًا فِيهِ مَاءٌ فَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ لِي اشْرَبْ مِنْهُ وَاغْسِلْ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ

কখনও কখনও আমি অসুস্থ হলে আমার পিতা একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাতে কিছু পাঠ করতেন। তারপর আমাকে বলতেন এটা পান করো এবং এটা দ্বারা হাত-মুখ ধৌত কর।

[আল-আদাব আশ-শারইয়্যাহ্, ইবনে মুফলিহ্]

ইউসূফ ইবনে মুসা ﵀ বর্ণনা করেছেন,

إنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُؤْتَى بِالْكُوزِ وَنَحْنُ بِالْمَسْجِدِ فَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيُعَوِّذُ

মসজিদে আবু আব্দিল্লাহ্ (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল) এর নিকট পানির পাত্র আনা হতো আর তিনি তাতে দোয়া পড়ে দিতেন।

এসব ঘটনা ইবনে মুফলিহ্ ﵀ তার গ্রন্থ আল-আদাব আশ-শারইয়্যাতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন,

وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ لِلْمُصَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَرْضَى شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَذِكْرُهُ بِالْمِدَادِ الْمُبَاحِ وَيُغْسَلُ وَيُسْقَى كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ

রোগাগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য কুরআনের কিছু অংশ পবিত্র কালি দ্বারা লিখে তা ধৌত করে তাকে খাওয়ানো বৈধ। ইমাম আহমদ ও অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

ইবনে কায়্যিম ﵀ নিজে শারীরিক সমস্যার কারণে সূরা ফাতিহা পাঠ করে পানিতে ফু দিয়ে তা পান করতেন। তিনি বলেন,

وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء

আমি এক বাটি জমজম কুপের পানি নিয়ে তাতে কয়েকবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে তা পান করতাম। এতে আমি এত উপকার পেয়েছি যে অন্য কোন ঔষধে তা পায় নি। [মাদারিজুস সালিকীন]

মোট কথা দোয়া-কালাম পাঠ করা পানি গায়ে মাখা বা পান করাতে কোনো দোষ নেই। যদি সেটা আল্লাহর কিতাব বা তার গুনাবলী সম্বলিত দোয়া-কালামের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরামের এটাই মত। তবে লক্ষ্য রাখা উচিৎ যাতে শরীরের আপত্তিকর স্থানে এ পানি না পৌছায়।

♦ ***কুরআনের আয়াত বা দোয়া লেখা কাগজ তাবিজে ভরে তা গলায় বা হাতে লটকানো।***

এই বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই মতপার্থক্য চলে আসছে। রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (إِنَّ الرُّقَى،

(وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ) "ঝাড়-ফুঁক, জাদু-টোনা ও তাবীজ-তুমার শিরক" [আবু দাউদ]

অন্য হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (من علق تميمة فقد اشرك) "যে কেউ মাদুলি ঝুলায় সে শিরক করে" [৫২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

من علَّق تَميمةً فلا أتمّ الله له

যে কেউ মাদুলি ঝুলায় আল্লাহ যেনো তার উদ্দেশ্য সফল না করেন। [৫৩]

এই সকল হাদীসের উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ সকল প্রকারের তাবীজ-তুমার পরিত্যাগ করার পক্ষে মত দিয়েছেন তবে বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরাম ঝাড়-ফুঁক ও পানি পড়ার মতো শর্ত স্বাপেক্ষে কুরআনের আয়াত বা দোয়া-কালাম লিখিত তাবীজ ব্যবহার করা বৈধ বলেছেন।

মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বাতে বর্ণিত আছে,

عن عبد الله أنه كره تعليق شيء من القرآن

।আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ কুরআনের কিছু অংশ লিখে ঝুলানো অপছন্দ করতেন

মুছান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে আরো বর্ণিত আছে, মুগীরা নামক একজন ব্যক্তি ইব্রাহীম নাখঈ কে আল্লাহর বাণী "হে আগুন তুমি ইব্রাহীমের উপর শান্তি ও শীতল হয়ে যাও" এই আয়াতটি লিখে তার বাহুতে লটকিয়ে দিতে বলেন কিন্তু তিনি তা অপছন্দ করেন।

অপর দিকে, আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে,

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর শেখানো একটি দোয়া) তার সন্তানদের মধ্যে যারা বুদ্ধি সম্পন্ন তাদের শেখাতেন আর যারা তেমন নয় তাদের শরীরে দোয়াটি লিখে লটকিয়ে দিতেন।

---

[৫২] ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। আল-হাইছামী বলেন, (ورجال أحمد ثقات) "ইমাম আহমাদ এর বর্ণনার রাবীমা বিশ্বস্ত"। শায়েখ আলাবনী সহীহ্ বলেছেন [সহীহা/৪৯২]

[৫৩] হাকিম ﵀ তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ। আজ-জাহাবীও হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছে।

হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাসান গরীব।

হযরত আয়েশা ﷺ থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে,

ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء

যেটা রোগাক্রান্ত হওয়ার পর ঝুলানো হয় সেটা নিষিদ্ধ মাদুলি নয় বরং নিষিদ্ধ মাদুীল হলো তাই যা রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ঝুলানো হয়। [মুস্তাদরাকে হাকিম, ইমাম আজ-জাহাবী সহীহ্ বলেছেন]

ইমাম কুরতুবী ইমাম মালিক ও অন্যান্য কিছু সংখ্যক আলেম থেকে অনুরুপ মত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بنى آدم شئ من العلائق خوف نزول العين، وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله عز وجل وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله تعالى، فهو كالرقي المباح الذى وردت السنة بإباحته من العين وغيرها.

তাদের মতে সুস্থ অবস্থায় মানুষের দৃষ্টির ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য তাবীজ ঝুলানো যাবে না। তবে সমস্যায় পতিত হওয়ার পর আল্লাহ্ ﷻ এর নাম বা তার কিতাবের কিছু অংশ রোগমুক্তির আশায় ঝুলালে হাদীসে বর্ণিত দোয়ার মাধ্যমে দৃষ্টি লাগা বা অন্য যে কোনো রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করার বিধানের মতো এটা বৈধ। [তাফসীরে কুরতুবী]

যারা দৃষ্টি লাগতে পারে এ ভয়ে কুরআনের তাবীজ ব্যবহার করেছেন এর করাণ সম্ভবত এই যে, মানুষের দৃষ্টি পতিত হয় সুন্দর জিনিসে তাই দৃষ্টিকে প্রতিরোধ করার জন্য অসুন্দর বস্তু ব্যবহার করা হয়। যেমন ক্ষেত-খামারে ভাঙা হাড়ি বা গরুর মাথার খুলি ব্যবহার করা হয়। এ স্থলে কুরআনের তাবিজ ব্যবহার করা বেমানান হয়। এর উত্তরে বলা যায় ভাঙা-হাড়ি বা গরুর খুলি যখন ব্যবহার করা হয় তখন সেগুলোর অসৌন্দর্যের কারণেই এটা করা হয় কিন্তু এক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত যখন ব্যবহার করা হয় তখন এমন উদ্দেশ্য থাকে না বরং আল্লাহর কিতাবের বরকতে মানুষের দৃষ্টি কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এমনটাই মনে করা হয়। যেমন রসুলূল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

আমি আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি প্রতিটি বিষাক্ত প্রাণী হতে এবং ক্ষতিকর দৃষ্টি হতে।

[সহীহ্ বুখারী]

অনেকে মনে করেছেন যেহেতু কেবল রোগে আক্রান্ত হলেই ঔষধ সেবন করা হয় তার পূর্বে নয় তাই তাবীজ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসরণ করা উচিৎ অর্থাৎ রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তাবীজ ব্যবহার না করা উচিৎ। কিন্তু এটা জানা কথা যে, আল্লাহর কালামের বরকতে যেমন রোগ মুক্তি ঘটতে

পারে একইভাবে রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তা প্রতিহত হতে পারে।

এসকল কারণে বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরাম রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে বা পরে দৃষ্টি লাগার কারণে বা অন্য কোন কারণে কুরআনের আয়াত লেখা তাবীজের ব্যবহারে দোষ মনে করেন নি।

ইবনে বাত্তাল ﵀ বলেন,

ولا بأس بتعليق التمائم والخرز التى فيها الدعاء والرقى بكتاب الله عند جميع العلماء؛ لأن ذلك من التعوذ بأسماء الله

দোয়া-কালাম লিখিত তাবিজ ঝুলোনো বা আল্লাহর কিতাব দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা সকল ওলামায়ে কিরামের মতেই বৈধ কেননা এটা মূলত আল্লাহর নাম দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করা। [শারহে বুখারী]

মালেকী মাযহাবের ফিকাহ্ গ্রন্থ 'মুখতাসারে খলীল' এ বলা হয়েছে, (وحرز بساتر وإن لحائض) "এমনকি হায়েজগ্রস্থ মহিলাও কোনো কিছুর ভিতরে আটকিয়ে (কুরআনের) তাবীজ ব্যবহার করতে পারবে।" এর ব্যাখ্যায় আল-খারাশী ﵀ বলেন,

يَعْنِي أَنَّ الْحِرْزَ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ عَلَى الشَّخْصِ وَلَوْ بَالِغًا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا حَامِلًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ جُنُبًا وَكَذَا عَلَى الْبَهِيمَةِ لِعَيْنٍ حَصَلَتْ لَهَا أَوْ لِخَوْفِ حُصُولِهَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْحِرْزُ بِسَاتِرٍ يُكِنُّهُ وَيَقِيهِ مِنْ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ أَذًى

এর অর্থ হলো, এ ধরণের তাবীজ যে কোন নাবালেগ বা প্রাপ্ত বয়ষ্ক, মুসলিম বা কাফির, সুস্থ বা অসুস্থ, গর্ভবতী, হায়েজগ্রস্থ বা নিফাসে আক্রান্ত মহিলা বা জুনুবী ব্যক্তির শরীরে লটকানো যাবে। একইভাবে চতুষ্পদ জন্তুর উপর দৃষ্টি পতিত হলে বা হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তাদের শরীরে এটা লটকানো যাবে যদি এটা কোনো কিছুর অভ্যন্তরে আটকানো থাকে ফলে কোনোভাবে এটার অবমাননা না হয়।

মালেকী মাযহাবের আরেকজন ফকীহ্ আল-কয়রাওয়ানী ﵀ বলেন,

ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن

কুরআন লেখা তাবীজ ঝুলাতে দোষ নেই। [রিসালাতুল কয়রাওয়ানী]

আবুল হাসান আল মালেকী ﵀ এই অংশের ব্যাখ্যায় বলেন,

(وَلَا بَأْسَ بِالْمُعَاذَةِ) وَهِيَ التَّمَائِمُ وَالتَّمَائِمُ الْحُرُوزُ الَّتِي (تُعَلَّقُ) فِي الْعُنُقِ (وَفِيهَا الْقُرْآنُ) وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَرِيضُ وَالصَّحِيحُ وَالْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْبَهَائِمُ بَعْدَ جَعْلِهَا فِيمَا يُكِنُّهَا

তাবীজ ঝুলানোতে কোনো সমস্যা নেই। আর তা হলো কোনো কিছুর মধ্যে কুরআনের আয়াত প্রবেশ করিয়ে তা গলায় ঝুলানো। সুস্থ, অসুস্থ, জুনুবী, হায়েজগ্রস্থ, নিফাস গ্রস্থ, ইত্যাদি সকলের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা বৈধ। জন্তুর ক্ষেত্রেও এটা ব্যবহার করা যাবে। [কিফাইয়াতুত্ ত্বলিব]

হানাফী ফকীহ্ ইবনে আবেদীন ﷬ বলেন,

الَّذِي رَأَيْته فِي الْمُجْتَبَى التَّمِيمَةُ الْمَكْرُوهَةُ مَا كَانَ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ

আমি মুজতাবাতে যা দেখেছি তা হলো, অপছন্দনীয় মাদুলী হচ্ছে কুরআনের তাবীজ ছাড়া অন্য কোনো তাবীজ। [হাশিয়াতু রদ্দিল মুহতার]

শাফেঈ মাযহাবের প্রশিদ্ধ ফিকাহ্ গ্রন্থ আল-মাজমু তে ইমাম আন-নাব্বী ﷬ বলেন,

وروي البيهقى باسناد صحيح عن سعيد بن المسيب انه كان يأمر بتعليق القرآن وقال لا بأس به قال البيهقى هذا كله راجع إلى ما قلنا انه ان رقى بما لا يعرف أو على ما كانت عليه الجاهلية من اضافة العافية إلى الرقى لم يجز وان رقي بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله تعالى متبركا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى فلا بأس به والله تعالى أعلم

বাইহাক্বী সহীহ্ সনদের সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাবীজ হিসেবে কুরআনের আয়াত ঝুলাতে আদেশ করতেন। তিনি বলেছেন এতে কোন সমস্যা নেই। বাইহাক্বী বলেন, পূর্বে ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে আমরা যা বলেছি এ বিষয়ে সে কথাই প্রযোজ্য। অর্থাৎ যদি সে অবোধগম্য ভাষা ব্যবহার করে বা জাহেলী যুগের লোকদের মতো সরাসরি ঝাড়-ফুঁকেই আরোগ্য হয় এমন মনে করে তবে এটা বৈধ হবে না। আর যদি ঝাঁড়-ফুঁক করা হয় আল্লাহর কিতাব দ্বারা বা বোধগম্য যে কোন দোয়া-কালাম দ্বারা এবং বরকতের উদ্দেশ্যে এমনটি করা হয় আর রোগ মুক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকেই হবে এমন মনে করা হয় তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

ইবনে হাযার আল-হাইতামী ﷬ তুহ্ফাতুল মুহতাজে বলেন,

أَمَّا مَا كُتِبَ لِغَيْرِ دِرَاسَةٍ كَالتَّمِيمَةِ ، وَهِيَ وَرَقَةٌ يُكْتَبُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ وَيُعَلَّقُ عَلَى الرَّأْسِ مَثَلًا لِلتَّبَرُّكِ وَالثِّيَابِ الَّتِي يُكْتَبُ عَلَيْهَا وَالدَّرَاهِمِ كَمَا سَيَأْتِي فَلَا يَحْرُمُ مَسُّهَا وَلَا حَمْلُهَا وَتُكْرَهُ كِتَابَةُ الْحُرُوفِ أَيْ مِنْ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيقُهَا إلَّا إذَا جُعِلَ عَلَيْهَا شَمْعٌ أَوْ نَحْوُهُ وَيُسْتَحَبُّ التَّطَهُّرُ لِحَمْلِ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَمَسِّهَا ا هـ

পড়ার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে কুরআনের আয়াত লেখা হলে তা ওযু ছাড়া স্পর্শ বা বহন করা নিষিদ্ধ নয়। যেমন তাবীজ -আর তা হলো, একটি কাগজে কুরআনের কিছু অংশ লিখে তা বরকতের উদ্দেশ্যে মাথা বা অন্য কোন স্থানে ঝুলানো- অথবা কুরআনের আয়াত লেখা কাপড় বা দিরহাম। আর কুরআনের কিছু অংশ লিখে তা ঝুলানো অপছন্দনীয়। তবে যদি তাবীজের মুখে মোম বা অন্য কিছু দিয়ে আটকিয়ে দেয় তাহলে সমস্যা নেই।

ইবনে হাযার আল-আসক্বালানী ﷬ বলেন,

فَأَمَّا مَا فِيهِ ذِكْر اللَّه فَلَا نَهْي فِيهِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُجْعَل لِلتَّبَرُّكِ بِهِ وَالتَّعَوُّذ بِأَسْمَائِهِ وَذِكْره ، وَكَذَلِكَ لَا نَهْي عَمَّا يُعَلَّق لِأَجْلِ الزِّينَة مَا لَمْ يَبْلُغ الْخُيَلَاء أَوْ السَّرَف

যেসব তাবীজের মধ্যে আল্লাহর যিকির থাকে তা নিষিদ্ধ নয়। কেননা এটা ঝুলানো হয় তাবাররুকের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর নাম ও তার যিকিরের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে। একইভাবে কেবলমাত্র সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্য এসব ঝুলানো হলে তাতেও সমস্যা নেই যদি না এর মাধ্যমে অহংকার ও অপচয় করা হয়। [ফাতহুল বারী]

হাম্বালী মাযহাবের ফকীহ্ ইবনে মুফলিহ ﷬ উল্লেখ করেন,

وَيُكْرَهُ تَعْلِيقُ التَّمَائِمِ وَنَحْوِهَا ، وَيُبَاحُ تَعْلِيقُ قِلَادَةٍ فِيهَا قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ غَيْرُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ

মাদুলি ঝুলানো অপছন্দনীয় তবে কুরআন বা অন্য কিছু লিখে ঝুলানো বৈধ। (ইমাম আহমাদ) এ বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন। [আল-ফুরু']

ইবনুল কায়্যিম ﷬ তার শায়েখ ইমাম ইবনে তাইমিয়া থেকে বর্ণনা করেন,

كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته: { وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ } [هود : 88] وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷬ তার কপালে এই আয়াত লিখতেন, "বলা হলো হে মাটি তুমি তোমার পানি শুষে নাও এবং হে আকাশ তুমি বৃষ্টি বর্ষন বন্ধ করো। তখন পানি কমে গেল এবং সব কিছু শেষ হয়ে গেল" [সূরা হুদ/৪৪]। আমি তাকে বলতে শুনেছি আমি এটা বহু লোককে লিখে দিয়েছি ফলে তাদের রোগ মুক্তি হয়েছে। [আত-তিব্ব আন-নাব্বী]

উপরোক্ত উদ্ধৃতির আলোকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, দোয়া-কালাম লিখিত তাবীজ ঝুলানো দোষের কিছু নয়। যে সকল হাদীসের মাধ্যমে সকলপ্রকার তাবীজকে নিষিদ্ধ প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হয় সেগুলোর মাধ্যমে কুরআনের তাবীজ উদ্দেশ্য নয় বরং ঐ সকল তাবীজ উদ্দেশ্য যাতে শিরকী কালাম রয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিষয়টি প্রমাণ করা যায়। যেমন,

ক. রসুলুল্লাহ্ যে সময় এবং যাদের উদ্দেশ্যে উপোরক্ত নিষেধাজ্ঞাগুলো বর্ণনা করেছেন তখন কুরআনের তাবীজের প্রচলন ছিল না বরং জাহিলী ধ্যান ধারনার বশবর্তী হয়ে কিছু পুতি বা কড়ির মাঝে ছিদ্র করে তাতে সুতা ভরে তা গলায় পরিধান করা হতো বা কুফরী কালাম গলায় ঝুলানো হতো এবং উক্ত বস্তুসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোগ প্রতিরোধ করে এমন মনে করা হতো। আরবী অভিধাসমূহতে হাদীসে ব্যবহৃত 'তামীমা' শব্দের এই ব্যাখ্যায় দেওয়া হয়েছে।

লিসানুল আরবে বলা হয়েছে,

التمائم خَرز تُثْقَب ويجعل فيها سُيورٌ وخُيوط تُعلَّق بها

তামিমা হচ্ছে পুতি যাতে ছিদ্র করে সুতা পরিয়ে ঝুলানো হয়।

আল-মাতরাজী رحمه الله বলেন,

قَالَ الْقُتَبِيُّ : وَبَعْضُهُمْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُعَاذَاتِ هِيَ التَّمَائِمُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا التَّمِيمَةُ هِيَ الْخَرَزَةُ وَلَا بَأْسَ بِالْمُعَاذَاتِ إِذَا كُتِبَ فِيهَا الْقُرْآنُ أَوْ أَسْمَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

কেউ কেউ মনে করে হাদীসে তামিমা বলতে তাবীজকেই বোঝানো হয়েছে, এটা সঠিক নয়। বরং নিষিদ্ধ তামিমা হলো পুতি বা কড়ি। কুরআন বা আল্লাহর গুনাবলী সম্বলিত তাবীজে দোষের কিছু নেই।

[আল-মাগরিব]

ইবনে আছীর رحمه الله বলেন,

التمائم جمع تمِيمة وهي خَرَزات كانت العرب تُعلّقها على أولادهم يَتَّقُون بها العين في زعْمهم فأبْطلها الإسلام

তামাইম হলো তামিমা শব্দের বহু বচন আর এগুলো হলো পুতি যা আরবরা তাদের সন্তানদের শরীরে ঝুলিয়ে দিতো। তাদের বিশ্বাস ছিল এর মাধ্যমে দৃষ্টির ক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে। পরে ইসলাম এটাকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করে। [আন-নিহাইয়া]

এর পর তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (من علق تميمة فلا أتم الله له) “ যে কেউ তামিমা ঝুলায় আল্লাহ যেনো তার উদ্দেশ্যকে তামাম (পূর্ণ) না করেন। এ থেকে এমন মনে হয় যে, তারা তামীমার মাধ্যমে পরিপূর্ণ আরোগ্য হয় বলে মনে করতো। এটাকে শিরক বলা হয়েছে কারণ তারা এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর তাকদীরকে রদ করতে চেয়েছিল এবং গয়রুল্লাহর নিকট বিপদ আপদ থেকে রক্ষা প্রার্থনা করেছিল। [আন-নিহাইয়া]

সুতরাং এই সকল হাদীস জাহেলী ধ্যান ধারনা বশত কুফরী কালাম বা আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন কিছু পাথর, পুতি ও অন্যান্য ধাতব পদার্থকে রোগ আরোগ্য করার স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী মনে করে যা কিছু ঝুলানো হয় সেগুলো উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহর নাম ও তার কালাম লেখা তাবীজের উপর এই বিধান প্রয়োগ করা মোটেও সুবিবেচনা হতে পারে না।

খ. হাদীসে তাবীজ-তুমারের মতো ঝাড়-ফুঁককেও শিরক বলা হয়েছে। অন্যান্য হাদীসে আবার আল্লাহর কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ বলা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মাঝে সমন্বয় সাধন করে ওলামায়ে কিরাম মত দিয়েছেন যেখানে ঝাড়-ফুঁককে শিরক বলা হয়েছে সেখানে জাহেলী যুগের শিরকী ঝাড়-ফুঁক উদ্দেশ্য দোয়া-কালামের মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করা নয়। একই কথা তাবীজ-তুমারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে হাদীসে তাবীজকে শিরক বলা হয়েছে সেখানে জাহেলী যুগের তাবীজ উদ্দেশ্য। দোয়া কালাম লিখিত

তাবীজ নয়। যেহেতু শিরক হলো গয়রুল্লাহর প্রতি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ভরসা করা আর আল্লাহর নাম বা তার কালাম লেখা তাবীজ মূলত তারই প্রতি নির্ভর করা, ভিন্ন কিছু নয়। তাই এটাকে কিছুতেই শিরক বলা যেতে পারে না।

ইমাম কুরতুবী ﷺ হাদীসটিতে কুরআনের তাবীজ উদ্দেশ্য নয় এটা বলার পর বলেন, (إذ الاستشفاء بالقرآن معلقا وغير معلق لا يكون شركا) "কেননা কুরআনের মাধ্যমে রোগ মুক্তি লাভ করার চেষ্টা করা শিরক হতে পারে না তা ঝুলিয়ে হোক বা অন্যভাবে হোক। [তাফসীরে কুরতুবী]

এর পর তিনি বলেন,

من علق شيئا وكل إليه " فمن علق القرآن ينبغى أن يتولاه الله ولا يكله إلى غيره، لانه تعالى هو المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن.

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "একজন ব্যক্তি যা ঝুলায় তার দায়-দায়িত্ব তার উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়।" (৫৪) [তিরমিযী] অতএব যে ব্যক্তি কুরআনের তাবীজ ঝুলায় আল্লাহর তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। কেননা কুরআনের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করার চেষ্টা করা হলে তাতে মূলত আল্লাহর উপরই ভরসা করা হয় এবং তার নিকটই প্রার্থনা করা হয়। [তাফসীরে কুরতুবী]

মোট কথা, জাহেলী যুগের ঝাড়-ফুঁকের মতোই তাদের তাবীজ-তুমারও নিষিদ্ধ কিন্তু দোয়া কালাম পাঠ করে ঝাড়-ফুঁক করার মতোই দোয়া-কালাম লেখা তাবীজ পরিধান করা বৈধ। দোয়া-কালাম লেখা তাবীজ কখনও জাহেলী যুগের কুফরী কালাম লেখা তাবীজের মতো হতে পারে না।

আমরা এ মতই পোষণ করি। যারা এটা মেনে নিতে প্রস্তুত নন তাদের বলব, কমপক্ষে এতটুকু তো স্মরণ রাখতে হবে যে, এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে ফলে এর উপর ভিত্তি করে কঠোরতা করা উচিৎ নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউ কেউ তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলে কেবল এই সব ইখতিলাফী মাসয়ালাই আলোচনা করেন। যেন মনে হয় তাবাররুক, তাওয়াস্‌সুল, কবর জিয়ারত, তাবীজ ইত্যাদি ছাড়া তাওহীদ পরিপূর্ণ হয় না। তারা এ বিষয়ে ব্যাপক কঠোরতা করে থাকে এবং এর উপর ভিত্তি করে মানুষকে অপমান অপদস্ত করা এমনকি আক্রমণ পর্যন্ত করে বসে। তারা এ কঠোরতার ব্যাপারে যুক্তি প্রদর্শন করে বলে,

"যদি আমরা কুরআনের তাবীজের অনুমতি দিই তবে অন্যান্য নিষিদ্ধ তাবীজের জন্য পথ খুলে দেওয়া

(৫৪) হাদীসটির সনদে আবু লাইলা নামক যে রাবী রয়েছে মুহাদ্দসীনে কিরাম তাকে সমালোচনা করেছেন।

হবে এবং শিরক কুফরের উদ্ভব ঘটবে। তাই এ পথ বন্ধ করার জন্য কুরআনের তাবীজও নিষিদ্ধ বলা উচিৎ।”

এ বিষয়ে আমাদের কথা হলো, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। কিসের মাধ্যমে কোন জিনিসের পথ খুলে যায় তা তারা বিলক্ষণ জানতেন। তাই সে পথ বন্ধ করে দিয়ে বাকি পথ গুলো খুলে দিয়েছেন। আর যারা কোনটা কিসের পথ সে সম্পর্কে কিছুই জানে না তারা সকল পথ বন্ধ করে মানুষের জীবন যাত্রা অতিষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেন। নিষিদ্ধ তাবীজ হলো তাই যার মধ্যে শিরকী কালাম লিখিত আছে।

আমরা উপরে দেখেছি যে, ওলামায়ে কিরাম দোয়া-কালাম লিখিত তাবীজ বৈধ বলেছেন এবং শিরকী তাবীজ নিষিদ্ধ বলেছেন। একইসাথে শিরক-কুফর থাকতে পারে এই আশঙ্কায় তারা অবোধগম্য ভাষায় লিখিত তাবীজ নিষিদ্ধ করেছেন। গয়রুল্লাহর প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হতে পারে এই আশঙ্কায় তারা দোয়া-কালাম ছাড়াই শুধুমাত্র কিছু পাথর ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ শরীরে ঝুলানো নিষিদ্ধ বলেছেন। এসবই তারা করেছেন শিরকী তাবীজ-তুমারের পথ বন্ধ করার জন্য। একইভাবে তারা শিরকী কালামের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক হতে পারে এ আশঙ্কায় অবোধগম্য ভাষায় ঝাড়-ফুঁক করা নিষিদ্ধ বলেছেন। সেই সাথে এও শর্ত করেছেন যে, রোগের শিফা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে ঝাড়-ফুঁক বা তাবীজ-তুমার থেকে নয় এটা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তারা ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজের ক্ষেত্রে একই পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং একই শর্ত আরোপ করেছেন। যদি এসব শর্তের আলোকে দোয়া-কালাম পাঠ করে ঝাড়-ফুঁক করা শিরকের পথ খুলে না দেয় তবে ঐ একই শর্তের অধীনে তাবীজ ঝুলানোর বৈধতা স্বীকার করলে শিরক-কুফরের পথ খুলে দেওয়া হয় কিভাবে!

এখানে আরো একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। আর তা হলো, “শিরক কুফরের পথ” বলতে কেবল সেই সব বিষয়কে বোঝাবে যা থেকে নিশ্চিতভাবে বা কমপক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিরকের উদ্ভব ঘটে। তা না হলে যে কোন বিষয়কেই শিরকের পথ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। উদাহরণস্বরুপ একশ্রেণীর নাস্তিক আছে যারা মনে করে ডাক্তারের চিকিৎসাই রোগীকে আরোগ্য করে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। এর অর্থ এই নয় যে গোটা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে “শিরক-কুফরের পথ” হিসেবে আখ্যায়িত করে পরিত্যাগ করতে হবে। বর্তমান সমাজে গুটিকয়েক লোকের মাঝে তাবীজ-তুমার বা ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে শিরকী আক্বীদা বিশ্বাস রয়েছে এতটুকুর উপর নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে এগুলোকে শিরকের পথ হিসাবে আখ্যায়িত করে পরিত্যাগ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

তারা বলে, শিরক কুফরের পথ বন্ধ করার জন্য আমরা তাবীজের ব্যাপারে কঠোরতা করে থাকি। কিন্তু তারা এটা লক্ষ্য করে না যে, এ পথ বন্ধ করতে যেয়ে সীমালঙ্ঘন করার কারণে তারা বহু সংখ্যক অনিষ্টের পথ খুলে দিয়েছে। যেমন,

তাবীজের মতো একটি মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ের উপর নির্ভর করে সাধারন মুসলিমদের বিদয়াতী বা ক্ষেত্র বিশেষে মুশরিক হিসেবে আখ্যায়িত করে মুসলিমদের মাঝে বিতর্ক ও বিভেদ সৃষ্টি করা।

শায়েখ আব্দুল্লাহ্ আজ্জাম সূরা তাওবার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সৌদি আরবের বিভিন্ন যুবকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যারা আফগানিস্থানে জিহাদ করা ও সেখানে সম্পদ ব্যয় করার জন্য আগমন করেছিল কিন্তু আফগান মুজাহিদদের হাতে তাবীজ ঝুলতে দেখে তারা বলে, (هؤلاء مشركون لا تدفعوا لهم الزكاة) "এরা তো মুশরিক এদের তোমরা যাকাত দিয়ো না" তারা তাদের সাথে থেকে যুদ্ধ করতেও অস্বীকার করে। তারা বলে, (لأنه جهاد مع المشركين ضد الملحدين) এটা মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

এছাড়া এদের কেউ যখন শোনে বহু সংখ্যক পূর্ববর্তী বরেণ্য ওলামায়ে কিরাম তাবীজ বৈধ বলেছেন এরা তাদের নিন্দা করে। সৌদি আরবের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন সালিহ্ আল-ফাওজান ইমাম শাওকানীর তাওহীদ সম্পর্কিত রিসালাটির দারস শুরু করলে কিছু যুবক বলে, শিরক কুফরের দিকে যারা আহ্বান করে তাদের বইয়ের দারস আমরা শুনবো না।

শায়েখ আব্দুল্লাহ আজ্জাম তার তাফসীরে উল্লেখ করেন; সৌদি আরবে একবার ইমাম নাব্বীর শারহে মুসলিম বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে কিছু লোক সেটা ফেরত দিতে আসে। তারা বলে এই ব্যক্তির আক্বীদা খারাপ।

এরা ইখতিলাফী বিষয়াবলীতে নিজেদের মতামত ছাড়া অন্যা কারো মতকে সম্মান প্রদর্শন করেনা। নিজেদের মতের বিপক্ষে কারো মত পেলেই তাকে বিদয়াতী, ফাসেক বা কাফির পর্যন্ত আখ্যায়িত করে বসে। সে যেই হোক না কেন।

অথচ রসুলুল্লাহ্ ﷺ থেকে স্পষ্ট সুন্নাত বিদ্যমান রয়েছে যে, কোনো ব্যাপারে দ্বিমত সৃষ্টি হলে সে বিষয়ে কাউকে তিরষ্কার না করা। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ ﷺ খন্দকের যুদ্ধের পর তার সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বনু কুরাইজায় না গিয়ে আসরের সলাত আদায় না করে।

কিন্তু পথের মধ্যে আসরের সলাত ফওত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে সাহাবায়ে কিরাম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে একদল বলেন, রসুলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন আমরা তাই করবো। আমরা বনু কুরাইজায় গিয়েই সলাত আদায় করবো। ফলে তারা সূর্য ডুবে যাওয়ার পর বনু কুরাইজায় পৌছে সলাত আদায় করেন। অন্য একদল বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ এর উদ্দেশ্য এমন নয় বরং তার উদ্দেশ্য হলো দ্রুত যাও যাতে আসরের সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই বনু কুরাইজায় পৌছে যেতে পারো। ফলে তারা রাস্তার মধ্যেই আসরের সালাত আদায় করে নেন। হাদীসের শেষে বলা হয়েছে,

فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

পরে রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে একথা বলা হলে তিনি কাউকে তিরষ্কার করেন নি। [সহীহ্ বুখারী]

একারণে সকল মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়াবলীতে এক অপরকে তিরষ্কার করা অবৈধ বলেছেন। ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন,

ثم العلماء انما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا انكار فيه

আলেমরাও কেবলমাত্র যেসব বিষয়ে ইজমা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে মানুষকে নিষেধ করবে কিন্তু যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে সেসব বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা চলে না। [শারহে মুসলিম]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন,

لَيْسَ لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ

একজন ফকীহর উচিৎ নয় সকলকে তার মত মানতে বাধ্য করা। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে করণীয় স্মপর্কে এই স্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বর্তমান যুগে কাউকে কাউকে দেখা যায় এই সীমানা লঙ্ঘন করে এসব বিষয়ে কড়াকড়ি করে থাকেন। আর গর্বভরে দাবী করেন আমরা শিরক-কুফরের রাস্তা বন্ধ করছি। এদের উদ্দেশ্যে আমাদের কথা হলো, শিরক কুফরের রাস্তা কোনগুলো আগে সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। খেয়ালখুশি মতো যে কোন বিষয়কে শিরক-কুফরের রাস্তা হিসেবে আখ্যায়িত করে তা বন্ধ করার চেষ্টা করলে আরো বেশি অনিষ্টের দরজা খুলে যেতে পারে তা স্মরণ রাখতে হবে। কেবল শিরক-কুফরের রাস্তা বন্ধ করার চিন্তায় চৈতন্য হারালে হবে না। যে বিষয় শিরক-কুফর নয় সেটার ব্যাপারে বাড়াবাড়িও যে এক প্রকার বিদয়াত সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। একইভাবে মুসলিমদের কাফির বলাও যে হাদীসের ভাষায় একপ্রকার কুফরী সেটাও স্মরণ রাখতে হবে।

অনেকে বলেন, কুরআনের আয়াত লিখিত তাবীজ ঝুলানো হলে কখনও কখনও কুরআনের অবমাননা হয়ে যেতে পারে যেমন স্ত্রী সহবাসের সময় বা প্রাসাব-পায়খানার সময় তা সাথে রাখা। এ বিষয়ে কথা

হলো, ওলামায়ে কিরাম বিষটির সামাধান দিয়েছেন। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, কুরআনের আয়াত লিখে সেটি তাবীজে ভরে তাবিজের মুখ মোম বা অন্য কিছু দ্বারা ভালভাবে আঁটকে দিতে হবে। এভাবে আবদ্ধ করার পর সেটা পরিধান করে প্রসাব-পায়খানায় প্রবেশ করতে বা স্ত্রী সহবাস করাতে তারা দোষ মনে করেন নি। যেভাবে হাফিজের অন্তরে কুরআন সংরক্ষিত থাকে তবু সে পায়খানায় প্রবেশ করতে পারে এবং স্ত্রী সহবাস করতে পারে। একইভাবে বর্তমানে মোবাইলের মেমোরীতে লিখিত বা অডিও কুরআন ভরে রাখা হয়। কিন্তু তাতে মোবাইল সাথে করে পায়খানায় প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হয় না।

♦ ***দৃষ্টির ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য ক্ষেত-খামারে ভাঙা হাড়ি বা গরু-ছাগলের মাথার খুলি ঝুলিয়ে রাখা।***

আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় গৃহপালিত জন্তুর গলায় বা চাষ ক্ষেতে ভাঙা হাড়ি বা গরু-ছাগলের মাথার খুলি ঝুলিয়ে রাখা হয়। মানুষের দৃষ্টি লাগার ভয়ে এমন করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে যুক্তি হলো, সুন্দর জিনিস দেখলে মানুষের চোখ পড়ে। হিংসুকের অন্তর হিংসায় জ্বলে ওঠে। ফলে তার কুদৃষ্টির প্রভাবে উক্ত জিনিসের ক্ষতি হয়। একারণে সুন্দর জিনিসের পাশে অসুন্দর জিনিস রাখা হয় যাতে সবার আগে সেটির উপর দৃষ্টি পড়ে এবং কুদৃষ্টির প্রভাব থেকে সুন্দর জিনিসটিকে মুক্ত রাখা যায়।

এ প্রসঙ্গে কথা হলো, দৃষ্টির কুপ্রভাব এবং তার কারণে যে ক্ষতি সাধিত হতে পারে তা বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (العين حق) "চোখ লাগা সত্য বিষয়" [বুখারী ও মুসলিম] দৃষ্টি যে সুন্দর বস্তুর প্রতিই পড়ে সেটিও হাদীস দ্বারা প্রমানিত। একটি হাদীসে এসেছে, একজন ব্যক্তি অন্য আরেকজন ব্যক্তিকে গোসল করতে দেখে বলল, তোমার মতো সুন্দর কাউকে আমি দেখিনি। এমনকি কোনো মেয়েকেও নয়। এটা শোনার পরই উক্ত ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এটা শুনে রসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,

عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ

তোমাদের একজন আরেকজনকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় কেনো! যদি কেউ অন্য কারো সুন্দর কিছু দেখে তবে যেনো আল্লাহর নিকট কল্যাণের দোয়া করে। [৫৫] [ইবনে মাযা]

এই হাদীস প্রমাণ করে, সুন্দর জিনিসের প্রতি কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তাতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে লক্ষ্য রেখে হিংসুকের দৃষ্টি পড়বে এই ভয়ে যদি কেউ দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিষয়সমূহ যথাসম্ভব গোপন রাখতে চায় তবে তা দোষের হতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় অনেক জিনিস পুরোপুরি

---

[৫৫] শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [সহীহু ইবনে মাযা/২৮২৮]

পর্দার আড়ালে রাখা সম্ভব হয় না যেমন ক্ষেত-খামার, গৃহপালিত জন্তু ইত্যাদি। এ সমস্যার সামাধানকল্পে কেউ কেউ এসব জিনিসের সাথে কিছু অসুন্দর জিনিস ঝুলিয়ে রাখে যাতে উক্ত বস্তুর সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায় এবং তা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। এ বিষয়টিকে শিরক-কুফর হিসেবে আখ্যয়িত করা যায় না বরং এটি একটি স্বাভাবিক বুদ্ধির বিষয় যেটা তাদের অন্তরে উদিত হয়েছে। যেভাবে ইয়া'কুব عليه السلام এর অন্তরে নিজ সন্তানদের কু-দৃষ্টি থেকে হেফাজত করার একটি পদ্ধতি উদিত হয়েছিল। খাদ্য সরবরাহ করার জন্য যখন তার এগারোটি পুত্র সন্তান মিশরে গমণ করে তখন তিনি তাদের একই দরজা দিয়ে একত্রে মিশরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। তাদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বলেন। [৫৬]

তৎকালীন সময়ে পুত্র সন্তান সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ বলে গণ্য হতো। কুরআনে বলা হয়েছে, (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) "সম্পদ ও সন্তান দুনিয়ার জীবনের আকর্ষণীয় বিষয়" [কাহফ/৪৬] বিশেষ করে কারো অধিক সংখ্যক পুত্র সন্তান থাকলে সেটা তার ক্ষমতা ও সম্মান বৃদ্ধি হিসেবে গণ্য হতো। একারণে এগারোজন পুত্র সন্তান একত্রে কারো দৃষ্টিতে পড়লে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং কু-দৃষ্টির প্রভাবে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় ইয়াকুব عليه السلام তাদের একই দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে আদেশ করেন।

ইমাম কুরতুবী رحمه الله তার তাফসীরে বলেন,

لما عزموا على الخروج خشي عليهم العين، فأمرهم ألا يدخلوا مصر من باب واحد، وكانت مصر لها أربعة أبواب، وإنما خاف عليهم العين لكونهم أحد عشر رجلا لرجل واحد، وكانوا أهل جمال وكمال وبسطة، قاله ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم

যখন তারা (মিশরের উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করল, ইয়াকুব عليه السلام তাদের একই দরজা দিয়ে মিশরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। তখন মিশরের চারটি দরজা ছিল। তিনি তাদের উপর কু-দৃষ্টির ভয় করছিলেন যেহেতু একই পিতার ঔরসে তারা ছিল এগারোটি পুত্র সন্তান। তাছাড়া তারা ছিল সুন্দর ও সহজ সরল প্রকৃতির। ইবনে আব্বাস, দাহ্হাক, কাতাদা ও অন্যান্যরা এ কথা বলেছেন।

ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে কাছির ও অন্যান্য মুফাস্সিরীনে কিরাম অনরুপ মত বর্ণনা করেছেন।

ইয়া'কুব عليه السلام এর এ কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ سبحانه وتعالى বলেন,

{وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ}

---

[৫৬] সূরা ইউসুফ/৬৮

﴾ তাদের পিতা তাদের যে স্থান দিয়ে প্রবেশ করতে বলেছিল তারা তাই করলো তবে এটা তাদের আল্লাহর তাক্বদীর থেকে রক্ষা করতে পারে নি। বিষয়টি ইয়াকুব এর অন্তরে উদিত হয়েছিল মাত্র তিনি তো জ্ঞানী ছিলেন যেহেতু আমি তাকে জ্ঞান দান করেছিলাম। ﴿ [ইউসুফ/৬৮]

অর্থাৎ ইয়াকুব ﷺ তার সন্তানদের দৃষ্টির কুপ্রভাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী পরামর্শ দিয়েছেন। তবে সেই সাথে তিনি তাকদীরের উপর ভরসাও করেছেন। এটাই জ্ঞানের পরিচয়। মানুষ নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী যা কিছু পথ পন্থা অবলম্বন করে তা কখনও আল্লাহর তাক্বদীরকে রদ করতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী ব্যাবস্থা অবলম্বন করবে না। বরং সে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী ব্যাবস্থা গ্রহণ করবে কিন্তু তার উপর চুড়ান্তভাবে নির্ভর করবে না। বরং আল্লাহর উপর ভরসা করবে।

এই ঘটনা প্রমান করে কুদৃষ্টির প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা দোষের কিছু নয়।

এ বিষয়ে হাদীসে বর্ণিত আছে।

أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالجماجم أن تنصب في الزرع من أجل العين

রসুলুল্লাহ ﷺ দৃষ্টির ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য চাষ-ক্ষেতে (গরু ছাগলের) মাথার খুলি লাঠির উপর রেখে তা পুতে রাখতে আদেশ করেছেন।

বাইহাকী, বাজ্জার প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মাযমায়ে যাওয়ায়েদে হাইছামী বলেন, এই হাদীসের রাবী হাইছাম ইবনে মুহাম্মাদ এবং ইয়া'কুব ইবনে মুহাম্মাদ দূর্বল।

ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া থেকে ইবনে আবেদীন রদ্দুল মুহতারের টিকায় উল্লেখ করেন,

لَا بَأْسَ بِوَضْعِ الْجَمَاجِمِ فِي الزَّرْعِ وَالْمَبْطَخَةِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْعَيْنِ ، لِأَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تُصِيبُ الْمَالَ ، وَالْآدَمِيَّ وَالْحَيَوَانَ وَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي ذَلِكَ عُرِفَ بِالْآثَارِ فَإِذَا نَظَرَ النَّاظِرُ إلَى الزَّرْعِ يَقَعُ نَظَرُهُ أَوَّلًا عَلَى الْجَمَاجِمِ ، لِارْتِفَاعِهَا فَنَظَرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْحَرْثِ لَا يَضُرُّهُ

শস্যক্ষেতে বা সব্জি ক্ষেতে দৃষ্টির কু প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য (গরু-ছাগলের) মাথার খুলি ঝুলাতে দোষ নেই। কেননা ধন সম্পদ, মানুষ, পশু ইত্যাদি সব কিছুতেই দৃষ্টি লাগে। দৃষ্টির কৃ-প্রভাব সেগুলোতে লক্ষ করা যায়। খুলি ঝুলিয়ে রাখলে প্রথমেই সেদিকে দৃষ্টি যাবে যেহেতু তা উঁচু করে রাখা হবে। এরপর ক্ষেতের দিকে দৃষ্টি পড়লে তাতে কোন সমস্যা হবে না।

মোট কথা, দৃষ্টির কুপ্রভাবের বিষয়টি যেহেতু সত্য এবং কোনো কিছুর সৌন্দর্য কারো দৃষ্টি আকর্ষণ

করলেই দৃষ্টির প্রভাব পড়ে এটিও প্রমাণিত অতএব, যাতে দৃষ্টি আকর্ষিত না হয় যে কোন বৈধ পন্থায় সে ব্যবস্থা করাতে কোনো দোষ নেই। যারা একটি সুন্দর জিনিসের পাশে অন্য একটি অসুন্দর বস্তু রাখলে সুন্দর জিনিসটির সৌন্দর্যে ঘাটতি পড়বে ফলে মানুষের দৃষ্টি আকির্ষত হবে না এমন মনে করে এসব বস্তু ঝুলায় তাদের এ কাজকে শিরক-কুফর বা নিষিদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করার যৌক্তিক কোন কারণ নেই। কেউ কেউ বলতে পারেন সুন্দর জিনিসের পাশে অসুন্দর বস্তু রাখলে তাতে সুন্দর জিনিসটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় এবং তা পূর্বের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তাদের এ কথাও সম্ভবত কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক। কিন্তু এ কারণে মুল বিষয়টি নিষিদ্ধ কাজে পরিনত হবে না বরং যার যা বুঝ অনুযায়ী কাজ করবে এতে প্রত্যেকের স্বাধীনতা রয়েছে।

এখানে অবশ্যই একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। সুন্দর জিনিসকে অসুন্দর করার মাধ্যমে দৃষ্টির কু-প্রভাব থেকে বাঁচার ইচ্ছায় মানুষ বা প্রাণীর অঙ্গহানী ঘটানো যাবে না। যেমন নাক-কানে ছিদ্র করা ইত্যাদি। এটা নিষিদ্ধ। শয়তান বলেছিল,

{وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}

﴾ আমি তাদের আদেশ করবো ফলে তারা গৃহপালিত জীব-জন্তুর কান কর্তন করবে এবং আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করবে। ﴿ [নিসা/১১৯]

অর্থাৎ কুদৃষ্টির প্রভাব থেকে বেঁচে থাকার নামে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করা যাবে না।

২.ক.(৫) উপসংহার

উপরের আলোচনাতে ইবাদত শব্দের অর্থ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমরা যেটা বলতে চেয়েছি তা হলো ঈমান ভঙ্গের চারটি মূলনীতি রয়েছে। গয়রুল্লাহর ইবাদত তার মধ্যে একটি। গয়রুল্লাহর ইবাদত বলতে বোঝায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করা তথা তার উপর রুবুবিয়্যাতের ক্ষমতা আরোপ করা এবং তার নিকট মঙ্গল অমঙ্গলের ব্যাপারে প্রার্থনা করা। এ প্রসঙ্গে আমরা খুবই স্পষ্ট করে বলেছি যে, কারো অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করা এবং তার নিকট প্রার্থনা করা ছাড়া তার ইবাদত করা সম্ভব নয়। প্রার্থনার উদ্দেশ্যে যাই করা হোক তাই ইবাদত যদিও তা নাচ গানের মতো নিকৃষ্ট কর্ম হয়। বিপরীত দিকে প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছাড়া রুকু-সাজদা বা অন্য যা কিছুই করা হোক তা প্রকৃত অর্থে ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। ক্ষেত্র বিশেষে এগুলো কুফরী হতে পারে যদি ঈমান ভঙ্গের অন্যান্য মূলনীতির আলোকে সেগুলো কুফরী প্রমাণিত হয়। যেমন মূর্তির সামনে যে সাজদা করে সে কাফির হবে। সে মূর্তির ক্ষমতায় বিশ্বাস করুক বা না করুক এবং

মূর্তির নিকট প্রার্থনা করুক বা না করুক। কারণ এ কাজটি শিরক-কুফরের প্রতীক হিসেবে গণ্য এবং এতে লিপ্ত হওয়া কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা হিসেবে গণ্য। যা ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণ। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে আর বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে ইনশা-আল্লাহ।

অতএব ঈমান ভঙ্গের প্রথম কারণ গয়রুল্লাহর ইবাদত বলতে আমরা কেবল বুঝবো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাস করে তার নিকট এমন কিছু প্রার্থনা করা যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দিতে সক্ষম নয়। এটা ছাড়া আনুগত্য, হুকুম-আহকাম, বিধি-বিধান, ভয়-ভরসা বা ভালাবাসা ইত্যাদি কোনো কিছুর সাথে ইবাদত শব্দটিকে সম্পৃক্ত করে এর প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করা যাবে না।

তবে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, গয়রুল্লাহর ইবাদত ছাড়াও আরো তিনটি মূলনীতির আলোকে কোনো কথা-বা কাজ কুফরী হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। অতএব কোনো কিছুকে ইবাদত হিসাবে আখ্যায়িত না করলেও সেটা ক্ষেত্র বিশেষে কুফরী হতে পারে যেমনটি আমরা পরবর্তী মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করবো ইনশা-আল্লাহ।

প্রতিটি মূলনীতি সম্পর্কে আমাদের পৃথকভাবে জানতে হবে। প্রতিটি বিষয়কে সঠিক মূলনীতির আলোকে জেনে নিলে সব কিছুই আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর একটি বিষয়কে অন্য আরেকটি বিষয়ের সঙ্গে জুড়ে দিলে প্রতিটি বিষয়ই অস্পষ্ট হয়ে যাবে। আর আল্লাহই তৌফিকদাতা।

ইবাদত সম্পর্কিত আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করে আমরা এখন ঈমান ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

২.(খ) ঈমান ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ “আল-ইনকার” (الانكار) তথা আল্লাহর দ্বীনের কোনো অংশকে বা অপছন্দ করা।

আরবী ইনকার (انكار) শব্দের অর্থ অস্বীকার বা অপছন্দ করা। কুরআন-হাদীস এবং উম্মতের ইজমার আলোকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহর দ্বীনের যে কোন অংশকে অস্বীকার করা বা অপছন্দ করা কুফরী।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

যারা অস্বীকার করে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা দোজখের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। [বাকারা/৩৯]

{بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ}

কাফিররা তো আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। [ইনশিকাক]

কাফিরদের সংজ্ঞায়ন করে আল্লাহ বলেন,

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}

ঐ সকল আহলে কিতাবীদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তার যা হারাম করেছেন তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করে না এবং সত্য দ্বীনকে গ্রহণ করে না। যতক্ষণ না তারা অপমানিত অবস্থায় স্বহস্তে জিজিয়া কর প্রদান করে। [সূরা তাওবা/২৯]

এই আয়াতটিতে কাফিরদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং এসব বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে থাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর অস্তিত্ব, কিয়ামত দিবস, হালাল-হারাম ইত্যাদি আক্বীদা বিশ্বাস ও বিধি-বিধান অস্বীকার করাকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরবী رحمه الله বলেন,

بَيَانُ أَنَّ فُرُوعَ الشَّرِيعَةِ كَأُصُولِهَا وَأَحْكَامَهَا كَعَقَائِدِهَا

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, (আল্লাহর অস্তিত্ব, কিয়ামত দিবস ইত্যাদি) শরীয়তের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস সমূহ এবং শরীয়তের শাখা প্রশাখা সমূহ (হালাল হারামের বিধি-বিধান) সমান গুরুত্ববহ।

[আহ্কামুল কুরাআন]

অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব, কিয়ামত দিবস ইত্যাদি আক্বীদা-বিশ্বাস অস্বীকার করা যেমন কুফরী একইভাবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান তথা হালাল-হারামকে অস্বীকার করাও কুফরী।

এরপর তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন,

فَإِذَا أَنْكَرَ أَحَدُ الرُّسُلَ أَوْ كَذَّبَهُمْ فِيمَا يُخْبِرُونَ عَنْهُ مِنْ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ ، وَالْأَوَامِرِ وَالنَّدْبِ ، فَهُوَ كَافِرٌ

অতএব যদি কেউ কোনো একজন রসুলকে অস্বীকার করে বা হালাল-হারাম, ফরজ-নফল ইত্যাদি যা কিছু তারা বর্ণনা করেন তার কোনো কিছুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে সে কাফির। [আহ্কামুল কুরআন]

অতএব, মুমিন হতে হলে আল্লাহ তার রসুললের উপর যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তার সম্পূর্ণ অংশকে মেনে নিতে হবে। এর কোনো একটি অংশকে অস্বীকার করলেই তা কুফরী বলে গণ্য হবে।

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ}

তারা মুহাম্মদের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

[সূরা মুহাম্মাদ/২]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِى وَبِمَا جِئْتُ بِهِ

আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দেয়, ‘‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই’’ আর আমার উপর ও আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

[সহীহ মুসলিম]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাব্বী রহ. বলেন,

ولا بد مع هذا من الايمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه و سلم كما جاء فى الرواية الأخرى لأبى هريرة هي مذكورة فى الكتاب حتى يشهدوا أن لااله الا الله ويؤمنوا بى وبماجئت به

কালেমার স্বাক্ষ্য দেওয়া এবং সলাত ও যাকাতকে স্বীকার করে নেওয়ার সাথে সাথে রসুলূল্লাহ্ ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সব কিছুকে মেনে নিতে হবে। যেমনটি আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত ভিন্ন একটি হাদীসে এসেছে যে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে) যতক্ষণ না তারা ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’’ বলে এবং আমার উপর ঈমান আনে আর আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর ঈমান আনে।

[শারহে মুসলিম]

সুতরাং এই হাদীসেও একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রসুল যা কিছু বলেছেন বা যেসব বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন তার সবটুকু স্বীকার করে না নেওয়া পর্যন্ত কেউ মুমিন হবে না।

আল্লাহ্ ﷻ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন,

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে যা কিছু বিবাদ ঘটে তার বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ করে এবং আপনি যে বিচার করেন তা মেনে নিতে তাদের অন্তরে সামান্যও দ্বিধা হয় না বরং পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে মেনে নেয়। [নিসা/৬৫]

কাজি ইয়াদ রহ. বলেন, (وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ الْقُرْآنَ أَوْ حَرَفًا مِنْهُ) ‘‘একইভাবে (কাফির হবে) যদি কেউ

কোরআনের একটি অক্ষরও অস্বীকার করে। [আশ-শিফা]

তিনি আরও বলেন,

وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى تَكْفِيرِ كُلِّ مَنْ اِسْتَحَلَّ الْقَتْلَ أَوْ شُرْبَ الْخَمْرِ أَوْ الزِّنَا مِمَّا حَرَّمَ اللهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيْمِهِ

যদি কেউ হত্যা করা, মদ পান করা, জিনা করা বা অন্য যা কিছুকে আল্লাহ ﷻ হারাম করেছেন তা জানার পরও হালাল মনে করে সে কাফির হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়েছে। [আশ শিফা]

ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِيْ كُلِّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَيْهِ مِنْ أُمُوْرِ الدِّيْنِ اِذَا كَانَ عِلْمُهُ مُنْتَشِرًا كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَتَحْرِيْمِ الزِّنِي وَالْخَمْرِ وَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ اِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلًا حَدِيْثَ عَهْدٍ بِالْاِسْلَامِ وَلاَ يَعْرِفَ حُدُوْدَهُ فَإِنَّهُ اِذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْهَا جَهْلًا بِهِ لَمْ يُكَفَّرْ

একই ভাবে (কাফির হবে) যে কেউ ইসলামের এমন কোনো বিষয় অস্বীকার করে যার উপর উম্মতের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে এবং বিষয়টি যথেষ্ট প্রচার প্রসারও হয়েছে, যেমন: পাচ ওয়াক্ত সলাত, রমজানের সওম, স্ত্রী সহবাসের পর গোসল ফরজ হওয়া, জিনা, মদ, মুহরিমা মহিলাকে বিবাহ করা ইত্যাদি বিষয় হারাম হওয়া। তবে যদি কোনো ব্যক্তি সবে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করে থাকে এবং ইসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে না জেনে থাকে তবে সে মূর্খতাবশত এসব বিষয় অস্বীকার করলে তাকে কাফির বলা হবে না। [শারহে মুসিলম]

কুফরীর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম আল-বাইদাবী ﵀ বলেন,

وفي الشرع إنكار ما علم بالضرورة مجيئ الرسول صلى الله عليه و سلم به

শরীয়তে কুফরী বলতে বোঝায় আল্লাহর রসুল ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন বলে নিশ্চিত জানা গেছে তার কোনো কিছু অস্বীকার করা। [তাফসীরুল বায়দাবী]

মোট কথা আল্লাহ ﷻ যা নাযিল করেছেন এবং রসুল ﷺ যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন তার কোনো কিছুকে অস্বীকার করা কুফরী। তা মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক বা শাখা-প্রশাখাগত আমল-আখলাক ও বিধি-বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক। এ বিষয়ে ওলামা ও তলাবা তো বটেই এমনকি সাধারন মুসলিমরাও অজ্ঞ নয়। কিন্তু বর্তমানে এর সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে কোনো একটি বিষয়কে অস্বীকার হিসেবে গণ্য করা বা না করা সম্পর্কে অনেক সময় ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা যা। নিম্মোক্ত আলোচনাতে আমরা সেকল বিষয়সমূহের সুস্পষ্ট সমাধান বর্ণনা করার চেষ্টা করবো ইনশা-আল্লাহ।

২.খ.(১) ‘ইনকার’ (اَلْإِنْكَارُ) বলতে তিনটি বিষয়কে বোঝায়?

আরবী শব্দ ইনকার ব্যাপক অর্থবহ।

মৌলিকভাবে এটার অর্থ হলো কোনো কিছু কারো নিকট অচেনা হওয়া।

আল্লাহ বলেন, (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) “তারা কি তাদের রসুলকে চিনতে পারেনি, যার ফলে তার সম্পর্কে অজ্ঞ রয়েছে?

হাদিসে বলা হয়েছে, (سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ) “অদূর ভবিষ্যতে কিছু রাজা-বাদশা হবে যাদের কিছু কাজ তোমরা চিনতে পারবে আর কিছু কাজ তোমাদের নিকট অপরিচিত মনে হবে। [সহীহ্ মুসলিম]

এখনে “ইনকার” শব্দটি কারো সম্পর্কে পরিচয় না থাকা বা তার ব্যাপারে অজ্ঞ থাকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

সাধারনত মানুষ অপরিচিত ও অজনা বিষয়কে অস্বীকার করে এবং তার প্রতি মানুষের এক প্রকার স্বাভাবিক ভীতি থাকে ফলে সেটা থেকে সে দূরে থাকে অর্থাৎ সেটাকে অপছন্দ করে একারণে ‘ইনকার’ শব্দটি অস্বীকার ও অপছন্দ অর্থে ব্যাবহৃত হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ}

❮ তিনি তোমাদের স্বীয় নির্দশসমূহ দেখাবেন। অতএব, তোমরা আল্লাহর কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? ❯ [মুমিন/৮১]

{فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ}

❮ যারা ঈমান আনে না আসলে তাদের অন্তর (আল্লাহর দ্বীনকে) অপছন্দ করে এবং তারা অহংকার করে। ❯ [নাহল:২২]

এসকল আয়াতে **‘ইনকার’** শব্দটি অস্বীকার করা এবং অপছন্দ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মানুষ যে বিষয়টিকে অপছন্দ করে সেটাকে পরিবর্তনের চেষ্টা করে আর যেটা পরিবর্তন করা হয় সেটা অচেনা হয়ে যায় এই দৃষ্টি কোন থেকে ইনকার শব্দটি পরিবর্তন করা বা পরিবর্তিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যেমন সুলাইমান عليه السلام তার সেনাবাহিনীকে বললেন, (نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا) “তার (বিলকিসের) সিংসহাসনটি

পরিবর্তন করে দাও'' [নামল:৪১] অর্থাৎ সেটার বর্তমান রুপ পবির্তন করে এমন একটি রুপ দাও যাতে তার নিকট অপরিচিত মনে হয়। হানজালা ﵁ বললেন- ''হে আল্লাহর রসুল, আপনার নিকট যখন থাকি তখন জান্নাত জাহান্নামের কথা বিশেষভাবে স্মরণ হয় কিন্তু যখন বাড়িতে স্ত্রী পুত্রের নিকট থাকি তখন আমরা নিজেদের চিনতে পারি না।'' অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন অনুভব করি।

এটা গেল ইনকার শব্দের শাব্দিক ব্যাখ্যা। আর কুফরীর সংজ্ঞায় যখন 'ইনকার' শব্দ প্রয়োগ করা হয় তখন তার অর্থ হয়-

(১) আল্লাহর বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট জানার পরও গোড়ামী বশত অস্বীকার করা। অর্থাৎ সেটা আল্লাহর বিধান হিসেবে মেনে না নেওয়া।

(২) আল্লাহর বিধানকে কোনোভাবে ত্রুটিপূর্ণ আখ্যায়িত করা ও অপছন্দ করা।

(৩) আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে ভিন্ন কোনো বিধানকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করা।

সুতরাং ইনকার বলতে আমরা এই তিনটি বিষয়কে বুঝবো। নিম্নে এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটির উপর পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

⇒ ১. আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা বা তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কোনো আক্বীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধান তার পক্ষ থেকে এসেছে বলে মেনে না নেওয়া।

কেউ যদি স্বয়ং আল্লাহকেই অস্বীকার করে তবে সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে।

যদি কেউ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তার কোনো একজন রসুলকে বা তার নাযিল করা কোনো বিধি-বিধান অস্বীকার করে তবে এটাও কুফরী হিসেবে গণ্য হবে।

যেমন কেউ হয়তো বলল, আল্লাহ্ নামায-রোজা ফরজ করেন নি অথবা মদ, জিনা হারাম করেন নি ইত্যাদি।

এ বিষয়টি দুরকম হতে পারে।

♦ *(ক) সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্ব, রসুলের রেসালাত ও আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করা।*

আল্লাহকে স্বীকার করার পরও তার কোনো একজন রসুলকে বা উক্ত রসুলের উপর অবতীর্ণ কিতাবকে মেনে না নেওয়া। যেমন, একদল কাফির তাদের রসুলদের উদ্দেশ্যে বলেছিল,

{قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ }

﴾ তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ আর দয়াময় আল্লাহ কিছুই নাযিল করেন নি। তোমরা তো মিথ্যা কথা বলছো। ﴿ [ইয়াসীন/১৫]

এই সম্প্রদায় আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসুলকে এবং তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবকে অস্বীকার করেছে। একই কাজ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা করেছিল। তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো এবং তাদের মধ্যে একটি অংশ রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত মুমিন হিসেবেই পরিগণিত ছিল। কিন্তু রসুলূল্লাহ্ ﷺ এর আগমণের পর যারা তাকে আল্লাহর রসুল হিসেবে এবং তার উপর নাযিল হওয়া কিতাব আল-কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মেনে নিতে পারে নি তারা সকলে কাফির হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}

﴾ যারা আল্লাহ্ ও তার রসুলদের অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তার রসুলদের মাঝে পার্থক্য করার ইচ্ছায় বলে, আমরা কারো কারো উপর ঈমান রাখি আর কারো উপর রাখি না। এরা মাধ্যপন্থী কোনো পথ তালাশ করে। এরাই প্রকৃত কাফির আর কাফিরদের জন্য রাখা হয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। ﴿

[নিসা:১৫০,১৫১]

এই আয়াতে আল্লাহ ও তার রসুলদের মধ্যে পার্থক্য করা বলতে বোঝানো হয়েছে আল্লাহর উপর ঈমান আনা কিন্তু রসুলদের অস্বীকার করা। আর এই বিষয়টি আল্লাহকে অস্বীকার করা বলেই গণ্য যেহেতু রসুল তিনিই প্রেরণ করেছেন। তাই রসুলকে অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহকেই অস্বীকার করা। একারণে প্রথমেই বলেছেন "যারা আল্লাহ ও তার রসুলদের অস্বীকার করে" অর্থাৎ তারা আল্লাহকে স্বীকার করলেও রসুলদের মধ্যে যে কাউকে অস্বীকার করে ফলে মুলত তারা আল্লাহকেই অস্বীকার করে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

{فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ}

﴾ তারা (কেবল) আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না বরং এরা তো আসলে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে। ﴿ [আনয়াম/৩৩]

পরবর্তীতে আল্লাহ ﷻ বলেন, "ওরাই হলো প্রকৃত কাফির" অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাবী করার পরও যারা কোনো একজন রাসুলকে অস্বীকার করে তাদের এই ঈমানের কোনো মুল্য নেই বরং

যারা আল্লাহ-রাসুল বা কোরআন-হাদীস কিছুই মানে না এরাও তাদের মতোই পরিপূর্ণ কাফির। কারণ এরা সরাসরি আল্লাহকে অস্বীকার করেনি কিন্তু আল্লাহর প্রেরিত রাসুলগণের কোনো একজনকে বা তাদের উপর অবতীর্ণ শরীয়তের কোনো একটি অংশ অস্বীকার করা মূলত আল্লাহকেই অস্বীকার করা।

কুরতুবী, বায়দাবী, জালালাইন ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এসব কথা উল্লেখিত আছে।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ; এই উম্মতের যে কেউ সে ইয়াহুদী হোক বা নাসারা হোক আমার নাম শোনার পরও আমি যা নিয়ে এসেছি তার উপর ঈমান আনয়ন না করে মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামী হবে। [সহীহ্ মুসলিম]

যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে রসুল হিসেবে স্বীকার করেনা এবং আল্লাহর কিতাব মহা গ্রন্থ আল-কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে গ্রহণ করেনা সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। একইভাবে যদি কেউ আল-কুরআনের কোনো একটি অংশ অস্বীকার করে সেও কাফির হবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ}

﴾ তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস করো আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস করো? যে কেউ এমনটি করে তার প্রতিদান এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তাকে দুনিয়ার জীবনে অপদস্ত করা হবে আর আখিরাতে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিন শাস্তির দিকে। ﴿ [বাকারা/৮৫]

কাজি ইয়াদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, (وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَالْقُرْآنَ أَوْ حَرَفًا مِنْهُ) "একইভাবে (কাফির হবে) যদি কেউ কোরআনের একটি অক্ষরও অস্বীকার করে। [আশ-শিফা]

মোল্লাহ্ আলী ক্বারী আল-হানাফী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ أَظْهَرَ إِنْكَارَ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ فَبِهَا وَإِلاَّ قُتِلَ كَافِرًا مُرْتَدًّا

এ বিষয়ে মুসলিমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই যে, একজন ব্যক্তি যদি অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো

প্রকাশ্য ফরজ কাজ অস্বীকার করে বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো হারাম কাজকে হারাম হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে তাকে তাওবা করতে বলা হবে, যদি সে তওবা না করে তবে তাকে কাফির ও মুরতাদ অবস্থায় হত্যা করা হবে। [শারহে ফিকহে আকবার/২৪২]

এই শ্রেণীর লোকেরা সরাসরি আল্লাহকে অস্বীকার না করলেও কোনো একজন রসুলকে বা কোনো একটি আসমানী কিতাবের সম্পূর্ণ অংশ বা কিছু অংশ সরাসরি অস্বীকার করে থাকে। এরা স্পষ্টভাষায় আল্লাহর রসুলদের যে কাউকে বা আল্লাহর কিতাবের কোনো একটি অংশকে অস্বীকার করে। বিধায় এরা যে স্পষ্ট কাফির সে বিষয়ে সাধারন মুসলিমদের অন্তরেও কোনোরুপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং এদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সামন্যও অস্পষ্টতা বা জটিলতার স্থান নেই। যারা সরাসরি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাদের কুফরীর বিষয়টি আরো স্পষ্ট। এই শ্রেণীর লোকদের কুফরী সম্পর্কে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই বিধায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

এখন আরেক শ্রেণীর কাফিরদের আলোচনা করা হবে যাদের অবস্থা কিছুটা ব্যতিক্রম।

♦ *(খ) আল্লাহর বিধানের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করা।*

এরা ঐ শ্রেণীর লোক যারা স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ, রসুল এবং কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপণের স্বাক্ষ্য দেয়। এরা মুহাম্মাদ ﷺ কে আল্লাহর রসুল এবং আল-কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে স্বীকার করে। আল-কুরআনের প্রতিটি আয়াত আর রসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রতিটি নির্দেশকে আবশ্যকভাবে পালনীয় মনে করে। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে কুরআনের কোনো একটি আয়াত বা রসুল ﷺ এর কোনো একটি হাদীসকে নিজেদের ইচ্ছামতো ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করার মাধ্যমে বিকৃত মতাদর্শের উদ্ভব ঘটায়।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর ওফাতের পর আবু বকর রضي الله عنه খলীফা হলে একদল লোক যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা যাকাতের বিধানকে সরাসরি অস্বীকার করতো না বরং তারা বলতো, রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর মৃত্যুর পর অন্য কেউ যাকাত আদায় করতে পারবে না। তাদের যুক্তি ছিল, আল্লাহ্ سبحانه وتعالى বলেছেন,

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}

আপনি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যার মাধ্যমে আপনি তাদের পবিত্র করবেন। আর তাদের জন্য দোয়া করুন। আপনার দোয়া তাদের জন্য রহমত সরুপ। [তাওবা/১০৩]

তাদের দাবী ছিল, যাকাত গ্রহণের বিষয়টি রসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্য খাস। যেহেতু এখানে বিশেষভাবে রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে যাকাত গ্রহণ করতে আদেশ করা হচ্ছে এবং বিনিময়ে দোয়া করতে বলা হচ্ছে আর

বলা হচ্ছে আপনার দোয়া তাদের জন্য রহমত স্বরুপ। যেহেতু এই সকল বৈশিষ্ট্য অন্য কারো নেই অতএব, তিনি ছাড়া আর কারো নিকট যাকাত আদায় করা আবশ্যক নয়। [৫৭]

বর্তমানে কাদিয়ানীরা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করে না বরং মীর্জা গোলাম আহমেদ কাদিয়ানীকে নবী মনে করে। যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, (وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ) "তিনি শেষ নবী" আর রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ) "আমি শেষ নবী আমার পরে কোনো নবী নেই।"

তখন তারা বলে, এখানে বলা হয়েছে শেষ নবী, শেষ রসুল তো বলা হয়নি। আর মীর্যা গোলাম আহমেদ কাদিয়ানী হলো রসুল, নবী নয়। এদের কেউ কেউ উপরোক্ত হাদীসটির অর্থকে সন্দিহান করার জন্য নিজেদের মতের স্বপক্ষে শেষ জামানায় ঈসা عليه السلام আগমন করার ঘটনাটি উল্লেখপূর্বক বলে, যদি হাদীসটির অর্থ হতো আমার পরে নবী বা রসুল কেউই আগমন করবে না তবে ঈসা عليه السلام একজন রসুল হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে শেষ জামানায় আগমন করবেন?

বর্তমানে একদল লোক আছে যাদের বলা হয় 'মুনকিরীনে হাদীস' তথা 'হাদীস অস্বীকারকারী'। এরা বলে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ কিছু বলেছেন বলে প্রমাণিত হলে তো সেটা অবশ্যই মেনে চলতে হবে কিন্তু কোনো একটি কথা আদৌ বলেছেন কিনা সেটা জানার উপায় কি? যেসব মুহাদ্দিসরা হাদীস সংকলণ করেছেন এরা তাদের দক্ষতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর জীবদ্দশায় কুরআন বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ ছিল এবং তার ওফাতের পরপরই আবুবকর رضي الله عنه এর সময় সেটা একত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে কুরআনের সংকলণের ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই কিন্তু হাদীসের ব্যাপারটি ভিন্ন। ব্যাপকভাবে হাদীস লেখা শুরু হয় রসুলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের প্রায় তিনশত বছর পর। এর মাঝে বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে বহু সংখ্যক জাল হাদীস বানানো হয়। মুহাদ্দীসরা সেসব জাল হাদীসকে পরিত্যাগ করে সহীহ্ হাদীসগুলো বাছায় করে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন সেটা সত্য কিন্তু সে চেষ্টায় তারা কতটুকু সফল হয়েছেন সেটাই প্রশ্নের বিষয়। এ প্রসঙ্গে তারা হাদীসের সহীহ্-জঈফের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের মাঝে যে মতপার্থক্য রয়েছে সেগুলো ফুলিয়ে-ফাপিয়ে বর্ণনা করে থাকে। তারা বলে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমেও কিছু জাল হাদীস ঢুকে পড়া অসম্ভব নয়। এভাবে তারা জনমনে রসুলুল্লাহর হাদীস সম্পর্কে সংশয় সন্দেহ অনুপ্রবেশের করানোর চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে থাকে।

এদের মধ্যে কেউ কেউ বলে যেহেতু রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নামে প্রচুর সংখ্যক জাল হাদীস বানানো হয়েছে

[৫৭] ইমাম নাব্বীর শারহে মুসলিম, ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী ইত্যাদি।

তাই যে কোনো হাদীসকে বিনা বিচারে গ্রহণ করা যাবে না (সেটা বুখারী বা মুসলিম যে গ্রন্থেই বর্ণনা করা হোক) বরং রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীসকে আল-কুরআনের সাথে মিলাতে হবে। যদি আল-কুরআনের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তা গ্রহণ করা হবে আর অসমাঞ্জস্যপূর্ণ হলে তা বর্জন করা হবে। এ দৃষ্টিকোন থেকে তারা প্রচুর সংখ্যক বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে থাকে। যেমন, তারা বিবাহিত জেনাকারীকে রজম করার বিধানটি অস্বীকার করে বলে, এটা কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হলেও তা কুরআনে জেনাকারীর জন্য যে শাস্তি নির্ধারন করা হয়েছে তথা বেত্রাঘাত করার বিপরীত হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। এমন অসংখ্য ভ্রান্ত মতবাদ ও মতামত রয়েছে যা গুনে শেষ করা সম্ভব নয় সেটা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়।

এরা সরাসরি আল্লাহ, রসুল ও কুরআন অস্বীকার করে নি বরং নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বর্ণনা করেছে। এ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সত্ত্বেও ঐ সকল লোকেরা মুসলিম উম্মার নিকট কাফির হিসেবে চিহ্নিত। কারণ তারা উম্মতের ঐক্যমত তথা ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত ব্যাখ্যাকে পরিত্যাগ করে নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করেছে। আর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের নিকটবর্তী যুগের ওলামায়ে কিরামের মতামত উপেক্ষা করে মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপণ করাও কুফরী। যেহেতু এর অর্থ হলো, পবিত্র কুরআনের সঠিক বিধান পরিত্যাগ করে ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অনুসরণ করা। সুতরাং এই বিষয়টি অন্য আর একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আর তা হলো, 'ইজমা'। ইজমা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ছাড়া ইনকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই নিচে এ বিষয়ে সুবিস্তারে আলোচনা করা হলো।

♦ ***= উম্মতের ঐক্যমত তথা ইজমা শরীয়তের অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয় দলিল।***

এই মূলনীতিটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান যুগের আধুনা (ইসলামী!) চিন্তাবিদদের একটি বিরাট অংশ ইজমাকে শরীয়তের দলীল মনে করে না। তারা বলে, কুরআন-হাদীস হতে যে ব্যাখ্যা আমাদের বুঝে আসে আমরা তাই মেনে চলবো। আল-কুরআনের দু-একটি আয়াত বা গুটি কয়েক হাদীস পাঠ করে এবং তার উপর যথাসামান্য গবেষণা করে এসকল লোকেরা যেটা বোঝে সেটার উপরই মতামত দেওয়া শুরু করে তা সকল ওলামায়ে কিরাম এমনকি সাহাবায়ে কিরামের মতামতের বিপরীতে হলেও।

অনেক সময় দেখা যায় যারা কাদিয়ানী, হাদীস অস্বীকারকারী ইত্যাদি ভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাসের বিরোধিতা করে এবং তাদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের একটি অংশ ইজমাকে শরীয়তের দলিল মনে করেন না। এনারা হাদীস কুরআনের উপর স্বাধীনভাবে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মতামত দিয়ে

থাকেন। যখন তাদের প্রশ্ন করা হয়, আপনারাও হাদীস কুরআনের উপর গবেষণা করে স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত উপস্থাপণ করেছেন তারাও হাদীস কুরআনের উপর গবেষণা করে নিজেদের বুঝ মতো মতামত প্রদান করেছে তাহলে তারা কেনো কাফির হবে? জবাবে এনারা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করে লম্বা লম্বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুরু করেন। যেমন, কাদেয়ানীদের বিপক্ষে তারা বলেন, আল্লাহ বলেছেন, "তিনি শেষ নবী" রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন আমি শেষ নবী ইত্যাদি। আমরা পূর্বে দেখেছি এসব আয়াত ও হাদীস কাদেয়ানীরা জানে না তা নয় বরং তারা এগুলো সম্পর্কে অবহিত এবং এ বিষয়ে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। তারা বলে, এখানে শেষ নবী বলা হয়েছে শেষ রসুল তো বলা হয়নি। তাছাড়া শেষ জামানায় ঈসা عليه السلام এর আগমন সম্পর্কিত হাদিসটিকে তারা নিজেদের স্বপক্ষে ব্যবহার করে থাকে। তারা বলে, যদি মুহাম্মাদ ﷺ এর পর রসুল আগমন নিষিদ্ধই হতো তবে ঈসা عليه السلام একজন রসুল হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে শেষ জামানায় আগমন করবেন? সন্দেহ নেই যে, এসকল সংশয়ের উৎকৃষ্ট জবাব রয়েছে যেমন, নবী বলতে আসলে রসুলকেই বোঝায় আর ঈসা عليه السلام শেষ জামানায় ভিন্ন কোনো শরীয়ত নিয়ে আগমন করবেন না বরং মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়তের উপরই আমল করবেন। কিন্তু এই উত্তরের উপর আপত্তি উপস্থাপণ করে এরা বলে, নবী যে রসুল একথা কি আল্লাহ বলেছেন অথবা রসুল বলে গেছেন? আর ঈসা عليه السلام নিজস্ব কোনো শরীয়ত নিয়ে না আসলেও তিনি তো তখনও রসুলই থাকবেন কারণ একবার রসুল হওয়ার পর তো কেউ পদচ্যুত হতে পারেন না। তাছাড়া হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, শেষ জামানায় ঈসা عليه السلام আগমন করার পর আল্লাহ তার উপর ওহী করবেন। [৫৮] সুতরাং রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পর রসুল আগমন করার প্রমান পাওয়া যায়।

এভাবে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে যে হত্যা করে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে [নিসা/৯৩]। কিন্তু আহ্‌লুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়ার সকল আইম্মায়ে কিরামের ঐক্যমতে শিরক-কুফর ছাড়া অন্য কোনো পাপের কারণে কেউ চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। তারা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলে থাকেন (اَلْمُرَادُ بِالْخُلُوْدِ اَلْمُكْثُ اَلطَّوِيْلُ) "এই আয়াতে চিরস্থায়ী বলতে লম্বা সময় বোঝানো হয়েছে প্রকৃতই চিরস্থায়ী নয়।" [বায়দাবী ও অন্যান্য]

এখন যদি কেউ একই ব্যাখ্যা ঐ সকল আয়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যেখানে আল্লাহ ﷻ বলেছেন জান্নাতীরা জান্নাতে চিরকাল অবস্থান করবে এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ করা চেষ্টা করে, জান্নাতীরা জান্নাতে লম্বা সময় থাকবে চিরকাল নয় তবে এটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ এ ব্যাপারে উম্মতের

---

[৫৮] সহীহ্ মুসলিমের একটি বর্ণনায় এসেছে আল্লাহ ﷻ ঈসা عليه السلام কে ওহীর মাধ্যমে ইয়া'জুজ মা'জুজ এর বের হওয়ার খবর দেবেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার পরিবর্তে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করার নির্দেশ দেবেন।

ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে জান্নাতীরা জান্নাতে প্রকৃত অর্থেই চিরকাল অবস্থান করবে।

এমন বহু উদাহরণ পেশ করা যায় যা এখানে সুবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। উম্মতের ঐক্যমতকে বাদ দিয়ে এসব বিষয়ে সংশয় নিরসন করা সম্ভব নয়।

দেখা যাচ্ছে সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমত বা ইজমাকে বাদ দিলে উভয় পক্ষের আলোচনা সমানতালে চলতে থাকবে। উভয় মতালম্বী লোকেরা নিজেদের স্বপক্ষে চমকপ্রদ দলিল-প্রমাণ হাজির করতে থাকবে আর সাধারণ লোকেরা তাদের তর্ক-বিতর্কে প্রতারিত হয়ে যে কোনো দলে ঢুকে পড়বে।

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম ও সাহাবায়ে কিরামের মত পরিত্যাগ করে স্বাধীনভাবে কুরআন-সুন্নাহ্ বোঝার চেষ্টা করলে সত্যপথ খুঁজে বের করা এবং হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ক্বাদরিয়া সম্প্রদায় তাক্বদীরকে অস্বীকার করতো। তাদের বিশ্বাস ছিলো কোনো ঘটনা ঘটার পূর্বে আল্লাহ্ তা জানতে পারেন না বরং ঘটনা ঘটার পর তিনি তা জানতে পারেন। এ বিষয়ে তারা পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু আয়াতকে দলিল হিসেবে উপস্থাপণ করতো। যেমন আল্লাহর বাণী,

{وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ}

❮ উহুদের ময়দানে তোমরা যে কঠিন অবস্থায় পতিত হয়েছো তা আল্লাহরই ইচ্ছায়, যাতে তিনি জেনে নেন কে প্রকৃতই মুমিন। ❯ [আলে-ইমরান/১৬৬]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

{لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ}

❮ আল্লাহ জেনে নিতে চান, কে তাকে না দেখে ভয় করে। ❯ [মায়েদা/৯৪]

এই সকল আয়াতের বাহ্যিক অর্থে ক্বাদরিয়া সম্প্রদায়ের আক্বীদা-বিশ্বাসের সমর্থন রয়েছে বলে মনে হয়। একারণে তারা নিজেদের স্বপক্ষে এই সব আয়াত ব্যবহার করতো। এই সব আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করে তারা খলীফা উমর ইবনে আব্দিল আজিজ একটি চিঠি লিখে পাঠালে তিনি জবাবে বলেন,

وَلَئِنْ قُلْتُمْ لِمَ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ كَذَا لِمَ قَالَ كَذَا لَقَدْ قَرَءُوا مِنْهُ مَا قَرَأْتُمْ، وَعَلِمُوا مِنْ تَأْوِيلِهِ مَا جَهِلْتُمْ، وَقَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ: كُلُّهِ بِكِتَابٍ وَقَدَرٍ

তোমরা যদি বলো আল্লাহ অমুক অমুক আয়াত কেনো নাযিল করেছেন? আমি বলবো, সাহাবায়ে কিরাম ঐ সকল আয়াত পাঠ করেছেন এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা তারা জানতেন, যা তোমরা জানো না। একারণে

তারা ঐসকল আয়াত পাঠ করার পরও এটা বিশ্বাস করতেন যে, তাকদীর পূর্ব হতেই লেখা রয়েছে। (৫৯)

[আবু দাউদ]

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ﵄ যখন পথভ্রষ্ট খারেজীদের সাথে আলোচনা করতে যান তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْأَنْصَارِ لِأُبَلِّغَكُمْ مَا يَقُوْلُوْنَ الْمُخْبِرُوْنَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ هُمْ أَعْلَمُ بِالْوَحْيِ مِنْكُمْ وَ فِيْهِمْ أُنْزِلَ وَ لَيْسَ فِيْكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ

আমি তোমাদের নিকট এসেছি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের পক্ষ থেকে। আমি এসেছি তাদের মতামত তোমাদের শোনাতে যেহেতু তাদের উপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তারাই ওহী সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক অবগত আর তোমাদের মধ্যে তাদের কেউ নেই।

[হাকিম তার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং আজ-জাহাবী সহীহ বলেছেন।]

দেখা যাচ্ছে, সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের পরবর্তী ওলামায়ে কিরাম ভ্রান্ত মতবাদের লোকদের সাথে বিতর্কের ক্ষেত্রে সামাধানের পথ হিসেবে সাহাবায়ে কিরামের মতামতকে চূড়ান্ত মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করতেন। যেহেতু কুরআন হাদীস তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে অতএব, তারাই এটার অর্থ সম্পর্কে অধিক অবগত।

আল্লাহ্ ﷻ এবং তার রসুল ﷺ আমাদের একই শিক্ষা দিয়েছেন।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

তোমাদের উপর আবশ্যক হলো আমার পথ এবং সত্যপন্থী খলীফাদের পথ অবলম্বন করা। তার উপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকো। আর নতুন মতবাদ সৃষ্টি করো না। কেননা যে কোনো নতুন মতবাদ বিদয়াত আর প্রত্যেকটি বিদয়াত পথভ্রষ্টতা। (৬০) [আবু দাউদ]

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

---

(৫৯) বর্ণনাটিকে শায়েখ আলবানী সহীহ বলেছেন [সহীহু ও দইফু আবি দাউদ/৪৬১২]

(৬০) হাদীসটি বর্ণনার পর ইমাম তিরমিযী বলেন, (حديث حسن صحيح) ''হাদীসটি হাসান সহীহ্''। ইমাম বাগাবী শারহে সুন্নাতে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [সহীহা/২৭৩৫]।

{فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا}

তোমরা যেভাবে ঈমান এনেছো যদি তারা সেভাবে ঈমান আনয়ন করে তবে তারা সত্য পথ প্রাপ্ত হবে। [বাকারা/১৩৭]

এই আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের মতো ঈমান আনাকে হেদায়েত তথা সত্য পথ প্রাপ্ত হওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

যে কেউ হেদায়েত প্রকাশিত হওয়ার পরও রসুলের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয় এবং মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য কোনো পথ অনুসরণ করে আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেবো আর তাকে জাহান্নামের প্রবেশ করাবো। নিশ্চয় জাহান্নাম খুবই নিকৃষ্ট স্থান। [নিসা/১১৫]

ইমাম শাফেঈ এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম এই আয়াত থেকে উম্মতের ঐক্যমত তথা ইজমাকে অনুসরণ করা আবশ্যক প্রমাণ করেছেন যেহেতু এখানে মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করাকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। [ইমাম সুয়ূতীর মিফতাহুল জান্নাহ্]

শরীয়তের বিধি-বিধান সঠিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের নিকটবর্তী যুগের ওলামায়ে দ্বীনের মতমত অনুসরণ করার বিষয়টি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যেসব সাহাবায়ে কিরাম সরাসরি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট হতে দ্বীন শিক্ষা করেছেন। যাদের উপস্থিতিতে আল-কুরআন নাযিল হয়েছে। তারাই যে, শরীয়তের বিধানাবলী এবং কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা সসম্পর্কে অধিক জ্ঞাত থাকবেন এটা কে অস্বীকার করতে পারে! একইভাবে সাহাবায়ে কিরামের ছাত্ররা এবং তাদের নিকটবর্তী যুগে আগমনকারী ওলামায়ে কিরাম শরীয়ত সম্পর্কে অধিক অবগত হবেন এটাই স্বাভাবিক। ফলে তাদের মতামত ও চিন্তা-দর্শনা পরিত্যাগ করে হাদীস- কুরআনের উপর মতামত ব্যক্ত করা পথভ্রষ্টতা ভিন্ন কিছু নয়। তারা যেসব বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন সেসব ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করার সুযোগ নেই। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

আল্লাহ্ আমার উম্মাতকে পথভ্রষ্টতার উপর একমত করবেন না। [৬১] [তিরিমিযী]

[৬১] হাদীসটির সনদ সম্পর্কে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে। হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী গরীব বলেছেন। শায়েখ আলবানী সহীহ বলেছেন [সহীহুল জামি/১৮৪৮]। তবে উপরে উল্লেখিত আয়াতসমূহ হাদীসটিকে সমর্থন করে আর হাদীসটির মূলভাব গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে আলেমরা একমত হয়েছেন।

কাজী ইয়াদ ﵀ বলেন,

وَكَذَلِكَ نَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ كُلِّ قَائِلٍ قَالَ قَوْلًا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى تَضْلِيلِ الْأُمَّةِ وَتَكْفِيرِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ كَقَوْلِ الْكُمَيْلِيَّةِ مِنَ الرَّافِضَةِ بِتَكْفِيرِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَمْ تُقَدِّمْ عَلِيًّا وَكَفَّرَتْ عَلِيًّا إِذْ لَمْ يَتَقَدَّمْ وَيَطْلُبْ حَقَّهُ فِي التَّقْدِيمِ فَهَؤُلَاءِ قَدْ كَفَرُوْا مِنْ وُجُوْهٍ لِأَنَّهُمْ أَبْطَلُوْا الشَّرِيْعَةَ بِأَسْرِهَا إِذْ قَدْ اِنْقَطَعَ نَقْلُهَا وَنَقْلُ الْقُرْآنِ إِذْ نَاقِلُوْهُ كَفَرَةٌ عَلَى زَعْمِهِمُ وَإِلَى هَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ أَشَارَ مَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ بِقَتْلِ مَنْ كَفَّرَ الصَّحَابَةَ

একইভাবে আমরা নিঃসন্দেহে তাকে কাফির বলবো যে এমন কোনো কথা বলে যার মাধ্যমে সমস্ত উম্মাত পথভ্রষ্ট প্রমাণিত হয় এবং সে সকল সাহাবাদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে। যেমন বলেছিল, রাফেজী সম্প্রদায়ের একটি অংশ কামিলিয়ারা। তারা রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পর সকল সাহাবায়ে কিরামকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। যেহতুে তারা (আবু বকর ﵁ এর পরিবর্তে) আলী ﵁ কে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করেনি। এরা আলী ﵁ কেউ কাফির বলেছিল, যেহেতু তিনি আবু বকর ﵁ এর নিকট হতে নিজের প্রাপ্য খিলাফত আদায় করে নেননি। এই সকল লোকেরা (কামিলিয়া সম্প্রদায়) বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে কাফির হিসেবে পরিগনিত হয়। যেহেতু এরা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ শরীয়তকে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছে। সাহাবাদের সকলকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করলে এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর শরীয়ত এবং পবিত্র কুরআন বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়নি। কেননা তাদের ধারনা অনুযায়ী এগুলো কাফিররা বর্ণনা করেছে (নাউযু বিল্লাহ্)। [আশ-শিফা]

কাজি ইয়াদের এই কথা কেবল সাহাবায়ে কেরাম নয় বরং যে কোনো যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যদি কেউ মনে করে কুরআন নাযিল হওয়ার পর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোনো একটি যুগের সকল মানুষ পথভ্রষ্ট ছিল তবে এর স্পষ্ট অর্থ হলো আমাদের নিকট যে কুরআন-হাদীস ও শরীয়ত রয়েছে সেটার বিশুদ্ধতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। অতএব এটা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী ওলামায়ে দ্বীনের ঐক্যমত তথা ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত বিধানকে অস্বীকার করা নিশ্চিতভাবে পথভ্রষ্টতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে কুফরী হিসেবে গণ্য। এটা কখন কুফরী হিসেবে গণ্য হবে সে সম্পর্কে উসুলবিদ ওলামায়ে কিরাম বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা সে বিষয়ে পৃথক শিরোনামে আলোচনা করতে চাই।

♦ = *ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত বিধান অস্বীকার করা কখন কুফরী হবে?*

উপরে আমরা ইজমার আবশ্যকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, সাহাবায়ে কিরাম এবং উম্মতের ওলামায়ে কিরামের মতামত পরিত্যাগ করে স্বাধীনভাবে কুরআন-হাদীস সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করা কারো জন্য বৈধ নয়। বর্তমানে যারা নিজেদের মন মতো শরীয়তের ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং এর মাধ্যমে উম্মতের ইজমা পরিত্যাগ করে তাদের এই কাজ চরম পথভ্রষ্টতা ও স্পষ্ট বিদয়াত হিসেবে

গণ্য। এমনকি তিনটি শর্ত উপস্থিত থাকলে ইজমার বিপরীতে রায় প্রদান করা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে। সেগুলো হলো:

ক. ইজমা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

উসুলবিদ ওলামায়ে কিরামের মতে ইজমা দুই প্রকার।

এক. আল-ইজমা আল-ক্বত্ঈ (اَلْإِجْمَاعُ الْقَطْعِيُّ) "অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইজমা"

দুই. আল-ইজমা আজ-জন্নী (اَلْإِجْمَاعُ الظَّنِّيُّ) "নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয় এমন ইজমা"

এ বিষয়টির ব্যাখ্যা হলো মুলত ইজমা বলতে বোঝায়, কোনো এক যুগের সকল ওলামায়ে কিরাম কোনো একটি ব্যাপারে একমত পোষণ করা।

ইমাম শাওকানী ﷬ বলেন,

وَأَمَّا فِيْ الْإِصْطِلَاحِ: فَهُوَ اِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِيْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرٍ مِنَ الأَعْصَارِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُوْرِ

পরিভাষায় **'ইজমা'** অর্থ হলো, উম্মতে মুহাম্মাদীর কোনো এক যুগের সকল মুজতাহিদগণ কোনো একটি বিষয়ে একমত পোষণ করা। [ইরশাদুল ফুহুল]

উসুলবিদ ওলামায়ে কিরাম ইজমার অনুরুপ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, কোনো একটি বিষয়ে একটি যুগের সকল ওলামায়ে কিরামের মতামত একত্রিত করা সম্ভব নয়। সত্যি কথা বলতে কোনো একটি যুগের আলেমদের সংখ্যা বা তাদের নাম ঠিকানা একত্রিত করাও অসম্ভব। অতএব, কোনো একটি বিষয়ে তাদের সবার মৌখিক মতামত সংগ্রহের চিন্তাও সুদূর পরাহত। **এমতাবস্থায় কোনো একটি বিষয়ে একটি যুগের সকল ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন কিনা সেটা জানার সর্বসম্মত পদ্ধতি হলো, কোনো বিষয়ে আলেমদের একটি অংশের মতামত থাকা এবং তার বিপরীতে কারো পক্ষ থেকে দ্বিমত বর্ণিত না হওয়া।** যারা কোনো বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করেন তারা এই পদ্ধতিটিই অনুসরণ করেন।

ইবনে রুশ্দ ﷬ ওযু সম্পর্কে বলেন,

فَأَمَّا الدَّلِيْلُ عَلَي وُجُوْبِهَا فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ

ওযু ফরজ হওয়ার দলিল হলো কিতাব সুন্নাত ও ইজমা।

এর পর তিনি এ বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাত থেকে দলিল-প্রমাণ উল্লেখের পর এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত

হওয়ার প্রমাণ হিসেবে বলেন,

وَأَمَا الإجماع فَإِنَّه لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ خِلاَفُ وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ خِلاَفُ لِنُقِلَ إِذْ الْعَادَاتِ تَقْتَضِي ذالك

এ বিষয়ে ইজমা সংঘঠিত হওয়ার প্রমান এই যে, এতে মুসলিমদের কারো পক্ষ হতে কোনো দ্বিমত বর্ণিত হয়নি। যদি কোনো দ্বিমত থাকতোই তবে তা বর্ণিত হতো। এটাই স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধির দাবী।

[বিদায়াতুল মুজতাহিদ]

কোনো এক প্রসঙ্গে ইবনে কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِيْ عَصْرِهِمْ فَيَكُوْنُ إِجْمَاعًا

এটা হলো সাহাবা ও তাবেঈনদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তিদের মতামত যাদের নাম আমরা উল্লেখ করেছি আর এ বিষয়ে তাদের যুগের কারো পক্ষ হতে দ্বিমত বর্ণিত হয়নি অতএব এটা ইজমা হিসেবে গণ্য হবে।

[আল-মুগনী]

ইমাম নাব্বী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

دَلِيلُنَا مَا رُوِىَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ وَلَا مُخَالِفَ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ فَكَانَ اِجْمَاعًا

এ বিষয়ে আমাদের দলিল হলো যায়েদ ইবনে ছাবিতের কথা যার বিপরীতে কোনো সাহাবার মত নেই। অতএব, এটা ইজমা বলে গণ্য হবে। [আল-মাজমু]

কোনো বিষয়ে কোনো এক যুগের একদল আলেমের মত পাওয়া যাওয়া এবং তার বিপরীতে কারো মত বর্ণিত না হওয়াই ইজমা হিসেবে গণ্য আর এটিই ইজমা প্রমাণিত হওয়ার একমাত্র পদ্ধতি। এখানে একটি মতের বিপরীতে কোনো মতপার্থক্য বর্ণিত না হওয়ার কারণে ধরে নেওয়া হচ্ছে আদৌ কোনো মতপার্থক্য ছিল না। বরং সকলে সে বিষয়ে একমত ছিলেন। যেহেতু ঐ বিষয়ে কারো মতপার্থক্য থাকলে তা অবশ্যই বর্ণিত হতো। এই যুক্তিটি সর্বাবস্থায় নিশ্চিতভাবে প্রয়োগ করা যায় না। দুটি পৃথক অবস্থার উপর চিন্তা-গবেষণা করলে বিষয়টির ভিন্নতা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

এক. যদি এমন হয় যে, কোনো একটি বিষয়ে একটি যুগে বহুসংখ্যক মুজতাহিদ একমত পোষণ করেন এবং তাদের মতটি ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার লাভ করে। এধরণের বিষয়ে কারো পক্ষ থেকে দ্বিমত বর্ণিত না হওয়াটা এমন প্রমাণ করে যে, আদৌ দ্বিমত ছিল না। যেহেতু এটাই স্বাভাবিক যে, ব্যাপক প্রচার প্রসারের ফলে বিষয়টি ঐ যুগের সকল আলেমদের কর্ণগোচর হবে এবং তাদের কোনো দ্বিমত থাকলে

তারা ইলমী দায়িত্ব হিসেবে সেটা উল্লেখ করবেন আর দ্বিমত করলে তাদের শিষ্যরা সেটা স্মরণ রাখবেন এবং পরবর্তীতে বর্ণনা করবেন। কিন্তু যখন এধরণের কোনো দ্বিমতই বর্ণিত হয় না তখন এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, আসলে উক্ত বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত ছিল না। একারণে এই প্রকৃতির ইজমাকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইজমা তথা (اَلْاِجْمَاعُ الْقَطْعِيُّ) বলা হয়।

দ**ুই.** অপরদিকে যদি কোনো বিষয়ে কয়েকজনের মত পাওয়া যায় কিন্তু বিষয়টি অপ্রশিদ্ধ ও অখ্যাত হয় তবে সে বিষয়ে কারো দ্বিমত পাওয়া না গেলে সেটাকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইজমা বলা যেতে পারে না। যেহেতু এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, ঐ বিষয়টি অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের নিকট পৌছায়নি ফলে সে বিষয়ে দ্বিমত করার প্রশ্নই ওঠেনি। এমনও হতে পারে তারা দ্বিমত করেছিলেন কিন্তু বিষয়টি অখ্যাত ও অপ্রশিদ্ধ হওয়ার কারণে তার শিষ্যরা সেটা গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেন নি। এই প্রকৃতির ইজমাকে "অনিশ্চিত ইজমা বলা হয়" (اَلْإِجْمَاعُ الظَّنِّيُّ) বলা হয়। এই প্রকারের ইজমা অপেক্ষাকৃত দূর্বল।

একইভাবে যদি কোনো একটি যুগে কোনো বিষয়ে দ্বিমত থাকে কিন্তু পরবর্তীতে সে ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয় তবে এটা অকাট্য ইজমা হিসেবে গণ্য হবে না। তবে এটার বিরোধিতা করা অনুচিত হবে। যেমন, গোসল ফরজ হলে তায়াম্মুম করা সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিমত ছিল। সকল সাহাবায়ে কিরাম এক্ষেত্রে তায়াম্মুম করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু উমর ﷛ এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ﷛ তায়াম্মুম করার বিপক্ষে মত দেন। পরবর্তীতে এটা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন এ মতের বিরোধিতা করা বৈধ নয়। তবে এটার বিরোধিতা করা কুফরী হিসেবেও গণ্য হবে না। যেহেতু এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইজমা নয়। আর এটা সকল ওলামায়ে কিরামের মত যে, অকট্যভাবে প্রমাণিত নয় এমন ইজমার মাধ্যমে কাউকে কাফির বলা যাবে না।

আল-আমিদী ﵀ বলেন,

مَعَ اِتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ إِنْكَارَ حُكْمِ الْاِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ غَيْرُ مُوْجِبٍ لِلتَّكْفِيْرِ

আলেমরা একমত হয়েছেন যে, নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয় এমন ইজমার মাধ্যমে কাউকে কাফির বলা যাবে না। [উসুলুল ফিকহ্ ওয়াল কওয়াইদ]

খ) যে ইজমা অস্বীকার করা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে তার দ্বিতীয় শর্তটি হলো, সাধারন মুসলিমদের মধ্যে সেটার ব্যাপক প্রচার-প্রসার থাকতে হবে। যে বিষয়ে ইজমা হয়েছে কিন্তু সাধারন মুসলিমরা সে সম্পর্কে অবগত নয় উক্ত ইজমার বিপরীতে রায় দিলে তা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে না।

ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِيْ كُلِّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَيْهِ مِنْ أُمُوْرِ الدِّيْنِ إِذَا كَانَ عِلْمُهُ مُنْتَشِرًا كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَتَحْرِيْمِ الزِّنَي وَالْخَمْرِ وَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْأَحْكَامِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ رَجُلًا حَدِيْثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلاَ يَعْرِفُ حُدُوْدَهُ فَإِنَّهُ إِذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْهَا جَهْلًا بِهِ لَمْ يُكَفَّرْ

একই ভাবে (কাফির হবে) যে কেউ ইসলামের এমন কোনো বিষয়ে অস্বীকার করে যার উপর উম্মতের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে এবং বিষয়টি যথেষ্ট প্রচার প্রসারও হয়েছে যেমন পাচ ওয়াক্ত সলাত, রমজানের সওম. স্ত্রী সহবাসের পর গোসল ফরজ হওয়া, জিনা, মদ, মুহরিমা মহিলাকে বিবাহ করা ইত্যাদি বিষয় হারাম হওয়া। তবে যদি কোনো ব্যক্তি সবে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করে থাকে এবং ইসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে না জেনে থাকে তবে সে মূর্খতা বশত এসব বিষয় অস্বীকার করলে তাকে কাফির বলা হবে না।

[শারহে মুসিলম]

তিনি আরো বলেন,

فَأَمَّا مَا كَانَ الْإِجْمَاعِ فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ طَرِيقِ عِلْمِ الْخَاصَّةِ كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ، وَأَنَّ الْقَاتِلِ عَمْدًا لَا يَرِثُ وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ السُّدُس ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَهَا لَا يَكْفُر ، بَلْ يُعْذَر فِيهَا لِعَدَمِ اِسْتِفَاضَة عِلْمهَا فِي الْعَامَّة

তবে যে বিষয়ে ইজমা রয়েছে কিন্তু তা কেবল বিশিষ্ট আলেমরা জানেন (সাধারন মানুষ জানে না) যেমন, কোনো মহিলা এবং তার ফুফুকে বা খালাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম হওয়া, পিতাকে হত্যাকারী সন্তান পিতার ওয়ারিশ না হওয়া, দাদি (মায়ের অনুপস্থিতিতে) নাতির সম্পতিতে এক ষষ্টমাংশ পাওয়া ইত্যাদি বিধি-বিধান। যে কেউ এগুলো অস্বীকার করে তাকে অজ্ঞতার কারণে ওযর দেওয়া হবে যেহেতু সাধারন লোকদের মধ্যে এসব বিষয়ের যথেষ্ট প্রচার-প্রসার নেই। [শারহে মুসলিম]

আল-কারাফী رحمه الله বলেন,

وَلَا يَعْتَقِدُ أَنَّ جَاحِدَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ يَكْفُرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مُشْتَهِرًا فِي الدِّينِ حَتَّى صَارَ ضَرُورِيًّا

এমন যেনো কেউ মনে না করে যে, যা কিছুর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অস্বীকার করা কুফরী হবে বরং উক্ত বিষয়টি প্রশিদ্ধ হতে হবে যাতে সেটা আল্লাহর দ্বীনের অংশ হওয়ার ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। [আনওয়ারুল বুরুক]

যেসব বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের যুগ হতে অকাট্যভাবে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে এবং সাধারন মুসলিমদের মধ্যে সেসব বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রসার রয়েছে সেগুলোকে ‘‘অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়’’ (ضَرُوْرِيَّاتْ) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। **যে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ধরণের বিষয়কে অস্বীকার করা**

কুফরী হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই।

একারণেই কুফরীর সংজ্ঞাতে ইমাম বাইদাবী ﵀ বলেন,

وَفِيْ الشَّرْعِ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْئُ الرَّسُوْلِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِهِ

শরীয়তে কুফরী বলতে বোঝায় আল্লাহর রসুল ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন বলে অকাট্যভাবে জানা গেছে তার কোনো কিছু অস্বীকার করা। [তাফসীরুল বায়দাবী]

গ) এ বিষয়ে তৃতীয় শর্তটি হলো, উম্মতের ঐক্যমতের মাধ্যমে প্রমাণিত যে কোনো বিষয় অস্বীকার করলে তা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে না বরং সেটা শরীয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হতে হবে। শরীয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ে আল্লাহ ও তার রাসুলের স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান থাকা যেমন, নামায-রোজা, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি অথবা শরীয়তের কোনো বিধান তার উপর নির্ভরশীল হওয়া যেমন, হজ্জের বিধান মক্কা নগরীতে অবস্থিত কা’বা শরীফের সাথে সম্পর্কিত। এখন যদি কেউ বলে যে মক্কা শহর কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যে কা’বার উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে বলা হয়েছে সেটা মানুষ ভুলে গেছে। আমরা যে শহরকে মক্কা বলি বা যে ঘরকে কা’বা বলি সেটা প্রকৃত মক্কা শহর নয় এবং এই ঘর প্রকৃত কা’বা ঘর নয়। তবে এই ব্যক্তি কাফির হবে। যেহেতু সে যা বলেছে তার অর্থ হজ্জের বিধানকে বাতিল করে দেওয়া। কিন্তু যদি কেউ বাগদাদ শহরকে অস্বীকার করে তবে এ কারণে সে কাফির হবে না যদিও মক্কা নগরী বা কা’বা ঘরের মতোই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাগদাদ বলে একটি শহর আছে। ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন এবং জনসাধারণের মাঝে এটা ব্যপক প্রচার-প্রসারও লাভ করেছে কারণ এটা আল্লাহর দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়।

হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ আল-আত্তার ﵀ শারহে জালালের টিকায় বলেন,

وَلَا يَكْفُرُ جَاحِدُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الدِّينِ كَوُجُودِ بَغْدَادَ قَطْعًا

যে বিষয়ে ইজমা হয়েছে কিন্তু তা দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তা অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে কুফরী নয় যেমন বাগদাদ শহরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা।

‘গইয়াতুল উসুল’ নামক কিতাবে বিষয়টির সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেখানে যা বলা হয়েছে তার সারাংশ হলো, (جَاحِدُ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ مَعْلُوْمٍ مِنَ الدِّيْنِ ضَرُوْرَةً كَافِرٌ) “দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ব্যাপক প্রচার প্রসারের মাধ্যমে সর্বজন বিদিত ইজমা যে অস্বীকার করে সে কাফির”

এরপর কয়েকটি স্তরে এই কথাটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

اَلْمُجْمَعُ عَلَيْهِ الْمَعْلُوْمُ مِنَ غَيْرِهِ ضَرُوْرَةً كَوُجُوْدِ بَغْدَادَ، فَلاَ يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَلاَ جَاحِدُ شَيْءٍ مِنْهَا، وَإِنْ اِشْتَهَرَ بَيْنَ

النَّاسِ

দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয় যদি সকল ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় এবং সে বিষয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রচার প্রসার থাকেও তবু তা অস্বীকার করলে কাফির হবে না যেমন বাগদাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা বা তার কোনো অংশ অস্বীকার করা কুফরী নয়।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তা হলো কোনো বিষয়ে আলেমদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হলেই সেটা অস্বীকার করা কুফরী হবে তা নয়। বরং এটা কুফরী হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। তা হলো, (১) ইজমাটি অকাট্য হতে হবে (২) সেটা সাধারন মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করতে হবে এবং (৩) সেটা দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হতে হবে।

যেহেতু কোনো বিষয়ে ইজমা সম্পাদিত হলেই সেটা অস্বীকার করা কুফরী নয়। বরং এর কিছু শর্ত ও নিয়ম-নীতি রয়েছে। তাই কারো কারো নিকট মনে হয়েছে এখানে কুফরীর বিষয়টি ইজমার উপর নির্ভর করেনা। বরং যেহেতু এ বিষয়ে হাদীস-কুরআনে দলিল রয়েছে এবং বিষয়টি সর্বসাধারনের নিকট সুপরিচিত ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত তাই এটা অস্বীকার করা কুফরী হচ্ছে। উম্মতের ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমত তথা ইজমার সাথে এর আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

এই চিন্তাধারাটি সঠিক নয়।

সত্য কথা হলো, ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয় কুফরী হওয়ার জন্য যেমন সে বিষয়টির ব্যাপক প্রচার-প্রসার থাকা শর্ত, তেমনি ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার রয়েছে এমন কিছু অস্বীকার করা কুফরী হওয়ার জন্য সেটার উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত থাকা শর্ত। উদাহরণস্বরুপ বর্তমানে সাধারন মুসলিমদের প্রায় সকলেই জানেন ওযু-গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায় এ বিষয়ে যে দ্বিমত আছে সেটা গুটি কয়েক আলেম-ওলামা ছাড়া কেউই জানেন না। এখন যে ব্যক্তি দ্বিমত আছে কিনা এটা না জেনেই গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার বিধান অস্বীকার করে তাকে কাফির বলা হবে না। যেহেতু বিষয়টিতে অকাট্যভাবে ইজমা সম্পাদিত হয়নি বরং মতপার্থক্য রয়েছে। যদিও উক্ত ব্যক্তি সে মতপার্থক্য সম্পর্কে অবগত নয়। সুতরাং সর্বসাধারনের মাঝে কোনো একটি দ্বীনী ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার-প্রসার থাকলেই কোনা বিষয় অস্বীকার করা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে না যদি না তার উপর উম্মতের ঐক্যমত প্রমাণিত হয়। এখানে আরো একটি ব্যাপার লক্ষ্যনীয়। ওযু-গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করার বিধান সরাসরি আল-কুরআনে উল্লেখিত আছে [মায়েদা/৬] কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম উক্ত আয়াতের অর্থ নির্ণয়ের ব্যাপারে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ার কারণে সেটা অস্বীকার করা কুফরী হিসেবে গণ্য হচ্ছে না। সুতরাং কোনো একটি বিষয়ে হাদীস-কুরআনে দলিল পাওয়া গেলেই সেটার বিপরীত মত পোষণকারীদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত

করতে হবে এমন নয় বরং দেখতে হবে সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী আইম্মায়ে মুজতাহিদীন উক্ত আয়াত সম্পর্কে কি বুঝতেন। যদি তারা কোনো বিষয়ে অকাট্যভাবে ইজমা করে থাকেন তবে তার বিপরীতে মত দেওয়া কুফরী হবে আর যদি তারা দ্বিমত করে থাকেন তবে এই মাসয়ালা অস্বীকার করার কারণে কাউকে কাফির বলা হবে না। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে বিপরীত মতটি বিরল ও অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণে এখন সেটা যে মেনে চলে তাকে বিদয়াতী ও বিভ্রান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। তয়াম্মুমের ব্যাপারে উমর ﵁ ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ﵁ এর মতটি এর মধ্যে অন্তভূর্ক্ত।

অতএব এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এখানে কুফরী হওয়া বা না হওয়ার সাথে উম্মতের ঐক্যমত তথা ইজমার সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে যদিও তার সাথে আরো কিছু শর্ত যুক্ত রয়েছে।

♦ *= ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয়কে অস্বীকার করা এবং সরাসরি ইজমা অস্বীকার করার মধ্যে পার্থক্য।*

পূর্বে আমরা দলিল প্রমাণ সহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ্র দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় যদি ইজমার মাধ্যমে অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং প্রশিদ্ধ হয় তবে তা অস্বীকার করা কুফরী। এখন প্রশ্ন হলো যারা সরাসরি ইজমাকে অস্বীকার করে তাদের বিধান কি হবে? আমাদের সময় কিছু লোক আছে যারা নিজেদেরকে কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী বলে দাবী করেন। সাধারনভাবে শরীয়তের মৌলিক বিধানাবলী যেমন সলাত-সওম, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি স্বীকার করেন কিন্তু উম্মতের ইজমা মান্য করেন না বা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। এদের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, কেবলমাত্র ইজমার গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করার কারণে তাদের কাফির বলা হবে না।

আল-ক্বারাফী ﵀ বলেন,

قَدْ جَحَدَ أَصْلَ الْإِجْمَاعِ جَمَاعَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ الرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ كَالنَّظَّامِ ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا قَالَ بِكُفْرِهِمْ

রাফেজী ও খারেজীদের মধ্যে বেশ কিছু লোক এবং নিজাম ইজমা অস্বীকার করেছে এর পরও কেউ তাদের কাফির বলেছে বলে আমি জানি না। [আনওয়ারুল বুরুক]

ইজমার গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করার বিধান সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো যদিও এমন ব্যক্তিকে বিদয়াতী ও বিভ্রান্ত বলা হবে তবে তাকে কাফির বলা হবে না।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয় অস্বীকার করা কুফরী অথচ সরাসরি ইজমা অস্বীকার করা কুফরী নয় এটা কেমন কথা?

কেউ কেউ এর উত্তরে বলেছেন, যে ব্যক্তি ইজমাকে স্বীকার করে নেওয়ার পর যে বিষয়ে ইজমা হয়েছে তা অস্বীকার করে তবে সে কাফির হবে যেহেতু সে যেটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে সেটাকেই

অস্বীকার করছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইজমাকেই অস্বীকার করে যেহেতু সে ইজমাকে দলীল হিসেবে স্বীকারই করে না তাই সে কাফির নয়।

ইবনে হাযার আল-হাইতামী ﷺ এই মতামতটির উপর যৌক্তিক আপত্তি উত্থাপণ করেছেন। তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো, যদি এটা সঠিক ধরে নেওয়া হয় তবে এর অর্থ হবে যদি কেউ ইজমাকে দলিল হিসেবে স্বীকার না করে তবে সলাত-সওম বা হজ্জ-যাকাতের মতো বিষয় অস্বীকার করলেও তাকে কাফির বলা হবে না। কিন্তু এটা সঠিক হতে পারে না। ইজমাকে অস্বীকার করার মতো বিদয়াত ও ভ্রান্ত মতের কারণে তাকে কুফরী করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে না। [৬২]

অতএব, উপরোক্ত প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হলো, আমরা উপরে বলেছি, আলেমদের ঐক্যমতের মাধ্যমে প্রমাণিত কোনো বিষয় অস্বীকার করা কেবল তখন কুফরী হবে যখন সেটা আল্লাহর দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হয় এবং সেটার ব্যাপক প্রচার-প্রসার থাকে। ফলে সেটা অস্বীকার করার স্পষ্ট অর্থ হয় আল্লাহর বিধানকেই অস্বীকার করা। কিন্তু যে বিষয়ে উম্মতের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু সেটা দ্বীনী বিষয় নয় বা সেটার ব্যাপক প্রচার-প্রসার না থাকার কারণে তা অস্বীকার করা নিশ্চিতভাবে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করার পর্যায়ে পড়েনা সেসব বিষয়কে অস্বীকার করা কুফরী হিসেবে গণ্য নয়। সুতরাং সাধারনভাবে ইজমা অস্বীকার করা কুফরী নয় বরং যেখানে ইজমা অস্বীকার করার অর্থ হয় আল্লাহর দ্বীনের কোনো অংশকে অস্বীকার করা তখন তা কুফরী হয়। এখন যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিধানকে অস্বীকার করে না কিন্তু ইজমার গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করে সে কাফির নয় যেহেতু অকাট্যভাবে প্রমাণিত দ্বীনের কোনো বিধানকে সে অস্বীকার করে নি। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ইজমা নিজেই কি দ্বীনের বিধান বলে গণ্য নয়? এর উত্তর হলো, ইজমা অবশ্যই দ্বীনের একটি বিধান যা কুরআন-সুন্নাহ্ ও উম্মতের ওলামায়ে কিরামের মতামতের আলোকে স্পষ্ট প্রমানিত। কিন্তু ইজমা কি, এটা কেনো মেনে চলতে হবে, ইজমা অস্বীকারের ক্ষতিকর প্রভাব কি সেটা কেবল বিজ্ঞ ওলাময়ে কিরাম স্পষ্টভাবে জানেন। সাধারন লোকেরা এ বিষয়ে তেমন কিছু জানে না। ইজমার স্বপক্ষে যেসব আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয় সেগুলোও ব্যাখ্যা স্বাপেক্ষ। মোট কথা শরীয়তের কোনো বিধান যতটা প্রচার-প্রসার হলে কোনোরুপ যুক্তিতর্ক ছাড়াই সেটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত বলে গণ্য হয় ইজমা সম্পর্কে সেই প্রকৃতির প্রচার-প্রসার নেই। সাধারন মানুষ নামায-রোজা, হজ্জ-যাকাত সম্পর্কে যেভাবে জানে ইজমা সম্পর্কে ততটা স্পষ্টভাবে জানে না। তাই ইজমার গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করার কারণে কাউকে কাফির বলা হবে

[৬২] আল-ই'লাম বিকওয়াতিইল ইসলাম।

না। তবে যদি সে এমন কোনো বিধান অস্বীকার করে যা ইজমার মাধ্যমে অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং সর্বজনবিদিত তবে তাকে কাফির বলা হবে যেহেতু সে আল্লাহর একটি স্পষ্ট বিধানকে অস্বীকার করেছে।

⇒ ২. আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কোনো বিধানকে ত্রুটিপূর্ণ ও অযৌক্তিক দাবী করা বা তার উপর আপত্তি-অভিযোগ উত্থাপন করা।

যেমন কেউ হয়তো বলল, আমার টাকা আমি উপার্জন করেছি এতে আবার যাকাত দিতে হবে কেন? অথবা চোরের হাত কাঁটা, নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিতে জেনা করলে তাদের বেত মারা বা বিবাহিত হলে রজম করা (পাথর মেরে হত্যা করা) ইত্যাদি কার্যকলাপ বর্বরচিত (নাউযু বিল্লাহ্)। এভাবে ইসলামের বিভিন্ন বিধান যেমন উত্তরাধিকার আইনে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান না করাম বিবাহের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পুরুষকে চারটি বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করা, যুদ্ধে বন্দি কাফিরদের দাসে পরিনত করা, বাল্যবিবাহ বৈধ হওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে আপত্তি-অভিযোগ ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা হলে তা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে এবং এই ব্যক্তির অন্যান্য আমল-আখলাক যতই সৌন্দর্যমন্ডিত হোক তাতে তার কোনোই লাভ হবে না।

♦ ***আল্লাহর বিধানের উপর প্রথম আপত্তি উত্থাপন করেছিল ইবলীস***

আল্লাহ ﷻ যখন তাকে আদম ﷺ এর উদ্দেশ্যে সাজদা করতে আদেশ করলেন এবং ইবলিস সে আদেশ পালন করলো না, তখন আল্লাহ ﷻ বললেন,

{قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ}

❮ আমি আদেশ করা সত্বেও তুমি কেনো আদমকে সাজদা করলে না? ❯

{قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ}

❮ ইবলিস বলল, আমি তার থেকে উত্তম যেহেতু আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন হতে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। ❯ [সূরা আ'রাফ / ১২]

অর্থাৎ সে আল্লাহর এই আদেশটিকে যথার্থ মনে করেনি। তাই আল্লাহ তাকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ}

﴿ সে সাজদা করতে অস্বীকার করলো এবং নিজেকে বড় মনে করলো। ফলে কাফির হয়ে গেলো। ﴾

[বাকারা/৩৪]

মোট কথা, ইবলিস আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হওয়ার কারণে কাফির হয়েছিল এমন নয়। যেহেতু আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হওয়া কুফরী নয়। বরং সে আল্লাহর আদেশের উপর আপত্তি-অভিযোগ উপস্থাপণের কারণে কাফির হয়েছিল।

মালেকী মাযহাবের ফিকাহ গ্রন্থ মুখতাসারুল খলীলের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

أَوَّلُ مَنْ كَفَرَ إبْلِيسُ بِنِسْبَتِهِ الْجَوْرَ لِلْبَارِي حَيْثُ قَالَ { : أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ } وَلَيْسَ كُفْرُهُ بِالْمُخَالَفَةِ وَامْتِنَاعِهِ مِنْ السُّجُودِ

প্রথম কুফরী করেছে ইবলিস যেহেতু সে আল্লাহর আদেশকে অন্যায় বলে দাবি করেছে। সে বলেছে, আমি তো আদম অপেক্ষা উত্তম আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন হতে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। ইবলিসের কাফির হওয়াটা সাজদা না করা বা আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কারণে নয়।

[ইমাম আল খারাশী কৃত মুখতাসার আল খলীলের ব্যাখ্যা]

♦ ***যুগে যুগে শয়তানের দোসরদের পক্ষ থেকে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে যুক্তি উপস্থাপণ।***

শয়তান আদম عليه السلام কে সাজদা করতে অস্বীকৃতি জানানোর পর আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করেন এবং জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেন। সে বলে, যার কারণে আপনি আমাকে পথহারা করলেন আমিও তাদের পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো। [হিজর/৩৯] এ সংকল্পের বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইবলিস সর্বদা স্বচেষ্ট রয়েছে। মানুষকে বিভিন্ন প্রকার পাপাচারে লিপ্ত করার পাশাপাশি যেভাবে সে নিজে কাফিরে পরিনত হয়েছে আদম সন্তানকে সেই একই কুফরীতে লিপ্ত করার জন্য বিভিন্ন কৌলশের আশ্রয় নিয়ে থাকে। আল্লাহর বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে সে মানুষের অন্তরে নানা প্রকারের আপত্তি অভিযোগ উপস্থাপণ করে। তার প্ররোচনায় কিছু লোক আল্লহর বিধানকে অকার্যকর সাব্যস্ত করে কাফিরে পরিনত হয়।

যখন আল্লাহ سبحانه وتعالى মৃত জন্তুর মাংস হারাম করলেন এবং আল্লাহর নামে জবেহকৃত পশুর মাংস হালাল করলেন তখন শয়তানের প্ররোচনায় মক্কার মুশরিকবা মুসলিমদের সাথে যুক্তির মাধ্যমে তর্কে লিপ্ত হলো। তারা বলল,

أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله

এটা কেমন কথা যে, তোমরা নিজেরা হত্যা করে খাও অথচ আল্লাহ হত্যা করলে (এমনি মারা গেলে)

খাও না। [তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি]

এ কথায় কোনো কোনো মুসলিম প্রভাবিত হয়ে যায় এই পরিপেক্ষিতে আল্লাহ ﷻ নাযিল করেন,

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}

তোমরা অবশ্যই খাবে না যে পশু আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়নি তার মাংস। আর শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্ররোচিত করে তোমাদের সাথে (আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে) তর্ক-বিতর্ক করার জন্য। যদি তোমরা তাদের মেনে নাও তবে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। [সূরা আনআম /১২১]

অর্থাৎ যারা আল্লাহর বিধানকে ত্রুটিপূর্ণ আখ্যায়িত করে তাদের সাথে একমত হলে ঈমান ভঙ্গ হবে।

এমনিভাবে সুদকে হারাম করা হলে একদল লোক বলে,

{إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}

বেচা-কেনা আর সুদ তো একই জিনিস। [বাকারা / ২৭৫]

তাদের যুক্তি ছিল বেচা-কেনাতেও লাভ হয় সুদেও লাভ হয় এতে পার্থক্য কি? বর্তমানে কেউ কেউ বলে আমি যে একজন ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করছি এটা কি তার উপকার করা নয়। যদি উপকার করাই হয় তবে সেই উপকারের বিনিময়ে কিছু টাকা বেশি গ্রহণ করতে দোষ কি? এই সকল যুক্তি-তর্ক কুফরী হিসেবে গণ্য।

বর্তমানেও দেখা যায় কিছু নাস্তিকমনা লোক ইসলামের বিভিন্ন বিধি বিধানের উপর আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। চোরের হাত কাটা, জেনাকারীকে বেত্রাঘাত করা বা রজম করা, কিসাস ইত্যাদি আইনকে তারা বর্বরতা ও অসভ্যতা হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। ইসলামের দাস প্রথা, নারী নীতি ইত্যাদি বিষয়কে মানবতা বিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করে। মুসলিম যুবকদের একটি অংশ এই সব প্রচার-প্রসারে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। তাদের কেউ কেউ এসব বিষয়ে কোনো না কোনো ভাবে নাস্তিকদের পক্ষাবলম্বন করে ঈমানহারা হয়েছে। আবার অন্য একদল পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন না করেই নাস্তিকদের সাথে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে নানাবিধ ভুল-ভ্রান্তি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। মুসলিম যুবকদের ঈমান-আক্বীদা রক্ষার জন্য ঐ সকল আপত্তি-অভিযোগের সদুত্তোর প্রদান করা একান্ত জরুরী। এখানে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই। তবে নিচে এই সকল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

♦ ***ইসলামী আইন, মানবতার সমাধান।***

এক শ্রেণীর আধুনা চিন্তাবিদ বর্তমান যুগের সার্বিক সমস্যার সামাধানে ইসলামী আইনকে যথাযোগ্য বিবেচনা করে না। তারা যুগের চাহিদা অনুযায়ী মস্তিষ্কপ্রসূত বিধি-বিধান প্রনয়ন ও প্রয়োগ করার পক্ষে দৃঢ় সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে থাকে। এরা ইসলামী আইনকে অত্যাধিক কঠোরাতা ও বর্বরতার দোষে দুষ্ট মনে করে। এই সকল লোকেরা কোনো কোনো মহলে বুদ্ধিজীবি হিসাবে স্বীকৃত হলেও আসলে এরা বিকৃত চিন্তাধারা এবং ইসলাম বিদ্বেষী চেতনা দ্বারা প্রভাবিত। এদের চক্ষু অন্ধ এবং অন্তকরণ আবদ্ধ ফলে এরা আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের যথার্থতা অনুধাবনে সক্ষম নয়। চোর-ডাকাত, খুনি-ধর্ষক ইত্যাদি অপরাধীদের উপর কঠোরতা করা হলে এদের দৃষ্টিতে অমানবিক হয় কিন্তু দু-একজন ভয়ংকর অপরাধী যখন সারা দেশের মানুষের আরামের ঘুম হারাম করে দেয়। তাদের সহায়-সম্পদ, জীবন-জীবিকা ও মান-মর্যাদার জন্য হুমকী হয়ে দাড়ায়। সেটা এদের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক ঘটনা। যেনো চোর-ডাকাত, খুনি ও সন্ত্রাসীরাই মানুষ আর অন্যরা জন্তু জানোয়ার! মানুষের বৈশিষ্ট্যই এমন। কোনো একটি বিষয়ে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করতে মানুষ সক্ষম নয়। যেহেতু সে বিষয়টি সার্বিকভাবে অবগত নয় এবং সর্বসাকুল্যে অনুধাবন করতেও সক্ষম নয়। একজন চোর বা ডাকাত যখন বিচারের মুখোমুখি হয় তখন অনেকের অন্তর তার দুরাবস্থা দেখে ব্যথিত হয়ে ওঠে কারণ সেই একই সময় তার এটা স্মরণ থাকে না যে এই ব্যক্তি কত শত মানুষকে দুর্ভোগে পতিত করেছে। এই ব্যক্তির উপর নমনিয়তা প্রদর্শনের ফলে সমাজে এই ধরণের ব্যক্তিদের বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া হয় সেটিও এদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। তাই দেলে যত দয়া আছে এদের উপর ঢেলে দেয়। এভাবে তারা অজ্ঞতাবশত মানব সমাজকে এক ভয়ানক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। এরা আরো একটি মৌলিক বিষয়ে অবগত নয়। আর তা হলো “আইন তৈরী করা হয় অপরাধ বন্ধ করার জন্য দেশের সকল জনগনকে আইনের ফাঁদে ফেলে শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়।” অতএব শাস্তি হতে হবে এমন দৃষ্টান্তমুলক যাতে তার ভয়ে মানুষ অপরাধ হতে দূরে থাকে। কিন্তু যদি চুরি-ডাকাতী, জেনা-ব্যাভিচার, খুন-ধর্ষন ইত্যাদি বড়-বড় অপরাধের শাস্তি হয় জেল-জরিমানার মতো মামুলি বিষয় তবে অপরাধের পরিমান ক্রমে বাড়তে থাকবে এবং এক পর্যায়ে দেশের সকল জনগন বা কমপক্ষে বেশিরভাগ জনগনকে কোনো না কোনো অপরাধে শাস্তি প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। এভাবে গণহারে শাস্তি দেওয়ার পরও দেশের শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। যেমনটি আমরা বর্তমানে স্বচক্ষে অবলোকন করছি। এই সকল নির্বোধ বুদ্ধিজীবীরা এই বিশৃঙ্খল সামাজিক অবস্থা দেখে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা মনে করে, চোরের হাত কাটা হলে দেশের অধিকাংশ লোকের হাত কাঁটা পড়বে। সম্ভবত এরা নিজেদের হাত সম্পর্কেও একই আশঙ্কা পোষণ করে। যেহেতু কোনো না কোনো ভাবে এরাও দুর্নীতির সাথে জড়িত। এরা এতটুকু চিন্তা করতেও সক্ষম নয় যে, একজনের হাত কাটা হলে অন্তত দশ জন চোর চুরি করা ছেড়ে দিয়ে ভাল মানুষে পরিনত হবে। ফলে

গুটি কয়েক অপরাধীর উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হলে অপরাধ প্রশমিত হবে এবং দেশ ও দশের কল্যাণ হবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে ইসলাম অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ ও তা কার্যকর করার ব্যাপারে বেশ কিছু মূলনীতি অনুসরণ করেছে। যেমন,

১. অপরাধ প্রমাণিত হলে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা, যাতে অপরাধ প্রবণ অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় এবং অপরাধ থেকে ফিরে থাকে। এ কারণেই মহান আল্লাহ চোরের হাত কেঁটে দেওয়া, হত্যার বিনিময়ে হত্যা তথা কিসাস, এবং জেনাকারীকে বেত্রাঘাত করা বা বিবাহিত হলে রজম করা (পাথর মেরে হত্যা করা) ইত্যাদি কঠোর বিধান প্রণয়ন করেছেন। এই সকল বিধান কার্যকর করার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। হত্যার বিনিময়ে হত্যা তথা কিসাস সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

﴾ ওহে বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তোমাদের জন্য কিসাসের বিধানে জীবন নিহিত রয়েছে। যাতে করে তোমরা বিরত হও। ﴿ [বাকরা/১৭৯]

এই আয়াতের শেষের অংশে (تتقون) শব্দটির অর্থ হয় বিরত হওয়া বা নিরপত্তা অর্জন করা। অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যার বিধান দেওয়া হয়েছে যাতে হত্যাকারী হত্যা হতে বিরত হওয়ার মাধ্যমে নিজের প্রাণ রক্ষা করে এবং অন্য সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা পায়। এভাবে সমাজে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহর কোনো একটি বিধান দ্বারা বিচার করা আল্লাহর জমিনে চল্লিশ রাত বৃষ্টি হওয়া অপেক্ষা অধিক কল্যাণকর। [৬৩] [ইবনে মাযা]

২. অপরাধ সংঘঠিত ও প্রমাণিত হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব সেটার শাস্তি কার্যকর করতে হবে। এবিষয়ে গড়িমসি করা বা টালবাহানা করা যাবে না। অপারাধীর প্রতি দয়াবরবশ বা তার ধন-সম্পদ ও বংশ গৌরবের কারণে তাকে শাস্তি হতে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না।

জেনাকারীর শাস্তি বর্ণনার পর আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}

---

[৬৩] শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন [সহীহু ইবনে মাযা/২০৫৬]

﴾ আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে যেনো তোমরা তাদের উপর দয়া প্রদর্শন না করো। ﴿ [নুর/২]

রসুলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় একবার এক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করলে কেউ কেউ উসামা ইবনে যায়েদ رضي الله عنه এর মাধ্যমে রসুলুল্লাহর এর নিকট উক্ত মহিলার হাত না কাঁটার ব্যাপারে সুপারিশ করলে রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

তুমি কি আমার নিকট আল্লাহর একটি বিধান পরিত্যাগ করার সুপারিশ করতে এসেছো? এরপর তিনি দাড়িয়ে যান এবং মানুষের সামনে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে। এর কারণ তারা সম্ভ্রান্ত লোক চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিতো আর নিম্নশ্রেণীর লোক চুরি করলে তার উপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করতো। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করতো তবু আমি তার হাত কেঁটে দিতাম। [বুখারী ও মুসলিম]

অপরাধ সংঘঠিত হওয়ার পরই সেটার শাস্তি বিধান করা হলে যার উপর অপরাধ করা হয়েছে সে শান্তি পায় এবং অপরাধীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয় কিন্তু অপারাধ প্রমাণিত হওয়ার পরও অকারণে সেটার শাস্তি কার্যকর করার ব্যাপারে টালবাহানা করা হলে অপরাধী বিভিন্ন কৌশল কসরতে ছাড়া পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ সুবিচার পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে যায় আর অপরাধীচক্র স্বক্রিয় হয়ে ওঠে।

৩. যখন একজন অপরাধীর উপর শাস্তি কার্যকর করা হয় তখন যথাসম্ভব সেটাকে কাজে লাগিয়ে অপরাধীদের ভীত সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করতে হবে। যাতে তারা এ ধরণের অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে এবং কাউকে এধরণের বিচারের সম্মুখীন হতে না হয়। একারণে আল্লাহ্ سبحانه وتعالى জেনাকারীর উপর শাস্তি প্রয়োগ সম্পর্কিত আলোচনাতে বলেন,

{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}

﴾ তাদের শাস্তি প্রদানের সময় একদল মুমিন যেনো সেখানে উপস্থিত থাকে। ﴿ [নুর:২]

জনসম্মুখে শাস্তি প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হলো একজন ব্যক্তিকে যখন শাস্তির সম্মুখীন করাই হচ্ছে তখন তার মাধ্যমে যতটা সম্ভব অন্যকে শিক্ষা দেওয়া। যাতে জনসাধারনকে গণহারে শাস্তির সম্মুখীন হতে না হয়। সামান্য চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই এটা অনুধাবন করা সম্ভব যে, অপরাধ দমনে কঠোর আইন এবং সে আইনের কঠোর প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই। এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে যেসব বুদ্ধিজীবীরা অপরাধীর উপর লঘু শাস্তি প্রয়োগ বা বেকসুর খালাস দেওয়ার পক্ষে কথা বলেন তারা সম্ভবত নিজেরাই

অপরাধচক্রের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। একারণে স্বজাতির প্রতি সহৃদ্যতা দেখানোর ব্যাপারে তারা বদ্ধপরিকর। কথায় বলে, চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই।

♦ *ইসলামে যুদ্ধ-বিগ্রহ তথা জিহাদ বা কিতাল*

ইসলাম সম্পর্কে এক শ্রেণীর লোকের আপত্তি হলো, এটা মানুষকে মারা-মারি, হানা-হানি করতে উৎসাহিত করে। এ বিষয়ে কথা হলো, অকারণে খুনো-খুনি, হানা-হানি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

যে ব্যক্তি অন্ধকার পতাকাতলে যুদ্ধ করে, অন্যায়ভাবে নিজের গোত্রের পক্ষে উত্তেজিত হয়ে ওঠে অথবা গোত্রপ্রীতির দিকে মানুষকে ডাকে এবং অন্যায়ভাবে স্বগোত্রীয়দের সহযোগিতা করে সে যদি এভাবে মারা যায় তবে তার মৃত্যু হবে জাহেলী মৃত্যু। [সহীহ মুসলিম]

এখানে অন্ধকার পতাকা বলতে বোঝানো হয়েছে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাড়া বা নিতান্ত মামুলী কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে পড়া। যেমনটি ইসলামপূর্ব আরব সমাজের নিত্যকার ঘটনা ছিল এবং বর্তমানে অহরহ ঘটে থাকে।

একজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে প্রশ্ন করলেন, কেউ তো যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রকাশের জন্য আবার কেউ যুদ্ধ করে সম্পদ হাসিল করার জন্য। এদের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে কে? রসলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

যে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যুদ্ধ করে সেই মূলত আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে।

[বুখারী ও মুসলিম]

ইসলাম আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধ করতে আদেশ করে। যেসব মানুষ আল্লাহর জমিনে বসবাস করে, আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক ভক্ষণ করে কিন্তু আল্লাহর উপর ঈমান আনে না এবং সত্য ধর্ম ইসলাম কবুল করে না তাদের সামনে তিনটি পথ খোলা রয়েছে। হয়তো তারা মুসলিম হয়ে যাবে অথবা জিজিয়া প্রদান করে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করবে নয়তো মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}

﴾ ঐ সকল আহলে কিতাবীদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তার রসুল যা হারাম করেছন তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করে না, এবং সত্য দ্বীনকে গ্রহণ করে না। যতক্ষণ না তারা অপমানিত অবস্থায় স্বহস্তে জিজিয়া কর প্রদান করে। ﴿ [সূরা তাওবা/২৯]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপণ না করা পর্যন্ত আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে। [বুখারী ও মুসিলম]

এ স্থানে কাফিররা আপত্তি করে বলে, ইসলাম একটি অসহিষ্ণু ধর্ম। অন্য ধর্ম ও তার অনুসারীদের প্রতি যথেষ্ট পরিমান শ্রদ্ধা-সম্মান ও সহানুভুতি প্রদর্শন করা উচিৎ। প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ও অধিকার থাকা উচিৎ ইত্যাদি। এদের প্রচারে প্রতারিত হয়ে কিছু কিছু চৈতন্যহীন ইসলামী চিন্তাবিদ জিহাদের বিধানটির অপব্যাখ্যা করে থাকেন। তারা বলেন, জিহাদ কেবল আত্মরক্ষার জন্য হয়ে থাকে, দ্বীন রক্ষার জন্য নয়। মুসলিমদের দেওয়ালে পিঠ না ঠেকা পর্যন্ত তারা অস্ত্র ধরে না। অর্থাৎ কাফিররা আল্লাহর দ্বীনের যা কিছু ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করুক তাতে মুসলিমদের টনক নড়েনা যতক্ষণ না তাদের পিঠ ও পেটে আঘাত করা হয়। এরা সমস্ত মুসলিমদের নিজেদের মতো দুনিয়া লোভী ও স্বার্থান্বেষী মনে করে থাকে। অথচ আয়েশা রাঃ বলেন,

وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا

রসুলুল্লাহ্ ﷺ তার নিজের ব্যাপারে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না তবে আল্লাহর দ্বীনের অবমাননা করা হলে তিনি আল্লাহর জন্য সেটার প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। [সহীহ বুখারী]

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট তার নিজের জীবন অপেক্ষা আল্লাহ্র দ্বীন বেশি প্রিয় ছিল। ফলে তিনি আত্মরক্ষার তুলনায় দ্বীন রক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করতেন বেশি। কিন্তু বর্তমন সময়কার অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে অধিক সচেতন। তাই তারা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য লড়াই করতে অস্বীকার করেন। তবে নিজের পেট ও পিঠ রক্ষার তাগিদে লড়াই করতে হলে সদা সর্বদা প্রস্তুত আছেন। এ বিষয়টিকে উদারতা বলা সঠিক নয় বরং এটা উদরতা বা পেট পূজা হিসেবে গণ্য।

কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো, মুসলিমরা ইসলামকে একমাত্র সত্য ধর্ম বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম ও মতকে শিরক ও কুফর তথা জাহেলিয়াতের অন্ধকার ও দুর্গন্ধময় আক্বীদা-বিশ্বাস বলে মনে করে। প্রতিটি মুসলিম মনে প্রাণে ইসলামের বিজয় ও কুফরীর ধ্বংস কামনা করে। যার অন্তরে এই সব ব্যাপারে সামান্য পরিমান সন্দেহ বা সংশয় অবশিষ্ট আছে সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

যারা অন্য ধর্ম ও তার অনুসারীদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন ও তাদের নিজ নিজ মতের উপর স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে তারা মনে করে সকল ধর্মই মানব রচিত। এখানে সত্য-মিথ্যা বলে কিছু নেই। বরং এগুলো কিছু মানুষের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়। অতএব, একজনের উচিৎ নয় নিজের মত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া। বরং এ ব্যাপারে একে অপরকে যতদূর সম্ভব ছাড় দিতে হবে। ধর্ম ও মতের উর্দ্ধে এসে সকল মানুষকে সমানভাবে বিচার করতে হবে।

অপরদিকে ইসলাম অন্য ধর্মের লোকদের উপর আক্রমন করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে বা কমপক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন প্রকার শর্ত মেনে নিয়ে জিজিয়া কর প্রদান করতে বাধ্য করে কারণ ইসলাম হলো, মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ জীবন বিধান। আর অন্য সকল ধর্ম হলো মানব রচিত ও মস্তিষ্কপ্রসূত। যারা এই বিষয়টিকে অসহিষ্ণু হিসেবে গণ্য করে তাদের নিকট প্রশ্ন হলো, সত্য কি কখনও মিথ্যাকে সহ্য করে? সত্য কি চায় মিথ্যা স্বাধীনভাবে বিকশিত হোক? যখন স্পষ্ট জানা যায় কোনো একজন ডাক্তার ভুল পদ্ধতিতে রোগী চিকিৎসা করে থাকে তখন তাকে সহ্য করা উচিৎ নাকি বাঁধা দেওয়া উচিৎ? মিথ্যাকে সহ্য করা ও সম্মান করাই কি সঠিক চিন্তাধারা নাকি মিথ্যাকে ধ্বংস করা ও বাধাগ্রস্থ করা?

সত্যকে বিজয়ী করা ও মিথ্যা ও অন্যায়কে ধ্বংস করাই বীরত্বের পরিচয়, অন্যায়কে সহ্য করা নয়। এটা সর্বস্বীকৃত একটি মূলনীতি। এ বিষয়ে লম্বা আলোচনার প্রয়োজন নেই। এখন বাকী থাকে কেবল একটি কথা আর তা হলো ইসলাম একমাত্র সত্য ধর্ম আর অন্য সকল ধর্ম ভ্রান্ত কিনা? যারা এটা বিশ্বাস করে না তারা সকল ধর্মকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করার মতবাদ প্রচার করে। কিন্তু যারা মনে-প্রাণে ইসলামকে একমাত্র সত্য ধর্ম হিসেবে বিশ্বাস করে আর কুফরীকে সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট অপরাধ বলে মনে করে তাদের পক্ষে ঐ ধরণের মতবাদে বিশ্বাস স্থাপণ করা সম্ভব নয়। সেটা যৌক্তিকও নয়।

অতএব, যারা কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের জিহাদ বা যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে তাদের সাথে প্রথমেই যুদ্ধের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে ইসলাম ধর্মের সত্যতা ও সকল কুফরী মতবাদের বাতুলতা সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। যদি সে ইসলামকে সত্য ও সঠিক ধর্ম হিসবে স্বীকার না করে তবে তার সাথে ভিন্ন কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। আর যদি সে মেনে নেই যে, ইসলাম একটি

সত্য ধর্ম তবে তার নিকট দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে, সত্য ও সঠিক ধর্ম হিসেবে ইসলামের কি করা উচিৎ? মিথ্যা ও বাতিল সকল কুফরী মতবাদকে সহ্য করা না কি ধ্বংস করা? যদি সে উত্তর দিতে সক্ষম না হয় বা উত্তর দিতে না চায় তবে তাকে এই হাদীসটি শোনাতে হবে,

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ

আমিই বিনাশকারী যার মাধ্যমে আল্লাহ্ কুফরীকে বিনাশ করবেন। [সহীহ্ বুখারী]

♦ *ইসলামে দাস প্রথা*

কাফির-মুশরিকরা ইসলামের যেসব বিষয়ে জোর আপত্তি-অভিযোগ উত্থাপন করে ‘‘দাসপ্রথা’’ তার মধ্যে একটি। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে টাকার বিনিময়ে ক্রয় করবে এবং তাকে দাস হিসেবে গণ্য করবে ব্যাপারটি শোনা মাত্র কিছু লোক হৈ-চৈ করে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক মুসলিমকে বলতে শোনা যায়, ইসলামে দাসপ্রথা একসময় ছিল কিন্তু এখন সেটা মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। কেউ আবার বিভিন্নভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন আসলে ইসলামে দাসপ্রথা বলে কখনও কিছু ছিল না। এরা কেউই এ বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানে না বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ খেয়াল খুশি মতো কথা বলে।

সত্য কথা হলো, একটি বিশেষ পরিসরে ইসলামে দাসপ্রথার অনুমতি রয়েছে। তবে সেটি সূদূর অতীতে বা হাল আমলে পৃথিবীর অন্য যে কোনো স্থানে প্রচলিত দাসপ্রথা অপেক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা ও অনন্য। মূলত দুটি দিক সম্পর্কে অবহিত হলে ইসলামে দাস প্রথার প্রকৃত স্বরুপ জানা সম্ভব হবে।

ক) কিভাবে একজন ব্যক্তি দাস হিসেবে গণ্য হয়?

খ) দাস হওয়ার পর তার সাথে কিরুপ আচরণ করা হয়?

আরব সমাজে রসুলুল্লাহ ﷺ আগমন করার পূর্ব থেকেই দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। তারা একে অপরকে দাস বানানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিষিদ্ধ পন্থা-পদ্ধতির অনুসরণ করতো। যেমন, কাউকে চুরি করে বেঁচে দেওয়া বা কোনো অসহায় লোককে একা পেয়ে তাকে বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করা, [৬৪] ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করা, কারণে-অকারণে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া এবং যুদ্ধ বন্দিদের দাসে পরিনত করা ইত্যাদি। একজন ব্যক্তিকে দাসে পরিনত করার এই সব পদ্ধতির মধ্যে বেশিরভাগই ইসলামে

---

[৬৪] যেভাবে ইউসুফ عليه السلام কে কিছু লোক কুয়া থেকে উদ্ধার করে বেঁচে ফেলেছিল [সূরা ইউসূফ/১৯-২০]

কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তিনজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি নিজে অভিযোগ করবো ..। এরপর তিনি তিনজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন এদের একজন হলো, (رجل باع حرا فأكل ثمنه) "যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করে" [সহীহ্ বুখারী] এই হাদীসটির মাধ্যমে কাউকে চুরি করে বা অসহায় অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করা বা নিজে দাস হিসেবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একইভাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে দাসে পরিনত করাও এই হাদীসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইবনে হাযার আসক্বালানী ﷺ ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে দাস হিসেবে বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করা সংক্রান্ত আলোচনাতে বলেন, (واستقر الإجماع على المنع) "এ বিষয়টি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে" [ফাতহুল বারী]

ইসলাম দাসপ্রথার এই সকল পন্থা-পদ্ধতিগুলো নিষিদ্ধ করার পর কেবল দুটি পদ্ধতি অবশিষ্ট রেখেছে যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি দাস হিসেবে গণ্য হতে পারে।

ক) যুদ্ধবন্দি নারী-পুরুষ বা শিশুদের দাস হিসেবে গ্রহণ করা, যদি মুসলিমদের খলীফা তাদের দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

খ) দাসীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তান জন্মানোর পর দাস হিসেবে গণ্য হওয়া।

এছাড়া একজন ব্যক্তি যে কোনো কারণে নিজেই নিজেকে কারো দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। হযরত উমর ﵁ ও হযরত আলী ﵁ হতে এ বিষয়টির বৈধ হওয়ার মত বর্নিত আছে। [ফাতহুল বারী]

যুদ্ধবন্দি নারী-পুরুষ বা শিশুদের দাস হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে মৌলিক কথা হলো ইসলাম মানুষকে দাস বানানোর জন্য যুদ্ধ করে না বরং কাফির-মুশরিকরা মুসলিমদের উপর আক্রমন করলে আত্মরক্ষার জন্য এবং তারা আক্রমণ না করলেও তাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া অথবা জিজিয়া প্রদান করে ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার জন্য মুসলিমরা যুদ্ধ বিগ্রহ পরিচালনা করে থাকে।

অর্থাৎ মুসলিমরা সাধারনত কাফির-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকে। অনেক সময় যেসব মুসলিম খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অথবা মুসলিম হওয়ার পরও কোনো ফরজ দায়িত্ব যেমন নামায-রোজা, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি পালন করতে অস্বীকার করে তবে মুসলিমরা খলীফার পক্ষাবলম্বন করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকে। যেমনটি হয়েছিল, আবু বকর ﵁ এর সময় যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে। এক্ষেত্রে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, মুসলিম বিদ্রোহী বা পাপাচারী ব্যক্তিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যকার নারী-পুরুষ বা শিশু কাউকে দাস বানানো যাবে না। দাস বানানো হবে কেবল কাফির-মুশরিক

যুদ্ধবন্দীদের।

যেসব কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করে না এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে না বরং মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদের মধ্যকার যুদ্ধবাজ পুরুষদের ব্যাপারে মুসলিমরা চার টি সিদ্ধান্তের যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারে,

ক) তাকে হত্যা করা

খ) তাকে দাস হিসেবে গ্রহণ করা

গ) তাকে কিছু মুক্তিপনের বিনিময়ে বা অন্য কোনো মুসলিম বন্দিকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত করার বিনিময়ে কাফিরদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া।

ঘ) তাকে বিনা মূল্যে ছেড়ে দেওয়া।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যেহেতু সাধারনত তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। তাদের ব্যাপারে বিধান হলো বন্দি হওয়ার সাথে সাথেই শিশুরা মুসলিম হিসেবে গণ্য হয় যেমনটি আমরা এই গ্রন্থের শুরুতে আলোচনা করেছি আর নারীরা তাদের নিজ নিজ ধর্মের উপর টিকে থাকার স্বাধীনতা পায়। অতএব কাফির-মুশরিকদের নাবালেগ ছেলে-মেয়েরা মুসলিমদের হাতে বন্দি হওয়ার মাধ্যমে মুসলিমে পরিণত হলে, তাদের ব্যাপারে উপরোক্ত চারটি পদ্ধতির মধ্যে কেবল দুটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। তাদের হয়তো দাস বানানো হবে অথবা মুক্ত ভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়া হবে। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে হত্যা করা ছাড়া অন্য যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে অর্থাৎ তাদের বিনাশর্তে মুক্ত করা যাবে, কাফিরদের নিকট থেকে কিছু মুক্তিপণ গ্রহণ করে বা অন্য কোনো মুসলিমকে মুক্ত করার শর্তে তাদের কাফিরদের হাতে অর্পণ করা যাবে এবং তাদের দাসী বানানো যাবে।

এখন যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে বা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতা করেছে বন্দি হওয়ার পর তাদের দাস বানানো হলে সেটা তাদের উপর স্পষ্ট দয়া করা ছাড়া কিছু নয় কেননা সেই ব্যক্তিকে হত্যা করাও বৈধ। যদি তাকে হত্যা ও দাস বানানোর মাঝে যে কোনো একটিকে বাছাই করার সুযোগ দেওয়া হয় তবে সে নিজেও হয়তো নিহত হওয়ার পরিবর্তে দাস হওয়াকেই বেছে নেবে। সুতরাং এই বিষয়টির যৌক্তিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

নারী ও শিশুদের দাস হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কথা হলো প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হবে কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা যুদ্ধ করে কেনো। কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনানুযায়ী এটা প্রমাণিত যে কাফিররা

হয়তো মুসলিম হবে অথবা বিনীতভাবে জিজিয়া প্রদানের মাধ্যম ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করবে। তাদের সাথে যুদ্ধ করে এ দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি আদায় করে নিতে হবে। কিন্তু যখন তারা আপোসে এটা মেনে না নিয়ে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের যে কেউ মুসলিমদের হাতে বন্দি হলে মুসলিমরা তাদের আপোসে কাফিরদের নিকট ফিরিয়ে দিতে পারে না।

এর প্রথম ও প্রধান কারণ মুসলিমরা কাফিরদের ইসলামে প্রবেশ করানো বা কমপক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুনের বশ্যতা স্বীকার করা তথা ইসলামী পরিবেশে বসবাস করে ইসলামের সৌন্দর্য অনুধাবন করার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যই যুদ্ধ করে থাকে। কাফিরদের স্ত্রী ও সন্তানদের হাতের নাগালে পেয়েও তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের ইসলামী পরিবেশে না রেখে পুনরায় কুফরীর পঁচা ডোবায় ফিরিয়ে দেওয়া মোটেও যৌক্তিক হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় রয়েছে, তাদের হত্যা করছে, তাদের সন্তানদের পিতৃহারা ও মায়েদের সন্তানহারা করছে। সুযোগ পেলে মুসলিম নারী ও শিশুদের হত্যা ও মানহানী করছে তাদের কলিজার টুকরো স্ত্রী-সন্তানদের হাতে পাওয়ার পরও বিনা বাধায় ফেরত দেওয়া অর্থ হলো ঐ সকল কাফিরদের দীর্ঘ সময় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মতো মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়া। যেহেতু তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকবে যে, মুসলিমরা আমাদের নারী ও শিশুদের কোনো ক্ষতিই করবে না। ফলে একটা বড় গুরুদায়িত্ব তাদের কাঁধ থেকে নেমে যাবে। শত্রুকে এই ধরনের উদারতা প্রদর্শন নিরেট বোকার পরিচয় ছাড়া কিছু নয়। যারা চিলে কোঠায় বসে সাহিত্য চর্চা করেন এবং কাগজ-কলমে দীগিজয় করেন তারা এসব নীতিবাক্য ফলাও করে প্রচার করতে পারেন কিন্তু যুদ্ধের ময়দান সম্পর্কে যার অভিজ্ঞতা আছে সে জানে কিভাবে শত্রুকে মানসিক চাপে রেখে যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে হয়। তার পক্ষে এমন বোকামী করা সম্ভব নয়।

এছাড়া আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। তা হলো, কোনো এলাকায় যুদ্ধ পরিচালনা করার মাধ্যমে সেটা দখল করার পর কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সেখানকার যুদ্ধবাজ সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে বা দাস বানানো হবে। সে ক্ষেত্রে সেখানকার নারী ও শিশুদের দায়িত্বভার কে গ্রহণ করবে?

ইসলামী ভাবধারার সাথে সঙ্গতি রেখে চিন্তা করলে দেখা যাবে কাফিরদের নারী ও শিশুরা বন্দি হওয়ার পর তাদের পুনরায় কুফরীর অন্ধকারে ফিরিয়ে দেওয়া সঠিক নয় বরং তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিতে হবে এটাই সঠিক। কিন্তু এত ব্যাপক সংখ্যক নারী ও শিশুকে ইসলামী রাষ্ট্রে কিভাবে স্থান দেওয়া হবে? তাদের কর্ম সংস্থান কি হবে এবং তাদের দায়িত্বভার কার উপর অর্পণ করা হবে? এই সকল প্রশ্নের সমাধান আধুনা চিন্তাবিদদের নিকট নেই। তারা কেবল কিছু নীতিবাক্য প্রদান করেন।

সে নীতিবাক্য যতটাই অবাস্তব হোক তাতে তাদের কোনো যায় আসে না। তারা হয়তো বলবেন এই সকল বন্দিদের মেহমান হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রে রাখতে হবে, অথবা কোনো বন্দি-আশ্রম খুলে সেখানে তাদের বিনি-পয়সায় খাওয়া-পরা দিতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু এভাবে লক্ষ-লক্ষ বেকার মানুষের খোর-পোষের যোগান দিতে দিতে রাষ্ট্র যে এক সময় দেউলিয়া হয়ে যাবে সেটা এনাদের দৃষ্টিতে ধরে না। ইসলাম এ ক্ষেত্রে এমন একটি বিধান দিয়েছে যাতে এই সকল লোকেরা একটি রাষ্ট্রীয় বোঝা নয় বরং রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিনত হয়েছে। তাদের খোর-পোষ দেওয়ার জন্য কাউকে বাধ্য করতে হচ্ছে না বরং মানুষ স্বেচ্ছায় আগ্রহভরে তাদের গ্রহণ করছে, তাদের যথাযোগ্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে এবং এভাবে স্বয়ংক্রিয় পন্থায় তাদের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই ব্যবস্থাটি হলো কোনো একজন ব্যক্তিকে অন্য আরেকজনের উপর স্থায়ী কর্তৃত্ব দেওয়া। সে তার ভাল-মন্দ দেখা-শোনা করবে এবং তাকে যথাযোগ্য কাজে লাগাবে। তার সাথে সর্বপ্রকারের সদাচারন করবে। এই ব্যক্তি হলো ঐ ব্যক্তির কর্তা বা সায়্যিদ (سيد) আর এই বিষয়টিকেই বলা হয় দাস প্রথা। দাস অর্থ একজন মানুষকে গরু-ছাগলের মতো চতুষ্পদ জন্তু হিসেবে গণ্য করা নয় বরং তাকে একজন মানুষের পরিপূর্ণ অধিকার দেওয়া হবে। তবে তার উপর আরেকজনের কর্তৃত্ব দেওয়া হবে যাতে সে তাকে পরিচালিত করে।

আবু জর ﷺ একবার তার এক দাসকে গালি দিলে রসুলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন,

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

এরা হচ্ছে তোমাদের ভাই। তোমাদের উপর তাদের দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। যার অধীনে তার এক ভাই থাকে সে নিজে যা খায় তাকে তাই খাওয়াবে এবং নিজে যা পরিধান করে তাকে তাই পরাবে। তাদের এমন কোনো কাজ দেবে না যা তারা করতে সক্ষম নয় যদি তেমন কোনো কাজ করার প্রয়োজন হয় তবে তাকে সহযোগিতা করবে।

[বুখারী ও মুসলিম]

এই হচ্ছে ইসলামের ''দাস প্রথা''। এই সদাচরণ ও সুবিচারকে যারা নিন্দা করেন তারা যুদ্ধ বন্দিদের ব্যাপারে কি আচরণ করেন সেটা লক্ষ্য করা যেতে পারে। দীর্ঘকাল সংকির্ণ প্রকোষ্ঠে আটকে রেখে নির্যাতন করা, কঠিন কঠিন দায়িত্ব অর্পন করা ও তা সম্পন্ন করতে বাধ্য করা, কারণে-অকারণে শাস্তির সম্মুখীন করা এই হচ্ছে যুদ্ধ-বন্দীদের সাথে তাদের মানবিক আচরণ! যারা এই প্রকার আচরণকেই পছন্দ করে আর ইসলামের দাস প্রথাকে নিন্দা করে তাদের বিকৃত মস্তিষ্কের এই চিন্তাধারাকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনোই কারণ নেই।

এটা গেল যুদ্ধ বন্দিদের ব্যাপারে। এখন দাসীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানকে দাসে পরিনত করার ব্যাপারে মূলনীতি হলো,

الْوَلَدَ يَتْبَعُ الأُمَّ فِي الْحُرِّيَّةِ ، وَالرِّقِّ

সন্তান দাসত্বের ব্যাপারে তার মাকে অনুসরণ করবে। [বাদাইউস্ সানায়ি]

অর্থাৎ যদি কোনো দাসী অন্য একজন দাস বা স্বাধীন পুরুষের সাথে বিবাহ করে তবে তার সন্তান দাস হবে কিন্তু যদি কোনো স্বাধীন মহিলা কোনো দাসের সাথে বিবাহ করে তবে তার সন্তান স্বাধীন বলেন গণ্য হবে।

তবে যদি কোনো ব্যক্তি তার নিজের দাসীকে শয্যাসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে আর তার গর্ভে সন্তান আসে তবে উক্ত সন্তান এবং ঐ দাসী উভয়ে মুক্ত হয়ে যাবে। এই দাসীকে বলা হয় "উম্মে ওয়ালাদ" (أم الولد)।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কোনো একজন দাসীর গর্ভে ইব্রাহীম নামে একটি পুত্র সন্তান হয়। পরবর্তীতে রসুলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত দাসী সম্পর্কে বলেন, (أعتقها ولدها) "তার সন্তানই তাকে মুক্ত করেছে" [ইবনে মাযা]

এই হাদীসটির সনদ ভীষণ দূর্বল। অন্য একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, (أم الولد حرة) "উম্মে ওয়ালাদ মুক্ত বলে গণ্য হবে" [দারে কুতনী]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কথা হিসেবে এটা দূর্বলভাবে বর্ণিত হয়েছে তবে উমর ؓ হতে মাওকুফভাবে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। [৬৫]

তবে এই হাদীসের মূলভাবের উপর উম্মতের ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন। আর তা হলো, যদি কেউ নিজ দাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম দেয় তবে তার মৃত্যুর পর উক্ত দাসী মুক্ত হয়ে যাবে।

মোট কথা, পুরুষ দাসকে কোনো স্বাধীন মহিলার সাথে বিবাহ দেওয়া হলে তার সন্তান স্বাধীন হিসেবে গণ্য হবে। নিজের দাসীর গর্ভে নিজেই সন্তান জন্ম দিলে সে সন্তান মুক্ত বলে গণ্য হবে, এবং ঐ সন্তানের মা তার মনিবের মৃত্যুর পর দাসত্ব হতে মুক্তি পাবে। কিন্তু যখন কেউ তার দাসীকে অন্য কোনো স্বাধীন পুরুষ বা দাসের সাথে বিবাহ দেয় কেবল তখন উক্ত দাসীর সন্তান তার মনিবের দাসে পরিনত হয়।

বিভিন্নভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। যেমন,

---

(৬৫) ইবনে হাযার আল-আসকালানী আত-তালখীসে একথা বলেছেন।

ক) সাধারনত পুরুষরা কর্মক্ষম হয়ে থাকে ফলে মানুষ তাদের ব্যবসা-বানিজ্য, চাষাবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার কাজে-কর্মে লাগাতে পারে। এভাবে দাসদের মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হতে পারে বিধায় তারা তাদের ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করে। নারীরা হয় এর বিপরীত। তাদের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা দেখেছি যুদ্ধে বন্দিদের একটি বিরাট অংশ হবে নারী ও শিশু যেহেতু বেশিরভাগ পুরুষ হয়তো যুদ্ধে নিহত হবে অথবা তাদের বন্দি করার পর বিভিন্ন অপরাধে হত্যা করা হবে। এই বিপুল সংখ্যক নারীকে যাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হবে তারা যদি কোনো ভাবে লাভবান না হতে পারে তবে তাদের দায়িত্বভার কেনো গ্রহণ করবে? এই লাভের একটি অংশ হলো তাদের গর্ভস্থ সন্তানকে নিজের কাজে লাগানোর আশা যেটাকে সামনে রেখে মানুষ এই সকল নারীদের দায়ভার গ্রহণ করত সম্মত হবে।

খ) একজন দাসীকে যখন কেউ নিজের শয্যসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে এবং নিজে তার উপকার ভোগ করে তখন সন্তান জন্মালে সেটা দাস হিসেবে গণ্য হবে না বরং সে সন্তান এবং তার মা উভয়ে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু অনেক সময় একজন ব্যক্তির অধীনে বহু সংখ্যক দাসী থাকতে পারে যাদের সবাইকে সে নিজের জন্য গ্রহণ করতে সক্ষম নয় বা সেটা তার ইচ্ছা নয়। এ অবস্থায় এ সকল নারীদের অন্যত্র বিবাহ দেওয়া একান্ত জরুরী যেহেতু তারাও মানুষ এবং স্বাভাবিক মানবিক চাহিদা তাদেরও আছে। কিন্তু অন্যত্র বিবাহ দেওয়া হলে উক্ত দাসীর মালিক দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির শিকার হবে। যেহেতু ঐ দাসী তার স্বামীর সহচর্যে থাকবে এবং তাদের সন্তান জন্মালে সে তার লালন-পালনে ব্যস্ত থাকবে। তার স্বামী তাকে তালাক না দেওয়া পর্যন্ত ঐ দাসীর মালিক তাকে ফেরত নিতে পারবে না। এমনও হতে পারে যে, হয়তো উক্ত দাসীটি একবার বিবাহ হওয়ার পর চিরকালের জন্য তার মনিবের আর কোনো উপকারেই আসবে না। এই ক্ষতির বিনিময়ে যদি উক্ত দাসীর মালিকের কোনো লাভ না থাকে তবে সে এতবড় ক্ষতি স্বীকার করে দাসীটিকে অন্যত্র বিবাহ দেবে না বা দিতে রাজি হবে না এটাই স্বাভাবিক। এভাবে ঐ সকল নারীদের স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত করা হবে। একারণে উক্ত দাসীর সন্তানকে তার মনিবের কর্তৃত্বের অধীন করা হয়েছে যাতে সে তাকে পরবর্তীতে নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে এবং এই আশাকে সামনে রেখে তার বিবাহের পথে বাধা হয়ে না দাড়ায় বরং নিজ আগ্রহে তার বিবাহের ব্যবস্থা করে।

এটা হলো, জন্মসূত্রে দাস হিসেবে পরিগনিত হওয়ার ব্যাখ্যা। এখন যে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে দাসে পরিনত করে আমরা পূর্বেই বলেছি, তার সম্পর্কে আলেমদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। যদি ধরেও নিই এটা বৈধ তবু বলতে হয় যে নিজেই নিজেকে দাসে পরিনত করতে সম্মত হয় তার ব্যাপারে আমাদের কি বলার আছে?

এখানে আরেকটি প্রশ্ন অনেকের মনে সৃষ্টি হতে পারে যে, বিবাহ না করেই দাসীদের শয্যাসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? এ বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার তেমন কোনো কারণ নেই। কেউ কেউ দাসী বলতে মনে করে কাজের মেয়ে। তারা বিষয়টিকে অবাস্তব মনে করে। কিন্তু দাসী বলতে সাধারন কাজের মেয়ে বোঝায় না বরং ঐ সকল নারীদের বোঝায় যারা কাফির অবস্থায় যুদ্ধে বন্দি হয় এবং খলীফা তাদের একেক জনকে একেক জন মুসলিমের দায়িত্বে অর্পন করেন। এ কর্তৃত্ব স্থায়ী। কোনো দাসী তার মনিবের ইচ্ছার বাইরে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করতে সক্ষম নয়। এভাবে কোনো নারী নিজের কর্তৃত্বাধীন হলে তাকে নিজের জন্য গ্রহণ করাও বৈধ অন্যত্র বিবাহ প্রদান করাও বৈধ। নিজের জন্য গ্রহণ করা হলে তাকে অন্যত্র বিবাহ দেওয়া বৈধ হবে না এবং অন্যত্র বিবাহ দিলে নিজের জন্য গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং নিজের স্থায়ী অধীকার ও কর্তৃত্বে থাকা দাসীর সাথে সহবাস করা আর নিজের বিবাহিত স্ত্রীর সাথে সহবাস করা একই বিষয়। এর মধ্যে কোনোটি চরিত্রহীনতা বলে গণ্য নয়। বড় কথা হলো, বিবাহকে যিনি বৈধ করেছেন নিজের অধীকারে থাকা নারীদের সাথে সহবাস করাও তিনিই বৈধ করেছেন। এর মধ্যে একটিকে আরেকটি অপেক্ষা ভিন্ন মনে করার কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}

{ যারা নিজের স্ত্রী বা দাসীদের সাথে সহবাস করে তারা নিন্দিত নয়। } [মুমিনুন/৬]

উপরোক্ত আলোচনয় একজন ব্যক্তি কিভাবে দাসে পরিনত হতে পারে এবং দাসে পরিনত হওয়ার পর ইসলাম তার সাথে কি ধরণের আচরণ করার নির্দেশ দেয় সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করলে দেখা যাবে বিষয়টি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা এসব বিষয়ের উপর আপত্তি-অভিযোগ উত্থাপণ করেন তারা ভীষণভাবে অজ্ঞ। একদিকে তারা যেমন ইসলামে দাস প্রথার স্বরুপ সম্পর্কে জানে না। বিপরীত দিকে তারা বর্তমানে সভ্যতার দাবীদাররা যুদ্ধ-বন্দীদের সাথে কিরুপ আচরণ করে সেটাও লক্ষ্য করে না। এই সকল পক্ষপাতদুষ্ট একপেশে গবেষকদের মতামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা মোটেও সঙ্গত নয়।

♦ *ইসলামে নারীনীতি*

বর্তমান যুগে নারীর স্বাধীনতা ও সমতার জোয়ার-ভাটা চলছে। শুধু জোয়ার নয়, বরং জোয়ার-ভাটা বলছি, কারণ স্বাধীনতার জোয়ারে ঘর-বাড়ি ছেড়ে, স্কুল-কলেজ ও অফিস-আদালতে বের হয়ে নারীরা যে

মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে সে কারণে স্বাধীনতার আবেগে কিছুটা ভাটা পড়েছে বলেই মনে হচ্ছে। স্কুল-কলেজে শিক্ষার আলো অর্জন করতে যেয়ে কত মেয়ের জীবন অন্ধকার হয়ে গেছে তার হিসাব কে রাখে। অফিস আদলতে সহকর্মী ও অফিসারদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে কত মহিলা। মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঘুরে-ফিরে স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগকালে চলন্ত বাসেই সম্ভ্রম হারাচ্ছে অনেকে। এতকিছুর পরও কিছু লোক গলা ফাটিয়ে বলে যাচ্ছে "নারীদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দিতে হবে"। এরা আর কি চায়! নারী স্বাধীনতা বলতেই বা এরা কি বোঝায়?

নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ইজ্জত-সম্ভ্রম, মান-মর্যাদা, সুখ-শান্তি সব কিছু থেকে স্বাধীন করে ফেলাই কি এদের উদ্দেশ্য?

এরা বলে, নারী-পুরুষ উভয়কে সমান অধিকার দিতে হবে। এটা তাদের মুখের বুলি মাত্র। এরা আসলে চায় সমঅধিকারের নামে নারীকে বাড়ি থেকে বের করে সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছড়িয়ে দিতে। এরা যদি সমঅধিকারই চায় তবে বলতে পারতো, নারী-পুরুষ উভয়ে বোরখা পরে রাস্তায় বের হবে। তাতেও বোঝা যেতো এরা ভুলভাবে হলেও নারী-পুরুষ উভয়কে সমান করতে চাচ্ছে। কিন্তু এরা বলে, পুরুষের শরীরে যতটুকু কাপড় আছে থাক কিন্তু নারীদের উলঙ্গ করে ফেলতে হবে। পুরুষরা সারা শরীর ঢেকে চলা-ফেরা করলেও সেটা আপত্তির বিষয় হয় না কিন্তু মেয়েরা নিজেদের শরীর আবৃত করার চেষ্টা করলেই সেটা মধ্যযুগীয় নিয়মনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে কোনো মেয়ে স্বেচ্ছায় বোরখা পরিধান করলেও তাকে তিরষ্কার করা হয়। আমাদের দেশে অনেক সময় স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ বোরখা পরিধান করার অপরাধে ছাত্রীদের শাস্তি বিধান করে থাকে। বহির্বিশ্বে যেমন ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বোরখা পরিহিত নারীদের লাঞ্ছিত করে থাকে। প্রশ্ন হলো ইচ্ছামতো পোশার পরিধান করার স্বাধীনতাও যেখানে দেওয়া হয় না সেটাকে নারী স্বাধীনতা কিভাবে বলা যায়। এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে আসলে এরা স্বাধীনতা বা সমতার নামে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}

নিশ্চয় যারা চায়, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়–ক তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না। [নুর/১৯]

এসব বিবেকভ্রষ্ট লোকেরা বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রপাগান্ডা চালিয়ে থাকে। কম বয়সে মেয়েদের বিবাহ হলে নাকি অসুস্থতা, এমনকি মৃত্যুর ঝুকি থাকে। অনেকের নিকট মনে হবে আমাদের ছেলে-মেয়েদের সুস্বাস্থ্য নিয়ে এনারা বড্ড চিন্তিত। আসল ব্যাপার কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। বিয়ে হতে দেরি হলে

মুসলিম যুবক-যুবতীরা চরিত্রহীন হয়ে যাবে এনারা এটিই চান। সুস্বাস্থ্য বা অকাল মৃত্যুই যদি এদের দুশ্চিন্তার কারণ হবে তবে বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্ককে নিষেধ করে না কেন? বৈধ পন্থায় নিজের চরিত্রকে রক্ষা করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে আর চরিত্র নষ্ট করার অন্য সকল পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কি? বিবাহের মাধ্যমে মিলন হয় একজনের সাথে সীমিত পরিসরে আর বিবাহবহির্ভুত সম্পর্ক হয় বহু জনের সাথে। বহু জনের সাথে বহুমুখী সম্পর্কের ফলে 'এইডস' এর মতো মারাত্মক রোগ বালাই দেখা দেয়। এটাই কি এসকল বুদ্ধিজীবীদের স্বাস্থ্যসচেতনা? তাছাড়া স্কুল-কলেজের উম্মুক্ত পরিবেশে খোলা-মেলা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে যেসব যুবক-যুবতী চরিত্রহীন হয়ে যায় তারা বিবাহের পরও একে-অপরকে দেল দিয়ে ভালবাসার পরিবর্তে এক জন আরেকজনের মাথায় বেল ভেঙে পরকীয়া চালিয়ে যায়। ক্ষেত্র বিশেষে সাজানো সংসার ও ছেলে-মেয়ে পরিত্যাগ করে প্রেমিক-প্রেমিকার হাত ধরে পালিয়ে যায়। কখনও কখনও স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে হত্যা করে এমনকি নিজেদের সন্তানকে নিজে হাতে হত্যা করে। এই ধরণের অনৈতিক কর্মকান্ড ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করাই এই সকল বুদ্ধিজীবীদের নীল নকশার অন্তর্ভুক্ত।

এর বিপরীতে ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে তাদের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী যথা স্থানে নিযুক্ত করেছে। ব্যবসা-বানিজ্য, চাষাবাদ বা চাকুরীর মাধ্যমে আয় উপার্জন করে সংসার পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পুরুষকে। আর নারীকে দেওয়া হয়েছে সন্তান জন্ম দেওয়া, লালন-পালন করা, রান্না-বান্না করা ইত্যাদি ঘরোয়া কাজ। সন্তানের জন্য মায়ের চেয়ে অধিক মমতাময়ী কেউ হতে পারে না আর আয় উপার্জনে পুরুষের মতো সুদক্ষ নারীরা নয়। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}

তার মা তাকে গর্ভে ধার করে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে। পরে তাকে দুই বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ায়।

[লুকমান/১৪]

প্রশ্ন হলো, এতো কষ্ট করে যে মা সন্তান ধারন ও পালন করে যদি নিজের দু মুঠো অন্নের জন্য তাকে অফিস-আদালতে দৌড়াতে হয় সেটা কিভাবে সমতা ও স্বাধীনতা হয়? এটা কিভাবে মানবতা হয় তা আমাদের বোধগম্য নয়। যারা মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত করে পুরুষদের কাধ হালকা করছেন তারা প্রকৃতই নারীবাদী নাকি পুরুষবাদী সেটিও তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

মোটামুটিভাবে ইসলামের এই সব বিষয়েই বিধর্মীদের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করা হয়। এছাড়া

আরো অনেক বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে আপত্তি-অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এই গ্রন্থে সেসব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। সেটার বিশেষ প্রয়োজনও নেই। মৌলিকভাবে এখানে এটা জেনে নেওয়াই যথেষ্ট যে, এই সকল বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এসব বিধানের যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে তা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। একজন মুসলিমের কাজ হলো আল্লাহ্ ও তার রসুলের কথা বিনাবাক্যে গ্রহণ করা। যুক্তি-তর্ক উপস্থাপণ করা নয়।

⇒ ৩. নিজের পক্ষ থেকে কোনো বিধান আল্লাহর বিধান হিসেবে চালিয়ে দেওয়া।

যেমন কেউ হয়তো বলল, মাগরিবের নামায আসলে চার রাকাত বা ফরজ রোজা রমজান মাসে নয় বরং শাওয়াল মাসে, তবে এটা কুফরী হবে যেহেতু উক্ত ব্যক্তির দাবী আল্লাহর বিধানে মাগরিবের নামায চার রাকাত এবং ফরজ রোজা শাওয়াল মাসে অথচ আল্লাহর বিধান এর বিপরীত। একইভাবে যদি কেউ বলে চোরকে হাত-কাঁটার পরিবর্তে জেল-জরিমান করতে হবে, এটাই আল্লাহর বিধান তবে সেটা কুফরী হবে যেহেতু আল্লাহর বিধান হলো চোরের হাত কেঁটে দেওয়া, জেল-জরিমানা করা নয়।

আল্লাহ্র বাণী

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

❮ যে কেউ আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না সে কাফির। ❯ [মায়েদা/৪৪]

ইবনুল আরাবী আল-মালেকী ﷺ তার আহ্কামুল কুরআনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

وَهَذَا يَخْتَلِفُ إِنْ حَكَمَ بِمَا عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ؛ فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ ، وَإِنْ حَكَمَ بِهِ هَوًى وَمَعْصِيَةً فَهُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُهُ الْمَغْفِرَةُ عَلَى أَصْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الْغُفْرَانِ لِلْمُذْنِبِينَ

এ বিষয়টি বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। যদি সে নিজের তৈরী বিধানকে আল্লাহর বিধান বলে দাবী করে তবে এটা শরীয়ত পরিবর্তন করা বলে গণ্য হবে এবং কুফরী হবে আর যদি সে অবাধ্যতাবশত খেয়ালখুশি মতো বিচার ফয়সালা করে (কিন্তু এটাকে আল্লাহর বিধান বলে দাবী না করে) তবে সে পাপী হিসেবে গণ্য হবে (কাফির হিসেবে নয়)। অতএব, আহ্লুস্সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়ার মূলনীতি অনুযায়ী তার এ অপরাধ (আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে) ক্ষমা হতে পারেন।

নিজের কথাকে আল্লাহর কথা হিসাবে দাবী করার ব্যাপারটি দু'রকম হতে পারে।

♦ ***ক) নিজেই সরাসরি আল্লাহর নিকট হতে ওহীর মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে কোনো বিষয়***

নিশ্চিতভাবে জানতে পারার দাবী করা।

এ বিষয়ে বেশ কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা যায় নিচে তার কিছু অংশ পেশ করা হলো।

♦ *:: মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার ও তাদের অনুসারীরা কাফির*

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ}

তার চেয়ে বেশি বড় অপরাধী আর কে আছে যে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে এবং বলে আমার উপর ওহী নাযিল হয়েছে অথচ তার নিকট কিছুই নাযিল হয় নি। [আনয়াম/৯৩]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي) "আমি শেষ নবী আমার পরে কোনো নবী নেই।"

আল্লাহ্ ﷻ নিজেও সূরা আহ্যাবের ৪০ নং আয়াতে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে খাতামুন্ নাবিয়্যিন (خاتم النبيين) বা শেষ নবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য এবং বহু সংখ্যক হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পর কোনো নবী বা রসুল আগমন করবে না। উম্মতে মুসলিমার সকল ওলামায়ে কিরাম এই আক্বীদার উপর ইজমা করেছেন। অতএব, রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পর যে কেউ নবুয়তের দাবী করলে সে এবং তার অনুসারীরা এই সকল দলিল প্রমাণ অস্বীকার করার কারণে মিথ্যাবাদী ও কাফির হিসেবে গণ্য হবে।

♦ *:: কাশফ, ইলহাম বা স্বপ্নকে ওহীর মর্যাদা দেওয়া কুফরী।*

কাশফ (كشف) বা ইলহাম (إلهام) বলতে বোঝায় আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো সত্য বিষয় হঠাৎ অন্তরে উদিত হওয়া। কাশফ-ইলহাম বা নেক স্বপ্নের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে অবগত হওয়ার বিষয়টি সঠিক। রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ

তোমাদের পূর্বের উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিল যাদের অন্তরে সত্য জাগ্রত হতো। যদি আমার উম্মতের মধ্যে তেমন কেউ থাকে তবে সে হবে উমর। [সহীহ্ বুখারী]

এই হাদীসে উল্লেখিত মুহাদ্দাস (محدث) শব্দের ব্যাখ্যায় ইবনে হাযার আসক্বালানী رحمه الله বলেন,

وفسر المحدث بفتح الدال بالملهم بالفتح أيضا وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كما أخبروا

‘মুহাদ্দাস’ অর্থ ‘মুলহাম’ অর্থাৎ যার নিকট ইলহাম হয়। বহু সংখ্যক আওলিয়ায়ে কিরাম (ইলহামের মাধ্যমে অবগত হয়ে) বিভিন্ন গায়েবী বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। পরে তারা যেমন বলেছেন তেমনটিই ঘটেছে। [ফাতহুল বারী]

তিনি আরো বলেন,

وفي إنكار وقوع ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن أنكره

ইলহামের বিষয়টি অধিক পরিমানে ঘটা সত্ত্বেও যারা এটা অস্বীকার করে এটা তাদের গোঁয়ারতুমি ছাড়া কিছু নয়। [ফাতহুল বারী]

এছাড়া নেক স্বপ্ন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

﴾لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا المُبَشِّرَاتُ﴿ قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: ﴾الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ﴿

নবুয়তের আর কিছুই বাকী নেই কেবল সুসংবাদসমূহ ছাড়া। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, সুসংবাদসমূহ কি? তিনি বললেন, নেক স্বপ্ন। [সহীহ বুখারী]

এই সকল দলিল প্রমাণের আলোকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কাশফ-ইলহাম ও নেক স্বপ্নের মাধ্যমে একজন নেককার ব্যক্তিকে আল্লাহ্ বিভিন্ন বিষয়ে অবগত করে থাকেন। উপরে আমরা দেখেছি, রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পর ওহীর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এখান আর কোনো নবী বা রসুল আগমন করবেন না। অর্থাৎ কারো উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হবে না। অতএব বর্তমানে যে কেউ ওহীর মাধ্যমে কোনো কিছু অবগত হওয়ার দাবী করবে সে কাফির বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, ওহীর মাধ্যমে কোনো বিষয়ে অবগত হওয়া আর কাশফ-ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে কোন বিষয়ে অবগত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি?

এখানে মৌলিক পার্থক্যটি হলো, ওহীর মাধ্যমে নবী-রাসুলদের যে জ্ঞান দেওয়া হয় সেটা নিশ্চিত ও অকাট্য জ্ঞান। কিন্তু কাশফ-ইলহাম ও স্বপ্নের মাধ্যমে সাধারন মুমিনরা যেসব জ্ঞান পেয়ে থাকে সেগুলো কোনো নিশ্চিত জ্ঞান নয় বরং ধারনা মাত্র।

মোল্লা আলী কারী رحمه الله বলেন,

وما ذكره بعض الأولياء من باب الكرامة بإخبار بعض الجزئيات من مضمون كليات الآية فلعله بطريق المكاشفة أو الإلهام أو المنام التي هي ظنيات لا تسمى علوما يقينيات

কোনো কোনো ওলী কারমত হিসেবে যেসব গায়েবী বিষয়ের খবর দিয়েছেন সম্ভবত এটা ছিল কাশফ-

ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে যা কোনো নিশ্চিত বিষয় নয় বরং ধারনা মাত্র। [মিরকাতুল মাফাতিহ্]

অতএব যদি কেউ কাশফ-ইলহাম বা স্বপ্নকে ওহীর মতো নিশ্চিত জ্ঞান মনে করে এবং সেসবের উপর ঐভাবে নির্ভর করে যেভাবে ওহীর উপর নির্ভর করা হয় তবে সে কাফিরে পরিনত হবে।

আল্লাহর বাণী

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ}

তার তুলনায় বড় জালিম কে যে বলে আমার নিকট ওহী আসে। [সূরা আনআম]

ইমাম আল কুরতুবী رحمه الله এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

قلت: ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها من الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة، إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص، فلا يحتاجون لتلك النصوص.وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ويستدلون على هذا بالخضر، وأنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم، عما كان عند موسى من تلك الفهوم.وهذا القول زندقة وكفر، يقتل قائله ولا يستتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب، فإنه يلزم منه هدم الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم.

আমি বলব, এর মধ্যে তারাও অন্তর্ভূক্ত যারা হাদীস ফিকাহ ও পূর্ববর্তী আলেমগণ যে পথে ছিলেন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে আমার অন্তরে এমন ধারণা হয়েছে অথবা আমার অন্তর আমাকে এই খবর দিয়েছে। তারা তাদের অন্তরে যা উদিত হয় এবং অনুমানে যা শক্ত মনে হয় সেই অনুযায়ী কথা বলে এবং বলে, যেহেতু আমাদের অন্তর সমস্ত প্রকারের কলূষতা হতে পবিত্র এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের চিন্তা হতে মুক্ত তাই তাদের নিকট আসমানী জ্ঞান ও ঐশী বার্তা প্রকাশিত হয় ফলে আমরা সমস্ত বস্তুর গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত হই আর প্রতিটি শাখা প্রশাখায় কি বিধান তা জানতে সক্ষম হয়। শরীয়তের কোনো কিছুর প্রতি আমরা মুখাপেক্ষী নয়। তারা এও বলে যে, শরীয়তের এসব বিধি বিধান কেবল নিম্ন স্তরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য এর মাধ্যমে বোকা ও সাধারন লোকদের বিচার করা হবে কিন্তু আল্লাহর ওলী ও বিশেষ ব্যক্তিদের এসব কোরআন হাদীসের দলীলের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা বলে থাকে, “যত মুফতীই তোমাকে ফতওয়া দিক তুমি তোমার অন্তরের নিকট ফতওয়া চাও”। তারা এ বিষয়ে খিজির عليه السلام কে দলীল হিসাবে পেশ করে। তারা বলে তিনি তো মুসা عليه السلام এর শরীয়তের প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন না বরং তার নিকট যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল তাই তার জন্য যথেষ্ট হতো। এ ধরনের কথা কুফরী ও ধর্মদ্রোহীতা বলে গণ্য। যে এমন বলবে তাকে হত্যা করা হবে তাকে তওবা করতেও বলা হবে

না। তার সাথে কোনরুপ আলোচনারও প্রয়োজন নেই। কেননা এ ধরনের চিন্তা চেতনা শরীয়তকে ধ্বংস করে এবং প্রমাণ করে যে, **আল্লাহর নবী ﷺ এর পরও নবী আসবে।** [তাফসীরে কুরতুবী]

এখানে ঐ সমস্ত তাসাউফ পন্থীদের কথা বলা হয়েছে যারা কাশফ ও ইলহামকে কোরআন হাদীসের মতো অকাট্য ও চূড়ান্ত দলীল মনে করে, শরীয়তে কোনটি হালাল কোনটি হারাম তা কাশফ-ইলহামের মাধ্যমে জানা যায় বলে বিশ্বাস করে। প্রকারান্তরে এরা আসলে কাশফ ও ইলহামকে ওহীর মর্যাদা দেয় এবং এভাবে নিজেদের নবুয়ত দাবি করে। এদের কেউ কেউ এমনটি জাল হাদীসকে কাশফের মাধ্যমে সহীহ বলে থাকে।

আল আলুসী রুহুল মায়ানীতে (كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف) ‘‘আমি গোপন ভান্ডার ছিলাম পরে আমি নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি। এ উদ্দেশ্যে আমি সকল কিছু সৃষ্টি করলাম’’ এই হাদিস প্রসঙ্গে বলেন,

فقال ابن تيمة : إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف ، وكذا قال الزركشي والحافظ ابن حجر . وغيرهما : ومن يرويه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلاً لكن يقول : إنه ثابت كشفاً

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন এটা নবী ﷺ এর কথা নয়। এর সহীহ বা জইফ কোনো সনদ নেই। ঝারকাশী ও ইবনে হাজার এবং অন্যান্যরা একই কথা বলেছেন। যে সব সুফীরা এই হাদীস বর্ণনা করে তারাও স্বীকার করেন যে, এটা সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। তবে তারা বলেন এটা কাশফের মাধ্যমে প্রমাণিত।

এরপর তিনি বলেন, (والتصحيح الكشفي شنشنة لهم) ‘‘আর কাশফের মাধ্যমে হাদীস সহীহ করা সুফীদের নিয়মিত অভ্যাস।’’ [তাফসীরে রুহুল মাআনী যারিয়াত/৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়]

আমরা কাশফ ইলহামকে স্বীকার করি। আমরা বিশ্বাস করি, স্বপ্ন যোগে যেভাবে একজন মুমিনকে আল্লাহ কোনো বিষয় সম্পর্কে জানাতে পারেন কাশফ-ইলহামের মাধ্যমেও তা সম্ভব। কিন্তু স্বপ্ন যেমন অকাট্য দলীল নয় এবং স্বপ্ন দ্বারা যেমন হালাল-হারাম বা অন্য কোনো বিধান প্রমাণিত হয় না, কোনো বিষয়ে অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে জানাও সম্ভব হয় না তেমনি কাশফ-ইলহামের মাধ্যমেও অকাট্যভাবে কোনো কিছু জানা যায় না। যাদি কেউ বলে সে কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে অকাট্য ও চূড়ান্তভাবে কোনো সত্য জানতে পারে তবে সে আসলে কাশফ-ইলহামের মোড়কে নিজের উপর ওহী নাযিল হওয়ার দাবী করে। এই ধরণের কাশফ ও ইলহামে বিশ্বাস স্থাপণ করা স্পষ্ট কুফরী।

সুফীদের এই ধরনের দাবী সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী رحمه الله ফাতহুল বারীতে বলেন,

قال القرطبي وهذا القول زندقة وكفر لأنه إنكار لما علم من الشرائع فإن الله قد أجرى سنته وانفذ كلمته بان احكامه لا تعلم الا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال الله أعلم حيث يجعل رسالاته وأمر بطاعتهم في كل ما جاؤوا به وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه الهدى وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب قال وهي دعوى تستلزم اثبات نبوة بعد نبينا لأن من قال أنه يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة

আল কুরতুবী বলেছেন এ ধরনের কথা কুফরী এবং ধর্মদ্রোহীতা। এর মাধ্যমে শরীয়তের জ্ঞানকে অস্বীকার করা হয় **কেননা আল্লাহ ﷻ এর নীতিই এই যে, তার বিধি-বিধান ও আদেশ নিষেধ তার রসুলদের মাধ্যমে ছাড়া জানা যাবে না** যাদের তিনি অন্যান্য মানুষের নিকট দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। তারা মানুষের নিকট আল্লাহর শরীয়ত ও বিধি-বিধান স্পষ্ট বর্ণনা করে দেন। আল্লাহ ﷻ বলেন "তিনি মানুষ ও ফেরেস্তাদের মধ্য হতে রসুল মনোনিত করেন।" তিনি আরও বলেছেন "আল্লাহই ভাল জানেন যে রেসালাতের দায়িত্ব তিনি কাকে দেবেন।" এছাড়া তিনি সকল মানুষকে রসুলরা যা কিছু নিয়ে আসেন তার আনুগত্য করতে আদেশ করেছেন, তাদের রসুলদের মান্য করতে উৎসাহিত করেছেন। তারা যা আদেশ করেন তা আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। কেননা এর মধ্যেই রয়েছে হেদায়েত। যা কিছু বললাম সেটা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে এবং এর উপর পূর্ববর্তীদের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। **যদি কেউ দাবি করে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বিধি-বিধান জানার জন্য রসুলদের পথ ভিন্ন অন্য কোনো পথ আছে যেটা অবলম্বন করলে রসুলদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কোনো প্রয়োজন থাকে না তবে সে কাফির হয়ে যাবে তাকে হত্যা করা হবে তওবাও করতে বলা হবে না।** আর এ ধরনের কথার মাধ্যমে এটাই বোঝা যায় যে, আল্লাহর রসুলের পরও নবী আসবে কেননা যে বলে আমি আমার অন্তর থেকে আল্লাহর বিধান অবগত হই এবং আমার অন্তরে যা উদিত হয় তা আল্লাহরই নির্দেশ। কুরআন-সুন্নাহর প্রতি দৃষ্টি না দিয়েই সে অনুযায়ী আমল করা যায়। তবে সে নিজের জন্য নবীদের বৈশিষ্ট দাবী করল। [ফাতহুল বারী]

একইভাবে যারা মনে করে একটি স্তরে পৌছানোর পর কোনো কোনো ওলী রসুলুল্লাহ ﷺ এর উপর নাযিল হওয়া শরীয়ত মানতে বাধ্য থাকে না তারাও স্পষ্ট কাফির। এসব পথভ্রষ্ট পীর-ফকীররা একটি আয়াতকে নিজেদের পক্ষে দলীল হিসাবে ব্যবহার করে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}

﴾ ইয়াকীন (মৃত্যু) না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত করো। ﴿ [সূরা হিজর / ৯৯]

তারা মনে করে এই আয়াতে ইয়াকীন অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং যখন কোনো ওলী হাক্কুল ইয়াকীন স্তরে পৌছে যায় অর্থাৎ তার ঈমান বা বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায় তখন তার উপর আর ইবাদত ফরজ থাকে না।

মোল্লা আলী কারী ﷺ বলেন,

وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين الحجر أي الموت بإجماع المفسرين

“ইয়াকীন না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত করো” সূরা হিজরের এই আয়াতে ইয়াকীন অর্থ হলো মৃত্যু এ বিষয়ে মুফাসসিররা ইজমা করেছেন। [মিরকাতুল মাফাতিহ]

ইমাম বুখারী তার সহীহতে এই আয়াত উল্লেখের পর বলেন (قال سالم اليقين الموت) সালিম বলেছেন ইয়াকীন অর্থ হলো মৃত্যু। অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন,

{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ}

(জাহান্নামীদের প্রশ্ন করা হবে) কি কারণে তোমরা সাকার নামক জাহান্নামে প্রবেশ করলে? তারা বলবে আমরা তো সলাত আদায় করতাম না, মিসকিনকে খাবার দিতাম না, যারা দ্বীন নিয়ে তামাশা করতো তাদের সাথে আমরাও তামাশা করতাম, আর আমরা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করতাম। এমনকি এই অবস্থায় আমাদের ইয়াকীন (মৃত্যু) চলে আসে। [সূরা মুদ্দাচ্ছির/৪২-৪৭]

এই আয়াতেও ইয়াকীন অর্থ মৃত্যু যদি এখানে ইয়াকীন অর্থ হাক্কুল ইয়াকীন স্তর বোঝানো হয় তবে আয়াতের অর্থ হবে এসকল কাফিররা হাক্কুল ইয়াকীন স্তরে পৌছে যাওয়ার কারণে জাহান্নামী হয়েছে। বর্তমানে যেসব পীর-ফকীর হাক্কুল ইয়াকীন স্তরে পৌছে গেছে বলে দাবি করে এবং সকল প্রকারের ইবাদত পরিত্যাগ করে। কোনো সন্দেহ নেই যে তারাও জাহান্নামে এসকল কাফিরদের সঙ্গী হবে।

আল কুরতুবী ﷺ বাতেনী সম্প্রদায় সম্পর্কে তার শায়খ আবুল আব্বাস হতে উল্লেখ করেন,

فقالوا: هذه الاحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الانبياء والعامة، وأما الاولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص

তারা বলেছে শরীয়তের এসব বিধান কেবল মাত্র নবী ও সাধারণ লোকদের উপর প্রযোজ্য যারা আল্লাহর ওলী এবং বিশেষ ব্যক্তি তাদের জন্য এসব দলীল প্রমানের কোনো প্রয়োজন নেই।

পরে তিনি বলেন,

وهذا القول زندقة وكفر يقتل صاحبه قائله ولا يستتاب

এ ধরণের কথা কুফরী ও ধর্মদ্রোহীতা। যে এমনটি বলবে তাকে হত্যা করা হবে তাকে তওবা করতেও বলা হবে না। [তাফসীরে কুরতুবী সুরা কাহফের ব্যাখ্যায়]

♦ *:: ইলমে গায়েব দাবী করা।*

নিজের পক্ষ থেকে কোনো বিষয় প্রমাণ করার আরেকটি মাধ্যম হলো ইলমে গায়েব দাবী করা। গায়েব (غيب) শব্দের অর্থ হলো, অদৃশ্য ও অতিলৌকিক বিষয়। মানুষের ধরা ছোয়া ও পর্যবেক্ষণ শক্তির বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোনো বিষয়ে অতিপ্রাকৃতিকভাবে জানতে পারাই হলো ইলমে গয়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান। কেবল মাত্র আল্লাহ্ই গায়েবের জ্ঞান রাখেন। অন্য কোনো মানুষ বা জ্বিন গায়েবের বিষয়ে অবগত নয়। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ }

আপনি বলুন, আকাশ ও পৃথিবীর কেউই গায়েব সম্পর্কে অবগত নয় শুধু আল্লাহ্ ছাড়া।

[নামল/৬৫]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে আল্লাহ ﷻ একথা ঘোষণা করতে আদেশ করেন যে, (ولا أعلم الغيب) ‘‘আমি তো গায়েব জানি না’’ [আনয়াম/৫০]

অন্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

{وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ}

আমি যদি গায়েব সম্পর্কে অবগত হতাম তবে আমি (সর্বদা) অধিক পরিমানে কল্যাণ হাসিল করতে সক্ষম হতাম এবং আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করতে পারতো না। [আরাফ/১৮৮]

আয়েশা রضي الله عنها বলেন,

ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله

যদি কেউ তোমাকে বলে রসুলুল্লাহ ﷺ গায়েব জানতেন তবে সে মিথ্যাবাদি। কারণ আল্লাহ ﷻ বলেন, (لا يعلم الغيب إلا الله) আল্লাহ ছাড়া কেউ গয়েব জানে না। [সহীহুল বুখারী]

এই সকল দলিল-প্রমাণের আলোকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ গায়েব সম্পর্কে অবগত নয়। তবে পবিত্র কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যাতে প্রমাণিত হয় নবী-রাসুলদের ওহীর মাধ্যমে এবং নবী-রাসুল ছাড়া অন্যান্য নেককার ব্যক্তিদের ওহী ছাড়া অন্যান্য পন্থায় অনেক সময় গায়েবের অনেক বিষয়ে অবহিত করা হয়। কেউ কেউ অবশ্য কেবল উপরোক্ত আয়াতগুলোর উপর নির্ভর করে আল্লাহ ছাড়া গায়েবের কোনো বিষয়ে কেউ কিছু জানতে পারবে না এমন দাবী করে। তাদের একটি অংশ রসুলদের গায়েব সম্পর্কে জানানো হয় এটা স্বীকার করে নিলেও রসুল ছাড়া অন্যান্য নেককার ব্যক্তি ও

ওলী-আওলিয়াদের কখনও কখনও গায়েব সম্পর্কে জানানো হয় এটা স্বীকার করতে চায় না। ফলে যে কেউ গায়েবের কেনো বিষয়ে খবর দিলে বা কোনো গায়েবী বিষয়ে মন্তব্য করলে সেটা তার নিকট এই সকল আয়াতের বিপরীতে মনে হয়। একারণে তারা গায়েবের বিষয়ে মন্তব্য করা শিরক-কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। এটা সঠিক কর্মপন্থা নয়। বরং সত্যান্বেষী সকল ব্যক্তির উচিৎ কোনো একটি বা কয়েকটি আয়াতকে পৃথকভাবে উপস্থাপণ করে পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে উভয় প্রকার আয়াতের মাঝে সমন্বয় সাধন করার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করা। নিচের আলোচনাতে আমরা সে চেষ্টাই করবো। প্রথমেই আমরা নবী-রসুল ও নেককার ব্যক্তিদের যে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করা হয় সে বিষয়ে দলিল প্রমাণ বর্ণনা করবো এবং পরবর্তীতে উভয় প্রকার আয়াতের মাঝে সমন্বয় সাধন করে সঠিক সিদ্ধান্ত বর্ণনা করার চেষ্টা করবো ইনশা-আল্লাহ।

♦ *= নবী-রাসুলদের ওহীর মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করার প্রমাণ।*

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ}

তিনি গায়েব সম্পর্কে জানেন আর গায়েবের বিষয়ে কাউকে অবহিত করেন না কেবল রসুলদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে গায়েবের বিষয়ে অবহিত করে থাকেন। [জিন/২৬,২৭]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ}

এটা কখনও সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের গায়েবের ব্যাপারে অবহিত করবেন। তবে তিনি (গায়েবের বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করার জন্য) রসুলদের মনোনিত করে থাকেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তার রসুলদের উপর ঈমান আনো। [আলে ইমরান/১৭৯]

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ তার জীবদ্দশায় ও তার ওফাতের পর কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান বহুসংখ্যক ঘটনার খবর পূর্ব হতেই প্রদান করেছেন। তার কিছু কিছু যথা সময়ে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যেমন রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর বাণী (ويح عمار تقتله فئة باغية) "আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে একটি বিদ্রোহী গ্রুপ হত্যা করবে।" [সহীহ্ বুখারী] পরবর্তীতে আলী رضي الله عنه এর বিরুদ্ধে মুয়াবিয়া رضي الله عنه যখন বিদ্রোহ করেন এবং উভয় গ্রুপের যুদ্ধ হয় আম্মার رضي الله عنه আলী رضي الله عنه এর পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদত বরণ করেন। এ ঘটনা থেকে সকলে বুঝে নেই আলী رضي الله عنه হকের উপর রয়েছেন আর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য। হাদীসে আরো কিছু বিষয়ে খবর দেওয়া হয়েছে যা

নির্দিষ্ট সময়ে সংঘঠিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। তার মধ্যে দাজ্জালের আগমন, ইমাম মাহদীর আবির্ভাব, ঈসা عليه السلام এর পুনরাগমন, পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী অন্তভূর্ক্ত। অন্যান্য রসুলদের ব্যাপারেও এমন বহু বর্ণনা রয়েছে। এসব বর্ণনা উল্লেখ করে আলোচনা দীর্ঘ করা নিষ্প্রয়োজন যেহেতু বিষয়টি সর্বজন বিদিত এবং কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বমহলে স্বীকৃত।

♦ = নবী-রসুল ছাড়া অন্যান্য সাধারন মানুষকে গায়েবের বিষয়ে অবহিত করা।

এ বিষয়টি অনেকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে থাকেন। তারা বলেন, নবী-রসুল ছাড়া অন্য কাউকে গায়েবের বিষয়ে জানানো হয় না। যেহেতু আল্লাহ ﷻ সূরা জিনের ২৬-২৭ নং আয়াতে এবং সূলা আলে ইমরানের ১৭৯ নং আয়াতে বলেছেন, "তিনি গায়েবের ব্যাপারে রসুল ছাড়া কাউকে অবহিত করেন না। এবিষয়ে তারা প্রচুর কঠোরতা করে থাকেন। কোনো নেককার ব্যক্তির জীবনীতে গায়েবী বিষয়ে কোনো মন্তব্য পাওয়া গেলে সেটাকে শিরক-কুফর ও ধর্মদ্রোহীতা হিসেবে আখ্যায়িত করে এই সকল আয়াতকে দলিল প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। এ বিষয়ে আমাদের কথা হলো, বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীসে নবী-রসুল ছাড়াও অন্যান্য নেককার ব্যক্তিদের গায়েব সম্পর্কে খবর দেওয়া হয় বলে উল্লেখিত আছে। তবে পার্থক্য হলো, নবী রাসূলকে জ্ঞান দেওয়া হয় ওহীর মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে আর অন্যদের জ্ঞান দেওয়া হয় ওহী ছাড়া অন্যান্য পন্থায় যা নিশ্চিত জ্ঞান নয় বরং ধারনা মাত্র। নিচে সেসব পন্থা ও তার স্বপক্ষে দলিল-প্রমাণ বর্ণনা করা হলো।

♦ = ক) স্বপ্নের মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

এ বিষয়ে আমরা পূর্বে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর একটি হাদীস উল্লেখ করেছি যেখানে তিনি বলেন, নেক স্বপ্নের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রদান করা হয়। বুখারী ও মুসলিমে এ অর্থের হাদীস বর্ণিত আছে। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে এসেছে, একজন ব্যক্তি নিজের হাত কেঁটে ফেলে আত্মহত্যা করে। পরে আরেকজন সাহাবী উক্ত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখতে পায়। তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার সাথে কিরুপ আচরণ করা হয়েছে? উক্ত ব্যক্তি বলেন, আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে তবে আমাকে বলা হয়েছে, তুমি যে হাত নিজেই নষ্ট করেছো সেটা ওভাবেই থাকবে। রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে এ বিষয়ে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, (اللهم وليديه فاغفر) "হে আল্লাহ্ তার দু'হাতকেও ক্ষমা করে দাও"

বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, আমর ইবনে তুফাইল একবার স্বপ্ন দেখেন, তিনি একটি মহিলার গর্ভে প্রবেশ করছেন। তিনি এর অর্থ করেন, মৃত্যুবরণ করা এবং কবরে প্রবেশ করা। তার পরই তিনি যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। [মারিফাতুস্ সাহাবা; আবু নাইম]

মুমিনদের স্বপ্নের বিষয়টি রসুলুল্লাহ্ ﷺ নিজেও যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। সামুরা ইবনে জুনদুব رضي الله عنه বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ: ﴿هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا﴾ قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ

রসুলুল্লাহ্ ﷺ তার সাহাবীদের উদ্দেশ্যে প্রায়ই বলতেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছে? তিনি বলেন, এর ফলে যে যা দেখেছে তা তার নিকট বর্ণনা করতো। [সহীহ্ বুখারী]

একটি বর্ণনাতে এসেছে, বেশ কিছু সাহাবায়ে কিরাম স্বপ্নে দেখলেন, লাইলাতুল কদর রমজানের শেষ সাত দিনের মধ্যে। রসুলুল্লাহ্ ﷺ এটা শুনে বললেন,

أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ

﴾ তোমাদের সকলেই যখন রমজানের শেষ সাত দিনের ব্যাপারে স্বপ্ন দেখেছো তবে ঐ সাত দিনের মধ্যেই লাইলাতুল কদর তালাশ করো। ﴿ [বুখারী ও মুসিলম]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাযার আসক্কালানী رحمه الله বলেন,

ويستفاد من الحديث أن توافق جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقها وصحتها كما تستفاد قوة الخبر من التوارد على الاخبار من جماعة

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় বেশ কিছু লোক একই বিষয়ে স্বপ্ন দেখা বিষয়টি সত্য ও সঠিক হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেভাবে একটি হাদীস বহু সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হলে তার সনদ শক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। [ফাতহুল বারী]

এই হাদীসে এটা প্রমাণিত হয় যে, যেসব বিষয়ে শরীয়তের স্পষ্ট বর্ণনা নেই ফলে ইজতিহাদ তথা চিন্তা-গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুমিন ব্যক্তির নেক স্বপ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

বর্তমানে কিছু লোক আছে যারা স্বপ্নের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বিদয়াত মনে করে। প্রশ্ন হলো, যদি স্বপ্ন কোনো কাজের জিনিস নাই হবে তবে সেটাকে নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ কেনো বলা হলো? কেনো স্বপ্নকে সুসংবাদের বার্তাবাহী হিসেবে ঘোষণা করা হলো?

এ বিষয়ে সঠিক কথা হলো যেসব বিষয়ে শরীয়তে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে সেসব বিষয়ে স্বপ্নকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। স্বপ্নের কারণে শরীয়তের কোনো বিধানে সামান্যতম পরিবর্তনও আনা যাবে না। যেহেতু স্বপ্ন কোনো নিশ্চিত জ্ঞান নয় বরং ধারনা মাত্র। কিন্তু যেসব বিষয়ে শরীয়তের স্পষ্ট

দিক নির্দেশনা বিদ্যমান নেই বরং নিজস্ব চিন্তা-গবেষনা ও ধারনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেসব বিষয়ে স্বপ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে যেহেতু নেক স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

স্বপ্নের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে রসুলূল্লাহ্ ﷺ মিথ্যা স্বপ্ন বানিয়ে বলার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন,

مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ

যে কেউ এমন স্বপ্ন দেখার দাবী করে যা সে দেখেনি তবে তাকে দুটি যবের দানা একটিকে আরেকটির সাথে বাঁধতে আদেশ করা হবে কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না। [সহীহ্ বুখারী]

অন্য রেওয়াতে এসেছে দুটি যবের দানা যতক্ষণ একটিকে আরেকটির সাথে বাঁধতে সক্ষম না হবে ততক্ষণ তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। [ফাতহুল বারী]

মোট কথা, তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে অজানা বিষয় জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলেই সে ব্যাপারে এধরণের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

♦ = খ) *কাশফ-ইলহামের মাধ্যমে কোনো গায়েবী ব্যাপারে অবহিত হওয়া।*

কাশফ-ইলাহামের মাধ্যমে কোনো অজানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার ব্যাপারে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে আমরা বেশ কিছু দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেছি। যেমন রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর বাণী,

إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ

তোমাদের পূর্বের উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিল যাদের অন্তরে সত্য জাগ্রত হতো যদি আমার উম্মতের মধ্যে তেমন কেউ থাকে তবে সে হবে উমর। [সহীহ্ বুখারী]

ইবনে হাযার আসক্কালানী رحمه الله বলেন,

وفسر المحدث بفتح الدال بالملهم بالفتح أيضا وقد أخبر كثير من الأولياء عن أمور مغيبة فكانت كما أخبروا

মুহাদ্দাস অর্থ মুলহাম অর্থাৎ যার নিকট ইলহাম হয়। বহু সংখ্যক আওলিয়ায়ে কিরাম (ইলহামের মাধ্যমে অবগত হয়ে) বিভিন্ন গায়েবী বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। পরে তারা যেমন বলেছেন তেমনটিই ঘটেছে। [ফাতহুল বারী]

তিনি আরো বলেন,

وفي إنكار وقوع ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن أنكره

ইলহামের বিষয়টি অধিক পরিমানে ঘটা সত্ত্বেও যারা এটা অস্বীকার করে এটা তাদের গোঁয়ারতুমি ছাড়া কিছু নয়। [ফাতহুল বারী]

তবে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, স্বপ্নের মতো কাশফ-ইলহামের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান অকাট্য বা নিশ্চিত নয় বরং ধারণামাত্র যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি।

♦ = গ) জ্বিনদের মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

বিভিন্ন হাদীসে জ্বিনদের সাথে মানুষের যোগাযোগ এবং তাদের মাধ্যমে কোনো অজানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার প্রমান পাওয়া যায়।

সহীহ্ বুখারীর একটি হাদীসে এসেছে, আবু হুরাইরা ﵁ সাদাকার খেজুর পাহারা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় একটি দুষ্টু জিন উক্ত খেজুর চুরি করতে আসে। পরপর কয়েকদিন সে আসে আর প্রতিবার আবু হুরাইরা ﵁ তাকে ধরে ফেলেন। শেষের দিন তিনি তাকে ধরে ফেললে, সে বলে, আমাকে ছেড়ে দিলে আমি আপনাকে এমন একটি দোয়া শিক্ষা দেবো যা পাঠ করলে আপনার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি প্রহরী নিযুক্ত থাকবে। ফলে সারা রাত কোনো শয়তান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না। সেটি হলো আয়াতুল কুরসী। পরে রসুলুল্লাহ ﷺ কে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি বলেন,

أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: لاَ، قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ

এব্যাপারে সে ঠিকই বলেছে যদিও সে মিথ্যা বাদী। তুমি কি জানো. এই তিন রাত তুমি কার সাথে কথা বলেছো? সে একজন শয়তান (দুষ্টু জ্বিন)।

অন্য হাদীসে এসেছে, গনকদের কিছু কিছু কথা সত্য হয় কেনো সে বিষয়ে রসুলূল্লাহ্ ﷺ কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ

ফেরেস্তাদের কিছু কথা জ্বিনেরা শুনে ফেলে এবং তার সাথে একশটি মিথ্যা কথা মিশ্রিত করে গনকদের নিকট বর্ণনা করে (এর ফলে গনকদের কিছু কথা সত্য হয়ে থাকে)। [বুখারী ও মুসলিম]

এই সকল হাদীসে জ্বিনদের সাথে মানুষের যোগাযোগ হওয়া এবং তাদের মাধ্যমে কিছু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে জিনেরা গায়েবের সকল বিষয়ে খবর রাখে এমন নয়। আসলে গায়েব দুই প্রকার। (১) ভবিষ্যতে কি ঘটবে সে বিষয়ের জ্ঞান। (২) অতীতে যা ঘটে গেছে এবং বর্তমানে ঘটমান রয়েছে এইসব বিষয়ের জ্ঞান। প্রথম প্রকারের গায়েব সম্পর্কে মানুষের মতো জ্বিনেরাও অজ্ঞ।

সুলাইমমান ﷵ কে আল্লাহ্ ﷻ জ্বিনদের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বিভিন্ন প্রকার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তার আদেশ অমান্য করলে তিনি তাদের কঠিন শাস্তি দিতেন। এর মধ্যে সুলাইমান ﷵ একদিন তার লাঠিতে ভর দিয়ে দাড়ানো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও জ্বিনেরা বুঝতে পারে নি যে, সুলাইমান ﷵ আসলেই মৃত্যুরবণ করেছেন। ফলে তারা নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকে। পরবর্তীতে উঁই পোকা লাঠিটি খেয়ে নিলে সুলাইমান ﷵ এর মরদেহ মাটিতে পড়ে যায় আর জ্বিনেরা বুঝে ফেলে তিনি বহু পূর্বেই মারা গিয়েছেন তখন তারা নিজেদের বোকামীর জন্য আফসোস করতে থাকে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ}

যখন সুলামান মৃত্যুবরণ করল, তখন উঁইপোকার মাধ্যমেই জ্বিনেরা তার মৃত্যুর সংবাদ জানতে পেরেছিল। উঁইপেকা তার লাঠি খেয়ে ফেলেছিল। যখন তার মরদেহ মাটিতে পড়ে গেল তখন জিনেরা স্পষ্ট বুঝতে পারল যদি তারা গায়েবের ব্যাপারে অবগত হতো তবে এতদিন এই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে অবস্থান করতো না। [সাবা/১৪]

এই ঘটনা প্রমাণ করে, জিনদের চোখের আড়ালে বা জ্ঞানের বাইরে যেসব ঘটনা সংঘঠিত হয় সেগুলো সম্পর্কে তারা গায়েবীভাবে অবগত হতে সক্ষম নয়। যেভাবে মানুষ তাদের চোখের আড়ালে সংঘঠিত হওয়া ঘটনা কারো মাধ্যমে ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবগত হতে সক্ষম নয়। কিন্তু জিনদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা খুব দ্রুতগতি সম্পন্ন ফলে নিমিশেই দূর-দুরান্তে ভ্রমণ করতে পারে। তারা এমনকি সুউঁচ্চ আকাশ পর্যন্ত গমণ করে এবং ফেরেস্তাদের কিছু কথা শুনে ফেলে। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখিত হাদীসে দেখেছি। রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর আগমণের পূর্বে তারা অবাধে ফেরেস্তাদের কথা শুনতে পেতো কিন্তু রসুলূল্লাহ ﷺ এর আগমনের পর এ বিষয়ে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। এখন কেউ ফেরেস্তাদের কথা শোনার জন্য আকাশে গমণ করলে তাদের দিকে অগ্নি নিক্ষেপ করা হয়। [সূরা জিন/৮,৯] তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জ্বলন্ত অগ্নি আঘাত করার পূর্বেই জিনেরা ফেরেস্তাদের নিকট হতে শোনা খবর গনকের নিকট পৌছে দিতে সক্ষম হয়।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ

অনেক সময় জিনেরা জ্বলন্ত অগ্নির আঘাতে প্রাণ হারানোর পূর্বেই ফেরেস্তাদের নিকট হতে জানা ঘটনা গনকদের নিকট পৌছে দিতে সক্ষম হয়। [সহীহ বুখারী]

এভাবে জিনেরা ভবিষ্যতে ঘটমান কোনো কোনো ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকে এবং তাদের মাধ্যমে গনকরা তা জানতে পারে। তবে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যেসব জিন ফেরেস্তাদের কথা শোনে তারা অবাধ্য ও অপরাধী হিসেবে গণ্য একইভাবে যারা এসব বিষয়ে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ সকল জিনদের সাথে সম্পর্ক রাখে তারাও পাপী ও অপরাধী।

এছাড়া জিনেরা দ্রুত বেগ সম্পন্ন ও দীর্ঘায়ূ প্রাপ্ত হওয়ার কারণে পৃথিবীতে বর্তমানে ঘটমান বিভিন্ন ঘটনা নিমিশের মধ্যে দুর-দুরান্তে পৌছে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। একইভাবে সূদুর অতীতে সংঘঠিত কোনো ঘটনা স্বচক্ষে অবলোকন করা কারণে তা অন্যান্য মানুষকে শুনিয়ে দিতে পারে। এভাবে বর্তমান ও অতীত কালে সংঘঠিত যেসব বিষয় মানুষের নিকট অজানা সেসব বিষয়ে জিনদের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। জিনদের মাধ্যমে এই প্রকার বিষয়ে অবগত হওয়া সম্পূর্ণ বৈধ যদি এক্ষেত্রে কোনো অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করা হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَخْدِمُهُمْ فِي أُمُورٍ مُبَاحَةٍ إمَّا إحْضَارِ مَالِهِ أَوْ دَلَالَةٍ عَلَى مَكَانٍ فِيهِ مَالٌ لَيْسَ لَهُ مَالِكٌ مَعْصُومٌ أَوْ دَفْعِ مَنْ يُؤْذِيهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا كَاسْتِعَانَةِ الْإِنْسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ فِي ذَلِكَ

কেউ কেউ জিনদের মাধ্যমে বৈধ উপকার গ্রহণ করে থাকে যেমন তার হারিয়ে যাওয়া সম্পদের খোঁজ পাওয়া, এমন কোনো পরিত্যাক্ত সম্পদের খোঁজ পাওয়া যার কোনো নির্দিষ্ট মালিক নেই বা কোনো আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে কোনো মানুষের সহযোগিতা গ্রহণ করার মতো জিনদের সাহায্য নেওয়াও বৈধ। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

♦ = ঘ) *ফেরেস্তাদের মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়া।*

সাধারনত ফেরেস্তাদের মাধ্যমে নবী-রসুলদের নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়। অনেক সময় নবী-রসুল ছাড়াও সাধারন মুসিলমদের নিকট ফেরেস্তা আগমন করে তাকে কিছু সংবাদ শোনাতে পারে। তবে নবী-রসুলদের নিকট ফেরেস্তা আগমন করা আর অন্যদের নিকট ফেরেস্তা আগমন করার মধ্যে পার্থক্য হলো, নবী-রসুলরা স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে, তার নিকট যিনি আগমন করেছেন তিনি ফেরেস্তা, দুষ্টু জিন বা শয়তান নয়। ফলে ফেরেস্তারা নবী-রসুলদের যে সংবাদ দেয় তা ওহী তথা নিশ্চিত জ্ঞান বলে গণ্য হয়। অপর দিকে সাধারন মানুষের নিকট ফেরেস্তা আগমন করে মানুষের আকৃতিতে। ফলে তিনি ফেরেস্তা কিনা এটা নিশ্চিত জানা সম্ভব হয় না তাই তার দেওয়া সংবাদ অকাট্য সত্য কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। একারণে সাধারন মানুষ ফেরেস্তাদের মাধ্যমে যা কিছু জ্ঞান অর্জন করে সেটা ওহীর মর্যাদা পায় না। এর মাধ্যমে তারা নবী বলেও গণ্য হয় না। সাধারন মানুষ ফেরেস্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হওয়ার বেশ কিছু প্রমাণ কুরআন-হাদীসে রয়েছে।

মারইয়াম ﵍ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন ফেরেস্তা তার নিকট এসে তার একটি নেককার পুত্র সন্তান হওয়ার সংবাদ দেয়। [আলে-ইমরান/৪৫]

মারইয়াম ﵍ এর ব্যাপারে সঠিক মত হলো, তিনি নবী ছিলেন না। যেহেতু আল্লাহ্ ﷻ বলেন, (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا) "আপনার পূর্বেও আমি কেবল পুরুষদের রসুল হিসেবে প্রেরণ করেছি" [আম্বিয়া/৭] তাছাড়া অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

{مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ}

ঈসা ইবনে মারইয়াম তো আল্লাহর রসুল তার পূর্বেও বহু রসুল গত হয়েছে আর তার মা হলো সিদ্দীকা। [মায়েদা/৭৫]

এই আয়াত প্রমান প্রমাণ করে যে, মারইয়াম ﵍ নবী বা রসুল নন বরং তিনি সিদ্দীকা।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বনী ইসরাঈলের তিনজন ব্যক্তির কাহিনী বর্ণিত আছে, যাদের পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাদের নিকট একজন ফেরেস্তা প্রেরণ করেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাদের একজনকে ফেরেস্তা বলে যান,

فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ

তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হলো, (পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার কারণে) আল্লাহ্ তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর অন্য দু'জনের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে ফেরেস্তা একজন নেককার ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি সম্পর্কে খবর দিচ্ছে যা একটি গায়েবী বিষয়।

সহীহ মুসলিমের অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে, একজন ব্যক্তি আকাশের মেঘের ভিতর থেকে একটি গায়েবী শব্দ শোনে, "অমুক ব্যক্তির বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করো"। পরবর্তীতে সে উক্ত মেঘ অনুসরণ করে একজনের বাগানে পৌছায় যেখানে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। তার নাম জিজ্ঞাসা করে জানা যায় আসলে তার নামই মেঘের মধ্যে শোনা গিয়েছিল।

সম্ভবত এই শব্দটি ফেরেস্তাদের পক্ষ থেকেই ছিল।

এই সব আয়াত ও হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ফেরেস্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় মানুষ বিভিন্ন গায়েবী বিষয়ে অবগত হতে পারে। তবে নবী-রসুল ছাড়া অন্যদের নিকট ফেরেস্তা মানুষের রুপে আগমন করে এবং এমনভাবে সংবাদ প্রদান করে যাতে নিশ্চিতভাবে এটা জানা সম্ভব হয় না যে এটা প্রকৃতই ফেরেস্তা

নাকি মিথ্যাবাদি জিন ও শয়তান। ফলে এভাবে যে সংবাদ জানা যায় তা সন্দেহের উর্দ্ধে নয়।

♦ = ৬) *অভিজ্ঞতার আলোকে গায়েব সম্পর্কে ধারনা করা।*

আল্লাহ্ ﷻ প্রকৃতির বুকে বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। অনেক সময় এসকল ঘটনার একটির সাথে অন্যটির যোগসূত্র থাকে। একটি ঘটনা ঘটলে তার পর অন্য ঘটনাটি ঘটবে বলে ধরে নেওয়া হয় বা ধরে নেওয়া যায়। উদহারণস্বরুপ ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হতে দেখলে বা মেঘ দেখলে বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া যায়। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ}

﴾ তিনি রহমতের (বৃষ্টি হওয়ার) সুসংবাদ নিয়ে বাতাস প্রেরণ করেন। ﴿ [আ'রাফ/৫৭]

সুতরাং বিশেষ প্রকৃতির বাতাস হতে দেখলে বৃষ্টি হতে পারে এমন মনে করতে দোষ নেই।

আবু বকর রাঃ একবার আয়েশা রাঃ কে বললেন,

وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه علي كتاب الله

তোমার তো দুটি ভাই ও দুটি বোন রয়েছে। তোমরা আল্লাহর কিতাব অনুসারে সম্পত্তি ভাগ করে নেবে।

আয়েশা রাঃ বলেন, আমার বোন তো কেবল আসমা। অর্থাৎ আমার দুটি বোন হলো কিভাবে? আবু বকর রাঃ বললেন, গর্ভে যে সন্তান রয়েছে আমার ধারনা সে মেয়েই হবে। [মুয়াত্তা মালিক]

পরবর্তীতে তার এই ধারনা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। সম্ভবত তিনি কোনো স্বপ্ন দেখে এমন মন্তব্য করেছেন অথবা অভিজ্ঞতার আলোকে এটা বলেছেন। এ বিষয়টি আবুবকর রাঃ এর একটি কারামত হিসেবে গণ্য করা হয়।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ ওফাতের কয়েকদিন পূর্বে রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। সে সময় একদিন আলী রাঃ কে একজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, (أصبح بحمد الله بارئا) আল-হামদু লিল্লাহ্ তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এটা শুনে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর চাচা আব্বাস রাঃ বলে উঠলেন,

وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، إِنِّي لَأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ عِنْدَ المَوْتِ

আল্লাহর কসম, আমি তো মনে করি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এই রোগেই মৃত্যুবরণ করবেন। আমি জানি মৃত্যুর সময় আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরধের চেহারা কেমন হয়। [সহীহ বুখারী]

একজন বংশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট আসলেন। তখন তার নিকট যায়েদ ইবনে হারিছা رضي الله عنه ও তার ছেলে উসামা رضي الله عنه হাজির ছিল। তাদের পা দেখে উক্ত ব্যক্তি বললেন, (إن هذه الأقدام بعضها من بعض) এই দুটি পা একজন আরেকজনের বংশধর। রসুলুল্লাহ্ ﷺ এটা শুনে ভীষণ খুশি হলেন এবং তৎক্ষনাৎ আয়েশা رضي الله عنها এর নিকট গমণ করে তা বর্ণনা করলেন। [সহীহ্ বুখারী]

সহীহ্ বুখারীর আরেকটি বর্ণানতে ওয়াহ্শী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, উবাইদুল্লাহ্ ইবনে আদি ইবনে খিয়ার নামক এক ব্যক্তি নিজের সারা শরীর আবৃত করে তার নিকট আসেন। তার চোখ ও পা ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তিনি ওয়াহ্শীকে বলেন, আপনি কি আমাকে চেনেন? তিনি বলেন, না। আমি আপনাকে চিনি না, তবে আদি ইবনে খিয়ার উম্মে কিতাল নামে এক মহিলাকে বিবাহ করে। তাদের একটি সন্তান হয়। উক্ত সন্তান এবং তার মাকে আমি আদি ইবনে খিয়ারের নিকট পৌছে দিয়েছিলাম। এখন আমার মনে হচ্ছে তোমার পা আর ঐ বাচ্চাটির পা একই রকম। অর্থাৎ তিনি একটি ছোট শিশুর পা দেখে বহু বছর পর তাকে শনাক্ত করতে সক্ষম হন। অভিজ্ঞতার আলোকে এধরণের আশ্চর্যজনক সমাধান বর্ণনা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য বিষয়। যারা এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ তাদের নিকট এটা স্বাভাবিক বিষয়। যদিও সাধারন মানুষের নিকট বিষয়টি অদৃশ্য ও অতিলৌকিক মনে হয়। অভিজ্ঞতার আলোকে এ ধরণের বিষয় বর্ণনা করাতে দোষ নেই।

ইবনুল আরবী رحمه الله বলেন,

وَالتَّجْرِبَةُ مِنْهَا أَنْ يَقُولَ الطَّبِيبُ : إذَا كَانَ الثَّدْيُ الْأَيْمَنُ مُسْوَدَّ الْحَلَمَةِ فَهُوَ ذَكَرٌ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الثَّدْيِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ أُنْثَى ؛ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَجِدُ الْجَنْبَ الْأَيْمَنَ أَثْقَلَ فَهُوَ ذَكَرٌ ، وَإِنْ وَجَدَتْ الْجَنْبَ الْأَشْأَمَ أَثْقَلَ فَالْوَلَدُ أُنْثَى ، وَادَّعَى ذَلِكَ عَادَةً لَا وَاجِبًا فِي الْخِلْقَةِ لَمْ نُكَفِّرْهُ ، وَلَمْ نُفَسِّقْهُ

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কিছু বিষয়ে অবগত হওয়ার উদাহরণ হলো হয়তো কোনো ডাক্তার বলল, যদি ডান স্তন কালো হয় তবে সন্তান পুরুষ হবে। আর যদি বাম স্তন কালো হয় তবে সন্তান মেয়ে হবে। অথবা যদি কেউ এমন বলে, মেয়েদের ডান পাশ্বর্ বেশি ভারি হলে সন্তান ছেলে হবে আর বাম পাশ্বর্ বেশি ভারি হলে সন্তান মেয়ে হবে। যদি সে এটাকে সাধারন নিয়ম বলে দাবী করে কোনো নিশ্চিত বিষয় হিসেবে নয় তবে তাকে কাফিরও বলা হবে না ফাসিকও বলা হবে না। [আহ্কামুল কুরআন]

ইমাম কুরতুবীও একই কথা তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।

♦ = নবী-রসুল ছাড়া অন্য কাউকে গায়েব জানানো হয় না এ কথার সঠিক অর্থ কি?

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী-রসুল ছাড়াও নেককার ব্যক্তিদের অনেক সময় গায়েব সম্পর্কে অবহিত করা হয়ে থাকে। যারা এ বিষয়টি সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করে তারা এই সকল দলিল প্রমাণ সম্পর্কে স্পষ্ট উদাসীনতা প্রকাশ করে থাকে। এ বিষয়ে তারা কেবল সূরা জিনের ২৬,২৭ ও সূরা আলে ইমরানের ১৭৯ নং আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করে যেখানে আল্লাহ্ ﷻ বলেছেন, আমি গায়েব সম্পর্কে নবী-রাসুল ছাড়া কাউকে অবহিত করি না। পবিত্র কুরআনের নির্দিষ্ট কিছু আয়াতকে আলাদা ভাবে উপস্থাপণ করে সেটার মাধ্যমে কিছু প্রমাণের চেষ্টা করা সঠিক নয় বরং একই বিষয়ের সকল আয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। একটি আয়াতে আল্লাহ্ ﷻ বলেছেন,

{قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ}

আপনি বলুন, আকাশ ও পৃথিবীর কেউই গায়েব সম্পর্কে অবগত নয় শুধু আল্লাহ্ ছাড়া।

[নামল/৬৫]

যদি অন্য সকল আয়াতকে পরিত্যাগ করে কেবল এই আয়াতটির উপর নির্ভর করা হয় তবে অর্থ হবে নবী-রসুল, ফেরেস্তা-জিন বা অন্য কেউই গায়েব সম্পর্কে সামান্যতমও অবগত নয়। যেহেতু আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, "আল্লাহ ছাড়া আকাশ-পৃথিবীর কেউ গায়েব সম্পর্কে অবগত নয়।" কিন্তু যে আয়াতে বলা হয়েছে, রসুল ছাড়া কাউকে গায়েব জানানো হয় না সে আয়াতের সাথে এই আয়াতটিকে একত্রিত করার পর স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, রসুলদের গায়েব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। একইভাবে যেসব আয়াত ও হাদীসে নবী-রাসুল ছাড়াও অন্যান্য নেককার ব্যক্তিদের বিভিন্ন গায়েবী বিষয়ে অবহিত করা হয় বলে বর্ণিত আছে সেগুলোর সাথে এই সকল আয়াতকে একত্রিত করলে বোঝা যায়, "নবী-রাসুল ছাড়াও অন্যান্য মুমিনদের গায়েব সম্পর্কে জানানো হয়"। এই সকল আয়াতের একটিকে গ্রহণ এবং অন্যটিকে বর্জন করা সঠিক পন্থা নয়। বরং সবগুলো আয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সেগুলোর সঠিক অর্থ নির্ণয় করাই বুদ্ধির দাবী। সুতরাং নবী-রাসুল ছাড়াও সাধারন মুমিনদের গায়েবের কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয় এ বিষয়টি অস্বীকার করা সঠিক নয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে আল্লাহ্‌র বাণী, "রাসুল ছাড়া কাউকে গায়েব জানানো হয় না" এর ব্যাখ্যা কি? এ বিষয়ে ইবনে হাযার রহ. ও ইবনে রজব হাম্বালী রহ. সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

ইবনে হাযার আসক্বালানী নবী-রাসুলদের মু'জিযা হিসেবে এবং আওলিয়া কিরামের কারামত হিসেবে বিভিন্ন গায়েবী ঘটনা জানানো হয়েছিল এটা উল্লেখের পর বলেন,

كل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله إلا من ارتضى من رسول فإنه يقتضي اطلاع الرسول على بعض

الغيب والولي التابع للرسول عن الرسول يأخذ وبه يكرم والفرق بينهما أن الرسول يطلع على ذلك بأنواع الوحي كلها والولي لا يطلع على ذلك إلا بمنام أو الهام والله اعلم

আল্লাহ যে বলেছেন, "তিনি রসুল ছাড়া কাউকে গায়েব জানান না" এই আয়াত থেকেই ঐ সব ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। যেহেতু এই আয়াত প্রমাণ করছে যে, রাসূলদের কোনো কোনো বিষয়ে গায়েব জানানো হয়। আর ওলী তো রাসুলের অনুসারী, অতএব তিনি রাসুলের ওসীলাতেই এই সম্মান প্রাপ্ত হন। তবে পার্থক্য হলো, নবীকে জ্ঞান দেওয়া হয় সকল প্রকার ওহীর মাধ্যমে (নিশ্চিতভাবে) আর ওলীকে স্বপ্ন বা ইলহাম ছাড়া অন্য কোনো ভাবে জানানো হয় না। [ফাতহুল বারী]

ইবনে রজব হাম্বালী ﵀ তার ফাতহুল বারীতে এ বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

وأما إطلاع غير الأنبياء على بعض أفراد ذلك فهو - كما تقدم - لا يحتاج إلى استثنائه؛ لأنه لا يكون علما يقينا، بل ظنا غالبا، وبعضه وهم، وبعضه حدس وتخمين، وكل هذا ليس بعلم،

নবী ছাড়া অন্যদের গায়েবের কোনো কোনো বিষয়ে যে জ্ঞান দেওয়া হয় সেটা বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন নেই কেননা এটা নিশ্চিত জ্ঞান নয় বরং প্রবল সম্ভাবনাময় ধারনা মাত্র। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে সন্দেহ ও অনুমান ছাড়া কিছু নয়। আর এসব কিছুকে (প্রকৃত অর্থে) জ্ঞান বলা যেতে পারে না।

[ফাতহুল বারী]

অর্থাৎ নবী-রাসূল ছাড়া অন্যদের গায়েবের জ্ঞান দেওয়া হয় না এর অর্থ হলো, নবী-রাসুলদের ওহীর মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞান দেওয়া হয়া যা অন্যদের দেওয়া হয় না বরং তাদের স্বপ্ন, ইলহাম ইত্যাদি অনিশ্চিত মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এটা ওহীর মতো নিশ্চিত জ্ঞান নয়।

♦ = যে পাঁচটি বিষয়কে গায়েবের চাবী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেগুলোর জ্ঞান কাউকে দেওয়া হয় কি?

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ}

তার নিকট আছে গায়েবের চাবিসমূহ যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। [আনয়াম/৫৯]

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ،

এটা ঐ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না।

এর পর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন,

{إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ}

নিশ্চয় আল্লাহর নিকটই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন। মায়ের গর্ভে কি আছে তিনি জানেন। কোনো মানুষ জানে না সে আগামী কাল কি অর্জন করবে এবং কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে। [লুকমান/৩৪]

এই সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে কেউ কেউ দাবী করেন, উপোরক্ত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে কাউকে কোনো প্রকার জ্ঞান দেওয়া হয় না। নবী-রাসুল বা অন্য কেউই এসব বিষয়ের কিছুই জানে না। যে কেউ এসব বিষয়ের জ্ঞান দাবী করবে এই সকল দলিল-প্রমাণ অস্বীকার করার কারণে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। তাদের এ মত সঠিক নয়। এই পাঁচটি বিষয়ের কোনো কোনোটি সম্পর্কে নবী-রাসুল ও অন্যান্য নেককার ব্যক্তিদের জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে প্রচুর দলিল-প্রমাণ রয়েছে। নিম্নে প্রতিটি বিষয়ের দলিল প্রমাণ সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো।

♦ = ক) বৃষ্টি অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত জ্ঞান।

ইউসূফ ﷺ তৎকালীন বাদশার একটি স্বপ্নের ব্যখ্যায় বলেন,

{ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ}

এরপর আসবে একটি বছর যাতে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হবে। [ইউসুফ/৪৯]

পূর্বে সহীহ মুসলিমে একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে এসেছে, একজন ব্যক্তি মেঘের মধ্যে গায়েবী আওয়াজ শুনতে পায়। যাতে বলা হচ্ছে, (اسق حديقة فلان) ‘‘অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষন করো’’ তৎক্ষনাৎ মেঘগুলো সেদিকে রওয়ানা হয় এবং উক্ত বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করে।

অন্য একটি হাদীসে দাজ্জাল সম্পর্কে বলা হয়েছে, (فيأمر السماء فتمطر) ‘‘সে আকাশকে আদেশ করলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষন করবে’’ [মুসলিম]

এই সকল দলিল-প্রমাণ হতে এটা অনুধাবন করা যায় যে, আল্লাহ্ ﷻ তার নিজ অনুগ্রহে বৃষ্টি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার কোনো বান্দাকে সে সম্পর্কে অবগত করতে পারেন।

♦ *= খ) মায়ের গর্ভে কি আছে সে সংক্রান্ত জ্ঞান।*

গর্ভের সন্তান সম্পর্কে অবহিত করার বেশ কিছু ঘটনা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আছে। ঈসা عليه السلام এর জন্মের পূর্বেই মারইয়াম عليها السلام কে নেককার পুত্র সন্তান হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছিল। [আলে ইমরান/৪৫] একইভাবে যাকারিয়া عليه السلام ও ইব্রাহীম عليه السلام কে পুত্র সন্তান জন্ম নেওয়ার সংবাদ প্রদান করা হয়েছিল।

ইমাম মালিক তার মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, আবু বকর رضي الله عنه স্বীয় কন্যা আয়েশা رضي الله عنها কে মীরাসের সম্পদ বন্টন সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

وانما هما أخواك وأختاك فاقتسموه علي كتاب الله

তোমার তো দুটি ভাই ও দুটি বোন রয়েছে। আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সম্পত্তি ভাগ করে নেবে।

আয়েশা رضي الله عنها অবাক হয়ে বলেন, আমার বোন তো কেবল আসমা। অর্থাৎ দুটি বোন কোথা থেকে আসল? আবু বকর رضي الله عنه বললেন, গর্ভে যে সন্তানটি আছে আমার মনে হয় সেটা কন্যা সন্তান হবে।

মুয়াত্তার ব্যাখ্যা আল-মুন্তাকাতে বলা হয়েছে "হয়তো আবু বকর رضي الله عنه স্বপ্নের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত হয়ে থাকবেন।" তবে এমনও হতে পারে যে, তিনি স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টি অনুমান করেছেন।

এছাড়া গর্ভের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেস্তাকে সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে, নেককার হবে না বদকার হবে, জান্নাতী হবে না জান্নাতী হবে ইত্যাদি বিষয়ে জানানো হয় বলে হাদীসে বর্ণিত আছে। [সহীহ্ বুখারী]

♦ *= গ) আগামীকাল কি অর্জন করবে সে সম্পর্কিত জ্ঞান।*

উপরে আমরা উল্লেখ করেছি যে, গর্ভের শিশুর রিযিক কি হবে তা পূর্ব হতেই ফেরেস্তাকে জানিযে দেওয়া হয় এবং তিনি তা লিখে রাখেন।

ইউসূফ عليه السلام তার দুই সঙ্গীকে বললেন,

{قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي}

{ তোমাদের কাছে যে খাবারই আসে আমি তোমাদের নিকট আসার পুর্বেই তার স্বরুপ সম্পর্কে অবহিত করি। এটা আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। } [সূরা ইউসুফ/৩৮]

বাদশার স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন,

{قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا}

﴾ তোমরা সাত বছর যাবৎ ভাল ফসল ফলাতে সক্ষম হবে। ﴿ [ইউসুফ/৪৭]

ঈসা ﷺ বললেন,

{وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ}

﴾ তোমর কি খাও ও বাড়িতে কি জমা করো তা তো আমি তোমাদের বলে দিই। ﴿

[আলে ইমরান / ৪৯]

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের স্পষ্ট বর্ণনাতে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ ভবিষ্যৎবাণী করে বলেন, তোমরা কিসরা ও কায়সারের ধনভান্ডার দখল করে তা আল্লাহর রাস্তায় ভাগ-বন্টন করে দেবে।

সহীহ্ বুখারীর আরেকটি বর্ণনাতে এসেছে রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন আমি উমাইয়া ইবনে খালফকে হত্যা করবো। পরে বদরের যুদ্ধে সে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর হাতে নিহত হয়। অর্থাৎ তিনি নিজে কি করবেন সেটা আগেই বলে দিয়েছেন।

এছাড়া আরো বিভিন্ন রেওয়ায়েতে ভবিষ্যতে কি ঘটবে সে বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তার কিছু অংশ বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে আর অন্য কিছু অংশ নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়িত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এসব বিষয়কে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নবুয়তের প্রমাণস্বরুপ মনে করা হয়। অতএব এমন বলার কোনো সুযোগ নেই যে, আগামীতে কি অর্জন করবে সে বিষয়ে কোনো সৃষ্টিকে কিছুই জানানো হয় না।

♦ = ঘ) মৃত্যু কোথায় হবে সে সম্পর্কিত জ্ঞান।

উমর ﷺ বলেন, "বদরের যুদ্ধের আগের দিন রসুলুল্লাহ্ ﷺ কাফিরদের মৃত্যুর স্থান আমদের দেখাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, (هذا مصرع فلان غذا إن شاء الله) " ইনশা-আল্লাহ্ আগামীকাল অমুক এখানে মৃত্যুবরণ কররবে ... "

উমর ﷺ বলেন,

فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَئُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে যিনি সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তার কসম, রসুলুল্লাহ্ ﷺ যে সীমা বর্ণনা করেছেন তা থেকে তার সামান্যতমও বিচ্যুত হয় নি। [সহীহ্ মুসলিম]

অন্য হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

ما بين قبري وبين منبري روضة من رياض الجنة

আমার কবর ও আমার মিম্বারের মধ্যে জান্নাতের একটি বাগান রয়েছে।

[বুখারী ও মুসলিম]

অন্য হাদীসে এসেছে, (ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض) "নবীদের রুহ্ যে স্থানে কবজ করা হয় সেখানেই তাদের দাফন করা হয়" [৬৬] [ইবনে মাযা]

একারণে রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে তার হুজরাতে দাফন করা হয়েছিল।

ইবনে রজব হাম্বালী বলেন, (وهو دليل على أنه علم موضع موته ودفنه) "এই হাদীস প্রমাণ করে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ কোথায় মৃত্যুবরণ করবেন এবং কোথায় তার দাফন হবে তা তিনি জানতেন।" [ফাতহুল বারী]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কণ্যা ফাতেমা رضي الله عنها বলেন,

سَارَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ

রসুলুল্লাহ্ ﷺ আমার সাথে গোপনে কথা বলেন। যে রোগে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন তিনি আমাকে পূর্বেই বলেন যে, আমি এই রোগে মৃত্যুবরণ করবো ফলে আমি কেঁদে ফেলি। পরে তিনি আমাকে বললেন, তার পরিবারের মধ্যে আমিই সবার পূর্বে তার সাথে মিলিত হবো এতে আমি হেসে ফেলি।

[বুখারী ও মুসলিম]

তিরমিযী শরীফের একটি সহীহ্ রেওয়ায়েতে এসেছে, আদম عليه السلام দাউদ عليه السلام এর আয়ু সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তাকে বলা হলো, ষাট বছর। তিনি বলেন, আমার আয়ু থেকে তাকে চল্লিশ বছর দান করো। পরবর্তীতে আদম عليه السلام নিজের আয়ু দাউদ عليه السلام কে দান করার ঘটনা ভুলে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর ফেরেস্তা তার প্রাণ সংহারের উদ্দেশ্যে আগমন করলে তিনি বলেন, আমার আয়ু তো এখনও চল্লিশ বছর বাকী আছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে, আদম عليه السلام কে তার নিজের আয়ু এবং দাউদ عليه السلام এর আয়ু কত হবে সে সম্পর্কে জানানো হয়েছিল।

♦ = ৬) *কিয়ামত সম্পার্কিত জ্ঞান।*

যে পাঁচটি বিষয়কে গায়েবের চাবী বলা হয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো কিয়ামতের জ্ঞান।

---

[৬৬] এই হাদীসটির সনদ সম্পর্কে কিছু আপত্তি রয়েছে। তবে নবীরা যেখানে মৃত্যুবরণ করেন যেখানে তাদের দাফন করা হয় এই কারণে রসুলুল্লাহ্ ﷺ যেখানে মৃত্যু বরণ করেন তাকে সেখানে দাফন করার ব্যাপারটি প্রশিদ্ধ।

কুরআন ও হাদীসে বহুস্থানে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত কখন হবে সে বিষয়ে কাউকে জানানো হয়নি। আল্লাহ ﷻ বলেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ }

﴾ তারা আপনার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তারা বলে, কিয়ামত কখন হবে? আপনি বলুন, এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আমার রবের নিকট। তিনিই নির্দিষ্ট সময়ে সেটা প্রকাশ করবেন।﴿ [আ'রাফ/১৮৭]

একটি হাদীসে এসেছে, জিব্রাঈল ﷺ রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে প্রশ্ন করলেন, "কিয়ামত কখন হবে?" রসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, (مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ) "এ বিষয়ে যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি যে প্রশ্ন করছে তার চেয়ে বেশি অবগত নয়।" [বুখারী ও মুসিলম]

এই সকল দলিল-প্রমাণের কারণে বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরামের নিকট সঠিক মত হলো নবী-রাসুল বা ফেরেস্তা কাউকেই কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করা হয় নি।

ইবনে রজব আল-হাম্বালী রহ. বলেন,

فإن الله استأثر بعلم الساعة، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه

আল্লাহ্ ﷻ কিয়ামতের জ্ঞান নিজের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। এ বিষয়ে তিনি কোনো সৃষ্টিকে অবহিত করেন নি। [ফতহুল বারী]

এটিই সঠিক মত। তবে অন্য কিছু আলেম এ বিষয়ে দ্বিমত করেছেন।

ইমাম সুয়ূতী রহ. বলেন,

ذهب بعضهم إلى أنه {صلى الله عليه وسلم} أوتي علم الخمس أيضا وعلم وقت الساعة والروح وأنه أمر بكتم ذلك

কেউ কেউ বলেছেন, রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে এই পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞানও দেওয়া হয়েছিল এমনকি তাকে কয়ামতের সময় ও রুহ্ সম্পর্কেও জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল। তবে তাকে এটা গোপন রাখতে আদেশ করা হয়েছিল। [খাসাইসুল কুবরা]

এছাড়া কিছু কিছু হাদীস থেকে কোনো কোনো বরেণ্য আলেম কিয়ামত কবে সংঘঠিত হবে সেটা নির্ধারনের চেষ্টা করেছেন।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ একদিন বললেন,

أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ

তোমরা কি আজকের এই রাতটির ব্যাপার লক্ষ্য করেছো? আজ থেকে একশ বছর পর পৃথিবীতে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। [বুখারী ও মুসলিম]

হাদীসটি বর্ণনা করার পর ইবনে উমর ﵁ বলেন,

فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ، فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ»

কিছু মানুষ রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর এই কথার ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে। একারণে তারা একশ বছর সম্পর্কে বিভিন্ন কথা-বার্তা বলে থাকে। আসলে রসুলূল্লাহ্ ﷺ এর উদ্দেশ্য ছিল যারা এখন পৃথিবীর বুকে আছে তাদের কেউই একশ বছর পর থাকবে না।

বদরুদ্দিন আইনী ﵀ বলেন,

لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند انقضاء مائة سنة كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري ورد عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলতো একশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর কিয়ামত সংঘটিত হবে। বদরী সাহাবী আবু মাসউদ ﵁ হতে তিবরানী এমন বর্ণনা উল্লেখ করেছেন তবে আলী ইবনে আবি তালিব ﵁ তার উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। [উমদাতুল কারী]

দেখা যাচ্ছে উপরে উল্লেখিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় এমনকি আবু মাসউদ ﵁ এর মতো সম্মানিত বদরী সাহাবী ভুল বুঝেছেন। তিনি মনে করেছেন এখানে কিয়ামতরে সময় নির্ধারন করা হচ্ছে। তার এ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ভুল এতে সন্দেহ নেই। একারণে আলী ﵁ কঠোরভাবে তার বিরোধিতা করেছেন এবং ইবনে উমর ﵁ এই মতের উপর আপত্তি উত্থাপন করে হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কিন্তু যারা মনে করেছেন এই হাদীসে মূলত কিয়ামতের সময় নির্ধারন করা হয়েছে তাদের কাফির বলা যেতে পারে না যেহেতু এ বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, (لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم) "আল্লাহ এই উম্মতকে অর্ধ দিবস [৬৭] পৃথিবীতে টিকে থাকার ব্যাপারে অক্ষম করবেন না। " [আবু দাউদ]

[৬৭] আখিরাতের হিসাবে অর্ধদিবস দুনিয়ার হিসাবে পাঁচশ বছর।

ইবনে জারীর তাবারী ও অন্য কিছু আলেম এই হাদীস থেকে এমন মনে করেছেন যে, পাঁচশ বছর পর কিয়ামত সংঘটিত হবে।

ইবনে হাযার আসক্কালানী ﵀ ফাতহুল বারীতে ইবনে জারীর তাবারীর এ মতটি উল্লেখ করেছেন এবং সেটির উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে এই উম্মতকে কমপক্ষে পাঁচশ বছর আয়ু দেওয়া হবে তার চেয়ে বেশি যে দেওয়া হবে না তা বলা হয়নি।

অর্থাৎ যারা উক্ত হাদীসটি পাঁচশ বছর পর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পক্ষে দলিল মনে করেছেন তারা ভুল করেছেন। কিন্তু এই ভুলের কারণে তাদের কাফির বলা যাবে না।

এসকল বিষয় এটা প্রমাণ করে যে, কিয়ামতের জ্ঞান যদিও কাউকে জানানো হয়নি তবে নবী-রাসুলদের এ সম্পর্কে অবহিত করা অসম্ভব ছিল না। যেহেতু গায়েবের অন্যান্য বিষয়ে তাদের জানানো হয়েছে এমনকি যে পাঁচটি বিষয়কে গায়েবের চাবী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেসবের কিছু বিষয়ও তাদের জানানো হয়েছে বলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। যদি অনুরূপ প্রমাণ কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে পাওয়া যেতো তবে সেটা অযৌক্তিক ও অসম্ভব হতো না বরং গ্রহণযোগ্য হতো। তবে যেহেতু এ বিষয়ে কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় নি তাই এটা দাবী করা সঠিক হবে না। কিন্তু বিষয়টি অসম্ভব নয় তাই যদি কেউ কোনো হাদীসের ব্যাখ্যায় এমন দাবী করে বা এই মত পোষণ করে তবে তাকে কাফির বলা হবে না যদিও তার মতের উপর আপত্তি উত্থাপন করা হবে। যেমনটি আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি। এ ক্ষেত্রে যেসব সন্দেহ ও সংশয় উপরে বর্ণিত হয়েছে সে কারণে এর উপর নির্ভর করে কোনো মুসলিমকে কাফির বলার সুযোগ অবশিষ্ট নেই।

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো, যে আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন, ‘‘আকাশ ও পৃথিবীর কেউ গায়েবের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত নয়’’ এ আয়াতের অর্থ হলো কেউ নিজে থেকে গায়েবের কিছুই অবহিত হতে সক্ষম নয় বরং আল্লাহ যাকে ইচছা এবং যতটুকু ইচ্ছা গায়েব সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন। অতএব এ আয়াত থেকে এমন মনে করার সুযোগ নেই যে, গায়েব সম্পর্কে কোনো মানুষ কিছুই জানতে সক্ষম নয়। বরং এর সঠিক অর্থ হলো, আল্লাহ যাকে যতটুকু জানান সে ততটুকু জানতে সক্ষম। যেমনটি বিভিন্ন দলিল-প্রমানের আলোকে প্রমাণিত হয়েছে। একইভাবে কুরআন ও হাদীসে যে পাঁচটি বিষয়কে গায়েবের চাবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এমন বলা হয়েছে এর অর্থও এমন নয় যে, এগুলো সম্পর্কে কাউকে কিছু জানানো হয় না। বরং এর অর্থ হলো, এই সকল বিষয়ে সর্বাধিক বেশি গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয় এবং বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া এ বিষয়ে কাউকে অবহিত করা হয় না। কিন্তু আল্লাহ্ ﷻ যাকে ইচ্ছা যে কোনো বিষয়ে অবহিত করে থাকেন এবং

করার পরিপূর্ন স্বাধীনতা রাখেন।

কাজী ইবনুল আরবী ﷺ আল্লাহর বাণী, (عنده مفاتح الغيب) “তার নিকট রয়েছে গায়েবের চাবী সমূহ” এই আয়াত সম্পর্কে বলেন,

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهَا فِي مِلْكِهِ يُظْهِرُ مِنْهَا مَا يَشَاءُ وَيُخْفِي مَا يَشَاءُ

আয়াতের অর্থ এমন হতে পারে যে, তিনি ঐ সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ করেন। তার মধ্যে যতটুকু ইচ্ছা গোপন রাখেন আর যতটুকু ইচছা প্রকাশ করেন। [আহ্‌কামুল কুরআন]

♦ *= গায়েবের জ্ঞান দাবী করা কখন কুফরী হিসেবে গণ্য হবে?*

উপরে আমরা দেখেছি, আল্লাহ্ ﷻ গায়েবের উপর কর্তৃত্ব করেন এবং যাকে যতটুকু ইচ্ছা সে সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন। নবী-রাসুলদের তিনি ওহীর মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে অবহিত করে থাকেন আর অন্যান্য নেককার ব্যক্তিদের কাশফ-ইলহাম, স্বপ্ন ইত্যাদি অনিশ্চিত মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে জানিয়ে থাকেন। অতএব গায়েবের কোনো একটি বিষয়ে জ্ঞান দাবী করা বা কোনো একটি গায়েবী বিষয়ে মন্তব্য করা দোষের বিষয় নয়। তবে পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহর আলোকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, কাউকে গায়েবের উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়নি এবং একজন ব্যক্তিকে গায়েবের সকল বিষয়ে জানানো হয় নি।

আদম ﵇ এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করার জন্য আল্লাহ্ ﷻ তাকে এমন কিছু বিষয় শিক্ষা দেন যে বিষয়ে ফেরেস্তাদের কোনো ধারনা ছিল না। যখন ঐ সকল বিষয়ে আল্লাহ্ ﷻ ফেরেস্তাদের প্রশ্ন করলেন তারা বলল, (لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا) “আপনি আমাদের যতটুকু শিক্ষা দিয়েছেন তার বাইরে আমরা কিছুই জানি না” [বাকারা/৩২] পরে আদম ﵇ ঐ সকল বিষয়ে সঠিক তথ্য বর্ণনা করলেন। আদম ﵇ কে যে সকল বিষয়ের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল এমন নয়। যে গাছটির ফল খেতে তাকে নিষেধ করা হয়েছিল সে গাছটি সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। জানতেন না বলেই শয়তান তাকে ধোকা দিতে সক্ষম হয়। শয়তান তাকে বলে, এই গাছটির ফল আস্বাদন করলে তুমি এবং তোমার স্ত্রী ফেরেস্তা হয়ে যাবে এবং জান্নাতে চিরস্থায়ী হতে সক্ষম হবে। [আ'রাফ/২০] তার কথা বিশ্বাস করে তিনি উক্ত গাছের ফল আস্বাদন করলেন কিন্তু এর ফলাফল হলো পুরো বিপরীত। জান্নাতে চিরস্থায়ী হওয়ার পরিবর্তে তারা জান্নাত থেকে বিতাড়িত হলেন। আল্লাহ্ ﷻ যাকে খলীল তথা অন্তরঙ্গ বন্ধুরুপে গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন, ইব্রাহীম ﵇। যখন তার নিকট ফেরেস্তারা আগমন করলো তিনি তাদের চিনতেই পারেন নি। তিনি বললেন, (قوم منكرون) “আপনাদের তো চিনি না” [যারিয়াত/২৫] ফেরেস্তারা বললেন, আমরা আপনার রবের

পক্ষ হতে দূত। আমরা লুত ﷵ এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে এসেছি। তবে লুত ও তার পরিবারকে রক্ষা করা হবে তার স্ত্রী ছাড়া। ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে ফেরেস্তারা তাকে বলে দিলেন যা তিনি জানতেন না। মুসা ﷵ এর সাথে আল্লাহ্ সরাসরি কথা বলেছেন” [নিসা/১৬৪]। মুসা ﷵ যখন তুর পাহাড়ে আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য গমণ করলেন তখন তার সম্প্রদায় গো-বৎস পূজাতে মেতে উঠেছিল। আল্লাহ ﷻ তাকে খবর দেওয়া আগ পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে কিছুই আঁচ করতে পারেন নি। শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা ؓ কে মুনাফিকরা অপবাদ দিলে তিনি তাকে ডেকে বলেন,

يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ، ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ

হে আয়েশা আমার নিকট এই খবর পৌছেছে। যদি তোমার কোনো দোষ না থাকে তবে আল্লাহ দ্রুতই তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন। আর যদি তুমি অপরাধ করে থাকো তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার নিকট তওবা করো। কেননা কেউ অপরাধ করার পর সেটা স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করে থাকেন। [সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম]

এরপর আল্লাহ্ ﷻ সূরা নূর অবতীর্ণ করেন এবং আয়েশা ؓ কে নির্দোষ ঘোষণা করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত রসুলুল্লাহ্ ﷺ এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারেন নি।

এমন বহু সংখ্যক উদাহরণ দেওয়া যায় যা এখানে সুবিস্তারে বর্ণনা করা অসম্ভব।

এই সকল ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ ﷻ গায়েবের যে কোনো বিষয়ে যাকে খুশি জ্ঞান দিয়ে থাকেন কিন্তু একজন ব্যক্তিকে গায়েবের উপর স্বাধীন ও সমগ্রিক কর্তৃত্ব দেওয়া হয় না। বরং বান্দা সর্বদা আল্লাহর অনুগ্রহের প্রার্থী হয়ে থাকে। তিনি তাকে যতটুকু জ্ঞান দেন তার বাইরে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যায়। এ বিষয়ে এটা হলো, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত অকাট্য সত্য।

অতএব, যদি কেউ দাবী করে কোনো নবী বা ফেরেস্তা অথবা অন্য কোনো মানুষ বা জিন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত। গায়েবের কোনো বিষয়ই তার নিকট গোপন নয় তবে সে কাফির হবে যেহেতু এর মাধ্যমে উপরো উল্লেখিত সকল দলিল-প্রমান অস্বীকার করা হয়।

ইবনে হাযার হাইতামী ؒ বলেন,

من ادعي علم الغيب في قضية أو قضايا لا يكفر ... ومن ادعي علمه في سائر القضايا يكفر

যদি কেউ একটি বিষয়ে বা কয়েকটি বিষয়ে গায়েব জানার দাবী করে তবে সে কাফির হবে না ...কিন্তু সকল বিষয়ে গায়েব জানার দাবী করলে কাফির হবে। [আল-ই'লাম]

উপরের আলোচনাতে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী-রাসুল ছাড়া অন্য কাউকে গায়েবের যে জ্ঞান দেওয়া হয় সেটা নিশ্চিত জ্ঞান নয়। এ আলোচনাও পূর্বে গত হয়েছে যে, বর্তমানে কাশফ্-ইলহাম, স্বপ্ন বা অন্য কোনো মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে গায়েবের জ্ঞান অর্জন করার দাবী করলে সেটা কুফরী হবে কারণ এর অর্থ হলো নিজের জন্য ওহীর দাবী করা অর্থাৎ নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করা। আর মিথ্যা নুবুয়ত দাবী করা কুফরী। ইমাম কুরতুবী ও ইবনে হাযার আসক্বালানী হতে পূর্বে এসব বিষয়ে বিস্তারত আলোচনা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং নবী-রাসুল ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে যে কোনো পন্থায় নিশ্চিতভাবে গায়েবের কোনো বিষয়ে অবগত হওয়ার দাবী করলে সেটা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে। যেমন কেউ যদি মনে করে অমুক বুযুর্গ বা অমুক আলেম গায়েব সম্পর্কে যা বলে তা অকাট্য সত্য তাই যে কোনো বিষয়ে এর উপর নির্ভর করা যায়। তাফসীরের রুহুল মায়ানীতে উল্লেখ করা হয়েছে, সুফীরা প্রায়ই কাশফ্-ইলহামের মাধ্যমে হাদীস সহীহ্-জঈফ করে থাকে। এ বিষয়টি কাশফ্-ইলহামকে নিশ্চিত জ্ঞান মনে করার উদাহরণ। এই প্রকৃতির চিন্তাধারা স্পষ্ট কুফরী হিসেবে চিহ্নিত। "কাশফ্-ইলহাম বা স্বপ্নকে ওহীর মর্যাদা দেওয়া" এই অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, কেবল জোর দিয়ে কিছু বললেই সেটা নিশ্চিত মনে করা বোঝায় না। উদাহরণ স্বরুপ যদি কেই বলে, এবার আমি নিশ্চিত যে, আমার পুত্র সন্তান হবে বা আগামী কাল অবশ্যই বৃষ্টি হবে তবে এই প্রকার কথা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ উক্ত ব্যক্তি মুখে নিশ্চয়তা প্রদান করলেও আসলে সে অন্তরে এটা ঠিকই বিশ্বাস করে যে, তার ধারনা ভুল হতে পারে। এ বিষয়ে আব্বাস ﵁ এর কথাটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছিলেন,

وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، إِنِّي لَأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ عِنْدَ المَوْتِ

আল্লাহর কসম, আমি তো মনে করি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এই রোগেই মৃত্যুবরণ করবেন। আমি জানি মৃত্যুর সময় আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরধের চেহারা কেমন হয়। [সহীহ বুখারী]

আব্বাস ﵁ আল্লাহর কসম করে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর মৃত্যুর খবর আগাম শুনিয়ে দিচ্ছেন। যদিও তিনি নিশ্চিত করে কথাটি বলছেন কিন্তু তিনি নিজে এবং তার কথার শ্রতারা সকলে এটাকে অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয় সত্য বলে মনে করেন না এটা নিশ্চিত। তাই বিষয়টিকে কুফরী মনে করা যাবে না। অর্থাৎ কেবল মৌখিক নিশ্চয়তা দোষের বিষয় নয় যতক্ষণ না বিষটিকে প্রকৃতই নিশ্চিত মনে করা হয়।

মোট কথা, গায়েবের জ্ঞান দাবী করা কুফরী হবে যখন কেউ নবী-রাসূল বা অন্য কোনো মানুষকে গায়েবের উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবে ক্ষমতাবান করে করে। অথবা নবী-ছাড়া অন্য কেউ গায়েব সম্পর্কে অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে অবহিত হয়ে থাকে এমন মনে করে।

তাছাড়া যদি কেউ আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়াই সরাসরি কোনো জ্ঞান অর্জনের দাবী করে তবে এই বিষয়টি আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে অন্যকে শরীক করা বলে গণ্য হবে এবং উক্ত ব্যক্তি কাফির হবে।

ইবনে আবেদীন ﷺ বলেন,

ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى أو ادعى علم الغيب بنفسه يكفر

যদি কেউ আল্লাহর তাকদীরে অবিশ্বাস করে এবং মনে করে সে নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কোনো বিষয়ে অবগত হয়েছে তবে সে কাফির হবে। [রদ্দুল মুহতার]

এছাড়া কোনো একটি বা কয়েকটি ব্যাপারে নবী-রাসূলদের ওহীর মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে আর অন্যদের কাশফ-ইলাহম, স্বপ্ন ইত্যাদি মাধ্যমে অনিশ্চিতভাবে জানানো হয় এমন দাবী করা হলে সেটা কুফরী হবে না বরং এটিই হবে সঠিক আকীদা যা বিভিন্ন দলিল প্রমাণের আলোকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে।

♦ *= "যদি কেউ বলে, "আমি গায়েব জানি" বা "অমুক গায়েব জানে" তবে সে কাফির হবে কিনা"*

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ ইবনে আবেদীন ﷺ বলেন,

وحاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر بها، إلا إذا أسند ذلك صريحا أو دلالة إلى سبب من الله تعالى كوحي أو إلهام، وكذا لو أسنده إلى أمارة عادية بجعل الله تعالى

মোদ্দা কথা হলো, গায়েবের জ্ঞান দাবী করা আল্লাহর কথা (আল্লাহ্ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না) এর সাথে সাংঘর্ষিব তাই এটা কুফরী হবে। তবে যদি স্পষ্টভাবে বা আকারে ইঙ্গিতে এমন বোঝাতে চায় যে, ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে বা প্রকৃতিতে আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মনীতির আলোকে বিষয়টি জানা গেছে তবে এটা কুফরী হবে না। [দুররুল মুখতার]

ইমাম নাব্বী ﷺ 'আর-রাওদা' তে হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম হতে উল্লেখ করেছেন তারা বলেছেন,

أو قيل له تعلم الغيب فقال نعم فهو كافر

যদি কাউকে বলা হয় তুমি কি গায়েব জানো আর সে বলে হ্যাঁ তবে সে কাফির হবে।

ইমাম নাব্বী ﷺ একথা উল্লেখের পর বলেছেন, এতে কাফির না হওয়ার মতটিই সঠিক। শাফেঈ মাযহাবের

বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরাম বিষয়টিকে কুফরী হিসেবে গণ্য করেন নি।

ইবনে হাযার হাইতামী ﵀ এ বিষয়টির সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানো না এর অর্থ হলো সামগ্রিক ও সাম্যকভাবে কেউ গায়েবের ব্যাপারে অবগত নয়। তবে কিছু কিছু ব্যাপারে নবী-রাসুল ও ওলী-আওলিয়াদের জ্ঞান দেওয়া হয়। অতএব, যে ব্যক্তি কোনো একটি বা কয়েকটি বিষয়ে গায়েবের জ্ঞান দাবী করে সে কাফির হবে না কিন্তু যে সকল বিষয়ে গায়েব জানার দাবী করবে সে কাফির হবে। এখন যে বলে, ''আমি গায়েব জানি'' তার এই কথাটির দু'রকম অর্থ হতে পারে।

এক. আমি সকল বিষয়ে গায়েব জানি।

দুই. আমি কোনো কোনো বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েব সম্পর্কে জানতে পারি।

যদি প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হয় তবে কথাটি কুফরী প্রমাণিত হয় যেহেতু এটা আল্লাহর বাণী, ''আল্লাহ্ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না'' এর বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করা হলে কথাটি কুফরী বলা যায় না যেহেতু দু-একটি বিষয়ে গায়েব জানা অসম্ভব নয়।

অবশেষে তিনি বলেন, ''আমি গায়েব জানি'' কথাটি যেহেতু দু'রকম সম্ভবনাই রাখে তাই ইমাম নাব্বী ﵀ এটাকে কুফরী হিসেবে গণ্য করেন নি। এবং এটাকে কুফরী হিসেবে গণ্য না করাই সঠিক।

হানাফী মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের নিকটও এ মত স্বীকৃত যে, যদি কোনো একটি কথার মাধ্যমে দু'রকম অর্থ বুঝে আসে যার একটি কুফরী প্রমান করে অন্যটি করে না তবে কুফরী না হওয়ার অর্থটিকেই প্রাধান্য দিতে হবে যেহেতু স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কোনো মুসলিমকে কাফির বলা যায় না।

হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন ফিকাহ্ গ্রন্থে এসেছে,

إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم

যদি একটি মাসয়ালায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে কুফরী প্রমাণিত হয় কিন্তু একটি দৃষ্টিকোন থেকে কাফির না হওয়া প্রমাণিত হয় তবে আলেমের উচিৎ যাতে কাফির প্রমাণিত না হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি গ্রহণ করা। মুসলিমদের ব্যাপারে সুধারনা রাখার জন্যই এমনটি করতে হবে।

[বাহ্রুর রায়েক, দুররুল মুখতার ইত্যাদি]

অতএব এই মাসয়ালার উপর নির্ভর করে কাউকে কাফির না বলাই সঠিক মত।

যদি কেউ বলে ‘‘রসুল গায়েব জানেন’’ বা ‘‘অমুক পীর গায়েব জানে’’ তবে তার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ তাকে প্রথমেই কাফির বলা হবে না বরং লক্ষ্য করতে হবে সে কি ধরনের গায়েব জানার কথা বলছে। যদি তার উদ্দেশ্য হয় সামগ্রিকভাবে গায়েবের জ্ঞান রাখা তবে এটা কুফরী হবে। আর যদি সে বোঝাতে চায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে গায়েবের বিষয়ে অবগত হওয়া তবে এটা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে না। তবে এ ধরণের সন্দেহমূলক কথা-বার্তা পরিহার করতে হবে যেহেতু এর একটি ভ্রান্ত অর্থও রয়েছে বরং ভ্রান্ত অর্থটিই বেশি প্রকাশ্য। একারণে আয়েশা ﵂ বলেছেন,

ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله

যদি কেউ তোমাকে বলে রসুলুল্লাহ ﷺ গায়েব জানতেন তবে সে মিথ্যাবাদি কারণ আল্লাহ ﷻ বলেন, (لا يعلم الغيب إلا الله) আল্লাহ ছাড়া কেউ গয়েব জানে না। [সহীহুল বুখারী]

কোনো একটি উৎসবে কিছু অল্প বয়স্কা মেয়ে সঙ্গীতের সূরে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর বিভিন্ন গুনাবলী তুলে ধরছিল। এক পর্যায়ে তারা বলে, (وفينا نبي يعلم ما في الغد) ‘‘আমাদের মধ্যে একজন নবী রয়েছে যিনি আগামীকাল কি ঘটবে তা জানেন।’’ রসুলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, (دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين) ‘‘এটা বাদ দিয়ে আর যা কিছু বলছিলে বলতে থাকো।’’ [৬৮] [আবুদাউদ]

♦ = *গনক ও জ্যোতিষীর বিধান।*

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد

যে কেউ ভাগ্য গননকারী বা ভবিষ্যৎ বক্তার নিকট আগমন করে এবং তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করলো। [৬৯]

আবু দাউদ ও ইবনে মাযাতে অনুরুপ বর্ণরা এসেছে, তবে সেখানে অতিরিক্ত বলা হয়েছে, ‘‘অথবা হায়েজ গ্রস্থ মহিলার সহিত মিলিত হয় বা তার স্ত্রীর পশ্চাতে মিলিত হয় তবে সে কাফির হয়ে যায়।’’আবু

---

[৬৮] ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীসটিকে হাসান সহীহ। শায়েখ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

[৬৯] মুসনাদে আহমাদ, মুস্তাদরাকে হাকিম, আজ-জাহাবী বলেন, হাদীসটি বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ।

দাউদের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ ﷺ না নিয়ে এসেছেন সে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সহীহ্ মুসলিমে এসেছে,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

যে কেউ ভবিষ্যৎবক্তার নিকট আগমন করে এবং তার নিকট কিছু প্রশ্ন করে তবে চল্লিশ দিনের সলাত কবুল হয় না।

তিবরানী বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত বলা হয়েছে,

من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم ومن أتاه غير مصدق له لم يقبل له صلاة أربعين يوما

যে কেউ গনকের নিকট গমণ করে এবং তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মাদ ﷺ যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা থেকে বের হয়ে যায় আর যে গনকের নিকট গমণ করে কিন্তু তাকে বিশ্বাস করে না তার চল্লিশ দিনের সলাত কবুল হয় না। [মু'জামুল আওসাত]

অন্য হাদীসে এসেছ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ

রসুলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণ করা, ব্যাভিচারের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ এবং ভাগ্য গননার পারিশ্রমিক থেকে নিষেধ করেছেন। [বুখারী ও মুসলিম]

ইবনে বাত্তাল رحمه الله বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন, (وأما نهيه عن حلوان الكاهن فالأمة مجمعة على تحريمه) "রসুলুল্লাহ্ ﷺ গনকের পারিশ্রমিক নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে।" ইমাম নাব্বী رحمه الله মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন, (هو حرام بإجماع المسلمين) ভাগ্য গননার পারিশ্রমিক হারাম হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

ইমাম নাব্বী رحمه الله ইমাম আল-খাত্তাবী থেকে উল্লেখ করেন,

كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور فمنهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقي إليه الأخبار ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه ومنهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها كمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم به المرأة ونحو ذلك ومنهم من يسمى المنجم كاهنا قال والحديث يشتمل على النهي عن اتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه

আরবে কিছু লোক ছিল যারা দাবী করতো আমরা অনেক গায়েবী বিষয় জানি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতো আমার নিকট জিন আছে যে বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে অবহিত করে থাকে। কেউ কেউ বলতো আমি বিভিন্ন বিষয়ের উপর চিন্তাগবেষণা করে এসব বিষয়ে জানতে পারি। এদের কাউকে কাউকে বলা

হতো আররাফ (عراف) এরা কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর চিন্তা করে উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে মন্তব্য করতো। যেমন, কোনো কিছু চুরি হওয়ার পর কে চুরি করেছে তা বলে দেওয়া, কোনো মহিলার সাথে কার অবৈধ সম্পর্ক আছে তা বলে দেওয়া ইত্যাদি। কেউ কেউ জ্যোতিষীকে (যে তারকারাজির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বলে দেওয়ার দাবী করে) গনক হিসেবে আখ্যায়িত করতো। হাদীসে এই সকল লোকদের নিকট গমন করা এবং তারা যা কিছু বলে তা সত্যায়ন করা হতে নিষেধ করা হয়েছে।

[শারহে মুসিলম]

এই সকল হাদীসে কারো ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করা বা নিজের ভাগ্য জানার জন্য কারো নিকট গমণ করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে। এরুপ কঠোরতার কারণে কেউ কেউ যে কোনো প্রকারে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করা ও ভাগ্য গননাকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। যারা এগুলো করে এবং যারা তাদের নিকট গমণ করে ও তাদের কথা বিশ্বাস করে বা তাদের কথা অনুযায়ী আমল করে তাদের সকলকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

এই ভুল ধারনার বিপরীতে আমরা বলব, ভাগ্য গননা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করার বিষয়টি বিভিন্নরকম হতে পারে। বিষয়টি যেহেতু গায়েবের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত তাই উপরে আমরা গায়েবী জ্ঞান সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেছি সে আলোকে এর সমাধান করতে হবে। আমরা বলেছি, গায়েবী জ্ঞানের দাবী করা তিনটি অবস্থায় কুফরী হবে।

(১) আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়াই কোনো বস্তু বা ব্যক্তির মাধ্যমে সরাসরি কোনো বিষয়ে জানার দাবী করা।

(২) রাসুল ছাড়া অন্য কারো জ্ঞানকে নিশ্চিত ও অকাট্য সত্য হিসেবে বিশ্বাস করা।

(৩) নবী-রাসুল, ফেরেস্তা, মানুষ জিন ইত্যাদি যে কাউকে গায়েবের সকল বিষয়ে সামগ্রিকভাবে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এমন মনে করা।

যদি কেউ এই তিনটি বিষয়ের কোনো একটি দাবী করে সে কাফির হবে। আর যদি কেউ জিনের মাধ্যমে বা কাশফ-ইলহামের মাধ্যমে গায়েব জানার দাবী করে তবে তা কুফরী হবে না।

আল-মানাবী ﷺ বলেন,

إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر

যে ব্যক্তি গনককে সত্যবাদী মনে করে যদি সে এমন আক্বীদা রাখে যে, সে নিজেই গায়েব সম্পর্কে অবগত তবে সে কাফির হবে আর যদি সে মনে করে জিনেরা ফেরেস্তাদের নিকট হতে যে খবর শোনে তা তাদের নিকট পৌছে দেয় অথবা এই ব্যক্তিকে ইলহামের মাধ্যমে কিছু খবর জানানো হয় আর একারণে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তবে এটা কুফরী হবে না। [ফায়দুল কাদীর]

যে হাদীসে গনকের কথায় বিশ্বাস স্থাপণ করা কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, ইমাম তিরমিযী সে হাদীসটি উল্লেখ পূর্বক বলেন,

وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ

আলেমদের নিকট হাদিসটি (প্রকৃত অর্থে কুফরী নয় বরং) তাগ্‌লীজ (অধিক কঠোরতা প্রদর্শন) অর্থে এসেছে। [জামে তিরমিযী]

হাদীসটি যে প্রকৃত অর্থে কুফরী বোঝায় নি তার প্রমান হলো, গনকের নিকট গমন করার সাথে সাথে হায়েজগ্রস্ত মহিলার সাথে মিলিত হওয়া এবং স্বীয় স্ত্রীর পশ্চাতে সঙ্গম করার বিষয়টিকেও কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ এটা নিশ্চিত যে এ বিষয়গুলো প্রকৃত অর্থে কুফরী নয়। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, প্রকৃত অর্থে কুফরী বোঝানো হয়েছে, তবু কথা হলো, এখানে গনকের কথাকে অকাট্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করাকে কুফরী বলা হয়েছে। কারো কথাকে সত্যায়ন করা অর্থ সেটাকে নিশ্চত সত্য বলে মনে করা। আমরা বলেছি, নবী-রাসুল ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের কোনো ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে এমন মনে করা কুফরী। যেসব জিনেরা ফেরেশতাদের কথা শুনে গনকদের নিকট পৌছে দেয় তারাও একটি সত্যের সাথে একশটি মিথ্যা মিশ্রিত করে গনকদের তা শুনিয়ে থাকে এবং তারপর গনকরাও তার সাথে আরো কিছু মিথ্যা মিশ্রিত করে মানুষের নিকট তা বর্ণনা করে। ফলে এর মাধ্যমে নিশ্চিত কোনো সত্যে উপনিত হওয়া সম্ভব হয় না। অতএব যে কেউ গনকের কথাকে নিশ্চিত ও অকাট্য সত্য মনে করে সে কাফির হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি গনকের নিকট গমন করে এবং তার কথা সত্য হতে পারে এমন মনে করে সেটা মেনে চলে সে কাফির হবে না। তবে তার এ কাজ হারাম হবে কারণ রসুলুল্লাহ্ ﷺ গনকদের নিকট গমন করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি তাদের কথা বিশ্বাস না করলেও কেবল কৌতুহলবশত প্রশ্ন করা হলেও চল্লিশ দিনের সলাত কবুল না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। গনকদের সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, (ليسوا بشيء) “তারা কিছু নয়” [বুখারী ও মুসলিম] অর্থাৎ তাদের কথার কোনো ভিত্তি নেই। আর এই প্রকার ভিত্তিহীন বিষয়ের পিছনে ছুটাছুটি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ্ ﷻ বলেন, (ولا تقف ما ليس لك به علم) “যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে ছুটো না” [বানী ইসরাইল/৩৬]

♦ *= গায়েবের বিষয়ে জানার জন্য চেষ্টা করা বৈধ কিনা।*

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত উপস্থিত না থাকলে গায়েব সম্পর্কে জানার দাবী করা বা জানতে চেষ্টা করা কুফরী হবে না। আমরা দেখেছি যে ব্যক্তি গনকের নিকট গমণ করে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করে কিন্তু তার কথা অকাট্য ও সুনিশ্চিত মনে না করে সে কাফির হবে না তবে পাপী হবে যেহেতু রসুলূল্লাহ্ ﷺ গনকের নিকট গমন করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং গায়েব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা কুফরী না হলেও অনেক সময় নিষিদ্ধ ও হারাম হিসেবে গণ্য হতে পারে। গায়েব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করার বৈধতা-অবৈধতা নির্ভর করে কি পদ্ধতিতে গায়েব জানার চেষ্টা করা হচ্ছে তার উপর। নিম্নে এসকল বিষয় সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো।

(ক) স্বপ্ন বা কাশফ ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েব জানা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখন যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নিকট হতে নেক স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে অবগত হওয়ার ইচ্ছায় বিভিন্ন বৈধ পন্থায় চেষ্টা-তদবীর করে তবে তা নিন্দনীয় হবে না।

হাদীসে কোনো কাজ করার পূর্বে দুরাকাত সালাত আদায় করে আল্লাহর নিকট উত্তম জিনিস প্রার্থনা করে ও মন্দ জিনিস হতে আশ্রয় চেয়ে দোয়া করতে বলা হয়েছে। এই সলাতকে বলা হয় ‘‘ইস্তিখারার সলাত’’। এবিষয়ে রসুলুল্লাহ্ ﷺ একটি দোয়াও শিক্ষা দিয়েছেন। ইস্তিখারার সলাতে বান্দা আল্লাহর নিকট দোয়া করে, যেনো তিনি তার অন্তরকে সত্য ও কল্যাণের দিকে পথনির্দেশ করেন। ইস্তিখারার সলাত বান্দার পক্ষ থেকে তার রবের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা হিসেবে গণ্য। আর বান্দার অন্তরে নির্দিষ্ট একটি বিষয় জাগ্রত করে দেওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত জানানোর মতো। অন্তরে কোনো বিষয় জাগ্রত হওয়াকেই মূলত ‘‘ইলহাম’’ বলে। সুতরাং ইস্তিখারার সলাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত জানার চেষ্টা করা হয়।

স্বপ্নের বিষয়টিও অনুরুপ। হাদীসে বলা হয়েছে, নেক স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ বহন করে। যদি কেউ এধরনের স্বপ্ন দেখার জন্য বিশেষ কিছু আমল করে তবে সেটা অবৈধ হতে পারে না। রাত্রে ঘুমানোর সময় রসুলুল্লাহ্ ﷺ ওযু করতে আদেশ করেছেন। এর কারণ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, (وليكون أصدق لرؤياه) ‘‘যাতে সে অধিক পরিমান সত্য স্বপ্ন দেখতে সক্ষম হয়।’’ [শারহে মুসলিম]

একইভাবে বৈধ হবে, কোনো বিষয়ে নেককার ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়া এবং এমন আশা করা যে, হয়তো আল্লাহর তার অন্তরে সত্য জাগ্রত করবেন ফলে সে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সঠিক সমাধান বর্ণনা

করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ ﷻ বলেন, (وأمرهم شوري بينهم) ‘‘তারা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করে কাজ করে’’ [শুরা/৩৮] এছাড়া বিভিন্ন হাদীসে মুমিনদের পরামর্শ নিতে উৎসাহিত করা হয়েছে। উত্তম দিক নির্দেশনা পাওয়ার আশায় নেক-কার ব্যক্তিদের স্বপ্ন সম্পর্কে খোঁজ-খবর করাও সঠিক কর্মপন্থা হিসেবে গণ্য। রসুলুল্লাহ্ ﷺ তার সাহাবাদের প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, (هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا) ‘‘তোমাদের কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছো?’’ [সহীহ্ বুখারী]

(খ) জিন ও ফেরেস্তার মাধ্যমে গায়েবের বিষয়ে খবর পাওয়ার চেষ্টা করা।

উপরে আমরা বলেছি, জিন ও ফেরেস্তার মাধ্যমে গায়েবের বিষয়ে খবর পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হলো, যদি কেউ জিন বা ফেরেস্তার মাধ্যমে গায়েব জানার চেষ্টা করে তবে তার বিধান কি হবে?

জিনদের মাধ্যমে যারা বিভিন্ন খবর সংগ্রহের চেষ্টা করেন তাদের ব্যাপারে কথা হলো, যদি তারা জিনদের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কোনো বিষয় জানার চেষ্টা করে তবে সেটা হারাম হবে কারণ মানুষের মতো জিনেরাও ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছুই জানে না তবে আকাশের ফেরেস্তাদের নিকট হতে তারা দু’একটি কথা শুনে ফেলে। কিন্তু এটা তাদের জন্য নিষিদ্ধ। অতএব কেবলমাত্র অবাধ্য জিনেরাই আড়ি পেতে এধরণের খবর শুনে থাকে। ঐসকল অবাধ্য জিনদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করে তারা যে খবর শ্রবণ করেছে সেটা শ্রবণ করার চেষ্টা করা মানুষের জন্যও অবৈধ হবে এতে সন্দেহ নেই। আর যদি তারা বর্তমানে ঘটমান এবং অতীতে ঘটেছে এমন বিষয়াবলী জানার জন্য জিনদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে তবে কথা হলো, মানুষের মধ্যে যেমন নেককার লোকদের তুলনায় বদকারের সংখ্যা বেশি তেমনি বেশিরভাগ জিনই যে আসলে অবাধ্য শয়তান সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাছাড়া দুষ্টু জিনেরাই মূলত মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপণ করে তাদের বিভিন্ন প্রকারে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে থাকে। নেককার ও আমলদার জিনদের পক্ষে এ ধরণের খেল-তামাশায় অংশ নেওয়ার সুযোগ কমই থাকার কথা। বাস্তবেও দেখা যায়, বে-নামাযী ওঝা-কবিরাজ, বদকার গনক ও জাদুকর ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকৃতির খারপ লোকেরাই জিনের সাথে যোগাযোগের দাবী করে। প্রকৃত নেককার ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এসব দাবী কমই করে থাকেন। বদরের যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষে স্বয়ং ‘‘ইবলিস শয়তান’’ একজন বৃদ্ধ পরামর্শদাতার রুপে যোগদান করেছিল এবং তাদের উৎসাহ দিয়ে বলেছিল,

{لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ}

আজ কেউই তোমাদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে না আমি তোমাদের সাথে আছি।

[আনফাল/৪৮]

কিন্তু রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পক্ষে কোনো জিন অংশগ্রহণ করেছিল বলে শোনা যায় নি। এমনকি বদরে কাফিরদের সংখ্যা কত ছিল সেটা জানার জন্য স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ ﷺ আবু বকর رضي الله عنه কে সাথে নিয়ে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। কোনো জিন সেদিন এই সামান্য তথ্যটি তাকে জানাতে আসে নি। এ ঘটনা প্রমান করে মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ যতটা স্বাভাবিক মানুষের সাথে জিনদের যোগাযোগ ততটা স্বাভাবিক নয়।

মোটকথা, জিনদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুষ্টু শয়তানদের হাতে পড়ে শিরক-কুফর ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া বা দিন দুনিয়ার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এসব বিষয়ে আগ্রহ না দেখানোই উত্তম।

তবে কোনো অবৈধ কাজে লিপ্ত না হয়ে জিনের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে অবগত হওয়া সম্ভব হলে সেটা নিষিদ্ধ হবে না। আমরা পূর্বে ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله থেকে বর্ণনা করেছি, তিনি এ ব্যাপারটিকে বৈধ বলেছেন। কিন্তু জিনদের মাধ্যমে পাওয়া খবরকে অকাট্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। সেটার আলোকে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করাও বৈধ হবে না। যেহেতু এটা জানা সম্ভব নয় যে, সে মিথ্যা বলেছে না সত্য বলেছে।

এখন ফেরেস্তাদের ব্যাপারে কথা হলো, নবী-রাসূল ছাড়া অন্য কারো নিকট সাধারনত ফেরেস্তা আগমন করে না। যদি ফেরেস্তা কেনো মানুষের নিকট খবর নিয়ে আসে তবে মানুষের আকৃতিতে বা গায়েবী আওয়াজের মাধ্যমে এমনভাবে তাকে খবরটি শোনানো হবে যাতে উক্ত ব্যক্তির পক্ষে এটা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না হয় যে, এটা ফেরেস্তা নাকি জিন।

যদি কেউ ফেরেস্তাদের মাধ্যমে কেনো বিষয়ে জানার চেষ্টা করে এবং ফেরেস্তাকে নিশ্চিতভাবে চিনতে পারা ও তার নিকট হতে অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয় জ্ঞান হাসিল করার আশা করে তবে এটা নুবুয়ত ও ওহী পাওয়ার ইচ্ছা হিসেবে গণ্য হবে এবং কুফরী হবে। যেহেতু শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পর আর কোনো নবী আসবে না এ বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব, এখন রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর রেখে যাওয়া কুরআন ও হাদীস ছাড়া ফেরেস্তাদের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে সরাসরি আল্লাহর নিকট হতে নিশ্চিত ও অকাট্য জ্ঞান হাসীল করার চেষ্টা করা বা তার দাবী করা স্পষ্ট কুফরী হিসেবে গণ্য হবে। তবে যদি কেউ মানুষের আকৃতিতে বা অন্য কোনো অনিশ্চিত পন্থায় ফেরেস্তাদের মাধ্যমে কিছু শোনার ইচ্ছা করে তাহলে তা কুফরী হবে না কিন্তু এটা অনুচিত হবে যেহেতু এ ক্ষেত্রে কেনো জিন বা শয়তান নিজেকে ফেরেস্তা পরিচয় দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। অতএব, উপরে জিনের মাধ্যমে গায়েবী খবার জানা সম্পর্কে আমরা যা কিছু বলেছি সেটা এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(গ) প্রকৃতির বুকে ঘটমান বিভিন্ন ঘটনার উপর গবেষণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে গায়েব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা।

যেসব মাধ্যমে গায়েবের বিষয়ে সাধারন মানুষ অবহিত হতে পারে সে সম্পর্কে আমরা বলেছি, প্রকৃতিতে ঘটমান বিভিন্ন বিষয়ের উপর চিন্তা-গবেষণা করে অনেক সময় অজানা বিষয়ে জানা সম্ভব হয়। এরূপ অভিজ্ঞতার আলোকে গৃহিত সিদ্ধান্ত অনেক সময় সঠিক প্রমাণিত হয়। রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর চাচা আব্বাস মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওহ্শী একজন ব্যক্তির পায়ের চিহ্ন দেখে তার পরিচয় শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। এসব ঘটনা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অভিজ্ঞতার আলোকে গায়েব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করার পন্থা ও পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থার পেক্ষিতে এর বিধানও বিভিন্ন রকম হতে পারে। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

১. এর মধ্যে কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা বারবার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন মানুষ মেঘ দেখলে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা করে থাকে যেহেতু সাধারনত ঝড়-বৃষ্টির পূর্বে আকাশে মেঘ দেখা যায় এবং আকাশে মেঘ দেখা গেলে ঝড়-বৃষ্টি হয়। যদি অন্য কোনো ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে ঝড়-বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগ সম্পর্কে পূর্বেই জানতে পারা যায় তবে সে জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সতর্কতা অবলম্বন বৈধ হবে বরং ক্ষেত্র বিশেষে আবশ্যক হবে। আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে জরুরী সতর্কবার্তা ঘোষণার পরও গভীর সমুদ্রে গমণ করা অনেক সময় আত্মঘাতি হিসেবে গণ্য হতে পারে। একারণে "রসুলুল্লাহ্ ﷺ ভগ্নপ্রায় প্রাচীরের পাশ দিয়ে গমণ করতে নিষেধ করেছেন" [মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা]। তাছাড়া রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ) "মুমিন এক গর্ত হতে দুইবার দংশিত হয় না" [সহীহ্ মুসিলম] অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তির উচিত কোনো ব্যাপারে একবার অভিজ্ঞতা হয়ে যাওয়ার পর ভবিষ্যতে সেটা স্মরণ রেখে বিপদ এড়িয়ে চলা। সুতরাং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত বিষয়াবলীর উপর নির্ভর করা কেবল বুদ্ধির দাবী তাই নয় বরং ঈমানের দাবী।

২. কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে প্রমাণিত নয় তবে মুল বিষয়ের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন নয়। যেমন, কারো মুখ দেখে তার আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অনুমান করার চেষ্টা করা বা গর্ভবতী মায়ের গঠন ও আকৃতির উপর চিন্তা-গবেষণা করে গর্ভের সন্তান মেয়ে কি ছেলে সে বিষয়ে মন্তব্য করা ইত্যাদি। আব্বাস رضي الله عنه এর পক্ষ থেকে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর চেহারা লক্ষ্য করে তার মৃত্যু সম্পর্কে মন্তব্য করাও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তিনি বলেছিলেন, আব্দুল মোত্তালিবের বংশধরদের মৃত্যুর সময় তাদের চেহারা কেমন হয় তা আমি জানি। সম্ভবত তিনি স্বীয়

জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর লোকদের মৃত্যুর সময় হাজির থাকতেন এবং তাদের মুখের ভাব লক্ষ্য রাখতেন। এভাবে তিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। যাই হোক, এধরণের মন্তব্য করা দোষের কিছু নয় যদিও এসব বিষয়ের উপর নির্ভর করা যায় না এবং এসব বিষয়েকে নিশ্চিত সত্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। যেহেতু এগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়।

৩. কিছু কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত নয় আবার মূল বিষয়ের সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয় বরং সেগুলো কুসংষ্কার এবং মুর্খতা হিসেবে গণ্য। যেমন ভ্রমণের সময় কাক ডাকলে বা পেঁচা দেখলে সেটাকে অশুভ জ্ঞান করে ভ্রমণ থেকে ফিরে থাকা, হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া, তারকারাজি বা রাশি গননা করে ভাগ্য নির্ধারন করা ইত্যাদি। এসকল কার্যাবলী ইসলামে নিষিদ্ধ।

বিভিন্ন নিষিদ্ধ কর্মের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ﷻ বলেন, (وأن تستقسموا بالأزلام) "এবং তীরের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করা" [মায়েদা/৩]

মুফাসসিরীনে কিরাম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আরবরা যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করতো তখন তিনটি তীর নিতো। যার একটিতে লেখা হতো, "আল্লাহ্ আমাকে এ কাজটি করার আদেশ দিয়েছেন" অন্যটিতে লিখতো "আল্লাহ্ আমাকে এ কাজটি করতে নিষেধ করেছেন" তৃতীয় তীরটিতে কিছুই লেখা হতো না। এরপর তীরগুলোর মাধ্যমে লটারী করতো। যদি "আল্লাহর আদেশ সংক্রান্ত তীরটি উঠে আসতো তবে তারা উক্ত কাজে লিপ্ত হতো আর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত তীরটি উঠে আসলে উক্ত কাজ হতে বিরত থাকতো। যে তীরটিতে কিছুই লেখা নেই সে তীরটি উঠে আসলে পুনরায় লটারী করতো। [ইবনে কাছীর ও অন্যান্য]

এধরণের কাজকর্ম শিশুসুলভ নির্বুদ্ধিতা ও কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। একারণে আল্লাহ্ ﷻ এটা হারাম করেছেন।

তারকারাজীর উপর গবেষণা করে পৃথিবীতে কি ঘটবে বা কার ভাগ্যে কি আছে তা নির্ণয় করার বিধান একই। পৃথিবীতে ঘটমান ঘটনাবলীর সাথে তারকারাজীর কোনো প্রকারের সম্পর্ক প্রমাণিত নয়। এটার উপর নির্ভর করা স্পষ্ট বোকমী ও মুর্খতা ছাড়া কিছু নয়। রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ

যে জ্যোতির্বিদ্যার (তারকারাজী সংক্রান্ত জ্ঞান) কিছু অংশ শিক্ষা করলো সে আসলে জাদুর কিছু অংশ

হাসিল করলো। [৭০] [আবু দাউদ]

আল-খাত্তাবী ﷺ বলেন,

قال الخطابي علم النجوم المنهي عنه هو ما يدل عليه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار وتغير الأسعار وأما ما يعلم به أوقات الصلاة وجهة القبلة فغير داخل فيما نهي عنه

কিছু লোক যে, তারকারাজীর উপর গবেষণা করে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া, জিনিসপত্রের দর-দাম পরিবর্তিত হওয়া ইত্যাদি ভবিষ্যতে ঘটমান বিষয়াবলী সম্পর্কে মন্তব্য করে, হাদীসে এটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারকারাজির মাধ্যমে সলাতের সময় নির্ধারণ করা বা কিবলা কোন দিকে তা নির্ণয় করা নিষেধাজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। [আল-মিরকাত ও আওনুল মা'বুদ]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (الطِّيَرَةُ شِرْكٌ) "তিয়ারা শিরক" [৭১]

তিয়ারার অর্থ সম্পর্কে ইবনে আছির ﷺ বলেন, (هي التشاؤم بالشيء) "এটা হলো কোন কিছুকে অশুভ জ্ঞান করা।" [আন-নিহাইয়া]

এই হাদীসে কোনো বিষয়কে অশুভ জ্ঞান করা শিরক বলা হয়েছে। এখানে প্রকৃত অর্থে শিরক বোঝানো হয়নি বরং বিষয়টি যে নিষিদ্ধ এখানে সেটিই বোঝানো হয়েছে।

বদরুদ্দীন আল-আইনী ﷺ বলেন, (وقوله الطيرة شرك خارج مخرج المبالغة والتغليظ) "রসুলুল্লাহ্ ﷺ তিয়ারাকে শিরক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এটা আসলে তাগলীজ্ (অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা) অর্থে (প্রকৃত অর্থে নয়)। [উমদাতুল কারী]

এখনে যে প্রকৃত অর্থেই শিরক বোঝানো হয়নি তার একটি প্রমাণ হলো, অন্য হাদীসে রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার উম্মতের একটি দল বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর তাদের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

তারা হলো, যারা ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করে না, তিয়ারা করে না, লোহা পুড়িয়ে দাগ দেয় না বরং তারা

---

(৭০) শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [সহীহা/৭৯৩]।

(৭১) হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাসান সহীহ। ইবনে হাযার আসক্বালানী বলেছেন, মুসনাদে বাজ্জারে হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে [ফাতহুল বারী;১০/২১৩] শায়েখ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [সহীহা/৪২৯]।

তাদের রবের উপর ভরসা করে। [বুখারী ও মুসলিম]

এই হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, যারা তিয়ারা করে না তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। অতএব, যারা তিয়ারা করে তারা হিসাব গ্রহণের পর জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি তিয়ারা প্রকৃত অর্থেই শিরক হতো তবে যারা তিয়ারা করে তারা হিসাব গ্রহণের পূর্বে বা পরে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করতো না।

সুতরাং এই প্রকৃতির উদ্ভট ও অসংলগ্ন ও আজগুবী বিষয়াবলীর উপর নির্ভর করে গায়েব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হারাম তবে এটা কুফরী নয়। যদি এর মধ্যে ঐ সকল বিষয় বিদ্যমান না থাকে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। যেমন নক্ষত্ররাজীকে পৃথিবীর উপর স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বশীল মনে করা বা নক্ষত্রের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে অকাট্য ও অলজ্ঘনীয় মনে করা ইত্যাদি। কেননা সে ক্ষেত্রে বিষয়টি কুফরী হিসেবে গণ্য হবে।

♦ ***খ) আল্লাহর কিতাব ও রসুলের হাদীসে কোনো কিছু উল্লেখ আছে বলে দাবী করা অথচ তা উল্লেখ নেই।***

এ বিষয়ের উদাহরণ হলো, না জেনে কোনো বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন, রসুল বলেছেন এমন মন্তব্য করা। জাল হাদিস বর্ণনা করা ইত্যাদি।

আল্লাহ্ ও রসুলের নামে মিথ্যা কথা প্রচার করা তখন কুফরী হবে যখন এর মাধ্যমে শরীয়তের স্পষ্ট প্রমাণিত কোনো বিষয় অস্বীকার করা হয়। যদি কেউ দাবী করে, আল্লাহ্ বা তার রসুল বলেছেন মদ পান করাতে দোষের কিছু নেই বা সলাত আদায় না করলে সমস্যা নেই অথবা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন বা সৃষ্টিজগতের পরিচালনায় তার সাথে অন্য কারো অংশিদারিত্ব রয়েছে তবে এই প্রকৃতির মিথ্যাচার কুফরী হিসেবে গণ্য হবে।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ}

﴾ কিয়ামতের দিন আপনি দেখবেন যারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছিল তাদের চেহারা কালো হয়ে যাবে। জাহান্নামই কি অহংকারীদের যোগ্য বাসস্থান নয়! ﴿ [যুমার/৬০]

এই আয়াতে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলা সম্পর্কে ইমাম বাগাবী رحمه الله বলেন, (فزعموا أن له ولدًا

وشريكًا) ''তারা দাবী করতো আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন বা তার কোনো শরীক রয়েছে'' [৭২]

ইমাম বায়দাবী ﷺ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, (بأن وصفوه بما لا يجوز كاتخاذ الولد) ''আল্লাহর ব্যাপারে তারা এমন সব কথা বলে যার যোগ্য তিনি নন যেমন সন্তান গ্রহণ করা''

আল্লাহ ও তার রসুলের নামে এই প্রকার মিথ্যাচার কুফরী হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যেসব বিষয়ে শরীয়তের স্পষ্টভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা হয় না ঐ সকল বিষয়ে আল্লাহ ও তার রসুলের নামে মিথ্যা কথা প্রচার করা কুফরী নয় যদিও এটা সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পাপ সমূহের মধ্যে একটি।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

আমার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলা তোমাদের কারো ব্যাপারে মিথ্যারোপ করার মতো নয় যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা কথা বলে তার স্থান জাহান্নামে। [সহীহ্ বুখারী]

এই হাদীসটির উপর নির্ভর করে কেউ কেউ মনে করেছেন, আল্লাহর রসুলের নামে মিথ্যা হাদীস তৈরী করা কুফরী। যেহেতু এখানে বলা হয়েছে অন্য কারো উপর মিথ্যারোপ করা আর রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর মিথ্যারোপ করা একই বিষয় নয়। আর এটা সবাই জানে যে, অন্য কারো ব্যাপারে মিথ্যা বলাও পাপ সুতরাং রসুলের উপর মিথ্যারোপ করা কেবল পাপ নয় বরং কুফরী।

ইবনে হাযার আল-আসক্বালানী ﷺ বলেন, ''ইমাম জুয়াইনী ﷺ অনুরূপ বলেছেন তবে তার পুত্র ইমামুল হারামাইন ﷺ স্বীয় পিতার এ মতকে দূর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।'' এরপর তিনি বলেন, (والجمهور على أنه لا يكفر الا إذا اعتقد حل ذلك) ''তবে বেশিরভাগ আলেমের মতে এই ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে না যদি না সে বিষয়টিকে হালাল মনে করে'' [ফাতহুল বারী]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া আস-সারিম আল-মাসলুলে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করার পর তিনি সরাসরি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নামে মিথ্যা বলা কুফরী হওয়ার মতটিকে শক্ত বলেছেন। তবে এ বিষয়ে জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। রসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণী, ''আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলা অন্য কারো ব্যাপারে মিথ্যা বলার মতো নয়।'' এটা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর ব্যাপারে মিথ্যা বলা কুফরী প্রমাণ করে না। যেহেতু পাপ কাজেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে একটি

---

[৭২] তাফসীরে বাগাবী।

পাপকে অন্য পাপের তুলনায় বেশি ভয়াবহ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্য কারো ব্যাপারে মিথ্যা বলার পাপের তুলনায় রসুলুল্লাহ ﷺ এর উপর মিথ্যারোপ করার অপারাধ বহুগুণ বেশি হওয়ার কারণে একটি আরেকটির সমান নয়। তবে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর মিথ্যারোপ করা কুফরী নয় যতক্ষণ না অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিধান অস্বীকার করা হয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

উপরের আলোচনাতে আমরা ঈমান ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ 'আল-ইনকার' (الانكار) এর তিনটি প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেগুলো হলো,

(ক) আল্লাহর অস্তিত্ব, রসুলের রিসালাত বা আল্লাহর কিতাব ও রসুলের হাদীসের মাধ্যমে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিধি-বিধানকে অস্বীকার করা।

(খ) আল্লাহর বিধানকে ত্রুটিপূর্ণ ও অযৌক্তিক আখ্যায়িত করা।

(গ) নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ ও রসুলের নামে মিথ্যা কথা প্রচার করা।

এ তিনটি বিষয়ে আমরা যে আলোচনা উপস্থাপণ করেছি তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে প্রতিটি বিষয় কোনো না কোনো ভাবে আল্লাহ ও তার রসুলের স্পষ্ট কথার মাধ্যমে প্রমাণিত বিধি-বিধান ও মতামতকে অস্বীকার করার সাথে সংশ্লিষ্ট। ইসলামী পরিভাষায় এ ধরণের অস্বীকারকে বলা হয় তাকযীব (التكذيب) যার অর্থ কোনো কিছুকে অসত্য ও অগ্রহণযোগ্য হিসেবে আখ্যায়িত করা।

উপরের তিনিটি বিষয়ই আল্লাহর শরীয়তকে অসত্য ও অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেহেতু এখানে আল্লাহর অস্তিত্ব, রসুলের রেসালাত বা প্রমাণিত কোনো বিধি-বিধানকে অস্বীকার করা হচ্ছে অথবা এসব বিধি-বিধানকে ত্রুটিপূর্ণ আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এসব বিধি-বিধানকে ত্রুটিপূর্ণ আখ্যায়িত করাও একপ্রকার অস্বীকার করা যেহেতু এর মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের যৌক্তিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করা হয়। প্রমাণিত কোনো বিধানের বিপরীতে নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর নামে কোনো বিধান বর্ণনা করা কুফরী হওয়ার কারণও মুলত এই যে, এর মাধ্যমে প্রমাণিত বিধানটিকে অস্বীকার করা হয়।

অতএব, ঈমান ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ আল-ইনকার মূলত আত-তাকযীব (التكذيب) তথা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করা ও অগ্রণযোগ্য সাব্যস্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

উপরের আলোচনাতে 'ইনকার' বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে সুবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচনার ধারাবাহিকতায় এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা দেওয়া হয়েছে। তবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা

প্রয়োজন। নিম্নে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

⇒ মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার ফয়সালা করা।

বর্তমান সময়ের আলোকে এ বিষয়টি অত্যাধিক গুরুত্বের অধিকারী। কাফির-মুশরিক ও নাস্তিক মুরতাদরা একযোগে প্রচার করে চলেছে, ইসলাম দেড় হাজার বছর পূর্বে যেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করেছে সেগুলো বর্তমান সময়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়। তারা যুগের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন-নতুন বিধি-বিধান প্রনয়নের কথা বলে এবং ইসলামী বিধি-বিধানকে মধ্যযুগীয় বর্বর আইন হিসেবে আখ্যায়িত করে। এই শ্রেণীর লোকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এমনকি মুসলিম নামধারী ও ইসলামী মনোভাবাপন্ন নেতা-নেত্রীবর্গও এটা মেনে নিয়েছে বা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। একারণে সারা পৃথিবীর কোথাও এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নেই যেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়। বেশিরভাগ মুসলিম দেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে ইসলামী বিধানকে পরিত্যাগ করে মানবরচিত বিধান গ্রহণের কথা লিখিত আছে। আর যেসব রষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবে ইসলামী বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তারাও কার্যক্ষেত্রে সেই ঘোষণা বাস্তাবায়িত করতে ব্যর্থ হয়। একদিকে তারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, দূর্বল-সবল উভয় শ্রেণীর সাথে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে। যেমনটি ইয়াহুদীরা করতো। অপরদিকে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তারা বেশ কিছু বিধানের বিকৃতি সাধন করে থাকে। যেমন কোনো কোনো দেশে বিবাহিত জেনাকারীকে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা) এর পরিবর্তে ফাসি দিয়ে বা তরবারি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হয় আবার কোথাও সাংবিধানিকভাবে ইসলামী আইনের স্বীকৃতি থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তা পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা হয়।

এ কথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত নেই। পাপাচারী ও জালেমদের পক্ষ থেকে মানুষের উপর মানবরচিত আইন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর সাধারন মানুষ নিজেদের জান-মাল হেফাজতের জন্য তাগুতের নিকট বিচারপ্রার্থী হতে বাধ্য হচ্ছে। এমতাবস্থায় এই সকল রাষ্ট্রের পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের অনুসারীদের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত সৃষ্টি হয়েছে। একদল লোক সাধারনভাবে এদের সকলকে ‘তাগুত’ (طاغوت) হিসেবে আখ্যায়িত করে। এরা মানব রচিত আইনের রচয়িতা এবং এই আইনের প্রচার, প্রসার ও প্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণীর লোকদের কাফির মুশরিক হিসেবে ঘোষণা দিয়ে থাকে। এদের কেউ কেউ এমনকি মানবরচিত আইনের নিকট বিচারপ্রার্থী সাধারন মুসলিমদেরও কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। যেহেতু তাদের ভাষ্য অনুযায়ী তারা তাগুতেকে মেনে নিয়েছে। এরা বেশ কিছু আয়াতকে নিজেদের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করে। যেমন, আল্লাহর বাণী,

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

আপনার রবের কসম তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে যা কিছু বিবাদ ঘটে তার বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ করে এবং আপনি যে বিচার করবেন সে ব্যাপারে তাদের অন্তরে সামান্যও সংশয় সৃষ্টি না হয়। বরং পরিপূর্ণভাবে মেনে নেয়। [নিসা/৬৪]

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

যারা আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না তারা কাফির। [মায়েদা/৪৪]

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}

আপনি কি তাদের দেখেন নি যারা আপনার উপর অবতীর্ণ এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ সকল কিতাবের উপর ঈমান রাখার দাবী করে অথচ তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থী হতে চায়। তাদের তো তাগুতকে অস্বীকার করতেই বলা হয়েছিল। শয়তান তো তাদের বহু দূরে পথভ্রষ্ট করতে চায়। [নিসা/৬০]

এই সকল আয়াত থেকে তারা প্রমাণ করতে চায়, যে কেউ আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার করে না সে কাফির এবং যে এমন ব্যক্তির নিকট বিচার প্রার্থনা করে সেও কাফির।

বিপরীত দিকে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা এই সকল নেতা-নেত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈধ রাষ্ট্রপ্রধান মনে করে এবং মুসলিমদের উপর তাদের আনুগত্য বাধ্যতামূলক মনে করে। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অবৈধ মনে করে। এক্ষেত্রে তারা আমীরের আনুগত্য সম্পর্কে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস পেশ করে থাকে এবং আমীরের মধ্যে কিছু দোষ ক্রুটি থাকলেও তার আনুগত্য করে যাওয়ার ব্যাপারে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে উপস্থাপণ করে। [৭৩]

এই ধরণের বিপরীতমূখী মতামতের দিকে লক্ষ্য রেখে বিষয়টির সঠিক সামাধান জেনে নেওয়া একান্ত জরুরী। এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত অবগত হওয়ার জন্য বেশ কিছু মূলনীতির সম্পর্কে জেনে নিতে হবে।

---

[৭৩] এই গ্রন্থে প্রথম প্রকারের ভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যেহেতু তাওহীদের বিষয়াবলীর সাথে দ্বীতীয় প্রকারের আলোচনা প্রসঙ্গিক নয়। দ্বিতীয় দলের ভ্রান্তি সম্পর্কে আমরা ''আত-তাবঈন ফি হুমমিল উমারা ওয়াস্ সালাতিন'' নামক পৃথক একটি গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

নিম্নে সেসব মূলনীতি সম্পর্কে পৃথক শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

♦ ***আল্লাহর আদেশ অমান্য করা কবীরা গোনাহ্ তবে কুফরী নয়।***

এ বিষয়ে উম্মতে মুসলিমার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ ﷻ আমাদের উপর যা কিছু ফরজ করেছেন তা আবশ্যকভাবে পালন করতে হবে এবং তিনি যা কিছু নিষিদ্ধ করেছেন বর্জন করতে হবে। যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় তারা অপরাধী ও পাপী হিসেবে গণ্য হবে। তবে এই প্রকারের অবাধ্যতার কারণে তারা কাফিরে পরিনত হবে না। পাপী ব্যক্তিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো তারা কাফিরদের মতো চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে না বরং হয়তো আল্লাহ্ ﷻ তাদের কিয়ামদের ময়দানে ক্ষমা করবেন এবং অন্যান্য মুমিনদের সাথে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন অথবা পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের কিছুকাল জাহান্নামে রাখার পর পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এটা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর আদেশ অমান্য করলেই কেউ কাফিরে পরিনত হয় না এবং এধরনের পাপী ব্যক্তিরা কাফির-মুশরিকদের মতো চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে না। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}

❮ নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শিরক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্য যে কোন অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন। ❯ [নিসা/৪৮]

একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,

ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة

যে কেউ লা ইলাহা ইল্লাহ্ বলে এবং তার উপর মৃত্যুবরণ করে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আবু জর رضي الله عنه বললেন, (وإن زنى وإن سرق) "যদিও সে জিনা করে বা চুরি করে?" রসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হঁ্যা, যদিও সে জিনা করে ও চুরি করে। [বুখারী ও মুসলিম]

একজন ব্যক্তি প্রায়ই মদ পান করতো আর তাকে একারণে বারবার শাস্তি প্রদান করা হতো। একদিন অন্য একজন সাহাবী বললেন, এর উপর আল্লাহর অভিসাপ, একে মদ পান করার অপরাধে কত বার পাকড়াও করা হলো আর কত বার শাস্তি প্রদান করা হলো! রসুলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,

لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

তোমরা তাকে অভিসাপ দিয়ো না আমার জানামতে সে আল্লাহ্ ও তার রসুলকে ভালবাসে। [সহীহ

বুখারী]

এই হাদীস প্রমান করে, নিয়মিত মদ পান করে এমন একজন ব্যক্তির অন্তরেও আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি ভালবাসা ও ঈমান বিদ্যমান থাকতে পারে।

তবে এমন বেশ কিছু হাদীস রয়েছে যেখানে বিভিন্ন পাপ কাজকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

যে জিনা করে সে জিনা করার সময় মুমিন থাকে না। যে মদ পান করে সে মদ পান করার সময় মুমিন থাকে না। যে চুরি করে সে চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। [বুখারী ও মুসলিম]

এছাড়া অন্যান্য হাদীসে মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদা, কারো বংশ তুলে গালি দেওয়া, নিজের পিতার পরিবর্তে অন্য কাউকে পিতা বলে পরিচয় দেওয়া, মনিবের নিকট হতে দাসের পলায়ন করা, স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীকে নিন্দা করা ইত্যাদি কর্মকান্ডকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাখ্যাকাররা এসব হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন এখানে মূলত কঠোরতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এমনটি বলা হয়েছে প্রকৃত অর্থেই কুফরী বোঝানো জন্য নয়। বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধান করে তারা এই মত পোষণ করেছেন।

ইমাম নাব্বী ﵀ শারহে মুসলিমে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপণ করেছেন। তিনি যা বলেছেন তার সারাংশ হলো, আহলুস্‌সুন্নাহ ওয়াল জামায়ার সকল ওলামায়ে কিরামের ইজমা এর উপর যে, পাপী ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। সে আদৌ জাহান্নামে প্রবেশ করবে কি না সেটাও নিশ্চিত নয়। তার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। যদি তাকে প্রথমেই ক্ষমা করে দেন তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না বরং অন্যান্য মুসলিমের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যদি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান তবে সে সেখানে স্থায়ী হবে না বরং একটি নির্দিষ্ট সময় পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

এটিই দলিল প্রমানের আলোকে স্পষ্ট প্রমাণিত ও ওলামায়ে কিরামের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত সিদ্ধান্ত। যারা এর বিপরীত মত পোষণ করে এবং কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের বলা হয় ‘খারেজী’। সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই এই শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিল। সকল সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, খারেজীরা

স্পষ্ট ভ্রান্ত ও বিদয়াতী। কেউ কেউ তাদের কাফিরও বলেছেন। সকলেই তাদের মত বর্জন করেছেন এবং সেটা খন্ডায়ন করেছেন।

সুতরাং আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা হবে না। এ বিষয়টি জেনে নেওয়ার পর লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, আল্লাহ্ ﷻ পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে বা রসুলের বাণীর মাধ্যমে যেসব বিধি-বিধান ও আইন-কানুন প্রনয়ন করেছেন এবং সেগুলোর মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করতে আদেশ করেছেন সেগুলোর অবাধ্য হওয়া কবীরা গোনাহ্ বলে গণ্য হবে তবে কুফরী হবে না। যেহেতু আল্লাহর আদেশ অমান্য করা বা তার অবাধ্য হওয়া কুফরী নয়। তবে কেউ আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার বা অপছন্দ করলে তাকে কাফির বলা হবে কারণ আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করা বা অপছন্দ করা কুফরী। আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য কোনো বিধানকে সত্য ও সঠিক বলে মনে করাও কুফরী।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

যে কেউ আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না সে কাফির। [মায়েদা/৪৪]

ইবনুল আরাবী আল-মালেকী রহিমাহুল্লাহ তার আহ্কামুল কুরআনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

وَهَذَا يَخْتَلِفُ إِنْ حَكَمَ بِمَا عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ؛ فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ ، وَإِنْ حَكَمَ بِهِ هَوًى وَمَعْصِيَةً فَهُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُهُ الْمَغْفِرَةُ عَلَى أَصْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الْغُفْرَانِ لِلْمُذْنِبِينَ

এ বিষয়টি বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। যদি সে নিজের তৈরী বিধানকে আল্লাহর বিধান বলে দাবী করে তবে এটা শরীয়ত পরিবর্তন করা বলে গণ্য হবে এবং কুফরী হবে আর যদি সে অবাধ্যতাবশত খেয়ালখুশি মতো বিচার ফয়সালা করে (কিন্তু এটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দাবী না করে) তবে সে পাপী হিসেবে গণ্য হবে (কাফির হিসেবে নয়)। অতএব, আহ্লুস্সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়ার মূলনীতি অনুযায়ী তার এ অপরাধ (আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে) ক্ষমা হতে পারে।

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}

তারা তাদের পন্ডিতবর্গ ও সন্যাসীদের আল্লাহর পরিবর্তে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

[তাওবা/৩১]

এ আয়াত প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا - حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ

এরা নিজেদের সন্যাসী ও পন্ডিতবর্গকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল যেহেতু আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করা এবং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার ব্যাপারে তারা তাদের আনুগত্য করেছিল। বিষয়টি দু'রকম হতে পারে;

এরপর তিনি উভয় প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। প্রথম প্রকারের বর্ণনায় তিনি বলেন,

أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ بَدَّلُوا دِينَ اللَّهِ فَيَتْبَعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيلِ فَيَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَتَحْرِيمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ اتِّبَاعًا لِرُؤَسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ خَالَفُوا دِينَ الرُّسُلِ فَهَذَا كُفْرٌ

ঐ সকল লোকেরা (সন্যাসী ও পন্ডিতবর্গ) আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে ভিন্ন একটি বিধান গ্রহণ করেছে এটা জানা সত্ত্বেও তাদের বিধানটিকেই (সত্য হিসেবে) গ্রহণ করে। নেতৃস্থানীয়দের কথা অনুযায়ী আল্লাহ যা হারাম করেছেন সেটাকে হালাল এবং তিনি যা হালাল করেছেন সেটাকে হারাম বলে আক্বীদা রাখে। অথচ সে জানে যে, আল্লাহর বিধান এর বিপরীত। তবে এটা কুফরী হবে।

দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন,

أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ وَإِيمَانُهُمْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ ثَابِتًا لَكِنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ أَنَّهَا مَعَاصٍ ؛ فَهَؤُلَاءِ لَهُمْ حُكْمُ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ

আর যদি এমন হয় যে, তারা আক্বীদা-বিশ্বাসে হালালকে হালালই মনে করে এবং হারামকে হারামই মনে করে তবে ঐ সকল সন্যাসী ও পন্ডিতবর্গকে অনুসরণ করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে। যেমনটি একজন মুসলিম বিভিন্ন প্রকারে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে থাকে তবে সে এটা বিশ্বাস করে যে আসলে সে পাপ করছে। এদের বিধান হবে অন্যান্য পাপীদের মতই। [অর্থাৎ তারা কাফির হবে না]

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

ইবনে তাইমিয়ার কথার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয় তা হলো, আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করা এবং অন্য কারো বিধান গ্রহণ করা দু রকম হতে পারে। যদি কেউ অন্তরের আক্বীদা বিশ্বাসেও বাতিল বিধানকে সঠিক মনে করে তাহলে সে কাফিরে পরিনত হবে। তবে সে ক্ষেত্রে শর্ত হলো তাকে জানতে হবে যে, মুলত এই বিধানটি আল্লাহর বিধানের বিপরীত। আর যদি সে অন্তরে আল্লাহর বিধানকেই সঠিক মনে করে কিন্তু বাহ্যিকভাবে অন্য কোনো বিধান অনুসরণ করে তবে সেটা কুফরী নয় বরং সাধারন অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে যা ক্ষমার অযোগ্য নয়।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}

তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে তাদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধান দাতা আর কে আছে? [মায়েদা/৫০]

ইবনে কাছির ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم اليَساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله

জাহেলী বিধান সমুহের মধ্যে ঐসব বিধানও গণ্য তাতাররা যার মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়াদির ফয়সালা করতো যা তারা তাদের নেতা চেঙ্গিস খান হতে গ্রহন করেছিল যে তাদের জন্য 'ইয়াসাক' নামে একটি সংবিধান রচনা করে দিয়েছিল যা সে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের বিধিবিধান হতে কিছু কিছু গ্রহণ করার মাধ্যমে রচনা করেছিল। তাতে এমন কিছু বিষয়ও ছিল যা তার নিজের মত। পরে এটাই তার বংশধরদের মধ্যে অনুসরনীয় বিধানে পরিনত হয়। তারা আল্লাহ ও তার রসুলের বিধানকে পিছনে ঠেলে উক্ত বিধানের মাধ্যমে বিচার করতো। তাদের মধ্যে যে কেউই এমনটি করবে সে কাফির হবে তার সাথে জিহাদ করা ফরজ হবে যতক্ষন না সে আল্লাহর বিধান ও তার রসুলের বিধানের দিকে ফিরে আসে।

[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

অন্য স্থানে তিনি অতিরিক্ত বলেন,

مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَفَرَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ

যে কেউ এমন করবে সকল মুসলিমের ঐক্যমতে সে কাফিরে পরিনত হবে।

[বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া]

ইবনে কাছির ﷺ তাতারদের এই কর্মকান্ডকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কারণ তারা ইসলামের পাশাপাশি ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্মকেও সঠিক বলে মনে করতো [৭৪] এবং চেঙ্গিস খানকে আল্লাহর পক্ষ

---

[৭৪] ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন,

وَكَذَلِكَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُزَرَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ يَجْعَلُونَ دِينَ الْإِسْلَامِ كَدِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَإِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا طُرُقٌ إِلَى اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ . ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يُرَجِّحُ دِينَ الْيَهُودِ أَوْ دِينَ النَّصَارَى وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَجِّحُ دِينَ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا الْقَوْلُ فَاشٍ غَالِبٌ فِيهِمْ

একইভাবে তাতারদের মধ্যকার নেতৃত্বস্থানীয়রা এবং অন্যান্যরা ইসলামকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মের অনুরুপ মনে করতো। তারা বলতো এগুলো আল্লাহর নিকট পৌছানোর বিভিন্ন পন্থা যেমন মুসলমানদের চারটি মাজহাবের মতো। এই তিনটি ধর্মকে

থেকে একজন বার্তাবাহক হিসেবে গণ্য করতো। [৭৫] মূলত একারণেই তারা ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম হতে কিছু বিধান গ্রহণ করেছিল এবং চেঙ্গিস খান যেসব বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছিল সেগুলো অনুসরণ করতো। অর্থাৎ তারা ইয়াসেখ নামক সংবিধানে উল্লেখিত বিধি-বিধানসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাই মনে করতো বা কমপক্ষে এগুলোকে সঠিক হিসেবে দাবী করতো। একারণে ইবনে কাছির ﷫ দ্ব্যার্থহীনভাবে তাদের কাফির হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কেবলমাত্র কিছু নিষিদ্ধ আইন-কানুন গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করা বা রাষ্ট্রে চালু করার কারণে নয়।

♦ *আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান অনুসরণ করা কুফরী নয়।*

উপরের আলোচনাতে সম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান অমান্য করা কুফরী নয়। তবে এটা কবীরা গোনাহ্ বা বড় পাপ। কেবলমাত্র খারেজীরা এ ধরণের অপরাধকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী সকল যুগের ওলামায়ে কিরাম তাদের এই মতবাদকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বিভিন্নভাবে তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। খারেজীদের ব্যাপারে ওলামায়ে দ্বীনের এধরণের পদক্ষেপ ও প্রতিক্রিয়ার ফলে সকল শ্রেণীর মুসলিমরা এটা স্পষ্ট জানে যে, পাপ ও কুফরী এক জিনিস নয়। আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হলেই কেউ কাফিরে পরিনত হয় না যতক্ষণ না সে আল্লাহর আদেশকে অস্বীকার করে বা অন্য কোনো কুফরীতে লিপ্ত হয়। এর বিপরীতে কোনো মতবাদ তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। এমতাবস্থায় কিছু সংখ্যক লোক খারেজীদের এই মতবাদটিই মুসলিম উম্মার সামনে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপণ করছে। একটু ঘোর-পেঁচের মাধ্যমে তারা যা কিছু বলছে তাতে মূলত পূর্বের যুগের খারেজীদের এই মতবাদটিই প্রমাণিত হচ্ছে। যদিও তারা নিজেরাই খারেজীদের নিন্দা করে থাকে। এভাবে তারা অজ্ঞাতসারে সেই মতবাদকে সমর্থন করে যাচ্ছে যা তারা অপছন্দ করে। তারা বলে, আল্লাহর বিধান অমান্য করা কুফরী নয় তবে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে সেই স্থানে ভিন্ন কোনো বিধানের উপর আমল করা কুফরী। চোরের

সঠিক হিসেবে মেনে নেওয়ার পর তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম বেশি উত্তম মনে করে সেটা গ্রহণ করতো আবার কেউ কেউ ইসলামকে বেশি উত্তম মনে করে তাতে প্রবেশ করতো। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

[৭৫] ইবনে তাইমিয়া ﷫ বলেন, (أَنَّ اعْتِقَادَ هَؤُلَاءِ التَّتَارِ كَانَ فِي جنكسخان عَظِيمًا فَإِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ ابْنُ اللَّهِ مِنْ جِنْسِ مَا يَعْتَقِدُهُ النَّصَارَى فِي الْمَسِيحِ) "তাতাররা চেঙ্গিস খানকে অত্যাধিক সম্মানিত মনে করতো। তারা বিশ্বাস করতো সে আল্লাহর পূত্র খৃষ্টানরা ঈসা ﷵ এর ব্যাপারে যেমনটি করে থাকে।" [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া] তিনি আরো বলেন, তাতাররা মুসলিম হওয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে একজন দূত শামের মুসলিমদের নিকট এসে নিজেদের মুসলিম প্রমাণের চেষ্টা করে। সে বলে, (هَذَانِ آيَتَانِ عَظِيمَتَانِ جَاءَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ وجنكسخان) "এই দুটি কথা মুহাম্মাদ ও চেঙ্গিস খান আল্লাহর নিকট হতে নিয়ে এসেছেন। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া] অর্থাৎ তারা চেঙ্গিস খানকে আল্লাহর নবীর সমান মনে করতো।

ব্যাপারে আল্লাহর বিধান হলো হাত কেঁটে দেওয়া। যদি কেউ চোর পাকড়াও করার পর তার উপর কোনো শাস্তি প্রয়োগ না করে বরং তাকে ছেড়ে দেয় তবে সে অপরাধী হবে যেহেতু সে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে নি তবে সে কাফির হবে না। আর যদি কেউ চোরকে আল্লাহর শাস্তির পরিবর্তে ভিন্ন কোনো শাস্তি যেমন জেল-জরিমানা ইত্যাদি প্রদান করে তবে সে কাফির হবে যেহেতু সে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে ভিন্ন একটি বিধানের উপর আমল করেছে। এ বিষয়টিকে তারা তাবদীল (تبديل) তথা দ্বীন পরিবর্তন হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। বলা হয়, যদি কেউ মাগরিবের ফরজ সলাত তিন রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত আদায় করে বা রমজানের ফরজ রোজা ত্রিশটির অধিক দাবী করে সে কি কাফির হবে না? একইভাবে যদি কেউ চোরকে হাত কাঁটার পরিবর্তে জেল-জরিমানা বা অন্য কোনো দন্ডে দন্ডিত করে সেও কাফির হবে।

তাদের এই সকল যুক্তি প্রমাণের জবাব হলো, আল্লাহর বিধান অমান্য করা আর উক্ত বিধানের বিপরীত কিছুর উপর আমল করা মূলত একই বিষয়। যে কেউ আল্লাহর আদেশ অমান্য করে সে উক্ত আদেশের বিপরীত কোনো না কোনো বিষয়ের উপর আমল করে। আল্লাহ্ ﷻ যাকাত আদায়ের যে বিধান দিয়েছেন অনেকে সেটা অমান্য করে তার পরিবর্তে গান-বাজনা, যাত্রা পালা ইত্যাদি অবৈধ কাজে টাকা দান করে। হজ্জ ফরজ হওয়ার পরও অনেকে হজ্জ করে না কিন্তু তার পরিবর্তে বহু টাকা খরচ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করে। এসব কাজ কুফরী হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে না। যদিও এখানে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে তার বিপরীতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমল করা হচ্ছে। বাস্তব কথা হলো, কোনো একটি আদেশ অমান্য করার অর্থই হলো তার বিপরীতে অন্য কিছু করা। যে সলাত পড়ে না সে ঐ সময় হয়তো ঘুমায় অথবা অন্য কোনো কাজে লিপ্ত থাকে। যে সওম পালন করে না সে এর পরিবর্তে পানাহার করে ইত্যাদি। যে চোরের উপর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ না করে তাকে ছেড়ে দেয় সেও তো আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান তথা বেকসুর খালাশ দেওয়ার বিধান অনুসরণ করে। সুতরাং কেবল আদেশ অমান্য করলে কুফরী হবে না বরং সেটির বিপরীতে কিছু করলে তা কুফরী হবে এই কথাটি সঙ্গত নয়। বরং আল্লাহর আদেশ অমান্য করা কুফরী নয় এর অর্থই হলো আল্লাহর আদেশের বিপরীতে কিছু করা কুফরী নয় যদিও এটা মারাত্মক অপরাধ। একারণে আমরা দেখেছি ওলামায়ে কিরাম আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোনো বিধানকে যারা অনুসরণ করে তাদের ব্যাপারে বলেছেন যদি কেউ নিজের বিধানটিকে আল্লাহর বিধান বলে দাবী করে এবং সেটিকেই সঠিক বলে মনে করে তবে কাফির হবে যেহেতু তারা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করছে। কিন্তু যদি তারা আল্লাহর বিধানটিকেই সঠিক মনে করে কিন্তু অবাধ্যতা বশত অন্য কোনো বিধান অনুসরণ করে তবে এটা কুফরী হবে না বরং পাপকাজ হিসেবে

গন্য হবে। ইবনুল আরাবী ও ইবনে তাইমিয়া থেকে আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি তাতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে, ইয়াহুদীরা জেনাকারীকে রজম করার পরিবর্তে বিভিন্নভাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত করতো এবং বেত্রাঘাত করতো। রসুলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন,

ما تجدون في التوراة في شأن الرجم

রজম সম্পর্কে তাওরাতে কি লেখা আছে?

তারা বলে, (نفضحهم ويجلدون) "তাদের লাঞ্চিত করা হবে এবং বেত্রাঘাত করা হবে" এটা শুনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম رضي الله عنه বলেন, তোমরা মিথ্যা বলছো, তাওরাতে পাথর মেরে হত্যা করার কথাই লিখিত আছে।

এই ঘটনা প্রমাণ করে ইয়াহুদীরা মূলত নিজেদের তৈরী বিধানকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধান হিসেবে দাবী করতো।

সহীহ্ মুসলিমের একটি হাদীসে ইয়াহুদীদের এসব কার্যাবলীর বর্ণানা এসেছে। সেখানে এও বলা হয়েছে যে, এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়,

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

﴾ যে কেউ আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না সে কাফির। ﴿ [মায়েদা/৪৪]

অতএব, আয়াতটিকে কেবল অনুরুপ ঘটনার উপর প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ যারা নিজেদের বিধানকে আল্লাহর বিধান হিসেবে দাবী করবে এবং প্রকৃতই যেটা আল্লাহর বিধান সেটা অস্বীকার করবে কেবল তারাই কাফির প্রমাণিত হবে। পূর্বে ইবনুল আরবী رحمه الله থেকে আমরা বর্ণনা করেছি, তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যারা নিজেদের আইনকে আল্লাহর আইন বলে দাবী করে তাদের উপর কুফরীর বিধান প্রযোজ্য হবে কিন্তু যারা এমন দাবী করে না বরং শুধুমাত্র আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজেদের আইন দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে তারা কাফির হবে না বরং পাপী হবে।

অর্থাৎ তিনি ইয়াহুদীদের ঘটনার অনুরুপ ঘটনাবলীতে কুফরীর বিধান প্রয়োগ করেছেন কেননা আয়াতটি তাদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে।

ইবনে জারীর তাবারী رحمه الله এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট কথা বলেছেন, তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন,

من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرّ به ولم يحكم، فهو ظالم فاسقٌ

যে কেউ আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে সে কাফির হবে আর যে আল্লাহর বিধানকে স্বীকার করে কিন্তু তা দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে না সে জালেম ও ফাসিক বলে গণ্য হবে।

এর পর ইবনে জারীর তাবারী ﵀ বলেন,

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، قولُ من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيُّون بها. وهذه الآيات سياقُ الخبر عنهم، فكونُها خبرًا عنهم أولى.

فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عمَّ بالخبر بذلك عن جميع منْ لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصًّا؟

قيل: إن الله تعالى عَمَّ بالخبر بذلك عن قومٍ كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكمَ، على سبيل ما تركوه، كافرون. وكذلك القولُ في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به، هو بالله كافر، كما قال ابن عباس

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমার নিকট সঠিক মত হলো আয়াতটি আহলে কিতাবী কাফিরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা এই আয়াতের আগে ও পরের আয়াতসমূহ তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে এবং সেখানে তাদের সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এই সকল আয়াত যেহেতু তাদের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গেই এসেছে তাই এই আয়াতটিও তাদের সাথে সম্পর্কিত হবে এটিই স্বাভাবিক। যদি কেউ বলে আল্লাহ ﷻ সাধারনভাবে যে কেউ আল্লাহর আইন দ্বারা বিচার করে না তাদের ব্যাপারে এই আয়াতে কথা বলেছেন আর আপনি এটাকে বিশেষ কিছু ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করছেন এটা কিভাবে সম্ভব? তাকে বলা হবে, আল্লাহ্ ﷻ এখানে ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে কথা বলছেন যারা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করতো। আল্লাহ ﷻ এই আয়াতে বলছেন, যারা তাদের মতো (অস্বীকার করার মাধ্যমে) আল্লাহর বিধানকে পরিত্যাগ করে তারা কাফির। এভাবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে যে, আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করার কারণে তার মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করে না। যেমনটি ইবনে আব্বাস ﵁ বলেছেন। [তাফসীরে তাবারী]

এছাড়া অন্য সকল তাফসীরকারক এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অনুরুপ কথা বলেছেন। যা এখানে সুবিস্তারে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

মুলত এই বিষয়টিই হলো তাবদীল তথা আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করা এবং এধরণের পরিবর্তন সাধন করা কুফরী বলে গণ্য। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে ভিন্ন কোনো বিধানের অনুসরণ করাকেই তাবদীল হিসেবে গণ্য করা এবং কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়।

আমরা যদি মাগরিবের ফরজ সলাত চার রাকাত আদায় করা বা ফরজ রোজা ত্রিশটির অধিক দাবী করা কেনো কুফরী হয় সে বিষয়ে চিন্তা করি তবে দেখা যাবে এখানে আল্লাহর বিধান অস্বীকার করা এবং

অন্য কোনো বিধানকে আল্লাহর বিধান হিসেবে দাবী করা হচ্ছে বিধায় এটি কুফরী হচ্ছে। কেবলমাত্র আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে ভিন্ন কেনো বিধান অনুসরণের কারণে নয়। যে ব্যক্তি মাগরিবের ফরজ সালাত চার রাকাত আদায় করে নিশ্চিতভাবেই সে এই চার রাকাত সলাতকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ হিসেবে বিশ্বাস করে। একইভাবে যে ব্যক্তি রমজানের ফরজ রোজা ত্রিশটির অধিক বলে মনে করে সেও আল্লাহর পক্ষ থেকে ত্রিশটির অধিক রোজা ফরজ করা হয়েছে এমন দাবী করে অথচ আল্লাহ তা করেন নি। অর্থাৎ এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সঠিক বিধানটি অস্বীকার করা হয় এবং ভিন্ন একটি বিধানকে আল্লাহর বিধান হিসেবে দাবী করা হয়। একারণে এটা কুফরী হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু যেসব বিষয়ে এধরণের দাবী করা হয় না বরং আক্বীদা সঠিক রেখে কেবল কার্যক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানের অনুসরণ করা হয সেখানে বিষয়টি কুফরী হতে পারে না। যদিও সেটা অবাধ্যতা হিসেবে গন্য হবে। উদাহরণস্বরুপ আল্লাহ ﷺ পরষ্পরের সাথে স্বাক্ষাতের সময় বা বাড়িতে প্রবেশের সময় সালাম দিতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً }

﴿ যখন তোমরা কোনো বাড়িতে প্রবেশ করো তখন নিজেদের আত্মীয় পরিজনকে সালাম দাও। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি অত্যাধিক কল্যাণময় সম্ভাষণ। ﴾ [নূর/৬১]

সুতরাং একে অপরকে সালাম দেওয়া আল্লার পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি বিধান। অথচ বর্তামানে বিশেষত শহুরে জীবনে একটি বিষয় রেওয়াজ হয়ে গেছে যে, বাড়িতে প্রবেশ করা বা বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সালাম দেওয়ার পরিবর্তে গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং ইত্যাদি ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ করা হয়। এ ধরণের বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য এটা সঠিক তবে কোনো ক্রমেই সালামের পরিবর্তে গুড মর্নিং বলা কুফরী হিসেবে গণ্য হতে পারে না। যদি না সালামের বিধানকে অস্বীকার করা হয় এবং গুড মর্নিং বলাটাই আল্লাহর বিধান হিসেবে দাবী করা হয়। একইভাবে চোরের হাঁত কাটা বা জেনাকারীকে রজম করার পরিবর্তে ভিন্ন কোনো শাস্তি দেওয়া হলে তা কুফরী হবে না যতক্ষণ না এ বিষয়ক আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার বা অপছন্দ করা হয় বা জেল-জরিমানাকে আল্লাহর বিধান হিসেবে দাবী করা হয় বা কমপক্ষে এসব বিধি-বিধানকে উত্তম মনে করা হয় এবং এগুলোর মাধ্যমে বিচার ফয়সালা করা বৈধ মনে করা হয়।

♦ ***হারাম কাজের অনুমতি দেওয়া বা আদেশ দেওয়া কুফরী নয়।***

আমরা পূর্বের আলোচনায় বলেছি, হারামকে হালাল মনে করা স্পষ্ট কুফরী। এ ব্যাপারে উম্মতে মুসলিমার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে হারামকে হালাল মনে করার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বেশ কিছু ভুল ধারনা

প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন সরকারীভাবে কোনো হারাম কাজের অনুমতি প্রদান করা হলে বা পারমিশন দেওয়া হলে তা উক্ত হারাম কাজকে হালাল মনে করা হিসেবে গণ্য। ফলে এটা কুফরী হবে। যেমন মদ বিক্রয় করা বা পতীতালয় খোলার লাইসেন্স প্রদান ইত্যাদি। তাদের দাবী, হালাল হারাম অর্থ বৈধ-অবৈধ। যারা একটি অবৈধ কাজকে লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে অনুমতি দেয় তারা মূলত কাজটিকে বৈধ তথা হালালে পরিনত করে একারণে তারা কাফির হবে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এটিও মূলত খারেজীদের আক্বীদার নবসংষ্করণ। যেহেতু এর মাধ্যমে হারাম কাজে লিপ্ত যে কোনো ব্যক্তিকে কাফিরে পরিনত করা যায়। কেননা যে নিজে হারাম কাজে লিপ্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে অন্যকে উক্ত হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। যে নিজে মদ পান করে সে নিজের বাড়িতে বন্ধুদের মদপান করার অনুমতি প্রদান করবে এটাই স্বাভাবিক। যে নিজে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলে না সে স্বীয় স্ত্রী, কন্যাদের বেপর্দা হাটে বাজারে ঘোরা-ফিরা করার অনুমতি প্রদান করে থাকে। কোনো কোনো বেহায়া পুরুষ তো নিজ স্ত্রী-কন্যাদের পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক করার খোলামেলা অনুমোদন প্রদান করে। যখন একটি নারী অন্য পুরুষের সহিত জেনায় লিপ্ত হয় তখন সে উক্ত পুরুষকে তার সহিত এই অপকর্ম করার অনুমতি প্রদান করে। তার অনুমতি ছাড়া উক্ত পুরুষের পক্ষে এহেন নিকৃষ্ট কাজ করা সম্ভব হতো না। মদ বিক্রেতা তার নিজের উপার্জনের জন্য অন্যদের মদ পান করার সুযোগ করে দেয়। যদি হারাম কাজের অনুমতি প্রদান করা কুফরী হয় তবে এই সকল ক্ষেত্রে কুফরীর ফতোয়া জারী করতে হবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ‘‘হারাম কাজের অনুমতি দিলে হারামকে হালালে পরিনত করা হয় এবং একারণে বিষয়টি কুফরী হয়’’ এই মূলনীতিটি কেবল রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। যে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে জেনা করার অনুমতি প্রদান করে, যে বাবা তার কন্যাদের বেপর্দা চলাফেরা করা বা এমনকি বয়ফ্রেন্ডদের সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে তাদের ক্ষেত্রে এই মূলনীতি প্রয়োগ করা হয় না। এমন বৈষম্য কেনো করা হয়? অথচ রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

তোমাদের প্রত্যেকেই কর্তৃত্বশীল এবং স্বীয় কর্তৃত্বে থাকা বিষয়াবলী সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। রাষ্ট্রপ্রধান তার প্রজাদের ব্যাপারে কর্তৃত্বশীল। তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে কর্তৃত্বশীল। তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। একজন মহিলা তার স্বামীর গৃহে কর্তৃত্বশীল তাকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। একজন চাকর তার মনিবের সম্পদের উপর কর্তৃত্বশীল তাকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। [বুখারী ও মুসলিম]

সুতরাং যদি নিজ কর্তৃত্বের অধীনে কাউকে হারাম কাজের অনুমতি প্রদান করলে সেটা হারামকে হালাল

করা হিসেবে গণ্য হয় এবং কুফরী হয় তবে কেবল রাষ্ট্রপ্রধান নয় বরং এই সকল শ্রেণীর লোকেরা কাফিরে পরিনত হবে। আর বলাবাহুল্য যে এভাবে সকল প্রকার পাপী ও অপরাধীরা কাফিরে পরিনত হবে এবং খারেজীদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে যে বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে তা হলো,

হারাম কাজে নিজে লিপ্ত হওয়া যেমন কুফরী নয় অন্যকে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার মৌখিক বা লিখিত অনুমতি দেওয়া বা আদেশ দেওয়া বা এমনকি বাধ্য করাও কুফরী নয়। সেটা ব্যক্তিগতভাবে হোক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে। আল্লাহর বিধান সকলের জন্য সমান। একই বিষয় রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য কুফরী কিন্তু অন্যদের জন্য কুফরী নয় এমন হতে পারে না।

খোলাফায়ে রাশিদা তথা চার খলিফার যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর হতেই বিভিন্ন খলীফা রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন ফরমান জারী করতেন যাতে প্রজাদের বিভিন্নপ্রকার হারাম কাজে বাধ্য করা হতো। উমায়্যাদের শাসনামলে ইসলামী সম্রাজ্যের সকল প্রদেশে জুম্মার খুতবায় আলী ﵁ কে গালি দেওয়ার নির্দেশ ছিল। উমর ইবনে আব্দিল আজিজ ﵀ খলীফা হওযার পর সে প্রথা বাতিল করেন। অথচ মুসলিমকে গালি দেওয়া অবৈধ। এ ব্যাপারে সাধারন নির্দেশ রয়েছে। আর আলী ﵁ এর ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশনা আছে। আলী ﵁ বলেন, রসুলুল্লাহ্ ﷺ আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমাকে কেবল মুমিনরাই ভালবাসবে আর কেবলমাত্র মুনাফিকরাই আমাকে ঘৃণা করবে। [সহীহ্ মুসলিম] এছাড়া জনসাধারনের উপর বিভিন্ন প্রকার অবৈধ কর আরোপ এবং সেগুলো বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করার জন্য লোক নিয়োগ করা। সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন ধরণের অবৈধ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুনো-খুনিতে লিপ্ত করা। কোনো এলাকা বিজিত হলে সেনাবাহিনীর জন্য সেখানে হত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠন ইত্যাদি যা খুশি তাই করার অনুমতি প্রদান করা ইত্যাদি ঘটনা তখনকার যুগের নিত্যনৈমিত্যিক ব্যাপার ছিল। ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে এসব বিষয়ে অঢেল দলিল প্রমাণ রয়েছে। এসব বিষয় নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত পাপাচার হিসেবে গণ্য তবে এগুলো কুফরী নয়।

♦ *ইসলাম বিরোধী নিয়ম-নীতিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন ও সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা।*

আমরা উপরে বলেছি, হালাল-হারামের বিধানে পরিবর্তন করা কুফরী হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই তবে হালাল হারামের মধ্যে পরিবর্তন বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে কিছু ভুল চিন্তাভাবনা রয়েছে। একদল লোক মনে করে রাষ্ট্রীয়ভাবে হারাম কাজের অনুমতি (লাইসেন্স) প্রদান করা হলে তা হারামকে হালাল করা হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণে কুফরী হবে। উপরে আমরা এ মত খন্ডায়ন করেছি। বিপরীত দিকে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা মনে করে ‘‘আমি অমুক হারাম জিনিসকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করছি’’ এভাবে হারাম ও হালাল শব্দদুটি উচ্চারণ না করা পর্যন্ত কেউ কোনো হারামকে হালাল হিসেবে গণ্য

করেছে বলে মনে করা হবে না। যদিও তার অন্যান্য কথা-বার্তা ও কার্যকলাপে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, হালাল-হারামের ব্যাপারে তার আক্বীদা-বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়েছে। এটিও সঠিক চিন্তাধারা নয়। ইসলাম কোনো একটি নির্দিষ্ট শব্দের উপর বিধান আরোপ করে না বরং উক্ত শব্দ যে অর্থকে ধারন করে সেই অর্থের যে কোনো শব্দের বিধান একই হবে। যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ‘‘তালাক’’ শব্দের পরিবর্তে ‘‘তোমাকে বাদ দিলাম’’ বা ‘‘ডিভোর্স দিলাম’’ ইত্যাদি সমার্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করে তবু তালাক সংঘঠিত হবে। একইভাবে যদি কেউ হালাল শব্দের পরিবর্তে ‘‘আমি মদ পান করা বৈধ মনে করি’’ বা ‘‘মদ পান করা ভাল’’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে তবু তা হারামকে হালাল করা বলেই গণ্য হবে এবং কুফরী হবে।

আমরা পূর্বে বলেছি যদি কেউ চুরি-জেনা বা অন্য কোনো শাস্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে ভিন্ন কোনো বিধান অনুসরণ করে তবে সে কাফির হবে না বরং পাপী হবে যেহেতু সে আল্লাহর বিধান অমান্য করেছে। কিন্তু যদি সে এই সকল বিধানকে সঠিক মনে করে বা কমপক্ষে এগুলোর মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করা বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত মনে করে তবে সে কাফির হবে। যেহেতু এর মাধ্যমে সে হারামকে হালাল হিসেবে গণ্য করেছে।

যদি বর্তমান যুগের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা আমরা দেখি তবে দেখা যাবে বেশিরভাগ রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানকে দেশের আইনে পরিনত করা হয়েছে ও সাংবিধানিকভাবে সেসব আইনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

আমরা যদি সংবিধান ও আইন এই দুটি শব্দের অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করি তবে দেখবো এগুলো সাধারনত বৈধ, উত্তম ও আবশ্যকভাবে পালনীয় ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলোর মাধ্যমে কোনো বিধানের বৈধতা ও ন্যায় সঙ্গতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সংবিধান বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি। দেশের নেতা-নেত্রীদের পক্ষ থেকে প্রায়ই ঘোষণা করা হয়, সংবিধানকে সম্মান করা এবং তার আনুগত্য করা সকলের উপর পবিত্র দায়িত্ব, রাষ্ট্রের সর্বস্তরের নাগরিক সংবিধান মেনে চলতে বাধ্য, সংবিধানের বিরোধিতা করা নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ ইত্যাদি। এমতাবস্থায় যদি পবিত্র কুরআনকে দেশের সংবিধান হিসেবে ঘোষণা করা হয় তবে তো এই সকল কথা যথাস্থানেই প্রযোজ্য হলো। কিন্তু যদি কুরআনের বিপরীত বিধি-বিধানকে দেশের সংবিধানে পরিনত করা হয় আর সেই সংবিধানের জন্য এই ধরণের সুউঁচ্চ সম্মান ও নির্ভেজাল আনুগত্য দাবী করা হয়, ঐ সকল কুরআন বিরোধী আইন মেনে চলা উচিৎ এবং সেগুলোর বিরুদ্ধাচারণ করা অন্যায় এমন আক্বীদা অন্তরে পোষণ করা হয় তবে এটা কুফরী হবে যেহেতু এর মাধ্যমে এই সকল শরীয়তবিরোধী অবৈধ নিয়মনীতিকে বৈধ ও ন্যায় সঙ্গত বলে দাবী করা হয়। যদিও এখানে সরাসরী

হালাল-হারাম শব্দ উচ্চারণ না করা হয়।

সাধারনভাবে আইন শব্দের অর্থই হলো বৈধতা। বৈধ যে কোনো কিছুকেই বলা হয় আইনসম্মত আর বেআইনী বলতে বোঝায় অবৈধ বিষয়। যখন জাতীয় সংসদে একদল লোক কোনো কিছুকে আইন হিসেবে ঘোষণা দেয় তখন তারা এটাই দাবী করে যে, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টি আমাদের নিকট সর্বোত্তম সমাধান ও উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে মনে হচ্ছে বিধায় আমরা সেটিকে আইন হিসেবে গ্রহণ করছি। এমন কথা তারা কখনই বলবে না যে, যদিও এই বিষয়টি অকার্যকর ও অযৌক্তিক তবু আমরা এটা আপনাদের উপর আইন হিসেবে চাপিয়ে দিলাম। কেননা আইন বলতেই উত্তম ও উৎকৃষ্ট বিষয়কে বোঝায় যার সম্মান করা হবে এবং পরম ভক্তির সাথে তার আনুগত্য করা হবে। একটি বিষয়কে খারাপ ও অনুত্তোম হিসাবে স্বীকার করে নেওয়ার পরও সেটা আইন হিসেবে গ্রহণ করা পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। এমন একটি উদাহরণও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে একজন আইনেপ্রনেতা কোনো একটি বিষয়কে আইন হিসেবে ঘোষণা করছে এবং সেই সাথে বিষয়টির ভ্রান্তি ও অযোগ্যতা স্বীকার করছে। বরং সে তার প্রণীত এই আইনকেই সঠিক ও সর্বোৎকৃষ্ট বলে দ্ব্যার্থহীনভাবে ঘোষনা করবে এটাই স্বাভাবিক। সে ঐ কথায় বলবে যা বলেছিল ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে।

{مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ}

আমি তো তোমাদের ঐ পথই দেখায় যা আমার নিকট উত্তম মনে হয় আর আমি তোমাদের সঠিক পথই দেখায়। [মুমিন/২৯]

তবে যে ব্যক্তি শরীয়তবিরোধী আইন প্রনয়ন করে এমন হতে পারে যে, তার অন্তরে উক্ত বিধানটির বাতুলতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তার প্রণীত আইনটি আসলে ভ্রান্ত এবং আল্লাহ প্রদত্ত আইনই সঠিক ও যথার্থ তবে সে মুখে এ কথার স্বীকৃতি দেবে না বরং অন্তরে বিপরীত বিশ্বাস থাকলেও মুখে নিজের আইনটিকেই সঠিক ও যথাযোগ্য বলে দাবী করবে। যেহেতু উত্তম ও উৎকৃষ্ট দাবী করা ছাড়া কোনো বিষয়কে আইন হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

এখানে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো হারামকে মুখে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া কুফরী। যদিও অন্তরে সেটার উপর বিশ্বাস না থাকে। যেমন যদি কেউ অন্তরে মদকে হারাম বলে বিশ্বাস করে কিন্তু কোনো দুনিয়াবী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মুখে বলে আমি মদকে বৈধ মনে করি তবে সে কাফির হবে। মূর্তির ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না এমন একজন ব্যক্তি যদি হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্য বলে, “আমি মনে করি মূর্তি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান” তবে সে কাফির হবে যদিও তার বিশ্বাস এমন নয়। এ

বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য মুলনীতি হলো, কুফরী কথা মুখে বলাও কুফরী যদিও অন্তরে সেটা বিশ্বাস না করা হয়। এ বিষয়ে ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণ "কুফরীর প্রতি সন্তোষ জ্ঞাপন" (رضا بالكفر) সম্পর্কিত আলোচনাতে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে ইনশা-আল্লাহ্। সুতারাং যারা অন্তরে আল্লাহর আইনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখে এবং স্পষ্ট জানে যে, মানব রচিত আইন-কানুন অযোগ্য ও অযথার্থ কিন্তু ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বা অন্য কোনো কারণে মুখে সেগুলো সঠিক বলে ঘোষণা করে তারা কাফির হবে। এখানে মৌখিক স্বীকৃতিই কুফরীর প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট্য বিবেচিত হবে।

এখানে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আইন ও সংবিধান বলতে সাধারনত বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত বিধি-বিধান বোঝালেও ক্ষেত্র বিশেষে এগুলো কেবলমাত্র আদেশ-নির্দেশ বা বাধ্যতামূলক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর আমরা উপরে বলেছি নিষিদ্ধ বিষরে আদেশ প্রদান বা কাউকে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করা কুফরী নয়। সুতরাং যদি কেউ সংবিধান ও আইন শব্দের মাধ্যমে বৈধতা না বুঝিয়ে সাধারনভাবে আদেশ বা আবশ্যকতা বোঝায় তবে তা কুফরীর পর্যায়ে পড়বে না। যেহেতু এখানে কুফরীর সম্পর্ক হলো বৈধ মনে করা বা না করার সাথে। উদাহরণস্বরুপ যদি একজন ডাকাত সর্দার তার অনুচরদের উদ্দেশ্যে বলে, "এই এলাকার প্রতিটি পুরুষকে হত্যা করতে হবে এবং নারীদের অপহরণ করতে হবে এটাই আমার আইন" তবে তার এই কথা কুফরী হসেবে গণ্য হবে না কারণ সে এখানে আইন বলতে এই কাজটি উত্তম ও বৈধ এটা বোঝাচ্ছে না বরং আইন বলতে সে আদেশ বোঝাচ্ছে আর হারাম কাজের আদেশ দেওয়া কুফরী নয়।

একইভাবে যদি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন অনুসরণ করার আবশ্যকতা এবং ইসলামী আইনের গ্রহণযোগ্যতা দ্ব্যার্থহীনভাবে স্বীকার করে এবং মানবরচিত বিধি-বিধানকে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে স্বীকার করে কিন্তু ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার অজুহাতে বা অন্য কোন কৌশলের কথা বলে ঐ সকল বিধি-বিধানকে রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও আইনে পরিনত করে তবে তাকে কাফির বলা হবে না। যেহেতু সে ঐ সংবিধান ও আইনকে বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত দাবী করছে না।

এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট স্মরণ রাখতে হবে তা হলো, কেবলমাত্র শরীয়তবিরোধী বিধি-বিধান কাগজ-কলমে লিপিবদ্ধ করার কারণে বা সেসব বিধি বিধানের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করার কারণে কাউকে কাফির বলা হবে না। বরং শরীয়ত বিরোধী নিয়ম-নীতিকে উত্তম বা কমপক্ষে বৈধ মনে করার কারণে কাফির বলা হবে। মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের যে কোনো মূল্যে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করার ব্যাপারে যারা বদ্ধপরিকর তারা এ রায়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তাদের কথা হলো, এখানে কুফরীর বিষয়টি উত্তম বা বৈধ মনে করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলাম বিরোধী আইন-কানুন গ্রন্থাকারে

লিপিবদ্ধ করা, সেটা ধারায়-উপধারায় বিভক্ত করা ইত্যাদি কাজ স্পষ্ট কুফরী। তাদের কেউ কেউ একটু অগ্রসর হয়ে বলেন, এ ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। তারা নিষিদ্ধ আইন-কানুনকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা এবং সেটাকে ধারা-উপধারায় বিভক্ত করার বিষয়টিকে কুফরীর একটি স্বতন্ত্র মুলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু এই মূলনীতিটি কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো নিষিদ্ধ বিষয় খাতা-কলমে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখে রাখলেই সেটা কুফরী হয়ে যায় না। বর্তমানে এমন বহু যুবক-যুবতী আছে যারা সারাদিন প্রেম-প্রীতি সহ নানাবিধ অপকর্ম করে এবং ঘরে ফিরে সেটা ডায়রীতে ডেট-টু-ডেট সুবিন্যস্তভাবে লিখে রাখে। অনেক কবি আছে যারা প্রেমিকার সাথে বিভিন্ন নিষিদ্ধ কর্ম কবিতার ছন্দে প্রকাশ করে। বিশেষ করে আরব দেশে এমন বেশ কিছু কবি ছিল যারা কেবল প্রেম কবিতার জন্য খ্যাত। যেমন, লাইলার প্রেমিক মজনু, বুছাইনার প্রেমিক জামিল প্রমুখ। তাদের কবিতার কিছু কিছু অংশে প্রেমিকার সাথে জেনা করা বা তাকে চুম্বন করা ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা এসেছে। এই সকল বিষয়কে কেউ কখনও কুফরী বলেছে বলে শোনা যায় নি। তবে কোনো অপরাধকে লিখিত বা মৌখিকভাবে মানুষের সামনে প্রচার করা আরেকটি অপরাধ। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এমন ব্যক্তিকে বে-হায়া বলে আখ্যায়িত করেছেন [সহীহ্ বুখারী]। কিন্তু এ কারণে কাউকে কাফির বলা হবে না। একইভাবে আল্লাহর বিপরীত মানব-রচিত আইন-কানুন স্পষ্ট পাপাচার হিসেবে গণ্য। যারা মৌখিকভাবে এধরণের আইন কানুন চালু করে তারা যেমন অপরাধী যারা লিখিতভাবে চালু করে তারাও অপরাধী। তবে এমন হতে পারে যে, তাদের একজন অন্যজন অপেক্ষা বেশি অপরাধী কিন্তু যেটা নিষিদ্ধ ছিল সেটা লিপিবদ্ধ করার কারণে কুফরীতে পরিনত হবে তা কখনই বলা যায় না। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আইনকে অযোগ্য সাব্যস্ত করে বা আল্লাহ-বিরোধী আইনকে উত্তম বা কমপক্ষে বৈধ মনে করে।

অতএব, যারা ইসলাম বিরোধী আইন-কানুনকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা বা সেগুলোকে ধারা-উপধারায় সুবিন্যস্তভাবে সজ্জিত করা কুফরীর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে চান তাদের মতামত পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য।

এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা বলেন, এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি মূলনীতি নয় তবে ইসলাম বিরোধী আইন-কানুনকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা এবং সেগুলোকে ধারা-উপধারায় সুসজ্জিত করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ঐ সকল বিধি-বিধানকে বৈধ আইন মনে করে। এই মতামতটি পুরোপুরি অসঙ্গত নয়। কেননা যে ব্যক্তি কোনো নিষিদ্ধ কর্মকে লেখা বা কথার মাধ্যমে গর্বভরে প্রকাশ করে এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে সে উক্ত বিষয়টিকে বৈধ মনে করে। কিন্তু যেহেতু এ সম্ভাবনা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয় এবং কেবলমাত্র সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা সঙ্গত নয় তাই উক্ত

ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না।

এ আলোচনার সারমর্ম হলো, যে কেউ মানবরচিত আইন চালু করে বা সেগুলোকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে তাদের ঢালাওভাবে কাফির বলা সঠিক পন্থা নয় যতক্ষণ না ঐ সকল আইন-কানুনের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা হয়। তাদের মধ্যে যে কেউ ঐ সকল বিধি-বিধানকে উত্তম বা কমপক্ষে বৈধ মনে করে তারা কাফির হবে। এক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধ বা হারাম-হালাম শব্দ প্রয়োগ করা শর্ত নয় বরং যে ভাষা বা ভঙ্গির মাধ্যমেই বৈধ মনে করার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রকাশ পাবে সেটাই কুফরীর প্রমাণ হিসেবে ধরা হবে।

তবে যাদের চিন্তা-ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে তারা মানব-রচিত বিধি-বিধান চালু করলেও সেটাকে বৈধ বা উত্তম মনে করে না এবং স্পষ্টভাবে এ ধরণের স্বীকৃতিও দেয় না তাদের কাফির বলা হবে না। যাদের ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, তারা হয়তো এই সকল বিধি-বিধানকে বৈধ মনে করে কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না হয় তারাও কাফির বলে গণ্য হবে না। যেহেতু সন্দেহের উপর নির্ভর করে কাউকে কাফির বলা সঙ্গত নয়। তবে গ্রহণযোগ্য বাধ্যবাধকতা না থাকলে এমন কাজে লিপ্ত ব্যক্তি পাপী বা গোনাহ্গার হবে তাতে সন্দেহ নেই।

যেসব বিচারক ইসলাম বিরোধী আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করে এবং যারা তাদের নিকট বিচার প্রার্থনা করে তাদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। যদি তারা ইসলামী আইন-কানুন সম্পর্কে জানার পরও ইসলাম বিরোধী আইন-কানুনকেই সঠিক মনে করে তবে তাদের কাফির বলা হবে আর যদি তারা ইসলামী আইনকেই সঠিক মনে করে আর ইসলাম বিরোধী আইন-কানুনকে ভ্রান্ত মনে করে কিন্তু দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এসেব বিধি-বিধানের নিকট বিচার প্রার্থী হয় তবে তা পাপের কাজ হবে কিন্তু কখনই কুফরী হিসেবে গণ্য হবে না। দুষ্কৃতিকারীর পাল্লায় পড়লে ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্য হয়ে মানব রচিত আইনের নিকট বিচার প্রার্থী হওয়া বৈধও হতে পারে যেহেতু বাধ্য হলে যে কোনো নিষিদ্ধ কর্মই বৈধ হিসেবে গণ্য হয়। এ বিষয়ে আমরা এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না যেহেতু এটা তাওহীদ ও শিরক-কুফরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নয় বরং হালাল-হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট।

⇒ আল্লাহ্ ﷻ এর সুন্দরতম গুনাবলীকে অস্বীকার করা

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ}

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। সুন্দরতম নামসমূহ তারই জন্য। [তহা/৮]

{قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}

আপনি বলুন, আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো। (তাতে একজন স্বত্ত্বাকেই ডাকা হয়) কেননা তার রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। [ইসরা/১১০]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ

আল্লাহর রয়েছে, নিরানব্বইটি নাম। একশত অপেক্ষা একটি কম। যে কেউ সেগুলো মুখস্থ্ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [সহীহ্ বুখারী]

এই হাদীসে আল্লাহ ﷻ এর গুনাবলী সম্বলীত নিরানব্বইটি নামের কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলো মুখস্থ্ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহর এমন কিছু নামও রয়েছে যা কেনো সৃষ্টিকে জানানো হয় নি। অন্য একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك

হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এমন প্রতিটি নামের মাধ্যমে যা আপনি নিজের জন্য নির্ধারন করেছেন এবং কোনো কিতাবে তা নাযিল করেছেন বা কোনো একজন সৃষ্টিকে সেটা শিক্ষা দিয়েছেন অথবা ইলমে গায়েবে সেটা সংরক্ষিত রেখেছেন (কাউকে শিক্ষা দেন নি)। [৭৬] [ইবনে হিব্বান]

মোট কথা, আল্লাহ্ ﷻ এর বহু সংখ্যক সুন্দরতম নাম রয়েছে। প্রতিটি নাম কোনো না কোনো গুনাবলী হতে উৎসরিত এবং কোনো না কোনো ক্ষমতা ও কাজের প্রমাণ বহন করে। আর-রহমান (الرحمن) অর্থ পরম দয়ালু। এ নামটি আল্লাহ ﷻ এর অপার ও অসীম দয়ার প্রমাণ বহন করে সেই সাথে তিনি যে বান্দাদের উপর দয়া করে থাকেন সেটা প্রমাণ করে। আর-রাজ্জাক (الرزاق) অর্থ রিযিক দাতা। আল্লাহ্ ﷻ যে প্রতিটি সৃষ্টির সমস্ত প্রয়োজন পূরন করে থাকেন এই নামটি সে কথাই বর্ণনা করে। এভাবে প্রতিটি নাম আল্লাহ ﷻ এর কোনো না কোনো কাজ বা গুনাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করে। এভাবে সুন্দরতম নামসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা তুলে ধরেছেন।

এর পাশাপাশি আল্লাহ্ ﷻ স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন,

---

[৭৬] হাইছামী রহ. বলেন, (ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان) "এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও আবি ইয়া'লা রহ. যে সনদে বর্ণনা করেছেন তার রাবীরা সহীহ্ শুধু আবু সালমা ছাড়া তবে ইবনে হিব্বান তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।" [মাজমায়ে যাওয়ায়েদ]

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}

কোনো কিছু তার মতো নয়। [শুরা/১১]

অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ এর গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সৃষ্টির গুনাবলী ও বৈশিষ্টের মতো নয়। সৃষ্টির কারো সাথে তার কোনো সাদৃশ্য নেই এবং তিনি সৃষ্টির কারো সাথে সাদৃশ্য রাখেন না। মানুষ যে দয়া প্রদর্শন করে সেটা কোনোভাবেই আল্লাহ ﷻ কর্তৃক প্রদর্শিত দয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কেননা মানুষের অন্তরে যে দয়া সেটা আল্লাহর সৃষ্টি আর আল্লাহ ﷻ এর নিকট যে দয়া রয়েছে সেটা সৃষ্টি নয় বরং তাঁর অনাদি-অনন্ত কালের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ যেমন অনাদি-অনন্ত কাল থেকে বিরাজমান তেমনি অনাদি-অনন্ত কাল থেকে তার মধ্যে দয়া নামক সিফাতটি বিরাজমান। একথা প্রতিটি গুণ-বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানুষের যে ক্ষমতা রয়েছে তা আল্লাহর সৃষ্টি কিন্তু আল্লাহ যে ক্ষমতা প্রদর্শন করেন সেগুলো সৃষ্ট নয় বরং সেগুলো তার অনাদি-অনন্ত কালের বৈশিষ্ট্য।

মোট কথা, আল্লাহ্ ﷻ এর এমন কিছু গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তার পরিপূর্ণতা ও পবিত্রতার ঘোষণা দেয় তবে সেসব গুনাবলী কোনোভাবেই অন্যান্য সৃষ্টির গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এই বিষয়টি একটি চুড়ান্ত মূলনীতি। যারা এই মূলনীতিটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে তারা আল্লাহ্ ﷻ এর গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাপারে বিভিন্নরকম বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। এই বিভ্রান্তি থেকে দুটি বিদয়াতী ফিরকার উদ্ভব ঘটেছে।

♦ *(১) সিফাত সম্পর্কে মু'তাজিলা ও জাহামিয়্যাদের ভ্রান্তি।*

একদল লোক মনে করে সৃষ্টির যেসব গুনাবলী রয়েছে, যেমন দয়া করা, ভালবাসা, ঘৃণা করা, রাগ করা ইত্যাদি, আল্লাহ সেসব গুনাবলী থেকে পবিত্র। কারণ তিনি সৃষ্টির মতো নন। তারা আল্লাহ ﷻ এর দয়া, ভালবাসা, রাগ, ঘৃণা ইত্যাদি গুন ও বৈশিষ্ট্য আছে বলেই মনে করে না। জাহামিয়্যা (جهمية) ও মু'তাজিলা (معتزلة) সম্প্রদায়ের এমন আক্বীদা ছিল। ইমাম বুখারী তার সহীহ্তে এই সকল বিদয়াতপন্থীদের বিরুদ্ধে পৃথক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি উক্ত অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন কিতাবুত-তাওহীদ। সেখানে তিনি আল্লাহ্ ﷻ এর বিভিন্ন গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যের পক্ষে বিভিন্ন প্রমানাদি পেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াত ও রাসুলে কারীমের বহু সংখ্যক হাদীসে আল্লাহ্ ﷻ এর বিভিন্ন গুনাবলীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ ﷻ দয়ালু, তিনি মুমিনদের ভালবাসেন, কাফিরদের ঘৃণা করেন, তিনি রাগান্বিত হন ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর দলিল প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ্ ﷻ এর এইসব গুনাবলীকে অস্বীকার করা কুফরী যেহেতু সেগুলো দলির প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। তবে

জাহামিয়া ও মু'তাজিলা সম্প্রদায়কে কাফির বলা হয়নি কারণ তারা এসব বিষয়ে বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখ করতো যার মাধ্যমে সরাসরি আয়াতকে অস্বীকার করা হয় না। যেমন তারা বলতো, "আল্লাহ জ্ঞানী তবে তার কোনো জ্ঞান নেই", আল্লাহ্ দয়ালু তবে তার অর্থ এই নয় যে, তার মধ্যে দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করেন, অসহায়কে সাহায্য করেন যেহেতু যার দয়া আছে সেই এগুলো করে থাকে সেকারণে বলা হয়েছে আল্লাহ্ দয়ালু। কিন্তু মানুষের মতো আল্লাহর স্বত্ত্বার মধ্যে দয়ার ভাব উদয় হয় এমন নয়। এভাবে তারা রাগ, ভালবাসা, ঘৃণা ইত্যাদি বিষয়কে আল্লাহর গুন হিসেব স্বীকার করতো না বরং তার কাজ হিসেবে স্বীকার করতো। যেসব আয়াতে এসব গুনাবলীর কথা বলা হয়েছে তারা সেগুলো অস্বীকার করতো না বরং ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করতো। কিন্তু তাদের ব্যাখ্যার ফলে মূলত আয়াতটির মূলভাব অস্বীকার করা হয় তাই ওলামায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে তাদের বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে যেহেতু তারা সরাসরি আয়াতটিকে অস্বীকার করতো না বরং এমনসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখ করতো যে সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না তাই তাদের কাফের বলা হয়নি।

ইমাম শাফেঈ ﷺ বলেন,

لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر واما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل

আল্লাহ্ ﷻ এর বেশ কিছু নাম ও গুনাবলী রয়েছে, কারো জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে এগুলো অস্বীকার করে। যদি কেউ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও এগুলো অস্বীকার করে তাকে কাফির বলা হবে তবে স্পষ্টভাবে দলিল-প্রমাণ পাওয়ার পূর্বে কেউ এমন বললে অজ্ঞতার কারণে তাকে ছাড় দেওয়া হবে।

[ফাতহুল বারী]

যারা তা'বিল বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে কুরআনের কোনো আয়াতের ভিন্ন অর্থ করে তাদের তাকফির করার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এক্ষেত্রে সেটিই করা হয়েছে।

♦ *(২) সিফাত সম্পর্কে মুজাস্‌সিমাদের ভ্রান্তি।*

জাহামিয়্যাদের বিপরীতে আরেকটি দল রয়েছে যারা আল্লাহ্ ﷻ কে সৃষ্টির গুণাবলীতে বিশেষিত করে। তাদের বলা হয় মুজাস্‌সিমা (مجسمة) বা মুশাব্বিহা (مشبهة)। তারা মনে করে আল্লাহ্ ﷻ তার সৃষ্টির মতই। তার দেহ, হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আকার-আকৃতি রয়েছে। তাদের মতবাদ আল্লাহর বাণী "কোনো কিছুই তার মতো নয়" এই আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। একারণে ওলামায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে তাদের বিদয়াতী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরাম তাদের কাফির বলেন

নি কারণ তারা এক্ষেত্রে সরাসরি আয়াতটিকে অস্বীকার না করে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়ে থাকে। যেমন, তারা বলে, (جسم لا كالأجسام) "আল্লাহর শরীর রয়েছে তবে তা অন্য সৃষ্টির শরীরের মতো নয়"। তাদের এই কথা বিদয়াত যেহেতু তারা আল্লাহর শরীর রয়েছে এমন দাবী করছে কিন্তু তাদের কাফির বলা হচ্ছে না কারণ তারা পরক্ষণেই বলছে, অন্যান্য শরীরের মতো নয়।

এইসকল ভ্রান্ত আক্বীদা জেনে নেওয়ার পর আমরা এ বিষয়ে সত্যপন্থী ওলামায়ে দ্বীন তথা আহলুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের মতামত সম্পর্কে সুবিস্তারে আলোচনা করতে চাই এবং তার আলোকে বর্তমান যুগে বিরাজমান কিছু ভ্রান্তির মূলৎপাটন করতে চাই ইনশাল্লাহ।

♦ *আল্লাহ্ ﷻ এর সিফাত সম্পর্কে আহলুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা।*

আমরা পূর্বে বলেছি, সত্যপন্থী ওলামায়ে কিরাম আল্লাহ্ ﷻ এর কোনো আয়াতকে অস্বীকার করেন না ফলে তারা একদিকে যেমন পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে বর্ণিত আল্লাহর গুনাবলী সমূহকে অস্বীকার করেন না বিপরীত দিকে ঐসকল গুনাবলীকে তারা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করেন না। সেই সাথে তারা আল্লাহ্ ﷻ এর ব্যাপারে এমন কোনো সিফাত আরোপ করেন না যা তার মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। সামগ্রিকভাবে সকল গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তারা এই মুলনীতি অনুসরণ করে থাকেন। এখানে কয়েকটি বিষয়ের উপর পৃথকভাবে আহলুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা বিশ্লেষণ করা হলো।

♦ *= হাত, পা, চোখ ইত্যাদির ব্যাপারে আহলুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা।*

পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে আল্লাহ ﷻ নিজের ব্যাপারে হাত, চোখ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}

হে ইবলিস তুমি তাকে কেনো সাজদা করলে না যাকে আমি নিজে দুহাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি?

[সদ-৭৫]

{بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ}

তার (আল্লাহর) দুই হাত প্রশস্থ তিনি যা ইচ্ছা দান করেন। [মায়েদা/৬৪]

মুসা ﷺ এর উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, (وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) "আমি চেয়েছিলাম তুমি আমার চোখের সামনে বেড়ে ওঠো" [তাহা/৩৯]

একটি আয়াতে এসেছে,

{يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ}

সেদিন পায়ের গোছা উম্মোচন করা হবে আর তাদের সাজদার দিকে ডাকা হবে কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। [কলাম/৪২]

এ আয়াতে কার পায়ের গোছা উম্মোচন করা হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু নেই। মুফাস্‌সিরীনে কিরাম বলেছেন, পায়ের গোছা উম্মোচন করা বলতে এখানে কিয়ামতের ময়দানে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আরবী ভাষায় শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে অনেকে দাবী করেন, এখানে আল্লাহ ﷻ তার নিজের পায়ের গোছা উম্মোচন করবেন (আউযু বিল্লাহ্)। অথচ এ আয়াতে সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু নেই তবে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (فيضع قدمه عليها) "আল্লাহ্ ﷻ জাহান্নামের উপর তার পা রাখবেন" এই হাদীস এবং উপরে আমরা হাত, চোখ ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করেছি যেসব বিষয়ে উম্মতে মুসলিমার ওলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মত হলো এগুলোর মাধ্যমে আমরা যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে পরিচিত তা উদ্দেশ্য নয়। আল্লাহ ﷻ এর জন্য এই প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকা অসম্ভব যেহেতু এটা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আর তিনি সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ধারন করা হতে পবিত্র।

আল্লাহ্ ﷻ এর ডান হাত সম্পর্কে বর্ণিত একটি হাদীস প্রসঙ্গে ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন,

وفيه إثبات اليمين لله صفة من صفات ذاته ليست بجارحة خلافًا لما تعتقده الجسمية فى ذلك لاستحالة جواز وصفه بالجوارح والأبعاض، واستحالة كونه جسمًا

এখানে আল্লাহ ﷻ এর ডান হাত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা আল্লাহর একটি সত্ত্বাগত অঙ্গ নয় যেমনটি মুজাসসিমারা মনে করে থাকে। কেননা আল্লাহ ﷻ এর কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা বিভিন্ন অংশ ও খন্ড থাকা সঙ্গত নয়। তার কোনো দেহ থাকবে এটিও সঙ্গত নয়। [শারহে বুখারী]

অন্য এক স্থানে তিনি এ বিষয়টির বর্ণনা দিয়ে বলেন,

لقيام الدليل على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء. خلافًا لما تقوله المجسمة من أنه جسمٌ لا كالأجسام

কেননা এ বিষয়ে দলিল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে না। যেমনটি মুজাস্‌সিমারা বলে থাকে যে, আল্লাহর দেহ রয়েছে যা অন্যদের দেহের

মতো নয়। [ইবনে বাত্তাল]

বদরুদ্দিন আইনী ﷺ উমদাতুল কারীতে হুবহু একই কথা বলেছেন।

জাহান্নামের উপর পা রাখা সম্পর্কিত হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম নাব্বী ﷺ বলেন,

ولابد من صرفه عن ظاهره لقيام الدليل القطعى العقلى على استحالة الجارحة على الله تعالى

এই হাদীসটির প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা হবে না বরং অবশ্যই এটিকে ব্যাখ্যা করতে হবে কেননা স্বাভাবিক বুদ্ধির মাধ্যমেই এটা অকট্যভাবে প্রমাণিত যে, আল্লাহ ﷻ এর কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকতে পারে না। [শারহে মুসলিম]

ইবনে হাযার আসক্কালানী ﷺ বলেন,

واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات

আহলুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল-জামায়া এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এখানে হাত বলতে অঙ্গ বোঝানো হচ্ছে না যা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। [ফাতহুল বারী]

অন্য স্থানে তিনি বলেন, (ومعاذ الله أن يكون لله جارحة) ‘‘আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে এমন বলা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই’’ [ফাতহুল বারী]

মোট কথা, ঐ সকল আয়াত ও হাদীসে হাত, চোখ, পা ইত্যাদি শব্দগুলো কোনোক্রমেই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বোঝায় না এ ব্যাপারে আহলুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়ার সকল ওলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এখন যেহেতু আমরা হাত-পা বলতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বুঝে থাকি কিন্তু তা এই সকল আয়াতে উদ্দেশ্য নয় অতএব, আয়াতের অর্থ আমাদের নিকট স্পষ্ট নয়। একারণে এই সকল আয়াতকে মুতাশাবিহাত (متشابهات) আয়াত বলা হয় অর্থাৎ যার উদ্দেশ্য বোধগম্য নয়।

একটি হাদীসে কিছু নেককার লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে,

عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ

তারা আল্লাহর ডান হাতের দিকে থাকবে আর তার দুটি হাতই ডান হাত। [সহীহ্ মুসলিম]

ইমাম নাব্বী ﷺ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

وأما قوله صلى الله عليه و سلم وكلتا يديه يمين فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة تعالى الله عن ذلك فإنها مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى

রসুলুল্লাহ্ ﷺ যে বলেছেন, আল্লাহর দুটি হাতই ডান হাত এর মাধ্যমে বোঝা যায় আসলে এখানে ডান

হাত বলতে অঙ্গ বোঝানো হয় নি। আল্লাহ ﷻ এ থেকে উর্দ্ধে কেননা এটা (অঙ্গ-পত্যঙ্গ থাকা) আল্লাহর জন্য অসম্ভব। [শারহে মুসিলম]

এই সকল অস্পষ্ট আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করার ব্যাপারে বরেণ্য ওলামায়ে কিরামের কর্মপন্থা সম্পর্কে ইমাম নাব্বী ﵀ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على مايليق بها على حسب مواقعها وانما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الاصول والفروع ذا رياضة في العلم

জেনে নাও, সিফাত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের দুটি পন্থা রয়েছে। প্রথম পন্থাটি হলো, বেশিরভাগ বরং সকল সালাফদের পথ আর তা হলো আমরা এসব আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করবো না। তারা বলেন, আমাদের উপর কেবল এতটুকু দায়িত্ব যে আমরা এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপণ করবো এবং নিশ্চিতভাবে মনে করবো যে, এগুলোর এমন কোনো অর্থ আছে যা আল্লাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় (কিন্তু সে অর্থটি কি তা আমরা নির্ধারণ করার চেষ্টা করবো না)। সেই সাথে দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ ﷻ তার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নন এং তিনি দেহ ধারণ করা, স্থান গ্রহণ করা, স্থানান্তরিত হওয়া, কোনো একটি নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান করা ইত্যাদি সকল প্রকার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হতে পবিত্র। মুতাকাল্লিমীন (কালাম শাস্ত্রবিদ) ওলামায়ে কিরামের একটি অংশ এই মতই পোষণ করেন। তাদের মধ্যকার মুহাক্কিকগণ এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। এই মতটিই অধিক নিরাপদ।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় পন্থাটি হলো বেশিরভাগ মুতাকাল্লিমীনদের মত। তারা বলেন, এই সকল আয়াতকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যা সঙ্গতিপূর্ণ হয়। তবে এই সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করা কেবল তার জন্য বৈধ হবে যে ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা রাখে। তাকে আরবী ভাষা এবং শরীয়তের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখতে হবে। জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে তার ব্যাপক অনুশীলন থাকতে হবে।

[শারহে মুসলিম]

অন্যস্থানে তিনি এ সম্পর্কে বলেন,

وقد سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيها وأن منهم من قال نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله ولا نعرف معناه لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد وأن لها معنى يليق بالله تعالى وهذا مذهب جماهير السلف وطوائف من المتكلمين والثاني أنها تؤول على ما يليق بها وهذا قول أكثر المتكلمين

পূর্বে গত হয়েছে যে, এ বিষয়ে আলেমরা মতপার্থক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন আমরা সেগুলোর উপর ঈমান রাখবো কিন্তু এসবের কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করবো না। এগুলোর অর্থ কি আমরা তা জানি না। তবে আমরা এতটকু বলবো যে, এগুলোর এমন একটি অর্থ রয়েছে যা আল্লাহর মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে, এসব আয়াত ও হাদীসের প্রকাশ্য অর্থে যা বোঝা যায় তা এগুলোর উদ্দেশ্য নয়। এই মতটিই জমহুর সালাফদের মত এবং একদল মুতাকাল্লিমীনদের মত। দ্বিতীয় মতটি হলো, আমরা এসব আয়াতের এমন ব্যাখ্যা করবো যা আল্লাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। বেশিরভাগ কালামশাস্ত্রবিদের মত এটাই। [শারহে মুসলিম]

ইমাম নব্বীর এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে বেশ কিছু বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যেমন,

ক) আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের সকল ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, যেসব আয়াত ও হাদীসে আল্লাহর ব্যাপারে, হাত-পা চোখ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে যেসগুলোর প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয় এবং তার অর্থ আসলে কি সেটাও স্পষ্ট নয়। এ ধরণের আয়াতকেই বলা হয় মুতাশাবিহাত আয়াত।

খ) মুতাশাবিহাত আয়াতের ব্যাখ্যা করা হবে কি হবে না সে বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। একদল আলেম মনে করেন মুতাশাবিহাত আয়াত কেবল তিলওয়াত করতে হবে এবং সেগুলোর উপর ঈমান রাখতে হবে। সেসবের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা যাবে না। এটিই বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরামের মত। অন্য একদল ওলামায়ে কিরাম মনে করেন, অন্যান্য আয়াতের সাথে সঙ্গতি রেখে মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যায়। এই মতপার্থক্যের মূল ভিত্তি হলো, আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}

তিনি আপনার উপর এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবের কিছু আয়াত সুস্পষ্ট। সেগুলোই কিতাবের মূল বিষয়। আর অন্য কিছু আয়াত আছে অস্পষ্ট। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঐসকল আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করে। সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানেনা আর জ্ঞানী লোকেরা বলে আমরা তো এসবের উপর ঈমান রাখি। এসবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে। কেবলমাত্র বোধসম্পন্ন লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। [আলে-ইমরান/৭]

এই আয়াত প্রমাণ করে আল্লাহর কিতাবে এমন কিছু আয়াতও রয়েছে যার অর্থ অস্পষ্ট হওয়ার কারণে সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লষণে প্রবৃত্ত হওয়া মারাত্মক ঝুকিপূর্ণ কাজ। বিদয়াতী ও বদ মতলবের অধিকারীরাই এসব আয়াত নিয়ে বেশি ঘাটা-ঘাটি করে। একারণে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের একটি বিরাট অংশ এই সকল আয়াত সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতেন না এবং এগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করাও পছন্দ করতেন না। ইমাম মালিককে "আরশে আসীন" হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, (والاقرار به واجب والسؤال عنه بدعة) "এ বিষয়ে ঈমান রাখা ওয়াজিব কিন্তু এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদয়াত" [ফাতহুল বারী] পরবর্তীতে ওলামায়ে কিরাম ইমাম মালিকের এই কথাটি এ বিষয়ে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা এই সকল আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে অনুৎসাহিত করতেন এবং যত্র-তত্র আলোচনা করা অপছন্দ করতেন। উমর ﵁ থেকে বর্ণিত আছে একজন ব্যক্তি এধরণের প্রশ্ন করলে তিনি তাকে শাস্তি প্রদান করেন। সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা ﵀ থেকে বাইহাকী সহীহ সনদে বর্ণনা করেণ তিনি সিফাত সম্পর্কিত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, (فتفسيره تلاوته والسكوت عنه) "এসব আয়াতের ব্যাখ্যা হলো তেলাওয়াত করে চুপ থাকা" [ফাতহুল বারী] ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম বলেন, আমি আওজাঈ, মালিক ও লাইছকে এইসব আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তারা বলেন, (أمروها بلا كيف) "কেনো মন্তব্য না করেই এগুলো অতিক্রম করে চলে যাও।" [ফাতহুল বারী; ইবনে রজব]। আহলুস্‌সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কিরাম হতে এধরণের সতর্কতা অবলম্বনের বর্ণনা প্রচুর পরিমাণ রয়েছে যা এখানে সবিস্তারে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, ঐ সকল ওলামায়ে কিরাম আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে অত্যাধিক জানা এবং দ্বীনের গভীর বুঝ সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত হওয়া সত্ত্বেও এই সকল আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা বা এগুলো নিয়ে আলোচনা করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। অথচ বর্তমানে কিছু নির্বোধ লোক অন্য কিছু নির্বোধ লোককে সাথে নিয়ে এসব আয়াত সম্পর্কে যাচ্ছেতাই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখ করে চলেছে। সাধারন মুসলিমদের এরা শিক্ষা দিচ্ছে; আল্লাহর হাত আছে, পা আছে, সুন্দর চেহারা আছে, আকার-আকৃতি আছে, তিনি আকাশে আছেন ইত্যাদি। এই সকল লোকদের সর্বাপেক্ষা বড় ভ্রান্তি হলো, তারা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো এই সব আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উল্লেখ করে এবং যে কেউ তাদের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে না বরং ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা করে বা এসব আয়াতের ব্যাপারে নিরাবতা অবলম্বন করে তারা তাকে ভীষণভাবে তিরষ্কার করে। এদের দৃষ্টিতে আল্লাহর হাত আছে? পা আছে? এসব প্রশ্ন করা অন্যান্য সৃষ্টির হাত-পা নিয়ে প্রশ্ন-উত্তর করার মতোই স্বাভাবিক বিষয়। অতএব, এ বিষয়ে প্রশ্ন করার ব্যাপারে নিজে ভীত হওয়া বা অন্যকে ভয় প্রদর্শন করার জরুরত নেই। একইভাবে তারা মনে করে, আল্লাহর হাত-পা, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ-পত্যঙ্গ রয়েছে তবে সেগুলো অন্যান্য সৃষ্টির মতো নয় এই বিশ্বাস যে রাখেনা সে মূলত এসম্পর্কিত আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। যে এসব বিষয়ে কোনো মন্তব্য

করতেই রাজী হয় না তাকেও এরা বিদয়াতীদের পর্যায়ে ফেলে। অথচ আমরা দেখেছি এসব আয়াতের ব্যাপারে নিরাবতা অবলম্বন করাই বেশিরভাগ সালফে সালেহীনদের পথ। তারা এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন নি। তারা এসব বিষয়ে প্রশ্ন-উত্তর করার ব্যাপারটিই পূরোপূরি অপছন্দ করেছেন। তারা বলেছেন আয়াতগুলো তেলাওয়াত করতে হবে এবং নিরবতা অবলম্বন করতে হবে। যদি এসব আয়াতের কোনো একটি অর্থ নির্ধারন করা ওয়াজিব হতো তবে তারা অবশ্যই নিরাবতা অবলম্বন করতেন না।

গ) ইমাম নাব্বীর কথার মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয় যে, যদিও বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরামের মত হলো, আল্লাহ ﷻ এর সিফাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসের কোনোরুপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বর্ণনা না করা বরং চুপ থাক। তবে কালামশাস্ত্রবিদ আলেমদের বেশিরভাগ অংশ এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের কিছু অংশ এ বিষয়ে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। উপরে উল্লেখিত সূরা আলে ইমরানের আয়াতটির শেষের অংশে বলা হয়েছে,

{وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}

সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না আর জ্ঞানী লোকেরা বলে আমরা তো এসবের উপর ঈমান রাখি। এসবই আমাদের রবের পক্ষ থেকে। [আলে-ইমরান/৭]

আয়াতটির এই অংশের ব্যাখ্যায় দুটি মত বর্ণিত আাছে, একমতে "এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না" এটুকু পুর্নাঙ্গ বাক্য হবে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলে আমরা ঈমান রাখি এটি নতুন একটি বাক্য বলে গণ্য হবে। অন্য মতে বাক্যটি হবে এমন, আল্লাহ ছাড়া কেউ এর অর্থ জানে না এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা। অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিরাও অন্যান্য আয়াতের উপর চিন্তাগবেষণা করে মুতাশাবিহাত আয়াতের অর্থ সম্পর্কে ধারনা করতে পারেন। প্রথম মত অনুযায়ী ঐ সকল আয়াতের ব্যাপারে কোনোরুপ মন্তব্য করা অনুচিত কিন্তু দ্বিতীয় মতের উপর নির্ভর করলে যোগ্যতা সম্পন্ন ওলামায়ে কিরাম ঐ সকল আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারেন। উক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যার ব্যাপারে এরুপ দ্বিমত সৃষ্টি হওয়ার কারণে এখানে দুটি কর্মপন্থা অবলম্বনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের ব্যাপারে কোনোরুপ মন্তব্য না করে চুপ থাকতে পারে। এটিই জমহুর সালফে সালেহীনদের অনুসৃত নীতি এবং এটিই অধিক নিরাপদ যেমনটি ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেছেন। আবার যোগ্যতা সম্পন্ন ওলাময়ে দ্বীন অন্য আয়াতের উপর চিন্তা গবেষণা করে এই সকল আয়াতের সঙ্গত অর্থ বর্ণনা করার চেষ্টা করলে তা বিদয়াত ও অপছন্দনীয় হবে না। তবে খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে কোনোভাবেই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত না করা হয়। একারণে ইমাম নাব্বী رحمه الله সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এতটুকু নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ ﷻ দেহধারন, নির্দিষ্ট দিকে বা নির্দিষ্ট অস্থানে অবস্থান গ্রহণ এবং এক

স্থান থেকে আরেক স্থানে স্থানান্তর ইত্যাদি সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য হতে পবিত্র। অন্যস্থানে তিনি এও বলেছেন যে, আল্লাহর শানে হাত-পা, চোখ ইত্যাদি বিষয়কে কোনোভাবেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনে করা যাবে না। এরূপ করলে তা মুজাস্‌সিমাদের আক্বীদা বলে গণ্য হবে। এখানে আরো একটি শর্ত স্মরণ রাখতে হবে। আল্লাহ্ ﷻ এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হাদীসে যতটুকু বর্ণিত হয়েছে তার বাইরে এক পাও অগ্রসর হওয়া যাবে না। কুরআনে হাত, চোখ ইত্যাদি শব্দ এসেছে বিধায় হাতের সাথে নোখ বা চোখের সাথে চোখের পাতা ও চোখের মনি ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করা যাবে না।

বদরুদ্দিন আল-আইনি রহ. বলেন,

وقال الخطابي الأصل في الإصبع ونحوها أن لا يطلق على الله إلا أن يكون بكتاب أو خبر مقطوع بصحته فإن لم يكونا فالتوقف عن الإطلاق واجب

ইমাম খাত্তাবী রহ. বলেন, হাতের আঙ্গুল বা এই জাতীয় বিষয়ে কথা হলো আল্লাহর ব্যাপারে এমন কোনো শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না যা কুরআন ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হাদীসে নেই। এভাবে প্রমাণিত নয় এমন কোনো বিষয় আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা হতে বিরত হওয়া ওয়াজিব। [উমদাতুল কারী]

কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর ব্যাপারে কিয়াসের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় প্রমাণের চেষ্টা করে। যেমন আল্লাহ শোনেন অতএব তার কান আছে আল্লাহকে কিয়ামতের দিন দেখা যাবে অতএব তার আকার-আকৃতি রয়েছে ইত্যাদি। এই সকল লোকেরাই প্রকৃত মুজাস্‌সিমা। যেহেতু তারা সৃষ্টির সাথে তুলনা করে আল্লাহর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের চেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ বলেন, "কোনো কিছুই তার মতো নয়"। যাকে দেখা যায় তার কোনো আকৃতি থাকতে হবে বা যে শোনে তার কান থাকতে হবে এটা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। [৭৭] আল্লাহ ﷻ এসব নিয়ম-কানুনের উর্দ্ধে। তিনি নিয়ম সৃষ্টি করেন কিন্তু তিনি নিয়মের অধীন নন। অতএব, এই ধরণের কিয়াস ও কল্পণার মাধ্যমে যারা আল্লাহর প্রতি কোনো বৈশিষ্ট্য আরোপ করে স্পষ্ট জেনে নিতে হবে যে, তারাই মুজাস্‌সিমাদের উত্তরাধিকার।

তবে উপরে বর্ণিত শর্তাবলী লংঘন না করে এবং পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীতে না যেয়ে ঐ সকল আয়াতের যে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা নিষিদ্ধ নয়। মুফাসসিরীনে কিরাম বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় এবং হাদীসের ব্যাখ্যাকাররা সিফাত সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস প্রসঙ্গে এধরণের ব্যাখ্যা বর্ণনা

---

[৭৭] এমনকি অনেক সৃষ্টিও কান ছাড়া শুনে থাকে, সুতরাং আল্লাহ শোনেন অতএব, তার কান থাকতে হবে বা আল্লাহকে দেখা যায় অতএব তার আকৃতি রয়েছে এ যুক্তি পূরোপুরি অগ্রহণযোগ্য।

করেছেন। ঐ সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যায়।

১. আল্লাহর চোখ আছে এর অর্থ আল্লাহর এমন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার উপর আল্লাহ নিজেই চোখ শব্দ প্রয়োগ করেছেন যদিও সেটা কোনো অঙ্গ নয় এবং মানুষ চোখ বলতে যা কিছু বোঝে সেটা তেমন নয়। একই কথা হাত-পা বা অন্য যে কোন শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর শানে এসেছে।

২. যেসব আয়াতে আল্লাহর শানে চোখ, হাত ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে আসলে ভিন্ন অর্থে তা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী "আমি তাকে দুহাতে সৃষ্টি করেছি" এবং মুসা عليه السلام এর উদ্দেশ্যে আল্লাহর বাণী "যেন তুমি আমার চোখের সামনে বেড়ে ওঠো" এর অর্থ আমার তত্ত্বাবধায়নে তুমি বেড়ে ওঠো ইত্যাদি। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এবং হাদীসের শরাহতে এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

"আল্লাহর দুই হাত উন্মুক্ত রয়েছে" [মায়েদা/৬৪] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী رحمه الله হাত (يد) শব্দের বিভিন্ন অর্থের বর্ণনা দিয়েছেন। অঙ্গ অর্থে হাত শব্দের ব্যবহার থেকে শুরু করে, নিয়ামত (نعمة) বা অনুগ্রহ অর্থে, কুদরত (قدرة) ও কুওয়া (قوة) তথা ক্ষমতা প্রদর্শন অর্থে ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থের বর্ণনা দিয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ্ سبحانه وتعالى এর বিশেষ একটি সিফাত যা অঙ্গ নয় আবার প্রকৃত অর্থে হাতও নয় এমন বোঝাতেও হাত শব্দটি ব্যবহৃত হয় বলে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে ঐ আয়াতটি উল্লেখ করেছেন যেখানে আদম عليه السلام কে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন। [সদ/৭৫]

পরবর্তীতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায়ও তিনি বিভিন্ন মতামত বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন রকম সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আদম عليه السلام এর সম্মান প্রমাণ করার জন্যই তাকে নিজ হতে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেভাবে সালিহ্ عليه السلام এর উষ্ট্রীকে আল্লাহর উষ্ট্রী (ناقة الله) বলা হয়েছে এবং মসজিদকে বিশেষত কা'বা শরীফকে বায়তুল্লাহ্ (بيت الله) বা আল্লাহর ঘর এবং ঈসা عليه السلام কে রুহুল্লাহ্ (روح الله) বা আল্লাহর রুহ্ বলা হয়েছে।

এরপর তিনি বলেন, এমনও বলা হয়ে থাকে যে, এই আয়াতে কুদরত অর্থে হাত শব্দ আসেনি বরং এখানে দুহাত বলতে আল্লাহর স্বত্ত্বাগত দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যার মাধ্যমে তিনি আদম عليه السلام কে সৃষ্টি করেছেন।

তিনি আরো বলেন,

وقيل: أراد باليد القدرة، يقال: مالي بهذا الأمر يد. وما لي بالحمل الثقيل يدان. ويدل عليه أن الخلق لا يقع إلا

بالقدرة بالإجماع

এমনও বলা হয়ে থাকে যে, এখানে আসলে ক্ষমতা তথা কুদরত উদ্দেশ্য। এমন বলা হয়, "এ বিষয়ে আমার হাত নেই" (অর্থাৎ আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই), "এতো ভারি জিসিন বহন করার মতো দুটি হাত আমার নেই" (এখানেও ক্ষমতা নেই এটিই উদ্দেশ্য)। এই মতটির স্বপক্ষে প্রমাণ হলো, কুদরত (قدرة) বা ক্ষমতা ছাড়া সৃষ্টি করা সম্ভব নয় এ ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে।

এরপর তিনি একটি কবিতা উল্লেখ করেন যেখানে ক্ষমতা অর্থে দু'হাত প্রয়োগ করা হয়েছে।

আদম ﷺ কে দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করা সম্পর্কে ইবনে হাযার আসক্বালানী ﷺ বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন। প্রথমেই তিনি ইবনে বাত্তাল ﷺ থেকে দুটি হাত বলতে দুটি সিফাত বোঝানোর মতটি উল্লেখ করে বলেন,

وقال غيره هذا يساق مساق التمثيل للتقريب لأنه عهد ان من اعتنى بشيء واهتم به باشره بيديه فيستفاد من ذلك ان العناية بخلق آدم كانت أتم من العناية بخلق غيره

এ ধরণের কথা উপমা হিসেবে বলা হয়ে থাকে যাতে কোনো বিষয় সহজে বোধগম্য হয়। যে ব্যক্তি কোনো বিষষকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং সে বিষয়ে যত্নবান হয় সে সেটা স্বহস্তে করে (তাই স্বহস্তে করা বলতে যত্নসহকারে করা বোঝানো হয়েছে)। এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটা বোঝা যায় যে, আদম ﷺ কে যতটা গুরুত্ব সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে অন্যদের সেভাবে করা হয়নি।

এরপর তিনি (ইবনে হাযার) বলেছেন হাত শব্দটির বহু অর্থ রয়েছে তার মধ্যে আমি ২৫ টি অর্থ অবগত হতে সক্ষম হয়েছি। পরে তিনি উক্ত ২৫ টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যার প্রতিটির স্বপক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে বায়াতে রিদওয়ান সম্পর্কে অবতীর্ণ আল্লাহ ﷻ এর বাণী, (يد الله فوق أيديهم) "আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর" এ সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হলো আহদ (عهد) বা চুক্তি।

[ফাতহুল বারী]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء

সকল মানুষের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে রয়েছে একটি অন্তরের মতোই। আল্লাহ যেভাবে খুশি সেগুলো পরিবর্তন করে থাকেন। [সহীহ্ মুসলিম]

ইমাম নাব্বী ﷺ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

هذا من أحاديث الصفات وفيها القولان السابقان قريبا أحدهما الايمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد قال الله تعالى ليس كمثله شئ والثاني يتأول بحسب ما يليق بها فعلى هذا المراد المجاز كما يقال فلان في قبضتي وفي كفي لا يراد به أنه حال في كفه بل المراد تحت قدرتي ويقال فلان بين إصبعي أقلبه كيف شئت اي انه مني على قهره والتصرف فيه كيف شئت فمعني الحديث انه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا يمتنع عليه منها شئ ولا يفوته ما أراده كما لايمتنع على الانسان ما كان بين إصبعيه فخاطب العرب بما يفهمونه

এই হাদীসটি সিফাতের হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য। পূর্বেই বলেছি এ বিষয়ে আলেমদের দুটি মত রয়েছে। একদল আলেম বলেন, এগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করতে হবে কোনোভাবেই এগুলোর ব্যাখ্যা করা হবে না এবং তার অর্থ নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে না। শুধু এতটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এগুলো সত্য ও সঠিক এবং বাহ্যিকভাবে এ থেকে যা কিছু বোধগম্য হচ্ছে তা উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু আল্লাহ্ বলেছেন, কোনো কিছুই তার মতো নয়। দ্বিতীয় মতটি হলো, এসব বর্ণনাকে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে। এই মত অনুযায়ী বলা হবে, এখানে রূপক অর্থে আঙ্গুলের কথা বলা হয়েছে। যেমন বলা হয় অমুক আমার মুঠোর মধ্যে বা সে আমার হাতের তালুতে, এর মাধ্যমে এটা বোঝানো হয়না যে সে আসলেই তার হাতের মুঠোর মধ্যে বা হাতের তালুতে রয়েছে। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, সে আমার ক্ষমতার অধীন রয়েছে। একইভাবে বলা হয়, অমুক আমার দুই আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে আমি তাকে যেভাবে খুশি পরিচালনা করি। অর্থাৎ সে আমার অনুগত আমি তাকে যেভবে খুশি পরিচালিত করি। অতএব হাদীসটির অর্থ হবে, আল্লাহ ﷻ তার বান্দাদের অন্তরসমূহ যেভাবে ইচ্ছা পরিচালিত করে থাকেন। কোনো কিছুই তার আয়ত্বের বাইরে নয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তার বাইরে কেউ যেতে পারে না যেভাবে একজন মানুষের দুই আঙ্গুলের মাঝে যা থাকে তা তার আয়ত্বের অধীন থাকে। এখানে আরবরা যেভাবে বোঝে সেভাবে তাদের বোঝানো হয়েছে। (প্রকৃতই আঙ্গুলের কথা বলা হয় নি)

এরপর তিনি বলেন,

فان قيل فقدرة الله تعالى واحدة والاصبعان للتثنية فالجواب أنه قد سبق أن هذا مجاز واستعارة فوقع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به التثنية والجمع والله أعلم

যদি কেউ বলে, আল্লাহর ক্ষমতা তো একক তাহলে এখানে দুই আঙ্গুলের কথা বলা হচ্ছে কেন? তবে বলা হবে, পূর্বেই বলেছি এখানে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য তাই উপমা হিসেবে মানুষ যেভাবে চিন্তা করে সেভাবে বলা হয়েছে। দ্বিবচণ বা বহুবচন ইত্যাদি কোনো কিছুই এখানে উদ্দেশ্য নয়। [শারহে মুসলিম]

অন্য একটি স্থানে আঙ্গুল সম্পর্কিত বর্ণনার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

وقيل يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته وهذا غير ممتنع والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة

এমনও বলা হয় যে এখানে আঙ্গুল বলতে আল্লাহর কোনো সৃষ্টির আঙ্গুল বোঝানো হয়েছে। এটিও অসম্ভব

নয়। মোট কথা এর মাধ্যমে অঙ্গ বোঝা যাবে না। [শারহে মুসলিম]

অজ্ঞ লোকেরা বলতে পারে কোনো একজন সৃষ্টির আঙ্গুলকে কিভাবে আল্লাহ নিজের আঙ্গুল বলতে পারেন। এর উত্তর হলো, উক্ত সৃষ্টির বিশেষত্ব বোঝানোর জন্য এমন বলা সম্ভব যেভাবে অন্য হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্ বলবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম তুমি আমাকে খাবার দাওনি, আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমাকে সেবা করো নি ইত্যাদি। এখানে বান্দার ক্ষুধাকে আল্লাহ নিজের ক্ষুধা এবং বান্দার অসুস্থতাকে আল্লাহ্ নিজের অসুস্থতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যদিও ক্ষুধা ও অসুস্থতা হতে তিনি পবিত্র।

[সহীহ্ মুসলিম]

আমরা পূর্বে আল্লাহ ﷻ এর শানে হাত-পা, চোখ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হওয়া সম্পর্কে দুই প্রকার ব্যাখ্যার কথা বলেছি। এক. আল্লাহ ﷻ এর একম কিছু গুন ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে তিনি যার নামকরণ করেছেন হাত বা চোখ যদিও সেগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়। দুই. এগুলোর মাধ্যমে আসলে কোনো গুন বা বৈশিষ্ট উদ্দেশ্য নয় বরং ক্ষমতা, তত্ত্বাবধায়ন ইত্যাদি অর্থে এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় প্রকার ব্যাখ্যাই বরেণ্য ওলামায়ে কিরামের মতামতের মাধ্যমে প্রমানিত। দ্বিতীয় প্রকারটি সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের বিস্তারিত মতামত বর্ণনা করলাম কারণ বর্তমানে কিছু লোক প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করে আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি বিদয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা দাবী করে সালফে সালেহীনরা প্রথম ব্যাখ্যাটির পক্ষে ছিলেন। অথচ আমরা স্পষ্ট বর্ণনা করেছি যে, সালফে সালেহীনরা যে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা করার বিপক্ষে ছিলেন। তারা সিফাত সম্পর্কিত আয়াতগুলি তেলাওয়াতের পর পুরোপুরি নিরব থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা এটাও বলেছি যে, এসব ব্যাপারে নিরব থাকার মতটিই অধিক নিরাপদ তবে সঙ্গত ব্যাখ্যা করার সুযোগও আছে। ফলে তা বিদয়াত হবে না। আর যদি বিদয়াত হয়ই তবে উভয়প্রকার ব্যাখ্যাই বিদয়াত হবে কারণ উভয় স্থানে আয়াতের প্রকৃত অর্থকে পরিত্যাগ করে রূপক অর্থের আশ্রয় নিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। যে বলে হাত অর্থ ক্ষমতা, চোখ অর্থ তত্ত্বাবধায়ন ইত্যাদি সে যেমন প্রকৃত হাত ও প্রকৃত চোখ বোঝাচ্ছে না একইভাবে যে বলে চোখ বা হাত বলতে এমন কিছু বোঝানো হচ্ছে যা কোনো অঙ্গ নয় এবং চোখ বা হাত বলতে আমরা যা বুঝি তা নয় সেও চোখ ও হাতের প্রকৃত ও বোধগম্য অর্থ গ্রহণ করেনি কারণ চোখ বলতে আমরা যা বুঝি সেটিই চোখ শব্দের প্রকৃত অর্থ একই ভাবে হাত বলতে আমরা যা বুঝি সেটিই হাত শব্দের প্রকৃত অর্থ। যে চোখ বা হাত বলতে এই বোধগম্য অর্থের বাইরে ভিন্ন কোনো জিনিসকে বোঝে সে চোখ ও হাতের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করে এবং রূপক অর্থ গ্রহণ করে। মূলত সে চোখ বলতে এমন কিছু বোঝায় যা আসলে চোখ নয়। সুতরাং উভয় ব্যাখ্যাতেই এসব শব্দের রূপক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে প্রকৃত অর্থ নয়। অতএব যদি ব্যাখ্যা করতেই হয় তবে একদল আরেকদলকে তিরষ্কার

করা নিরর্থক বরং একে অপরকে সমগোত্রীয় জেনে সদ্ভাব বজায় রাখাই শ্রেয়। সেই সাথে যারা কোনোরুপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উল্লেখ করে না বরং নিরবতা অবলম্বন করে তাদের পন্থাকে সর্বোত্তম হিসাবে স্বীকৃতিও দেওয়া উচিৎ যেহেতু এই মতটিই জমহুর সালফে সালেহীনদের মত। এবং এটিই বেশি নিরাপদ কারণ এতে ভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যারা ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের পন্থা গ্রহণ করে তাদের ক্ষেত্রে যে কোনো মুহুর্তে মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উভয়প্রকার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এমন ভ্রান্তি ঘটতে পারে।

জাহান্নামের উপর আল্লাহ্ ﷻ নিজের পা রাখবেন এ সম্পর্কিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় যারা মনে করে পা বলতে এখানে আল্লাহর সিফাত সমূহের মধ্যে একটি সিফাত বোঝানো হয়েছে তাদের তিরষ্কার করে আব্দুর রহমান ইবনুল জাওজী রحمه الله বলেন,

كان من تقدم من السلف يسكتون عند سماع هذه الأشياء ولا يفسرونها مع علمهم أن ذات الله تعالى لا تتبعض ولا يحويها مكان ولا توصف بالتغير ولا بالإنتقال ومن صرف عن نفسه ما يوجب التشبيه وسكت عن تفسير ما يضاف إلى الله عز وجل من هذه الأشياء فقد سلك طريق السلف الصالح وسلم فأما من ادعى سلوك طريق السلف ثم فهم من هذا الحديث أن القدم صفة ذاتية وأنها توضع في جهنم فما عرف ما يجب لله ولا ما يستحيل عليه ولا سلك منهاج السلف في السكوت ولا مذهب المتأولين وأخسس به من مذهب ثالث ابتدعه من غضب من البدع قال أبو الوفاء بن عقيل تعالى الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة هذا عين التجسيم ثم إنه لا يعمل في النار أمره وتكوينه حتى يستعين بشيء من ذاته وهو القائل للنار (كوني بردا وسلاما)

পূর্ববর্তী সালফে সালেহীনরা এই সকল বিষয় শোনা মাত্র নিরাবতা অবলম্বন করতেন। এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতেন না। সেই সাথে তারা এ বিশ্বাস রাখতেন যে, আল্লাহর সত্ত্বা বিভিন্ন অংশে (যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গে) বিভক্ত নয় কোনো স্থানে অবস্থিত নয়, কোনোভাবে পরিবর্তিত বা স্থানান্তির হতে পারে না। যে কেউ আল্লাহর ব্যাপারে এমন সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হতে বিরত থাকে যাতে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয় এবং আল্লাহর সাথে ঐরুপ যা কিছু সম্পর্কিত করা হয়েছে সে সেগুলোর কোনোরুপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে না বরং নিরব থাকে সে সালফে সালেহীনদের পথ অনুসরণ করে। আর যে নিজেকে সালাফদের অনুসারী বলে দাবী করে কিন্তু মনে করে এই হাদীসে পা বলতে আল্লাহ ﷻ এর স্বত্ত্বাগত সিফাত (বৈশিষ্ট্য) বোঝানো হয়েছে এবং এমন দাবী করে যে আল্লাহ জাহান্নামে এটা রাখবেন সে এটা বুঝতেই সক্ষম হয় নি যে, আল্লাহর ব্যাপারে কেমন কথা বলা উচিৎ আর কেমন কথা তার ব্যাপারে অসম্ভব। সে না সালফে সালেহীনদের নিরব থাকার নীতি অবলম্বন করেছে আার না সে (সঙ্গতিপূর্ণ) ব্যাখ্যার পথ অবলম্বন করেছে। তার এই তৃতীয় বিদয়াতপন্থী মতবাদটি কত নিকৃষ্ট! যারা বিদয়াতের বিরোধীতা করে তারাই এই বিদয়াত তৈরী করেছে। আবুল ওফা ইবনে আক্বীল বলেন আল্লাহ এ থেকে পবিত্র যে, তার একটি সিফাত থাকবে যা কোনো স্থানে অবস্থান করবে। এটিই তো প্রকৃত মুজাস্সিমাদের আক্বীদা। তাছাড়া আল্লাহ্ ﷻ কি এতটাই অক্ষম হয়ে গেলেন যে, জাহান্নামকে আদেশ দান করার মাধ্যমে

নিরব করতে পারলেন না এমন কি নিজের স্বত্ত্বাগত একটি সিফাত (বৈশিষ্ট্য) ব্যবহার করতে (জাহান্নামের ভিতরে রাখতে) বাধ্য হলেন! [কাশফুল মুশকিল]

সালফে সালেহীনদের অনুসরণ করার দাবীদার কিছু লোকের পক্ষ থেকে এধরণের ভ্রান্তী বেশ কিছু ব্যাপারে ঘটেছে। এর মধ্যে সর্বাধিক ভয়বহ হলো, আল্লাহর সুরত (صورة) বা আকার-আকৃতি আছে এবং তিনি আকাশে অবস্থান করেন বলে দাবী করা। নিচে আমরা এ দুটি বিষয়ে আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা সুবিস্তারে বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ্।

◆ *আল্লাহর আকার-আকৃতির ব্যাপারে আহ্লুস্সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা।*

পূর্বে ইমাম খাত্তাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত সহীহ্ সুন্নাতে উল্লেখ নেই এমন কোনো গুণ ও বৈশিষ্ট্য দাবী করা জাবে না। পবিত্র কুরআনের কোথাও আল্লাহর ব্যাপারে সুরাত (صورة) তথা আকার-আকৃতির কথা বলা হয়নি। হাদীসে এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে যেখানে আল্লাহ সম্পর্কে আকার-আকৃতির কথা বলা হয়েছে তবে তার একটিকেও আকার আকৃতি অর্থে গ্রহণ করা যায় না।

একটি হাদীসে বলা হয়েছে,

إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

তোমাদের কেউ যখন অন্য কাউকে প্রহার করে তখন তার চেহারার উপর আঘাত করা হতে যেনো বিরত থাকে কেননা আল্লাহ আদম عليه السلام কে সৃষ্টি করেছেন তার নিজ আকৃতিতে। [মুসলিম]

অন্য একটি বর্ণনাতে এসেছে আদম عليه السلام কে সৃষ্টি করা হয়েছে রহমানের (আল্লাহর) আকৃতিতে। ইমাম নাব্বী এই হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, (وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ) মুহাদ্দীসদের নিকট এই হাদীস প্রমাণিত নয়। [শারহে মুসলিম]

উপোরক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আলেমরা বলেছেন, এখানে তার নিজ আকৃতিতে বলতে আল্লাহর নিজ আকৃতি নয় বরং আদম عليه السلام এর নিজ আকৃতি বোঝানো হয়েছে। [শারহে মুসলিম]

এছাড়া বিষয়টির অন্যান্য বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

এই হাদীসের এধরণের ব্যাখ্যা করার ছাড়া উপায় নেই। কারণ, এখানে আল্লাহর আকৃতিতে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু এটা ঐ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক যেখানে বলা হয়েছে, “কোনো কিছুই তার মতো নয়।”

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দ্বীন আল্লাহ ﷻ একটি ভিন্ন আকৃতিতে মুসলিমদের সামনে হাজির হয়ে বলবেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে আপনি আমাদের রব নহেন। আমরা আমাদের রবের নিকট আপনার নিকট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হাদীসে বলা হয়েছে,

فَيَأْتِيهِمُ اللهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ

এরপর আল্লাহ্ ﷻ এমন একটি আকৃতিতে আসবেন যা তারা চেনে।

এই হাদীসটিতে ব্যবহৃত সুরাত শব্দটিকে আকৃতি অর্থে গ্রহণ করা এবং তা আল্লাহর ব্যাপারে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। যেহেতু তাতে প্রমাণিত হবে আল্লাহ নিজের আকৃতি পরিবর্তন করেন এবং একবার পরিচিত ও অন্য আরেকবার অপরিচিত আকৃতি ধারন করেন। অর্থাৎ একবার স্বীয় আকৃতির মধ্যে এমন কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করেন যা পূর্বে ছিল না। এধরনের পরিবর্তন ও সংযজোন থেকে আল্লাহ ﷻ পবিত্র।

তিরমিযী বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إِنِّي نَعَسْتُ فَاسْتَثْقَلْتُ نَوْمًا فَرَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম এমন কি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম তখন আমার রবকে একটি সুন্দর আকৃতিতে দেখতে পেলাম। [৭৮] [তিরমিযী]

এই হাদীসে ব্যবহৃত আকৃতি শব্দটি বাস্তবে আল্লাহর সিফাত হিসেবে প্রয়োগ করা যাবে না কারণ স্বপ্নে মানুষ যা কিছু দেখে সেটা উপমা হিসেবে দেখে থাকে বাস্তবতা হিসেবে নয়। উদাহরণ স্বরুপ ইউসূফ عليه السلام চাঁদ সূর্য ও তারকারাজিকে তার উদ্দেশ্যে সাজদা করতে দেখেন কিন্তু বাস্তবে তার অর্থ হলো তার পিতা-মাতা ও ভ্রাতারা তার উদ্দেশ্যে সাজদা করবে প্রকৃতই চাঁদ সূর্য নয়। উহুদ যুদ্ধের পূর্বে রসুলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে একটি তরবারি দেখেন তার একটি স্থান ভেঙে গিয়েছিল। তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেন, আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কেউ একজন এই যুদ্ধে নিহত হবে। পরে হামযা رضي الله عنه নিহত হন। তরবারি ভেঙে যাওয়া দেখে তিনি একজন ব্যক্তির নিহত হওয়ার খবর দেন। তিনি এমন বলেন নি যে, এই যুদ্ধে আমার তরবারি ভেঙে যাবে। কারণ স্বপ্ন পুরোপুরি বাস্তবতার সাথে মিল রাখেনা বরং স্বপ্ন আসে উপমার ভঙ্গিতে এবং সেটা বুঝে নিতে হয়। একারণে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন হয়।

---

[৭৮] ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, (সহীহুজ জিলাল: ৩৮৮)।

ইমাম নাব্বী ﷺ বলেন,

قال القاضي واتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها وان رآه الانسان على صفة لا تليق بحاله من صفات الأجسام لأن ذلك المرئي غير ذات الله تعالى إذ لا يجوز عليه سبحانه وتعالى التجسم ولا اختلاف الأحوال

কাজি ইয়াদ ﷺ বলেছেন, আলেমরা একমত হয়েছেন যে, আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব। যদিও কেউ তাকে এমনভাবে দেখে যেটা তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় যেমন হয়তো তাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শারিরিক বৈশিষ্ট্যে দেখে (তবু সমস্য নেই) কারণ স্বপ্নে যা দেখা যাচ্ছে সেটিই বাস্তবে মহান রব নন (বরং এটা উপমা)। [শারহে মুসিলম]

মোট কথা, স্বপ্নে আল্লাহ্ ﷻ কে কোনো একটি আকৃতিতে দর্শন করলে বাস্তবে তার ঐ ধরণের আকৃতি রয়েছে এমন মনে করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়।

এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কুরআন হাদীসে আল্লাহ ﷻ এর সুরাত বা আকৃতি থাকার পক্ষে স্পষ্ট ও অকাট্য কিছুই পাওয়া যায় নি। যেসব হাদীসে আকৃতি শব্দটি এসেছে সেখানে আল্লাহর আকৃতি প্রমাণ করা হলে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। একারণে কোনো অর্থেই আল্লাহর আকৃতি আছে এমন মনে করা সঠিক আক্বীদা নয়।

অনেকে বলে, আল্লাহকে আখিরাতে মুমিনরা দেখতে পাবে। নিশ্চয় তার কোনো আকৃতি আছে তা না হলে দেখা যাবে কীভাবে? কেউ কেউ আল্লাহর চেহারা (وجه) সম্পর্কে যেসব আয়াত এসেছে সেগুলো সুরাত (صورة) বা আকৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চেষ্টা করে। আমরা পূর্বেই বলেছি এধরণের অপচেষ্টা স্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়। যাকে দেখা যায় তার আকৃতি থাকা লাগবে এমন মন্তব্য মূলত সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্রষ্টার ক্ষেত্রেও যে এটা প্রায়োগ করার চেষ্টা করে সে আসলে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টাকে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করে। আর বলা বাহুল্য যে এটা মুজাস্সিমাদের আক্বীদা ছাড়া কিছু নয়। একইভাবে পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ্ সুন্নাতে আল্লাহর ব্যাপারে যতটুকু বলা হয়েছে তার বাইরে এক চুল পরিমান বৃদ্ধি করা যাবে না। হাতের কথা বলা হয়েছে কিন্তু তার সাথে হাতের নোখ যুক্ত করা যাবে না একইভাবে চেহারার কথা বলা হয়েছে তার সাথে শরীর বা আকৃতি যুক্ত করা যাবে না। বরং হয়তো এসব ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা যাবে না অথবা যদি ব্যাখ্যা করতেই হয় তবে যতটুকু উল্লেখ আছে কেবল তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে তার বাইরে কিছুই বলা যাবে না।

আকৃতির বিষয়টি হাত বা চেহারা ও চোখের মতো নয় কারণ এগুলো পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে তাই পূর্বে উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে এগুলো আল্লাহর ব্যাপারে প্রয়োগ করা যায়। যেমন আল্লাহর হাত

আছে কিন্তু সৃষ্টির হাতের মতো নয়, আল্লাহর চোখ বা চেহারা আছে কিন্তু তা সৃষ্টির মতো নয় ইত্যাদি। আকৃতি শব্দটি সেভাবে প্রমাণিত নয় তাই কোনো শর্তের আলোকেই আল্লাহর আকৃতি আছে এমন বলা যাবে না। এমন কি “আল্লাহর আকৃতি আছে কিন্তু তা অন্যান্য সৃষ্টির আকৃতির মতো নয়” এমন কথা বলাও সঙ্গত নয়।

আদম ﷺ কে সৃষ্টি করা সংক্রান্ত হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম নাব্বী رحمه الله আল মারিযী رحمه الله থেকে বর্ণনা করেন,

وقد غلط بن قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره وقال لله تعالى صورة لا كالصور وهذا الذي قاله ظاهر الفساد لأن الصورة تفيد التركيب وكل مركب محدث والله تعالى ليس بمحدث فليس هو مركبا فليس مصورا قال وهذا كقول المجسمة جسم لا كالاجسام

ইবনে কুতাইবা এই হাদীসের অর্থের ব্যাপারে ভ্রান্তির শিকার হয়েছে। সে হাদীসটিকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করেছে। সে বলেছে, আল্লাহর আকৃতি রয়েছে তবে তা অন্যদের আকৃতির মতো নয়। তার এই কথাটি স্পষ্ট ভ্রান্ত কথা। কেননা আকৃতি বলতেই একটি গঠনকে বোঝায় আর গঠিত হওয়া সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আল্লাহ সৃষ্ট নন অতএব তার কোন গঠন নেই বা আকৃতি নেই। তিনি (আল-মারিযী এও বলেছেন যে, এটা মুজাস্‌সিমাদের কথার মতো যেহেতু তারা বলে আল্লাহর দেহ রয়েছে তবে তা অন্যদের দেহের মতো নয়। [শারহে মুসলিম]

তিনি (আল-মারিযী) আরো বলেন,

قال العجب من بن قتيبة في قوله صورة لا كالصور مع أن ظاهر الحديث على رأيه يقتضي خلق آدم على صورته فالصورتان على رأيه سواء فاذا قال لا كالصور تناقض

ইবনে কুতাইবার কথায় আমি অবাক হয়। তিনি বলছেন, “আল্লাহর আকৃতি আছে কিন্তু তা অন্যদের আকৃতির মতো নয়”। অথচ হাদীসটিকে যদি তার মতে প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণ করা হয় তবে তাতে প্রমাণিত হয় যে, আদম ﷺ কে আল্লাহর আকৃতিতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে তা আল্লাহদের আকৃতি ও অন্যদের আকৃতি একই হয়ে গেল! কিন্তু তিনি বলছেন, তার আকৃতি অন্যদের মতো নয় তবে তো তার কথা সাংঘর্ষিক হয়ে গেল। [শারহে মুসিলম]

আল্লাহ ﷻ এর দুরকম আকৃতিতে প্রকাশিত হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান আল-জাওযী رحمه الله বলেন,

وهذا شيء قد تخبط فيه جماعة فالمتقدمون من السلف قرأوه وعبروا ولم ينطقوا بشيء مع علمهم واعتقادهم أن الصورة التي هي تخاطيط لا تجوز علي الله عز وجل ولا التغير وهذا أصلان لا بد من اعتقادهما التخاطيط لا تكون إلا في الأجسام والتغير لا يصلح أن يطرأ على الإله

এই হাদীসটির ব্যাখ্যায় কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী সালফে সালেহীনরা এইসব হাদীস পাঠ করতেন এবং অতিক্রম করে চলে যেতেন। তারা এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতেন না। তবে তারা দৃঢ়ভাবে এটা বিশ্বাস করতেন যে, সুরাত (আকৃতি) হলো এটি নির্দিষ্ট গঠন ও রুপরেখা যা আল্লাহর ক্ষেত্রে সঙ্গত নয় একইভবে তার বৈশিষ্ট্যে কোনোরুপ পরিবর্তন ঘটাও সম্ভব নয়। এদুটি বিষয় এমন দুটি মূলনীতি যা আবশ্যকভাবে বিশ্বাস করতে হবে। কেননা নির্দিষ্ট গঠন ও রুপরেখা কেবল তার থাকতে পারে যার দেহ রয়েছে এবং যিনি ইলাহ তার বৈশিষ্ট্যে কোনোরুপ পরিবর্তন সাধিত হতে পারে না।

এরপর তিনি বলেন,

فإذا وقع اعتقاد هذين الأصلين ثم سكت الساكت عن تفسير هذه الكلمات فقد سلك مذهب القدماء

যে ব্যক্তি এই দুটি বিষয় নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস স্থাপণ করবে এবং নিরব থাকবে সে পূর্ববর্তী সালফে সালেহীনদের পথ অনুসরণ করলো।

এরপর তিনি এ হাদীসটির [৭৯] বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন এবং এক পর্যায়ে বলেন,

فأحوجتنا لذلك الأدلة إلى تأويل صورة تليق إضافتها إليه سبحانه ويصح عليها التغير والتعريف والتنكير وما ذلك إلا الحال التي يوقع عليها أهل اللغة اسم صورة فيقولون كيف صورتك مع فلان وفلان على صورة من الفقر

(যেহেতু আল্লাহর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হতে পারে না) একারণে আমরা এই হাদীসটির সুরাত শব্দটিকে এমন একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে বাধ্য হই যা আল্লাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সেই সাথে পরিবর্তিত হওয়া এবং একবার অপরিচিত ও অন্যবার পরিচিত হওয়া সম্ভব হয়। আর সেই ব্যাখ্যাটি হলো সুরত শব্দটিকে অবস্থা অর্থে গ্রহণ করা। আরবী ভাষাভাষি লোকেরা সুরত শব্দটি এ অর্থে ব্যাবহার করে থাকেন। তারা বলেন, অমুকের সাথে তোমার সুরত কেমন? (অর্থাৎ তার সাথে তোমার সম্পর্ক, সদ্ভাব ইত্যাদির অবস্থা কেমন)। অমুক দরিদ্র সুরতে (দরিদ্র অবস্থায়) আছে। [কাশফুল মুশকিল]

অর্থাৎ দ্বিতীয়বার এমন পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আল্লাহ্ প্রকাশিত হবেন যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে যে আসলে মহাবিশ্বের প্রতিপালক প্রকাশিত হয়েছেন। এই পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেই বলা হয়েছে সুরত। সুরত এখানে আকৃতি অর্থে নয়।

ইবনে জাওজী ﷺ আরো বলেন,

ولو حمل - ونعوذ بالله - على ما قالت المجسمة من صورة ترجع إلى ذاته لكان ذلك تجويزا لتغيير صفاته وخروجه في صورة فإن كانت حقيقة فهو استحالة وإن كانت تخيلا فليس ذاك هو وإنما يريهم غيره فما أشنع

---

[৭৯] যে হাদীসে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে দুটি ভিন্ন আকৃতিতে আল্লাহ আগমন করবেন।

مقالة من يصدر قوله عن الجهالة ويتعلق بالظواهر كما تعلقت النصارى في المسيح وقالوا هو روحه حقيقة

মুজাস্সিমাদের মত অনুযায়ী যদি এখানে আকৃতিকে আল্লাহর স্বত্বাগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয় -নাউযু বিল্লাহ- তবে এর মাধ্যমে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিবর্তিত হয় এমন প্রমাণিত হবে (যেহেতু এখানে দুই বারে দুরকম আকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছেন এমন বলা হয়েছে)। যদি বলা হয় আল্লাহ বাস্তবেই আকৃতি ধারন করেছেন তবে তা সম্ভব নয়। আর যদি বলা হয় যারা দেখছিল তাদের নিকট এমন মনে হয়েছিল তবে তো সেটা বাস্তবে আল্লাহর আকৃতি নয় বরং তিনি অন্য কিছু দেখিয়েছেন। ঐ সকল লোকদের এসব মুর্খতাসূলভ কথা-বার্তা কত নিকৃষ্ট যারা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর করে যেভাবে খৃষ্টানরা ঈসা عليه السلام এর ব্যাপারে করেছিল। (ঈসা عليه السلام কে রূপক অর্থে আল্লাহর রুহ্ বলা হয়) তারা বলেছিল ঈসা عليه السلام বাস্তবেই আল্লাহর রুহ (প্রাণ)। (অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্)।

[কাশফুল মুশকিল]

বদরুদ্দিন আইনী رحمه الله ইবনে কুতাইবার মতটি বর্ণনাপূর্বক বলেন,

فأثبت لله صورة قديمة وقال ابن فورك وهذا جهل من قائله

সে আকৃতিকে আল্লাহর জন্য অনাদি-অনন্ত কাল হতে বিরাজমান বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছে। ইবনে ফাওরাক বলেন, এ কথা যে বলে তার মুর্খতাই প্রমাণিত হয়। [উমদাতুল ক্বারী]

ইবনে বাত্তাল رحمه الله বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় এই হাদীস প্রসঙ্গে বলেন,

ففيه إيهام للمجسمة أنه تعالى ذو صورة، ولا حجة لهم فيه

এই হাদীসের ব্যাপারে মুজাসসিমারা বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা বলেছে আল্লাহর আকৃতি রয়েছে। এই হাদীসে তাদের পক্ষে কোনো দলিল নেই।

এরপর তিনি এখানে সুরাত শব্দটির উপরে বর্ণিত অর্থসমূহ উল্লেখ করেছেন।

মোট কথা, যারা বলে আল্লাহর আকৃতি আছে ওলামায়ে কিরাম তাদের ভীষণভাবে তিরষ্কার করেছেন এবং এই আক্বীদাটি মুজাসসিমাদের আক্বীদা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব মুসলিমদের এ ধরণের বিভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে যথেষ্ট্য পরিমান সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

♦ ***আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা।***

ইবনুল জাওজী رحمه الله বলেন,

فما أشنع مقالة من يصدر قوله عن الجهالة ويتعلق بالظواهر كما تعلقت النصارى في المسيح وقالوا هو روحه حقيقة

ঐ সকল লোকদের এসব মুর্খতাসূলভ কথা-বার্তা কত নিকৃষ্ট যারা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর করে যেভাবে খৃষ্টানরা ঈসা ﵇ এর ব্যাপারে করেছিল। (ঈসা ﵇ কে রূপক অর্থে আল্লাহর রুহ্ বলা হয়) তারা বলেছিল ঈসা ﵇ বাস্তবেই আল্লাহর রুহ (প্রাণ)। (অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্)। [কাশফুল মুশকিল]

তিনি খুব উত্তম কথা বলেছেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বিভ্রান্তির জন্ম হয়েছে। যার বেশ কিছু প্রমাণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্র অবস্থান সম্পর্কিত বিভ্রান্তি এ বিষয়ে আরেকটি উদাহরণ। একদল লোক দাবী করেছে আল্লাহ্ সব জায়গায় আছেন। তারা নিজেদের পক্ষে বেশ কিছু দলিল-প্রমাণ পেশ করেছে। যেমন,

{وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ}

﴾ তিনিই আল্লাহ, আকাশে ও পৃথিবীতে আছেন। তিনি জানেন তোমরা কি গোপন করো আর কি প্রকাশ করো। ﴿ [আনয়াম/৩]

{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}

﴾ আল্লাহ পূর্ব পশ্চিমের মালিক। তোমারা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকে তার চেহারা রয়েছে। তিনি সর্বব্যাপী মহাজ্ঞানী। ﴿ [বাকারা/১১৫]

{وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

﴾ তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা সেখানেই থাকো না কেনো। তিনি তোমাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন। ﴿ [হাদীদ/৪]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى

যখন তোমাদের কেউ সলাত আদায় করে সে যেনো তার সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে কেননা যে সলাত আদায় করে আল্লাহ তার সামনের দিকে থাকেন। [বুখারী ও মুসলিম]

এই সকল আয়াত ও হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের উপর নির্ভর করে একদল লোক আল্লাহ ﷻ আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান এমন দাবী করে।

আর অন্য একদল বলেছে তিনি আকাশে আছেন। তারা নিজেদের পক্ষে বেশ কিছু আয়াত ও হাদীস ব্যবহার করে। যেমন,

{أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ}

❮ তোমরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে যে যিনি আকাশে আছেন (আল্লাহ) তোমাদের পায়ের নিচের মাটি ধসিয়ে দিতে পারেন ... ❯ [মুলক/১৬]

ফিরআউন বলল,

يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى

হে হামান আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করো যাতে আমি আকাশে উঠতে সক্ষম হই এবং মুসার ইলাহকে দেখতে পারি। [সূরা মুমিন/৩৬,৩৭]

তারা বলে, মুসা ﷵ দাবী করেছিলেন যে তার রব আকাশে আছেন সেকারণে ফিরআউন তামাশার ছলে বলেছিল তবে আকাশে উঠে আমি দেখবো সেখানে কোনো রব আছে কিনা।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

পৃথিবীবাসীর প্রতি তোমরা দয়া প্রদর্শন করো যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। [আবু দাউদ, তিরমিযী; তিরমিযী বলেছেন, হাসান সহীহ]

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ ﷺ একটি দাসীকে প্রশ্ন করেন, (أين الله) "আল্লাহ্ কোথায়?" সে বলে, (في السماء) "আকাশে"। এরপর তিনি বলেন, (فمن أنا) "আমি কে?" সে বলে, (انت رسول الله) "আপনি আল্লাহর রাসুল"। একারণে রসুলুল্লাহ্ ﷺ স্বাক্ষ্য দেন যে, উক্ত দাসীটি ঈমানদার।

এই সকল দলিল-প্রমাণের বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর করে একদল লোক বলে আল্লাহ্ আকাশে আছেন।

এই সকল আয়াত ও হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের উপর নির্ভর করে উপরে যে দুটি মত বর্ণনা করা হয়েছে উভয় মতই ভ্রান্ত ও অগ্রহণযোগ্য। আহ্লুস্সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কিরামের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত আক্বীদা হলো, আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই আল্লাহর সৃষ্টি। আর আল্লাহ তার সৃষ্টির অভ্যন্তরে অবস্থান করা হতে পবিত্র। তিনি স্বত্ত্বাগতভাবে সকল সৃষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন। তবে তিনি তার জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে প্রতিটি সৃষ্টির সাথে আছেন। তাই বলা হয়েছে (هو معكم أينما كنتم) "তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো তিনি তোমাদের সাথে আছেন" অর্থাৎ তোমরা কি করছো বা কি করছো না সে সম্পর্কে তিনি খবর রাখেন। এমন নয় যে, তিনি প্রকৃতই সকলের সাথে এবং সর্বস্থানে অবস্থান

করছেন। এ আক্বীদাটি হিন্দুদের সর্বেশ্বরবাদ এবং ওয়াহ্‌দাতুল উজুদ মতালম্বী একদল তাসাউফপন্থীর বিভ্রান্ত মস্তিষ্কের সৃষ্টি। যেহেতু আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}

আর-রাহমান আরশের উপর আছেন। [তাহা/৫]

এই আয়াত উল্লেখের পর ইবনে আব্দিল বার রহ. বলেন,

وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عز وجل في كل مكان

এটা মু’তাযিলা ও জাহামিয়্যাদের বিপক্ষে দলিল যারা বলে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। [আত-তামহীদ]

অন্য একস্থানে তিনি এ মতটিকে জাহামিয়্যা ও মু’তাজিলাদের মুর্খতাসূলভ মত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম আজ-জাহাবী রহ. আল-উলু নামক কিতাবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণনা করেন তার নিকট এমন কিছু ব্যক্তিকে হাজির করা হলো যারা বলতো (الله في كل مكان) “আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান” তিনি তাদের কাউকে কয়েদ করেন আর কিছু লোককে প্রহার করেন এবং তাদের নিয়ে মানুষের মাঝে প্রদক্ষিন করেন।

আল্লাহ্ ﷻ তার বান্দাদের সাথে থাকা সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্দিল বার রহ. আরো বলেন,

علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التآويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله

বিজ্ঞ সাহাবা ও তাবেইনরা, যাদের নিকট হতে আমরা আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান পেয়েছি তারা এই সকল আয়াতের ব্যখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ আরশের উপর আছেন কিন্তু তার জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান। গ্রহণযোগ্য কেউই এই মতের বিপরীত মত পোষণ করেনি। [আত-তামহীদ]

অর্থাৎ এই ব্যাখ্যার উপর উম্মতে মুসলিমার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইমাম আজ-জাহাবী তার আল-উলু নামক কিতাবে বিভিন্ন ওলামায়ে কিরাম থেকে অনুরুপ কথা বর্ণনা করেছেন যারা বলেছেন, আল্লাহ্ আরশের উপর আছেন কিন্তু তার জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান।

একইভাবে তিনি আকাশে আছেন একথার অর্থ তিনি আকাশে অবস্থান করছেন এমন নয় বরং এর অর্থ তিনি সমস্ত সৃষ্টির উর্দ্ধে আছেন। এখানে হয়তো সামা (سماء) বা আকাশ অর্থ উর্দ্ধে বা উপরে বুঝতে হবে সেক্ষেত্রে অর্থ হবে তিনি উপরে আছেন। অথবা ফি (في) বা ‘এ’ বলতে আলা (علي) বা উপরে

বুঝতে হবে। সেক্ষেত্রে অর্থ হবে, তিনি আকাশের উপরে আছেন।

ইমামা নাব্বী رحمه الله বলেন,

قال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم فمن قال باثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي على السماء ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحسب مقتضاها

কাজি ইয়াদ رحمه الله বলেছেন, ফুকাহা, মুহাদ্দিস, কালামশাস্ত্রবিদ, গবেষক ও মুকাল্লিদ ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর মুসলিমরা এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত করেন নি যে, যেসব দলিল প্রমাণে বাহ্যিকভাবে আল্লাহ আকাশে আছেন এমন বলা হয়েছে যেমন আল্লাহর বাণী, "যিনি আকাশে আছেন তোমরা কি তার ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছো যে তিনি হয়তো তোমাদের নিয়ে মাটি ধসিয়ে দেবেন?" এই সকল আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং তারা সকলে এটার কেনো না কোনো ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে যারা কোনো প্রকার সীমা ও প্রকৃতি নির্ধারন ব্যাতিরেখে সাধারনভাবে আল্লাহ উপরে আছেন এমনটি বলেছেন তারা বলেছেন এখানে আকাশে আছেন (في السماء) বলতে আকাশের উপরে (علي السماء) বোঝানো হয়েছে। অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনকারী অন্যান্য গবেষক ও কালামশাস্ত্রবিদ বলেছেন, আল্লাহ কোনো দিকে আছেন আমরা এমন বলবো না। [শারহে মুসিলম]

মোট কথা উম্মতে মুসলিমার সর্বশ্রেণীর ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ আকাশে অবস্থান করছেন এটা সঠিক আক্বীদা নয় তবে তাদের মধ্যে একদল বলেছেন আমরা বলবো তিনি উপরের দিকে আছেন অন্য আরেকদল বলেছেন আমরা আল্লাহ ব্যাপারে দিক শব্দ প্রয়োগ করবো না।

ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন,

كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ : إنَّهُ فِي السَّمَاءِ أَنَّهُ فِي الْعُلُوِّ وَأَنَّهُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ

যে বলে আল্লাহ আকাশে আছেন আসলে সেটার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ উপরে আছেন এবং সকল সৃষ্টির উর্দ্ধে আছেন। [মাজমুউল ফাতাই]

তিনি আরো বলেন,

مَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ مُقْتَضَى هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فِي دَاخِلِ السَّمَوَاتِ فَهُوَ جَاهِلٌ ضَالٌّ بِالِاتِّفَاقِ

যে মনে করে এই আয়াতের অর্থ; আল্লাহ্ আকাশের অভ্যন্তরে আছেন তবে সে সর্বসম্মতিক্রমে মুর্খ ও পথভ্রষ্ট বলে গণ্য হবে। [মাজমুউল ফাতাই]

ইমাম কুরতুবী ﷺ এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। "আকাশে যিনি আছেন তোমরা কি তার ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছো?" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

وقال المحققون: أمنتم من فوق السماء، كقوله: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أي فوقها لا بالمماسة والتحيز لكن بالقهر والتدبير. ... مديرها ومالكها، كما يقال: فلان على العراق والحجاز، أي واليها وأميرها. والاخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة، مشيرة إلى العلو، لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل معاند. والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت. ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام

বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম বলেছেন আকাশের উপরে যিনি আছেন তোমরা কি তার ব্যাপারে নির্ভিক হয়ে গেছো? (এখানে অভ্যন্তরে বলতে উপরে বোঝানো হয়েছে) যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভ্রমণ করো অর্থাৎ পৃথিবীর উপরে। এর অর্থ আল্লাহ আকাশের উপরে আছেন, আকাশকে স্পর্শ করে বা আকাশে অবস্থান গ্রহণ করে নয় কর্তৃত্ব ও পরিচালনার দিক থেকে এটা বলা হয়েছে। ... অর্থাৎ তিনি আকাশের পরিচালক ও মালিক। যেমন বলা হয় অমুক ইরাকের উপর (দায়িত্ব প্রাপ্ত) বা হিযাজের উপর (দায়িত্বপ্রাপ্ত) অর্থাৎ সে ইরাক বা হিযাযের উপর কর্তৃত্বশীল এবং সেখানকার আমীর। আল্লাহ উপরে থাকার ব্যাপারে প্রচুর দলিল-প্রমাণ রয়েছে যা কেবল একজন বেদ্বীন ছাড়া কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এই উচ্চতার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহকে সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাকে যাবতীয় হীন ও নিচ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত ঘোষণা করা। এখানে অবস্থান বা দিক ইত্যাদি সীমা-পরিসীমা উদ্দেশ্য নয় কেননা তা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। [তাফসীরে কুরতুবী]

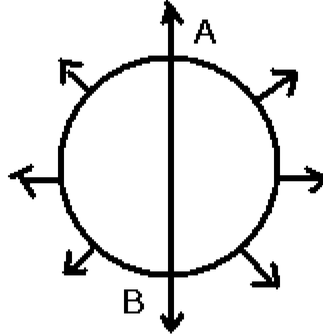
এরপর তিনি বলেন,

ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليها، وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان. ولا مكان له ولا زمان. وهو الآن على ما عليه كان

এর কারণ তিনি স্থান সৃষ্টি করেছেন অতএব তিনি স্থানের মৃখাপেক্ষী নন। সকল কিছু সৃষ্টি করার পূর্বে কোনো স্থান বা সময় ছিল না তখনও আল্লাহ ছিলেন। তার তখন স্থান ও সময়ের প্রয়োজন হয়নি। তিনি তখন যেভাবে ছিলেন এখনও সেভাবেই আছেন। [তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম কুরতুবীর এই বিশ্লেষণটি খুবই চমৎকার। আল্লাহ উপরে আছেন। এর অর্থ যদি দিক বা অবস্থান ধরা হয় তবে তাতে স্পষ্ট বৈপরিত্ব সৃষ্টি হয়। যেহেতু উপর বিষয়টিই একটি আপেক্ষিক বিষয়। আমরা জানি পৃথিবী ফুটবলের মতো বৃত্তাকার। একটি ফুটবলের উপর কয়েকটি পিপড়া যেভাবে হাটাহাটি করে আমারও সেভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে চলাফেরা করি এবং বসবার করি। পৃথিবীর চারিপাশ ঘিরে বিভিন্ন এলাকা ও দেশে মানুষ বসবাস করে। প্রত্যেকে নিজের মাথার উপর আকাশ দেখতে পায়। যেহেতু পৃথিবীকে

ঘিরে যে শূন্যস্থান তাকেই আকাশ বলা হয়। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের নিকট উপর বলতে বিভিন্ন দিক বোঝাবে, একই দিক নয়। এমনও হতে পারে যে, এক দেশের লোক উপর বলতে যে দিকে ইঙ্গিত করছে অন্য দেশের লোকেরা উপর বলতে ঠিক তার বিপরীত দিকে ইঙ্গিত করছে। তাই দু দেশের লোকের নিকট উপরের দিক বিভিন্ন দিকে হবে। যারা ভূগোল সম্পর্কে অবগত আছেন তারা সহজেই আমার কথা বুঝতে সক্ষম হবেন। তবু বোঝার সুবিধার জন্য আমরা একটি চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করবো। নিচের চিত্রে আমরা একটি বৃত্ত দেখতে পাচ্ছি। মনে করি এটি পৃথিবী। এই গোলাকার পৃথিবীর উপরিভাগের তীরচিহ্নগুলিকে একেকটি মানুষ হিসেবে কল্পণা করি। যারা পৃথিবীপৃষ্ঠে দাড়িয়ে আছেন। পৃথিবীর চারিপাশের শূন্যস্থানকেই মূলত আকাশ বলা হয়। প্রতিটি তীর চিহ্ন যেদিকে ইঙ্গিত করছে উক্ত স্থান থেকে সেটিই হলো উপরের দিক এবং সেদিকে আকাশ। সে হিসেবে অ বিন্দুতে অবস্থিত ব্যক্তি উপর বলতে যেদিকে ইঙ্গিত করে ই বিন্দুতে অবস্থিত ব্যক্তি ঠিক তার বিপরীত দিকে ইঙ্গিত করে।



এখন যদি আমরা আল্লাহ্ উপরে আছেন বলতে প্রকৃত অর্থেই তিনি উপরের দিকে অবস্থান করেন এমন বুঝি তবে তাতে পৃথিবীর একেকটি অবস্থান স্বাপেক্ষে তার অবস্থান পরিবর্তীত হয়। আর আল্লাহর শানে এটা সম্ভব নয়।

ইমাম কুরতুবী رحمه الله বলেন,

عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة، فليس بجهة فوق عندهم، لأنه يلزم من ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيز، والتغير والحدوث هذا قول المتكلمين

পূর্ববর্তী প্রায় সকল আলেমরা এবং পরবর্তী নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো

আল্লাহ্ ﷻ এর ব্যাপারে দিক শব্দ প্রয়োগ না করা। তাদের নিকট আল্লাহর উপরে থাকার বিষয়টি দিক হিসেবে নয়। কেননা যদি বলা হয় তিনি একটি নির্দিষ্ট দিকে আছেন তবে এর অর্থ দাড়ায় তিনি কোনো স্থানে এবং কোনো একটি সীমায় অবস্থান করছেন। আর কোনো স্থান ও সীমায় অবস্থান করার কথা বলা হলে স্থীর থাকা বা নড়াচড়া করার বিষয়টি এসে যায়। আর এগুলো সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। কালাম শাস্ত্রবিদ ওলামায়ে কিরামের এটিই মত।

এরপর তিনি বলেন,

وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة

সালফে সালেহীনরা আল্লাহর ব্যাপারে নির্দিষ্ট দিক অস্বীকার করেন নি আবার আল্লাহর ব্যাপারে সেটা উল্লেখও করেন নি। বরং আল্লাহর কিতাবে যেভাবে এসেছে এবং তার রসুলগণ সেভাবে খবর দিয়েছেন তারা সকলে সেভাবেই বলতেন। তারা কেউই আল্লাহ প্রকৃত অর্থেই আরশের উপর আছেন এ ব্যাপারটি অস্বীকার করেন নি। [তাফসীরে কুরতুবী]

অর্থাৎ সালফে সালেহীনদের পন্থা ছিল দিক বা অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করা বরং আল্লাহ তার কিতাবে যেভাবে বলেছেন সেভাবে স্বীকার করে নেওয়া এবং নিরব থাকা। যেমনটি আমরা পূর্বে বহু বার বলেছি। তবে কেউ কেউ দিক ও অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন। যারা এসব ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেণ তাদের বেশিরভাগ আল্লাহর ব্যাপারে দিক ও অবস্থান ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগের বিপক্ষে। কেউ কেউ অবশ্য আল্লাহ্ আরশের উপরে আছেন এই হিসেবে তার অবস্থান উপরের দিকে এমন মন্তব্য করেছেন।

তাদের ব্যাপারে অবাক হয়ে কাজি ইয়াদ রহিমাহুল্লাহ বলেন,''আহ্লুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়া'' এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এসব আয়াত সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করা উচিৎ। অথচ তাদের কেউ কেউ আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট দিকে আছেন এমন কথা বলেছেন।

এরপর তিনি বলেন,

وهل بين التكييف واثبات الجهات فرق لكن أطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده وانه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلى الذي لا يصح في المعقول غيره وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء عصمة لمن وفقه الله تعالى

নির্দিষ্ট দিকের কথা বলাই কি ব্যাখ্যা প্রদান করা নয়! বরং শরীয়ত যেসব শব্দ প্রয়োগ করেছেন সেগুলো প্রয়োগ করা যেমন তিনি বলেছেন, ‘‘আল্লাহ তার বান্দাদের উপর পরক্রমশালী’’, এবং ‘‘তিনি আরশের

উপর'' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা এবং সেই সাথে স্বাভাবিক বুদ্ধির মাধ্যমে এবং আল্লাহর বাণী ''তার মতো কিছুই নেই'' এর মাধ্যমে যে বিষয় প্রমাণিত হয়েছে তাতে বিশ্বাস করাই বেশি নিরাপদ আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান তার জন্য। [শারহে মুসলিম]

অর্থাৎ কাজি ইয়াদ ﷺ আল্লাহ সম্পর্কে দিক বা অবস্থান ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করার চেয়ে সালফে সালেহীনদের ব্যাখ্যা প্রদান ছাড়াই নিরব থাকার পন্থাটি অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ আরশের উপরে আছেন এ কথাটি স্বীকার করে নিতে হবে এবং চুপ থাকতে হবে। দিক বা অবস্থান ইত্যাদি কোনো বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হবে না।

অতএব এখানে দুটি পন্থার যে কোন একটি অবলম্বন করতে হবে। হয়তো আমরা সাধারনভাবে বলবো আল্লাহ উপরে আছেন কিন্তু কিভাবে আছেন তা বলবো না। কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করবো না দিক বা অবস্থান আছে বা নেই ইত্যাদি কোনো শব্দ তার উপর প্রয়োগ করবো না। এটাই ছিল সালফে সালেহীনদের পথ। আর যদি কোনো ব্যাখ্যা করতেই হয় তবে বলবো দিক বা অবস্থান হিসেবে নয় বরং আল্লাহর সুউচ্চ সম্মান বোঝাতে এবং তিনি সৃষ্টির উর্দ্ধে আছেন এটা বোঝাতে এখানে উপরে বলা হয়েছে। যারা ব্যাখ্যা করেছেন তাদের বেশিরভাগ এমন ব্যাখ্যা করেছেন। **প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ﷻ স্বত্ত্বাগতভাবে সৃষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন এবং সকল সৃষ্টির উর্দ্ধে, সৃষ্টির কোনো কিছু তার মধ্যে নয় তিনিও সৃষ্টির কোনো কিছুর মধ্যে নন এই আক্বীদাটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত ওলামায়ে কিরামের ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত একটি অকাট্য আক্বীদা।** আল্লাহ্ ﷻ উর্দ্ধে বলতে তারা মূলত এটাই বোঝাতেন যে, তার সত্ত্বা সৃষ্টির সংস্পর্শ থেকে বহু দূরে। তবে তার জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রন প্রতিটি সৃষ্টিকে ঘিরে আছে। তারা এ বিষয়টি অত্যাধিক গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন যাতে মূর্তিপূজারীরা তাদের মূর্তির মধ্যে আল্লাহর উপস্থিতির দাবী করতে না পারে। একইভাবে যাতে কেউ খৃষ্টানদের মতো আল-হুলুল (الحلول) তথা মানুষের মধ্যে আল্লাহর অবতীর্ণ হওয়া বা কিছু তাসাউফপন্থীর মতো ফানা ফিল্লাহ্ (فناء في الله) তথা আল্লাহর সঙ্গে কোনো বান্দা মিশে যাওয়ার দাবী করতে না পারে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন,

فَالسَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ يَقُولُونَ : إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ سَلَفِ الْأُمَّةِ

পূর্ববর্তী ইমামগণ বলেন, আল্লাহ তার আরশের উপর আছেন সমস্ত সৃষ্টি হতে তিনি সত্ত্বাগতভাবে বিচ্ছিন্ন আছেন। যেমনটি কুরআন সুন্নাহ্ ও পূর্ববর্তীদের ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।

অন্যস্থানে তিনি বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ لَيْسَ فِي مَخْلُوقَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَاتِهِ وَلَا فِي ذَاتِهِ شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ

তিনি আকাশের উর্দ্ধে আরশের উপর আছেন। তিনি সৃষ্টি থেকে স্বাত্তাগতভাবে বিচ্ছিন্ন আছেন। তার সৃষ্টির মধ্যে তার স্বত্ত্বার কোনো কিছু নেই এবং তার সত্ত্বার মধ্যে তার সৃষ্টির কোনো কিছু নেই।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

ইমাম আজ-জাহাবী ﷺ তার আল-উলু নামক কিতাবে বিশটিরও বেশি পূর্ববর্তী বরেণ্য আলেম হতে এ মত বর্ণনা করেছেন। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তার সৃষ্টি হতে স্বত্ত্বাগতভাবে বিচ্ছিন্ন। তিনি সৃষ্টির সাথে মিশ্রিত হন না এবং সৃষ্টি তার সাথে মিশ্রিত হয় না। সৃষ্টির কোনো কিছুর সাথে তার স্বত্ত্বার কোনো কিছু স্পর্শ করে বা সংযুক্ত হয়ে নেই। তবে তার জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ওলামায়ে কিরাম এই মতবাদটি তুলে ধরেছেন। যা ইমাম আজ-জাহাবী তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ সত্ত্বাগতভাবে তার সৃষ্টির সংস্পর্ষ ও সংযোগ থেকে মুক্ত। আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এই আক্বীদাটি স্পষ্টভাবে অন্য আরেকটি আক্বীদা প্রমাণ করে আর তা হলো, আল্লাহ কোনো স্থানে অবস্থিত নহেন। কারণ স্থান আল্লাহর সৃষ্টি আর তিনি সত্ত্বাগতভাবে তার সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত বা সংযুক্ত নন। অর্থাৎ তিনি কোনো স্থানে অবস্থিত নন।

উপরের আলোচনার সারমর্ম হলো, আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে ওলামায়ে কিরাম তিনটি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন,

১. আল্লাহ্ সর্বত্র বিরজমান নন।

২. তিনি আকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত নন।

৩. তিনি সৃষ্টির সংস্পর্ষ ও সংযোগ থেকে মুক্ত।

তিনিটি বিষয়ই মূলত একটি কথায় প্রামাণ করে যে, আল্লাহ তার সৃষ্টির মধ্যে নন এবং তার সৃষ্টি তার সাথে সংযুক্ত নয় বরং তিনি আরশের উপরে আছেন। এই আক্বীদাটি যে মনে প্রাণে গ্রহণ করে। সে এ বিষয়ে সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। এরপর যদি সে অন্য কোনো ব্যাখ্যা প্রদান না করে বরং চুপ থাকে তবে তাকে নিন্দা করা হবে না। যেহেতু চুপ থাকাই সালফে সালেহীনদের পথ। আর যদি কেউ ব্যাখ্যা দিয়ে বলে আল্লাহ্ উর্দ্ধে আছেন এটা দিক বা অবস্থান বোঝায় না বরং সম্মান ও সৃষ্টির সাথে বিচ্ছিন্নতা বোঝায় তবে তাকে জাহামিয়্যা আখ্যায়িত করে তিরষ্কার করা যাবে না। কারণ এধরনের ব্যাখ্যা বহু সংখ্যক আলেম

থেকে বর্ণিত আছে যারা জাহামিয়্যা ছিলেন না। আর পূর্বে আমরা এ ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছি। একইভাবে যদি কেউ বলে আল্লাহ তার সৃষ্টির মধ্য অবস্থিত বা সৃষ্টির সাথে সংযুক্ত নন কিন্তু তিনি আরশের উপরে এটা বোঝানোর জন্য "আল্লাহর অবস্থান উপরের দিকে" এভাবে মন্তব্য করে অর্থাৎ এ অর্থে আল্লাহর ব্যাপারে দিক ও স্থান শব্দদুটি প্রয়োগ করে তাকেও মুজাস্‌সিমা বলা হবে না। কারণ এর মাধ্যমে সে আসলে সৃষ্টির সাথে আল্লাহর সাদৃশ্য প্রমাণ করছে না। তাছাড়া আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কিরামের কেউ কেউ এমন কথা বলেছেন যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। মোট কথা, ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমতের মাধ্যমে প্রমাণিত মৌলিক বিষয়াবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর এধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সামান্য দ্বিমত হলেই কাউকে বিদয়াতী বলে হৈ-হট্টোগোল করা উচিৎ নয় বরং মুসলিমদের উচিৎ যতদূর সম্ভব সদ্ভাব বজায় রেখে চলা।

ঈমান ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ 'আল-ইনকার' তথা আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয়কে অস্বীকার ও অপছন্দ করা সম্পর্কিত আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করতে চাই। এখন ঈমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

২.(গ) *ঈমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণ (الاستهزاء بالدين) তথা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কিত কোনো বিষয় নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল ও তামাশা করা।*

একদল মুনাফিক রসুলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা বলে, আমরা তো তামাশার ছলে এগুলো বলেছি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}

আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, রসুল এবং তার আয়াত নিয়ে তামাশা করছিলে? তোমরা ওযর পেশ করো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কাফিরে পরিনত হয়েছো। [সূরা তাওবা/৬৫]

এ আয়াতে আল্লাহ, তার দ্বীন ও তার রসুল সম্পর্কে তামাশার ছলে কিছু বলা কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য একটি আয়াতে কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

{وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ}

তোমরা যখন সলাতের জন্য আযান দাও তারা এটাকে তামাশার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ তারা নির্বোধ লোক। [মায়েদা/৫৮]

ইয়াহুদীরা বলতো জিব্রাঈল ﵇ আমাদের শত্রু। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ }

যে কেউ আল্লাহ, জিব্রাঈল বা মিকাঈল ইত্যাদি ফেরেশতা ও তার রাসুলদের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে আল্লাহ্ ঐ সব কাফিরদের শত্রু। [বাকারা/৯৮]

অতএব, নবী-রাসুল, কুরআন-হাদীস, ফেরেশতা, জান্নাত-জহান্নাম, সলাত-সওম, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি দ্বীন সম্পর্কিত যে কোনো বিষয় নিয়ে কটুক্তি করা স্পষ্ট কুফরী। এ বিষয়টি কুফরীর একটি মূলনীতি যার উপর উম্মতের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে।

কাজী ইয়াদ رحمه الله বলেন,

أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبيا أو حاربه فهو كافر بإجماع

যে কেউ নবী-রাসুলদের অবমাননা করে এবং তাদের ছোট করে বা তাদের কষ্ট দেয় অথবা কোনো নবীকে হত্যা করে বা তার সাথে যুদ্ধ করে সে কাফির হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [আশ-শিফা]

ইমাম ইবনুল আরবী আল-মালিকী رحمه الله বলেন,

فَإِنَّ الْهَزْلَ بِالْكُفْرِ كُفْرٌ ، لَا خُلْفَ فِيهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ

কুফরী কথা তামাশার ছলে মুখে উচ্চারণ করাও কুফরী এ বিষয়ে উম্মতের ওলামায়ে কিরামের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। [আহ্কামুল কুরআন]

ফুকাহায়ে কিরাম তাদের গ্রন্থাবলীতে এ সম্পর্কে বহু উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। আমরা সেসব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। বুঝার সুবিধার্থে আমরা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তামাশা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করার বিষয়টি কয়েকটি শাখা-প্রশাখাতে বিভক্ত করে প্রতিটি বিষয়ে পৃথক পৃথক উদাহরণ পেশ করবো।

২.গ.(১) আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোনো অসম্মানজনক শব্দ প্রয়োগ করা বা অসঙ্গত আচরণ করা।

আল্লাহ্-রাসুল, ফেরেশতা, জান্নাত জাহান্নাম, সাধারণ বিধি-বিধান ইত্যাদি যে কোনো দ্বীনী বিষয়ে অসম্মানজনক উক্তি বা আচরণ করা কুফরী। যেমন, আল্লাহ্-রাসুল বা ফেরেশতাদের গালি দেওয়া। যেভাবে ইয়াহুদীরা বলেছিল, জিব্রাঈল عليه السلام আমাদের শত্রু এবং তার উত্তরে আল্লাহ্ বলেছেন বরং আল্লাহই তাদের শত্রু। এভাবে কুরআন ছুড়ে ফেলা বা কোনো নাপাকী দ্বারা পবিত্র কুরআন লেখা যেমনটি অনেক কবিরাজ করে থাকে। এ ধরণের যে কোনো অসম্মানজনক উক্তি ও আচরণের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের

সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়কে অবমাননা করা হলে তা কুফরী বলে গণ্য হবে। এ বিষয়টিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

⇒ ক) আল্লাহর দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপারে বিরক্তি, অসন্তোষ বা অস্বীকৃতি প্রকাশ পায় এমন মন্তব্য বা আচরণ করা।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ}

এক আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। [যুমার/৪৫]

তিনি আরো বলেন,

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

আপনার রবের কসম তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে যা কিছু বিবাদ ঘটে তার বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ করে এবং আপনি যে বিচার করেন তা মেনে নিতে তাদের অন্তরে সামান্যও দ্বিধা হয় না বরং পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে মেনে নেয়। [নিসা/৬৫]

আল্লাহ্ ও তার রাসুলের সিদ্ধান্তের উপর বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ পায় এমন কোনো উক্তি বা আচরণ করা কুফরী। মোল্লাহ্ আলী কারী শারহে ফিকহে আকবারে, ইমাম নাব্বী রাওদাতুত্ তালেবীন নামক কিতাবে, কাজী ইয়াদ আশ-শিফা নামক কিতাবে এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম নিজ নিজ গ্রন্থে এ বিষয়ক বহু উদাহরণ উপস্থাপণ করেছেন। আমরা এখানে তার কিছু অংশ উল্লেখ করবো।

- শারহে ফিকহে আকবারে মোল্লাহ্ আলী কারী رحمه الله বলেন, যদি,কেউ বিপদ-আপদে পতিত হয়ে বলে, হে আল্লাহ্ তুমি আমার সম্পদ কেড়ে নিয়েছো বা তুমি আমার অমুক অমুক জিনিস ছিনিয়ে নিয়েছো। তুমি আর কি করতে চাও! বা সে বলে, আর কি করার বাকী আছে বা এই প্রকৃতির কোনো কথা বলে। তবে সে কাফির হবে। যেহেতু সে আল্লাহর তাকদীরের উপর আপত্তি অভিযোগ উত্থাপণ করছে।

এর সাথে সাদৃশ্য রেখে বলা যায়, যদি কারো একমাত্র সন্তান মারা যায় আর কেউ বলে, গরীব মানুষের ছেলেটিই কি আল্লাহর চোখে পড়ল? অথবা বলে, আল্লাহর কি ইনসাফ নেই বা আন্দাজ নেই ইত্যাদি তবে সে তাকদিরের উপর আপত্তি করা ও আল্লাহর ব্যাপারে বেইনসাফীর অভিযোগ উত্থাপন করার কারণে

কাফির হবে। একই কারণে যদি কেউ বলে, ‘‘আল্লাহ্ কাউকে রেখেছেন গাছ তলায় আর কাউকে রেখেছেন পাঁচতলায় এটা কেমন বিচার?’’ সে কাফির হবে।

- তিনি আরো বলেন, যদি কেউ মৃতপ্রায় মানুষের নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করে আর অন্য একজন বলে, তুমি কি মরা মানুষকে সূরা ইয়াসীন গিলিয়ে খাওয়াচ্ছো? এই ব্যক্তি কাফির হবে কারণ সে সূরা ইয়াসীন পাঠ করার ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করছে।
- যদি কারো সামনে বলা হয় ‘‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্’’ আর সে বলে এটা কি কাজে আসে? এর মাধ্যমে কি ক্ষুধা মেটে? বা এটা কি একটি রুটির কাজও করে? অথবা বলে, এর মাধ্যমে কি রুটি ভেজানো যায়? তবে সে কাফির হবে। অন্য যে কোনো যিকির বা দোয়ার ক্ষেত্রে এমন কথা বলাও কুফরী হবে। কারণ সে এই সকল দোয়া ও যিকিরের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব অস্বীকার করছে সেই সাথে এগুলো পাঠ করার ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করছে।
- যদি কেউ বলে, দিনে রাতে এত বেশি নামায পড়ে আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম। এত আমল কে করতে পারে! সে কাফির হবে কারণ সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধি-বিধানের উপর বিরক্তি প্রকাশ করছে। তাছাড়া সে মনে করেছে আল্লাহ ﷻ বান্দাদের উপর সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব প্রদান করেছেন অথচ তিনি বলেছেন, (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) ‘‘আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না।
- যে ব্যক্তি ইলমের মজলিস থেকে জ্ঞান অর্জন করে ফিরে আসে তাকে উদ্দেশ্য করে যদি কেউ বলে এই ব্যক্তি গীর্জা থেকে ফিরে আসলো বা মন্দির থেকে ফিরে আসলো তবে সে কাফির হবে কারণ সে ইলমের মজলিসকে গীর্জা বা মন্দিরের সাথে তুলনা করেছে। একইভাবে যদি কেউ ফতোয়ার গ্রন্থ অবজ্ঞাভরে ছুড়ে ফেলে তবে সে কাফির হবে। এ বিষয়ে তিনি (মোল্লাহ্ আলী কারী) একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। একবার একজন বিজ্ঞ আলেম এক দোকানীর নিকট একটি ফতোয়ার গ্রন্থ রেখে চলে যান তখন উক্ত ব্যক্তি তাকে বলে, আপনি তো ভুলক্রমে আপনার করাতটি ফেলে যাচ্ছেন। উক্ত আলেম বলেন, তোমার কাছে তো আমি একটি কিতাব রেখেছি করাত নয়। সে বলে কাঠমিস্ত্রীরা যেভাবে করাত দিয়ে কাঠ কাটে আপনারাও তো একইভাবে এসব কিতাব দিয়ে মানুষের গলা কাটেন। পরে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয় যেহেতু সে ফিকাহর কিতাব নিয়ে তামাশা করেছে। মোল্লাহ্ আলী কারী রহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, শুধু মাত্র শরীয়তের জ্ঞান সম্পর্কিত বইয়ের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য মানতিক (যুক্তি বিদ্যা) বা অন্যান্য

জ্ঞান সম্পর্কিত বইয়ের ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য হবে না। যেহেতু তার মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে যা আসলেই তিরষ্কারের যোগ্য।

- যার নিকট শরীয়তের কোনো বিষয় উল্লেখ করা হলে নাক শিটকায় বা আচার-আচরণে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে তবে সে কাফির হবে।
- কাজী ইয়াদ ﷬ বর্ণনা করেন, ইবনে আখি আজাব নামে একজন ব্যক্তি রাস্তায় বের হলে বৃষ্টি শুরু হয়। সে বিরক্ত হয়ে বলে, (بدأ الخراز يرش جلوده) "চামড়া সেলাইকারী এখন চামড়া ভিজাতে শুরু করেছে" একারণে কর্ডোভার ফুকাহায়ে কিরাম তাকে হত্যা করার ফতোয়া দেন। পরে তাকে হত্যা করা হয় এবং তার ব্যাপারে নিরাবতা অবলম্বনের কারণে কাজিকে বহিষ্কার করা হয়। [আশ-শিফা]
- তিনি অন্য আরেকজন ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করেছেন যে নিজেকে পন্ডিত মনে করতো। সে একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে অবজ্ঞার ছলে রসুলুল্লাহ্ ﷺ কে আব্দুল্লাহ্‌র ইয়াতীম, হায়দারার (আলী ﷛ এর) শশুর ইত্যাদি নামে সম্মোধন করেছিল। স্পেনের ওলামায়ে কিরাম তাকে হত্যা করার ফতোয়া জারী করেন। [আশ-শিফা]
- ইবনে হাযার হাইতামী ﷬ আল-ই'লাম বিকওয়াতিইল ইসলাম নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, একজন ব্যক্তি ঝগড়ার সময় অন্য আরেক জনকে বলে (أنا عدوك وعدو نبيك) "আমি তোমার শত্রু এবং তোমার নবীর শত্রু।" আলেমরা তাকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তারা কেউ কেউ বলেন, সে সাধারন মুরতাদ ফলে তাকে তওবা করার সুযোগ দেওয়া হবে আর অন্যরা বলেন তাকে তওবা করার সুযোগ দেওয়া হবে না যেহেতু সে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে গালি দিয়েছে।
- হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন ফতোয়া গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ ﷬ সম্পর্কে বর্ণিত আছে তিনি কাজির পদে থাকা কালীন একবার মজলিসের মধ্যে বলেন, রসুলুল্লাহ্ ﷺ লাউ পছন্দ করতেন। একজন লোক তখনই বলে ওঠে "আমি লাউ পছন্দ করি না।" তার কথা শুনে আবু ইউসুফ বলেন, (هاتوني بالنطع والسيف) "আমাকে তরবারী ও বর্ষা দাও"।

মোল্লাহ্ আলী কারী আল-হানাফী ﷬ শারহে ফিকহে আকবারের মধ্যে এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং এর ব্যাখ্যায় বলেছেন রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পছন্দ ও অপছন্দের বিষয় বর্ণিত হওয়ার পরপরই সেটার বিপরীতে নিজের মতামত বর্ণনা করার মাধ্যমে মূলত রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পছন্দের বিষয়ের উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয় তাই এটা কুফরী হিসেবে গণ্য হয়েছে।

অর্থাৎ সাধারন ভাবে লাউ খেতে অপছন্দ করা কুফরী নয় কিন্তু এই ঘটনায় রসুলুল্লাহর ﷺ এর হাদীস বর্ণিত হওয়ার পরপরই সেটার বিপরীতে মত ব্যক্ত করা হয়েছে ফলে এটা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর শানে বেয়াদবী হিসেবে গণ্য হয়েছে একারণে তা কুফরী।

- মোল্লাহ্ আলী কারী رحمه الله শারহে ফিকহে আকবারে এবং ইবনে হাজার হাইতামী কওয়াতিউল ইসলাম নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, যে কেউ পবিত্র কুরআনের উপর পা রাখে [নাউযু বিল্লাহ্] সে কাফির।

- তারা আরো বলেন, যদি কেউ কাউকে কুরআন তেলওয়াত করতে শুনে তা নিয়ে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করে (যেমন বলে, ভেড়ার ডাক) সে কাফির হবে। মোল্লাহ আলী কারী رحمه الله বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলেন, যদি কুরআনের আয়াতের ব্যাপারে এরুপ মন্তব্য করে তবে সে কাফির হবে কিন্তু যদি যে তেলওয়াত করছে তার কণ্ঠ কর্কষ হওয়ার কারণে উক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এ কথা বলা হয় তবে তা কুফরী হবে না। মুয়াজ্জিনের আজান শুনে বিদ্রুপ করার ব্যাপারেও অনুরুপ কথা প্রযোজ্য।

- কুরআনকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া, ময়লা আবর্জনা বা নাপাকী বস্তুর সংস্পর্শে রাখা ইত্যাদি অবমাননাকর কাজ স্পষ্ট কুফরী। রোগ মুক্তির জন্য প্রসাব বা অন্য কোনো নিকৃষ্ট পদার্থ দ্বারা পবিত্র কুরাআনের আয়াত লেখা স্পষ্ট কুফরী যা অনেক সময় জাদুকর বা কবিরাজরা করে থাকে।

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ্, রসুল ও ফেরেশতা ইত্যাদি দ্বীন সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে যে কোনো প্রকার মন্দ বাক্য প্রয়োগ করা কুফরী। এ বিষয়ে উম্মতে মুসলিমার ওলামায়ে কিরামের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে গালি দেওয়ার বিধান ও পরিনাম সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া আস-সারিম আল-মাস্‌লুল আলা শা-তিমির্ রসুল (الصارم المسلول علي شاتم الرسول) নামে পৃথক একটি বই রচনা করেছেন যার অর্থ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে যে ব্যক্তি গালি দেয় তার বিরুদ্ধে খোলা তলোয়ার। মালেকী মাজহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ কাজি ইয়াদও এ বিষয়ে পৃথক একটি বই রচনা করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন, আশ-শিফা ফি তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা (الشفا في تعريف حقوق المصطفي) অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করা। এসব গ্রন্থে এ বিষয়টির ভয়াবহতা সম্পর্কে সুবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সর্বজন বিদিত তাই বর্তমান গ্রন্থে আমরা এ বিষয়ে পৃথক শিরোনামে আলোচনা করতে চাই না। তবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি বিষয়ে আমরা এখানে পৃথক শিরোনামে আলোচনা করবো। এক. সাহাবায়ে কিরামকে গাল-মন্দ করা এবং দুই. কোনো মুসলিমকে কাফির বলে সম্বোধন করা।

♦ *সাহাবায়ে কিরামকে গাল-মন্দ করা।*

সাধারনভাবে উম্মতের ওলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, নবী-রাসুল বা ফেরেস্তা ছাড়া অন্য কাউকে গালি দেওয়া মারাত্মক অপরাধ হলেও কুফরী নয়। তবে কারো কারো মতে সাহাবায়ে কিরামকে গাল-মন্দ করার বিষয়টি ব্যতিক্রম। বিশেষভাবে শাইখাইন (شيخين) তথা আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ কে গালি দেওয়াকে হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন ফিকাহ্গ্রন্থে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বাহ্রুর রায়েকে অন্যান্য বিভিন্ন কিতাব যেমন, আল-খুলাসা, আল-বাজ্জারিয়্যা, আল-জাওহারা ইত্যাদি গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে,

مَنْ سَبَّ الشَّيْخَيْنِ أَوْ طَعَنَ فِيهِمَا كَفَرَ

যদি কেউ আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ কে গালি দেয় বা তাদের নিন্দা করে তবে তাকে কাফির বলা হবে।

আদ্দুররুল মুখতার নামক গ্রন্থে উপরোক্ত মতটি উল্লেখের পর বলা হয়েছে, (وهو المختار للفتوي) অর্থাৎ হানাফী মাজাহবে গ্রহণযোগ্য রায় এটিই।

তবে ইবনে আবেদীন ﷺ রদ্দুল মুহতারে বলেন,

عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ مُشْكِلٌ ، لِمَا فِي الِاخْتِيَارِ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى تَضْلِيلِ أَهْلِ الْبِدَعِ أَجْمَعَ وَتَخْطِئَتِهِمْ وَسَبُّ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَبُغْضُهُ لَا يَكُونُ كُفْرًا ، لَكِنْ يُضَلَّلُ إلَخْ .

হযরত আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ কে যে ব্যক্তি গাল-মন্দ করে তাকে কাফির বলার ফতোয়াটি অস্পষ্ট। যেহেতু আল-ইখতিয়ারে (একটি গ্রন্থ) রয়েছে আলেমরা একমত হয়েছেন যে, যতগুলো বিদয়াতী ফিরকা আছে তারা পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত আর যে ব্যাক্তি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে কাউকে গাল-মন্দ করে বা ঘৃণা করে সে কাফির হবে না তবে গোমরাহ্ হবে।

এরপর তিনি বলেন,

وَذَكَرَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّ الْخَوَارِجَ الَّذِينَ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ وَيُكَفِّرُونَ الصَّحَابَةَ حُكْمُهُمْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ حُكْمُ الْبُغَاةِ

ফাতহুল কাদীরে উল্লেখ আছে যেসব খারেজীরা মুসলিমদের হত্যা করতো তাদের সম্পদ লুন্ঠন করতো এবং সাহাবায়ে কিরামকে কাফির বলতো জমহুর (বেশির ভাগ) ফুকাহায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিসগণ তাদের বিদ্রোহী বলেছেন (কাফির বলেন নি)।

শাফেঈ মাজহাবের ওলামায়ে কিরামের মাঝেও এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। তাদের কেউ কেউ হযরত আবু

বকর ও উমর ﵄ এর সাথে উসমান ﵁ ও আলী ﵁ কে গালি দেওয়াও কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শাফেঈ মাজহাবের আলেম ইবনে হাযার আল-হাইতামী ﵀ আল-ই'লাম বি কওয়াতিইল ইসলাম নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে শাফেঈ মাজহাবের ওলামায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিমত উল্লেখ করার পর ইমাম বাগাবী ﵀ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

من أنكر خلافة أبي بكر يبدع ولا يكفر ، ومن سب أحدا من الصحابة ولم يستحل يفسق

যে কেউ আবু বকর ﵁ এর খিলাফতকে অস্বীকার করে সে বিদয়াতী হবে কাফির নয়। আর যে কেউ কোনো একজন সাহাবাকে গাল-মন্দ করে কিন্তু সে এটা বৈধ মনে না করে তবে সে ফাসিক হবে।

ইবনে হাযার হাইতামী ﵀ আরো উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম সুবাকী ﵀ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবার যে কাউকে গাল-মন্দ করা কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে এটা তার নিজস্ব মত।

মোট কথা, হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবের কিছু আলেমের নিকট প্রথম দুই খলীফা অন্য আরেকদল আলেমের মতে চার খলিফা বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ খলিফার যে কাউকে গাল-মন্দ করা কুফরী। তবে বেশিরভাগ ওলাময়ে দ্বীন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পর অন্য কাউকে গাল-মন্দ করা কুফরী মনে করেন নি। এটিই সঠিক মত। কেননা যদি কোনো সাহাবাকে গাল-মন্দ করা কুফরী হতো তবে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা ﵂ কে যারা অপবাদ দিয়েছিল তারাই প্রথম কাফির হতো। তাছাড়া উমায়্যা শাসন আমলে বিভিন্ন শাসকের নির্দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে আলী ﵁ কে গাল-মন্দ করা হতো। যারা এটা করতো তাদের কেউ কাফির বলেন নি।

♦ ***কোনো মুসিলমকে কাফির বলে সম্বোধন করা।***

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما

যদি কেউ তার ভাইকে বলে হে কাফির তবে যে কোনো একজনের দিকে তা ফিরে আসে। [সহীহ বুখারী]

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে,

وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ

যে কেউ কাউকে কুফরী নামে ডাকে অথবা বলে আল্লাহর শত্রু অথচ উক্ত ব্যাক্তি তেমনটি নয় তবে এ

কথা যে বলল তার দিকেই ফিরে আসবে। [সহীহ মুসলিম]

অর্থাৎ যাকে কাফির বলা হচ্ছে যদি সে কাফির না হয় তবে যে বলছে তার দিকেই কথাটি ফিরে আসবে।

ইমাম আন নাব্বী ﷬ বলেন,

هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصى كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الاسلام

আলেমরা এই হাদীসটিকে অস্পষ্ট অর্থ সম্পন্ন হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন যেহেতু এর প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা সত্যপন্থী ওলামায়ে কিরামের মত হলো কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফির বলা হবে না। যেমন, হত্যা করা বা যিনা করা ইত্যাদি। একইভাবে যদি কেউ তার মুসলিম ভাইকে কাফির বলে (সেও কাফির হবে না)। যদি না সে এর মাধ্যমে ইসলামকেই ভ্রান্ত বলতে চায়।

[শারহে মুসলিম]

ইবনে মুনজির ﷬ বলেন,

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا لرجل من المسلمين: يا يهودي، أو يا نصراني: أن عليه التعزيز ولا حد عليه.

আমি যেসব ওলামায়ে কিরামের মতামত সম্পর্কে জানি তারা সকলে ইজমা করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো মুসিলমকে বলে হে ইয়াহুদী, হে নাসারা তবে তাকে লঘু শাস্তি দেওয়া হবে কোনো দন্ড (হদ) দেওয়া হবে না। [আল-ইশরাফ]

অর্থাৎ তারা কেউই বিষয়টিকে কুফরী মনে করেন নি যেহেতু তেমন মনে করলে তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যার দন্ড (হদ) প্রদান করা হতো।

মোট কথা একজন মুসলিমকে অন্যান্য গালি দেওয়ার মতো তাকে কাফির বলাও একটি মারাত্মক অপরাধ তবে এটা কুফরী নয়। যদি না এর মাধ্যমে ইসলামকেই গাল-মন্দ করা হয়। যেমন, যদি কেউ বলে যারা কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করে বা কা'বাকে ঘিরে তাওয়াফ করে তারা কা'বাকে পূজা করে ফলে তারা কাফির। অথবা বলে ইবলিস আদম ﷵ কে সাজদা না করে ঠিকই করেছে যেহেতু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করা কুফরী ইত্যাদি।

অতএব, যে কোনো মুসলিমকে কাফির বলে সম্বোধন করা যে কোনো অবস্থায় কুফরী হবে উপরের হাদীসটির অর্থ এমন নয়। হাদীসটিতে কুফরী বলতে প্রকৃত কুফরী নয় বরং বিষয়টির ভয়াবহতা বোঝানো হয়েছে। তবে এই হাদীসটি কোনো মুসলিমকে কাফির বলার ভয়ানক পরিনতির প্রমান বহন করে।

অনেকে এই হাদীসটি ভুলভাবে উপস্থাপন করে থাকে। বিভিন্নভাবে ইসলামী বিধি-বিধান অস্বীকার ও অপছন্দ করার কারণে যেসব নামধারী মুসলিমরা কার্যত কাফিরে পরিনত হয়েছে তাদের ব্যাপারে কাফির শব্দ প্রয়োগ করা হলে অনেকে সেটার নিন্দা করেন এবং এই হাদীসটি দলিল হিসেবে পেশ করেন। এটি সঠিক কর্মপন্থা নয়। আবার যারা বিভিন্ন ভ্রান্ত অজুহাতে যাকে তাকে কাফির বলে থাকে তাদের এ কাজও সঠিক নয়। বরং কোনো মুসলিমকে কাফির বলার ক্ষেত্রে বেশ কিছু মূলনীতি মেনে চলতে হবে। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা সে সকল মূলনীতি সম্পর্কে সুবিস্তারে আলোচনা করবো ইনশা-আল্লাহ।

কোনো মুসলিমকে কাফির বলার ব্যাপারে বিস্তারিত কথা হলো এ বিষয়টি কয়েক রকম হতে পারে।

ক. কোনো মুসিলমকে প্রকৃত অর্থেই কাফির ঘোষণা করার জন্য নয় বরং গালি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা তাকে ছোট করার উদ্দেশ্যে কাফির বলা। এ বিষয়টি দু'রকম হতে পারে।

=: যদি উক্ত ব্যক্তি এমন নেককার লোক হয় যাকে কাফির, মুনাফিক, ফাসিক ইত্যাদি শব্দ দ্বারা গালি দেওয়া যায় না তবে এমন ব্যক্তিকে কাফির বলে বা অন্য যে কোনো ভাষায় গালি দেওয়া কবীরা গোনাহ্ হিসেবে গণ্য হবে এবং এই গালি মূলত যে দিচ্ছে তার দিকেই ফিরে আসবে। অর্থাৎ যে গালি দেয় সেই মূলত এই গালি পাওয়ার যোগ্য হবে। তবে সে কাফির হবে না।

=: আর যদি উক্ত ব্যক্তি জালেম ও পাপাচারী হয় তবে তার পাপ কাজকে অধিক কঠোরভাবে উপস্থাপণের উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র বিশেষে তাকে ‘‘ভীষণ পাপিষ্ঠ’’ এই অর্থে কাফির শব্দটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে তাকে প্রকৃত অর্থেই কাফির বলা যাবে না যেহেতু কোনো মুসলিম পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফিরে পরিনত হয় না। জালেম ও পাপী ব্যক্তিকে রূপক অর্থে কাফির বলার বৈধতা পাওয়া যায় ঐ সকল হাদীসে যেখানে বিভিন্ন পাপ কাজকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমরা তার কিছু অংশ পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি ওলামায়ে কিরাম ঐ সকল হাদীসে কুফরী বলতে প্রকৃত অর্থে কুফরী বোঝেন নি। তারা বলেছেন, পাপ কাজের প্রতি অধিক কঠোরতা আরোপ করার জন্য কুফরী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। একইভাবে ঐসকল কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের রূপক অর্থে কাফির বলা যায়। কোনো মজলুম জালেমকে গালি হিসেবে এটা বলতে পারে। যেমন কেউ হয়তো অন্য কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিল বা কারো সন্তান হত্যা করলো ফলে মজলুম তাকে ইয়াহুদী-খৃষ্টান বা বেদ্বীন বলে গালি-গালাজ করলো এতে তার কোনো পাপ হবে না। বরং এই কথাগুলো জালেমের বিপক্ষে বদ-দোয়া হিসেবে আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে। কারণ সে নিজ কর্মের মাধ্যমে এসব গালি-গালাজের যোগ্য হয়েছে। একইভাবে কোনো বক্তা মুসলিমদের সতর্ক করার জন্য উপদেশ হিসেবে এমন বলতে পারেন। যেমন;

তিনি হয়তো বললেন, যে ব্যক্তি সলাত পড়ে না সে কাফির, যে সারা বিশ্বে ভ্রমণ করে কিন্তু হজ্জ করে না যে মুসলিম নয়, যে যাকাত আদায় না করে যাত্রা পালায় অর্থ যোগান দেয় সে মুমিন নয় ইত্যাদি। এখানে তার উদ্দেশ্য হবে এসব কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সতর্ক করা প্রকৃত অর্থেই কাফির ঘোষণা করা নয়।

খ. কোনো মুসিলমকে প্রকৃত অর্থেই কাফির বলা। এ বিষয়টি কয়েকরকম হতে পারে।

=: একজন মুসলিম ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোনো কাজ করলো যাতে ঈমান ভঙ্গ হয়। যেমন মূর্তির উদ্দেশ্যে সাজদা করলো বা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধান ও আইন কানুনকে অযোগ্য ঘোষণা করলো ইত্যাদি। তবে এই ব্যক্তিকে কাফির বলা ফরজ। বরং এই ব্যক্তিকে কাফির না বললে ক্ষেত্র বিশেষে যে কাফির বলবে না তার কাফির হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা যার কাফির হওয়া পবিত্র কুরআন ও রাসুলের সুন্নাত হতে প্রমাণিত এবং উম্মতের ইজমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তাকে কাফির না বলা অর্থ আল্লাহর বিধানকেই অস্বীকার করা যা নিজেই একটি কুফরী।

কাজি ইয়াদ ﵀ বলেন,

ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم

একই কারণে আমরা কাফির বলবো যারা ইসলামের বিপরীত অন্য ধর্ম ও মতের লোকদের কাফির বলে না বা তাদের ব্যাপারে নিরাবতা অবলম্বন করে বা সন্দেহ প্রকাশ করে বা তাদের মতকে সঠিক বলে।

[আশ-শিফা]

যেসব কাজ করলে একজন ব্যক্তি কাফিরে পরিনত হয় স্পষ্টভাবে ঐ সকল কাজে লিপ্ত হওয়ার পরও কোনো ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না এটা সঠিক নয়। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীস ‘‘যে কেউ কোনো মুসিলমকে কাফির বলে সেটা তার দিকেই ফিরে আসে’’ এটা এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেহেতু রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যাকে কাফির বলা হচ্ছে যদি সে কাফির না হয় তাহলে কথাটি যে বলেছে তার দিকে ফিরে আসবে। আর এখানে তো যাকে কাফির বলা হচ্ছে সে প্রকৃতই কাফির।

=: যদি কেউ এমন কোনো বিষয়কে কুফরী মনে করে যেটা আসলে কুফরী নয় এবং তার উপর নির্ভর করে অন্য কোনো মুসলিমকে কাফির বলে তবে তার ব্যাপারটি দুরকম হতে পারে।

এক. সে যে বিষয়টিকে কুফরী মনে করছে উক্ত বিষয়টি কুফরী না হওয়ার ব্যাপারে যদি উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এ বিষয়ে সর্ব শ্রেণীর মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক প্রচার প্রসার থাকে তবে উক্ত ব্যক্তি কাফির হবে কারণ সে কুরআন-হাদীসের আলোকে ও উম্মতের ইজমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এবং

সর্বজন বিদিত একটি বিধানকে অস্বীকার করেছে। আর আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, **এধরনের বিধান অস্বীকার করা কুফরী**।

দুই. যদি উক্ত বিষয়টি কুফরী কিনা সে ব্যাপারে দ্বিমত থাকে বা উক্ত বিষয়টি কুফরী না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হলেও সেটার যথেষ্ট প্রচার-প্রসার না থাকে তবে এমন বিষয়ের উপর নির্ভর করে মুসলিমদের কাফির ঘোষণা করা বিদয়াত বলে গণ্য হবে। যে বিষয়ে দ্বিমত আছে সে বিষয়ের উপর নির্ভর করে কাউকে কাফির বলে ঘোষণা করা বিদয়াত হবে কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি, ওলামায়ে কিরামের নিকট সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হলো, কোনো সন্দেহজনক বিষয়ের উপর নির্ভর করে তারা কোনো মুসলিমকে কাফির বলতেন না। যে কথার বিভিন্ন অর্থ আছে বা যে বিষয়ে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে তার উপর নির্ভর করে তারা কাউকে কাফির ঘোষণা করতেন না। সুতরাং আলেমদের মতামত উপেক্ষা করে এই ধরণের বিষয়ের উপর নির্ভর করে মুসলিমদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা সঠিক পন্থা নয়। যে বিষয়ে আলেমদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে তা কুফরী নয় কিন্তু সেটার প্রচার প্রসার নেই এমন বিষয়ের উপর নির্ভর করে মুসলিমদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা প্রথমটি অপেক্ষা বড় বিদয়াত। কারণ অন্য কাউকে কাফির বলার পূর্বে যিনি কাফির বলছেন তাকে অবশ্যই এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমান জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ ছিল। সামান্য পড়াশোনা করলেই তিনি জানতে পারতেন যে, তার মতের বিপরীতে আলেমদের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু তিনি তা করেন নি।

=: যদি কেউ কোনো মুসলিমের ব্যাপারে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়। এবং এর মাধ্যমে তাকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে। যেমন, সে হয়তো বলল, আমি দেখেছি অমুক মূর্তি পূজা করেছে বা আমি শুনেছি অমুক বলেছে আমি ইয়াহুদী অথচ উক্ত ব্যক্তি একাজ করেনি এবং এ কথা বলেনি তবে এই ব্যক্তি মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হবে কিন্তু কাফির হবে না।

মোল্লা আলী ক্বারী رحمه الله উল্লেখ করেন,

من اعتقد الحرام حلالا أو علي القلب يكفر أما لو قال لحرام هذا حلال لترويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكون كافرا

যদি কেউ কোনো হারামকে হালাল বলে বিশ্বাস করে বা কোনো হালালকে হারাম মনে করে সে কাফির হবে। তবে যে নিজের পন্য বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে হারাম জিনিসকে হালাল বলে চালায় (যেমন, শুকরের মাংস গরু-ছাগলের মাংস হিসেবে বিক্রয় করে) সে কাফির হবে না। [শারহে ফিকহে আকবার]

এই ব্যক্তি কাফির না হওয়ার কারণ সে শুকরে মাংসকে হালাল বলছে না বরং শুকরের মাংসকে গরু বা ছাগলের মাংস হিসেবে বিক্রি করছে এবং বলছে এটা হালাল। অর্থাৎ সে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার

করছে না বরং একটি মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিচ্ছে একারণে সে কাফির হবে না তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হবে।

=: যদি কোনো যোগ্য মুফতী বা কাজি (বিচারক) কোনো একজন ব্যক্তির ব্যাপারে সুক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে, সে কাফির। ফলে তাকে কাফির ফতোয়া দেন কিন্তু বাস্তবে সে কাফির না হয় তবে উক্ত মুফতী বা বিচারক আল্লাহর দরবারে ধরাসায়ী হবেন না। যেহেতু রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

যখন কোনো বিচারক বিচার করে এবং চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় আর সে সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হয় তবে তার জন্য দুটি সওয়াব আর যদি তার সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয় তবে তার জন্য একটি সওয়াব। [বুখারী ও মুসলিম]

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে উমর رضي الله عنه বলেন,

وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ

এখন ওহীর যুগ শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা তোমাদের বাহ্যিক কার্যাবলী অনুযায়ী বিচার করবো।

একজন বিচারক বাইরের বিষয়াবলীর উপর চিন্তা-গবেষণা করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তিনি যতটা সম্ভব নির্ভূল রায় দেওয়ার চেষ্টা করেন। তারপরও যদি তার রায় বাস্তবে ভুল প্রমাণিত হয় তবে তার কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে না। এমন না হলে কোনো বিচারকই আল্লাহর দরবারে মুক্তি পেতেন না। যেহেতু মানুষ মাত্রই ভুলের উর্দ্ধে নয়।

এই মূলনীতির উপর দৃষ্টি রেখে আমরা বলবো যদি উপযুক্ত স্বাক্ষ্য-প্রমাণে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষন করে কোনো মুফতী বা কাজির নিকট স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে অমুক ব্যক্তি কুফরী করেছে তবে তিনি তাকে কাফির ঘোষনা করতে পারেন। যদি বাস্তবে এমন হয় যে, উক্ত ব্যক্তি আসলে কাফির ছিল না তবে আল্লাহ্ উভয়কে ক্ষমা করবেন ইনশা-আল্লাহ। উদাহরনস্বরুপ যদি একজন ব্যক্তি মারা যায় আর বেশ কয়েকজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে বলে সে মারা যাওয়ার পূর্বে বলেছে আমি ইয়াহুদী ধর্মের উপর মৃত্যু বরণ করছি। যারা স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যদি তাদের বাহ্যিক অবস্থা সন্তোষজনক মনে হয় তবে বিচারক তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন ফলে উক্ত মৃত ব্যক্তির জানাজার সলাত হবে না, তাকে মুসিলমদের কবরে দাফন করা হবে না, তার মৃত্যুর পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য কোনো মুসিলম দোয়া করবে না ইত্যাদি। যদি বাস্তবে এমন হয় যে, উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে যারা স্বাক্ষ্য দিয়েছে তারা মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিয়েছে বা তারা তার

কথা বুঝতে ভুল করেছে তাহলে আল্লাহর নিকট উক্ত ব্যক্তি মুসলিম হিসেবেই গণ্য হবে কিন্তু এই বিচারক এ বিষয়ে পাকড়াও হবেন না যেহেতু তিনি গায়েবের বিষয়ে জানেন না। যারা শরীয়তের বিধি-বিধান অকার্যকর করে ফেলতে চায় তারা এসব সন্দেহ-সংশয়কে সামনে উপস্থাপণ করে যে কাউকে কাফির বলা হতে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে সঠিক পন্থা হলো, একজন ব্যক্তির বাহ্যিক আমল-আখলাকের মাধ্যমে যদি কুফরীর পরিচয় ফুটে ওঠে এবং ভিন্ন কোনো সম্ভাবনা ও সুযোগ দেখা না যায় তবে তাকে কাফির ঘোষণা করতে হবে এবং দুনিয়ার যাবতীয় বিধানে তার সাথে কাফিরের মতোই আচরণ করা হবে। এটিই আমাদের কাজ। যদি সে বাস্তবে কাফির না হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ তার প্রতিদান দেবেন কিন্তু আমাদের শাস্তি দেবেন না। যেহেতু আমরা তার ভিতরের খবর রাখি না। বিষয়টি নিয়ে অনেকে গোলমাল সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। তাই বিষয়টি আমাদের স্পষ্ট বুঝে নিতে হবে।

গ. যদি কেউ কোনো মুসিলমকে মুসলিম হওয়ার কারণে বা ইসলাম মেনে চলার কারণে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে যেমন, বলে, যারা ক'বা শরীফে হজ্জ করতে যায় এবং হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে এরা কা'বা ঘর ও হাজরে আসওয়াদের পূজা করে তবে এই ব্যক্তি কাফির হবে সে প্রকৃত কুফরী উদ্দেশ্য করুক বা খেল-তামাশার ছলে এমন বলুক। কারণ ইসলাম নিয়ে তামাশা করাও কুফরী।

⇒ খ) লোক হাসানোর জন্য আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে বিভিন্ন অপ্রীতিকর মন্তব্য ও অসঙ্গত আচরণ করা।

আল্লাহ্ বলেন, (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) "তোমরা আল্লাহর আয়াতকে হাসি-তামাশার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করো না। [সুরা বাকারা/২৩১]

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك به الناس يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض وإنه ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدمه

মানুষ লোক হাসানোর জন্য অনেক সময় এমন কথা বলে যা তাকে (জাহান্নামের ভিতর) আসমান-জমিন সমান দুরুত্বে নিক্ষেপ করে। মানুষের পা যতটা না পথভ্রষ্ট হয় তদাপেক্ষা তার জিহ্বা (কথা) বেশি পথভ্রষ্ট হয়। [মিশকাত, বাইহাকী] (৮০)

হাসি তামাশাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকতে পছন্দ করে এমন ভাড় প্রকৃতির লোকদের একটি বদ অভ্যাস হলো, দুনিয়ার যাবতীয় অনর্থক কথা-বার্তা যোগাড় করে তার মাধ্যমে আড্ডা জমিয়ে রাখা। অন্যান্য অনর্থক কথার ফাঁকে ফাঁকে তারা প্রায়ই দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সম্মানিত বিষয়কে হাসি-তামাশার

---

(৮০) শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে যঈফ বলেছেন [যঈফ তারগীব ওয়াত তারহীব/১৭১৫]।

খোরাক হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। আল্লাহর দ্বীনকে এভাবে হাসি-তামাশার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা স্পষ্ট কুফরী।

- মাজমাউল আনহারে উল্লেখ করা হয়েছে,

  وَمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَضَحِكَ مِنْهُ آخَرُ كَفَرَ الضَّاحِكُ وَالْمُتَكَلِّمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَرُورِيًّا بِأَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ مُضْحِكًا

  যদি কেউ কোনো কুফরী কথা বলে আর সেটা শুনে আরেকজন হাসে তবে যে হাসলো আর যে বললো উভয়ে কাফির হবে। তবে যদি কথাটি এমন হাস্যকর হয় যাতে হাসি চেপে রাখা সম্ভব না হয় তাহলে যে হাসে সে কাফির হবে না।

- মোল্লাহ্ আলী কারী ﵀ উল্লেখ করেন, ‘‘যদি কেউ কাউকে বলে, অত বেশি আমল করো না তাহলে জান্নাত পার হয়ে বাইরে যেয়ে পড়বে। তবে সে কাফির হবে’’।

কারণ সে জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে হাসি-তামাশা করছে। অনুরুপভাবে বর্তমানে কিছু লোক বলে, যদি পাপ করতেই হয় তবে এত বেশি পাপ করতে হবে যাতে আল্লাহ্ ভীষণ রেগে গিয়ে এত জোরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন যে, জাহান্নাম পার হয়ে জান্নাতে গিয়ে পড়বে। এটাও কুফরী হিসেবে গণ্য হবে। একইভাবে যদি কেউ অন্য আরেক জনকে হাসানোর জন্য বলে, তুমি অসুখ হয়ে মরে যাচ্ছে এমন কারো সাথে এক বিছানায় ঘুমাবে না তাহলে আজরাইল ভুলক্রমে তোমার জান কবজ করে নিতে পারে। এই ব্যক্তি কাফির হবে কারণ সে মৃত্যুর ফেরেশতা সম্পর্কে তামাশা করছে।

- শারহে ফিকহে আকবারে বলেন, (من قرأ القرآن علي وجه الهزل كفر) যদি কেউ তামাশার স্বরে (হাস্যকর কণ্ঠে মুখ ভেংচিয়ে বা অন্য কোনোভাবে কৌতুক সৃষ্টি করে) কুরআন তেলাওয়াত করে তবে সে কাফির হবে। তিনি আরো বলেন, যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে লোক হাসানোর জন্য কুরআন তিলোয়াতের সময় কিছু শব্দ রদ-বদল করে যেমন (والنازعات نزعا) ওয়ান-নাঝিয়াতি নাঝয়া’’ এই আয়াতে নাঝয়া এর স্থলে নুঝয়া বলে লোক হাসানোর চেষ্টা করে তবে সে কাফির হবে।

এর সাথে সাদৃশ্য রেখে বলা যায়, যারা হাসি তামাশার ছলে বিভিন্ন দোয়ার মধ্যে কিছু রদ-বদল করে, আরবী-বাংলা মিশ্রিত করে কিছু বাক্য তৈরী করে সেটা যিকির বা দোয়ার মতো করে পাঠ করে তারা কাফির হবে। কারণ তারা আল্লাহর দ্বীনকে হাসি-তামাশার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

মোল্লাহ্ আলী কারী ﵀ শারহে ফিকহে আকবারে এ বিষয়ে কিছু কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

খলীফা মনসুরের দরবারে একজন ব্যক্তি অন্য আরেকজন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে একজন তাতীকে হত্যা করেছিল। পাশ থেকে একজন বলে, তাকে কাফ্ফারা হিসেবে একটি সুন্দরী দাসী মুক্ত করতে হবে। সে তামাশার ছলে এরূপ বলেছিল যেহেতু শরীয়তের প্রকৃত বিধান এটি নয়। খলীফা মনসুর এই ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দেন।

তৈমুর (তৈমুর লঙ নয়) নামক একজন মুসলিম শাসকের ব্যাপারে এমন বর্ণিত আছে যে, একবার তার ভীষণ মন খারাপ ছিল। তখন তাকে হাসানোর জন্য একজন ভাড় একটি গল্প বলতে শুরু করে, সে বলে,

একজন কাজির নিকট একটি লোক এসে (রমজানের রোজা অবস্থায় খেয়ে ফেলেছে এমন বলার পরিবর্তে) বলে অমুক রমজানের রোজা খেয়ে ফেলেছে। তখন কাজি বলে, যদি আরেকজন এসে পাঁচওয়াক্ত নামায খেয়ে নিতো তবে আমরা নামায-রোজা থেকে চিরতরে মুক্তি পেতাম।

এ শুনে উক্ত শাসক রেগে গিয়ে বলেন, তোমরা কি অন্য কোনো হাসির বিষয় খুঁজে পাও না যে দ্বীনী বিষয় নিয়ে কৌতুক করো। পরে তিনি উক্ত ভাড়কে ভীষণভাবে প্রহার করার নির্দেশ দেন ফলে তাকে প্রহার করা হয় এমনকি সে রক্তাক্ত হয়ে যায়।

বর্তমানে দেখা যায়, বইতে লিখিত ও অডিও বা ভিডিও আকারে যেসব কৌতুক পাওয়া যায় তাতে প্রায়ই ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হাসি-তামাশা করা হয়। এসব কৌতুক দেখে বা শুনে মুসলিম যুবকদের অন্তরে ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার সৃষ্টি হয়। অতএব এসব ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সাধারন মুসলিমদের এ ধরণের ঈমান বিধ্বংশী বিষয় থেকে সতর্ক করতে হবে।

⇒ গ) রূপকভাবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে উত্তম অর্থে অনুত্তোম শব্দ প্রয়োগ করা।

কিছু নির্বোধ লোক আছে যারা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে আলোচনার মাঝে আল্লাহ্, রসুল ও দ্বীন সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অসঙ্গত ও অরুচিকর উপমা ও উদাহরণ পেশ করে থাকে। ঐসব উদাহরণের মাধ্যমে তারা যা উদ্দেশ্য করে তা সঠিক হলেও আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে ঐ প্রকার উদাহরণ পেশ করা স্পষ্ট বেয়াদবী ও আল্লাহর দ্বীনকে অবমাননা করা বলেই গণ্য। তাসাউফ পন্থী আবেদ ও আলেমরা (আল্লাহ্ তাদের সংশোধন করুন) এ বিষয়ে সর্বাধিক বেশি স্পর্ধা প্রদর্শন করে থাকে। তারা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ককে বোঝানোর জন্য প্রায়ই প্রেমিক প্রেমিকার উদাহরণ উপস্থাপণ করে থাকে। তারা এসব বিষয়ে অনেক ভয়ংকর কথা-বার্তাও বলে থাকে। একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, একবার হাসান বছরী রাবেয়া বছরীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে রাবেয়া বছরী বলেন, আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে আমি আল্লাহর সাথে বিবাহ করেছি (নাউযু বিল্লাহ্)।

কাহিনীটি শোনানোর পর বক্তা বলেন, এখানে আসলে বিয়ের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকার কথা বোঝানো হচ্ছে।

এ কাহিনীতে বিয়ে শব্দটিকে যত সুন্দর ও উত্তম অর্থে প্রয়োগ করা হোক না কেনো, নিঃসন্দেহে আল্লাহর শানে এমন উদাহরণ উল্লেখ করা স্পষ্ট বেয়াদবী ও অবমাননা হিসেবে গণ্য হবে।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى}

সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ আল্লাহর জন্য। [নাহল/৬০]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

{فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ}

তোমরা আল্লাহর জন্য (অসঙ্গত) উদাহরণ পেশ করো না। [নাহল/৭৪]

মোল্লাহ্ আলী ক্বারী ﵀ ফিকহে আকবারের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ক কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। যেমন যদি কেউ বলে, আমি সূরা ইখলাসের চামড়া ছিলে তাই শুনবো (অর্থাৎ সেটা ভালভাবে মুখস্থ করবো) অথবা বলে তুমি তো সূরা কাউছারের লেজ ধরে পড়ে রয়েছো (অর্থাৎ সারাদিন কেবল সূরা কাউছার তেলাওয়াত করো) তবে সে কাফির হবে।

চিন্তা করলে দেখা যাবে, অজ্ঞ ও মুর্খ লোকেরা এমন বহু কথা বলে থাকে। তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ আল্লাহর কিতাব ও তার দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারে কিরূপ মন্তব্য করা উচিৎ তা জানে না। তারা অনেক সময় উত্তম কথা বলার নিয়তেও খারাপ শব্দ প্রয়োগ করে থাকে। অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতার কারণে অথবা তাদের কথার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের সাথে বেয়াদবী হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে অস্পষ্টতার কারণে তাদের হয়তো কাফির বলা হবে না তবে এসব কথা-বার্তা হতে মুসলিমদের ভীষণভাবে সতর্ক করতে হবে।

২.গ.(২) আল্লাহর দ্বীনকে অসঙ্গত স্থানে প্রয়োগ করা।

উপরে আমরা আলোচনা করলাম আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে খারাপ শব্দ প্রয়োগ করা বা খারাপ আচরণ করা সম্পর্কে। আমরা দেখেছি, বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ, লোক হাসানো বা উপমা ও উদাহরণ হিসেবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে খারাপ শব্দ প্রয়োগ করা বা খারাপ আচরণ করা কুফরী।

এখন আমরা আলোচনা করবো আল্লাহর দ্বীনকে অসঙ্গত স্থানে প্রয়োগ করা সম্পর্কে। এটা তিন ভাগে বিভক্ত।

⇒ ক) আমল বা ইবাদত হিসেবে আল্লাহর দ্বীনকে অসঙ্গত স্থানে প্রয়োগ করা।

মোল্লাহ্ আলী ক্বারী ﵀ শারহে ফিকহে আকবারে বর্ণনা করেন,

من قال عند ابتداء شـرب الخمر أو الزنا أو أكل الحرام باسـم الله كفر وفيه أنه ينبغي أن يكون محمولا علي الحرام المحض المتفق عليه وأن يكون عالما بنسبة التحريم اليه بأن تكون حرمته مما علم من الدين باضـرورة كشرب الخمر.

যদি কেউ মদ পান করার পূর্বে বা জিনা করার পূর্বে বা অন্য যে কোনো হারাম জিসিন ভক্ষণ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলে সে কাফির হবে। তবে উক্ত হারাম বস্তুটি সুস্পষ্ট হারাম হবে যে বিষয়ে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ওটা যে হারাম তা ঐ ব্যক্তির জানা থাকতে হবে। অর্থাৎ সেটা হারাম হওয়ার বিষয়টি ব্যাপক প্রচার প্রসার থাকতে হবে যেমন মাদ পান করা।

তিনি আরো বলেন,

وكذلك إذا قال وقت قمار كعبتين باسم الله كفر

একইভাবে যদি সে জুয়া খেলার গুটি নিক্ষেপের সময় বলে বিসমিল্লাহ্ তবে সে কাফির হবে।

[শারহে ফিকহে আকবার]

ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

أو قال وهو يتعاطى قدح الخمر أو يقدم على الزنى باسم الله تعالى واستخفافاً باسم الله تعالى

যদি কেউ আল্লাহর কালামকে অবমাননার উদ্দেশ্যে মদ পান করার সময় বা জেনা করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলে তবে সে কাফির হবে। [রওদাতুত তালেবনীন]

বর্তমানে গান-বাজনার অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করা বা অশ্লীল ছায়াছবি মুক্তি পাওয়ার সময় দোয়ার অনুষ্ঠান করা একই কারণে কুফরী হিসেবে গণ্য।

যদি কেউ পায়খানায় বসে বা স্ত্রী মিলনের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে তার উপরও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, এখালে কুফরীর বিষয়টি আল্লাহর কালামকে অবমাননা করার সাথে সংশ্লিষ্ট।

অতএব, যদি কোনো ক্ষেত্রে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল্লাহর নামকে অবমাননা করা হচ্ছে না তবে তাকে কাফির বলা হবে না। যেমন, একজন ব্যক্তি সকল জিনিস খাওয়া বা পান করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলে থাকে এটা তার অভ্যাস। একারণে সে মদপানের পূর্বেও অভ্যাসবশত বিসমিল্লাহ্ বলে ফেলল সে কাফির হবে না। উক্ত ব্যক্তি হারাম কাজের সাথে আল্লাহর কালাম উল্লেখের মাধ্যমে কুফরী করছে কিনা সেটা অনুধাবন করার জন্য হানাফী মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে তিনটি শর্ত আরোপ করেছেন,

=: সে যে কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলছে সেটা কেবলমাত্র হারাম কাজ (الحرام المحض) হারাম-হালাল মিশ্রিত কোনো কাজ নয়। উদহারণস্বরুপ কোথাও একটি জনসভার আয়োজন করা হলো যেখানে গান-বাজনাও হবে। যদি উক্ত জনসভার শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তবে তা কুফরী হবে না যেহেতু এখানে জনসভাই মূল উদ্দেশ্য আর গান-বাজনা তার সাথে সংযুক্ত।

=: উক্ত হারাম কাজটি ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকবে না। যেমন মদ, জিনা ইত্যাদি।

=: উক্ত বিষয়টি যে হারাম সে বিষয়ে ব্যাপক প্রচার প্রসার থাকতে হবে।

এই সকল শর্ত উপস্থিত থাকার পরও যদি কেউ এ ধরণের হারাম কাজ আল্লাহর নামে শুরু করে তবে সে কাফির হবে কারণ হয়তো সে এ বিষয়টিকে হারাম মনে করে না অথবা সে জেনে-বুঝে আল্লাহর কালামকে অবমাননা করতে চায়।

⇒ খ) উপমা বা ভাষার প্রয়োগ হিসেবে আল্লাহর দ্বীনকে অসঙ্গত স্থানে প্রয়োগ করা।

প্রতিটি জাতিই নিজেদের মধ্যে কথোপোকথনের সময় বিভিন্ন কবিতা বা ছন্দকে উপমা ও উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। ইসলাম পরবর্তীযুগে পবিত্র কুরআন এবং রসুলের মুখ নিঃসরিত বাণী আরবী সাহিত্যের প্রধান অলংকারে পরিনত হয়। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ}

❮ আমি এই কুরআনে যা ওহী করেছি তাতে সুন্দর সুন্দর কাহিনী বর্ণনা করেছি। ❯ [ইউসুফ/৩]

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (أعطيت جوامع الكلم) ‘‘আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত কথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে’’ [সহীহ্ মুসিলম]

পবিত্র কুরআন ও রাসুলের হাদীসের মধ্যে একদিকে যেমন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে অন্য দিক থেকে প্রতিটি দিক নির্দেশনা অতি চমৎকার ও আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা

করা হয়েছে। একারণে মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসের খন্ডিত অংশ উপমা ও উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করার ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি বিষয়। সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই এটা শুরু হয়।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, আবু মুছা আল আশআরী ﵁ কে মিরাছের একটি মাসয়ালা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি একটি রায় দেন। পরবর্তীতে তার রায় সম্পর্কে ইবনে মাসউদকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলন,

ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ

এমন ফতোয়া দিলে তো আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো এবং কখনও পথ প্রাপ্ত হবো না।

এই কথাটি মূলত সুলা আনয়ামের ৫৬ নং আয়াতের অংশ। ইবনে মাসউদ ﵁ নিজের কথার মধ্যে তা চয়ন করেছেন।

এ বিষয়টির পারিভাষিক নাম ইকতিবাস (اقتباس) বা চয়ন করা।

ইমাম সুয়ূতী ﵀ আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআনে এ সম্পর্কে পৃথক একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মালেকী মাযহাবের ওলাময়ে কিরাম এ ব্যাপারে ব্যাপক কঠোরতা করেছেন বলে প্রশিদ্ধ আছে। তবে আমাদের মাজহাবের (শাফেঈ মাযহাব) কেউ এটাকে নিন্দা করেনি।

এরপর তিনি ইজ্জুদ্দিন আব্দুস্ সালাম হতে বিষয়টি বৈধ হওয়ার পক্ষে মত উল্লেখ করেছেন। মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ আবুবকর ইবনে আরবী ﵀ হতে কবিতা ছাড়া অন্যান্য স্থানে এমন করার বৈধতা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, মালেকী মাজহাবের আরেক ফকীহ্ কাজি ইয়াদ ﵀ নিজেই আশ-শিফা নামক কিতাবের ভূমিকাতে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতাংশ চয়ন করেছেন।

এরপর তিনি ইবনে হুজ্জা নামক একজন আলেম হতে ইক্তিবাস (اقتباس) বা চয়ন করা সম্পর্কে বিস্তারিত মত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

الاقتباس ثلاثة أقسام مقبول ومباح ومردود فالأول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود والثاني ما كان في القول والرسائل والقصص والثالث على ضربين أحدهما ما نسبه الله إلى نفسه ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه كما قيل عن أحد بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والآخر تضمين آية في معنى هزل ونعوذ بالله

নিজের কথার মধ্যে পবিত্র কুরআন হতে কোনো আয়াত বা আয়াতাংশ চয়ন করা তিন রকম হতে পারে। (১) উত্তম (২) বৈধ (৩) অবৈধ।

প্রথম প্রকার হলো দ্বীনী বিষয়ে ওয়াজ-নসীহত করার সময় পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীস হতে চয়ন

করা।

দ্বিতীয় প্রকার হলো, সাধারন দুনিয়াবী কথা-বার্তা ও চিঠি-পত্রে বা গল্প-কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে এমন করা।

তৃতীয় প্রকারটি দুরকম হতে পারে;

এক: আল্লাহ্ নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন সেটা যদি কেউ নিজের কথা হিসেবে বর্ণনা করে।

এ বিষয়টির উদাহরণ হিসেবে তিনি একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। কোনো একজন ব্যক্তি তার কর্মচারীদের প্রসঙ্গে বলে, (ان الينا ايابهم وان علينا حسـابهم) “নিশ্চয় আমার দিকেই তারা প্রত্যাবর্তন করবে এবং আমার নিকটই তাদের হিসাব হবে”। পবিত্র কুরআনে এই কথাটি আল্লাহ ﷻ নিজের বান্দাদের হিসাব সম্পর্কে বলেছেন সেই কথাটিকে এই ব্যাক্তি নিচের কর্মচারীদের ব্যাপারে প্রয়োগ করেছে। এটা অবশ্যই অসঙ্গত কাজ।

শারহে ফিকহে আকবারের মধ্যে মোল্লাহ্ আলী কারী রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে আরো বেশ কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। যেমন যদি কেউ কিছু লোককে ডেকে একত্রিত করে আর বলে, (جمعناهم جمعا) “আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করলাম”। হানাফী মাযহাবের বেশ কিছু ফতোয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে এই ব্যক্তি কাফির হবে।

এখানে আরবীতে যে শব্দদুটি উল্লেখ করা হয়েছে তা সরাসরি কুরআন হতে গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ হাশরের ময়দান সম্পর্কে এ কথা বলেছেন আর এই ব্যক্তি সেটা নিজের উপর প্রয়োগ করছে।

দুই: অবৈধ চয়ন করার আরেকটি প্রকার হলো, হাসি তামাশার ছলে পবিত্র কুরআনকে উপস্থাপণ করা। [নাউযু বিল্লাহ্]

এই বিশ্লষণটি উল্লেখ করার পর ইমাম সুয়ুতী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

قلت وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول

এই বিশ্লেষণটি চমৎকার! আমি এই মতই পোষণ করি। [আল-ইতকান]

যে কেউ চিন্তা করলে এটা বুঝতে পারবে যে, এ বিষয়ে ইমাম সুয়ূতী ঠিক কথাই বলেছেন।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, নিজের কথার মধ্যে পবিত্র কুরআন বা রাসুলের হাদীস হতে চয়ন করা দোষের কিছু নয় যতক্ষণ না আল্লাহ্ বা রাসুলের জন্য বিশেষভাবে বলা হয়েছে এমন কোনো কথা নিজের উপর প্রয়োগ করা হয় বা নিকৃষ্ট স্থানে কুরআন হাদীস হতে উপমা

উল্লেখ করে কুরআন হাদীসকে ছোট করা হয়।

যেমন, সিনেমাতে যদি নায়ক গানের ছলে নায়িকার সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে, নুরুন আল নূর (অর্থাৎ আলোর উপর আলো) তবে এটা কুফরী হবে যেহেতু এখানে জেনা ব্যাভিচার ও প্রেম-প্রীতির মধ্যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

⇒ গ) কুরআন হাদীস হতে তামাশার ছলে বিকৃত দলিল-প্রমাণ উপস্থাপ করা।

আল্লাহ্ ﷻ সমগ্র মানবজাতিকে পথ নির্দেশ করার জন্য পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং সে কিতাব মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য রসুল প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআন এবং রাসুলের হাদীসে রয়েছে মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। একারণে মুসলিমরা প্রতিটি বিষয়ে কুরআন-হাদীস হতে দলিল পেশ করে থাকে বা কমপক্ষে দলিল অনুসন্ধান করে। এ বিষয়টির সাথে সাদৃশ্য রেখে অনেক সময় কিছু অকর্মন্য লোক খেল তামাশার ছলে বিভিন্ন অসঙ্গত ও ভ্রষ্ট মতামতের স্বপক্ষে বিকৃতভাবে শরীয়তের দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করে থাকে। মোল্লা আলী কারী ﵀ শারহে ফিকহে আকবারের মধ্যে এ বিষয়ে বহু উদাহরণ পেশ করেছেন। তার কিছু অংশ আমরা নিচে উল্লেখ করছি।

যদি কেউ বলে, আমি জামাতে সলাত পড়বো না বরং একাকী পড়বো কারণ আল্লাহ্ বলেছেন, ইন্নাস্ সলাতা তান্‌হা (إن الصـلاة تنها)। এই আয়াতে তান্‌হা (تنها) অর্থ বিরত রাখে। অর্থাৎ সলাত খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু এই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তা নয়। ফার্সী ভাষায় 'তানহা' শব্দের অর্থ 'একাকী'। উক্ত ব্যক্তি আয়াতে এই অর্থ উদ্দেশ্য করেছে। অর্থাৎ সলাত পড়তে হবে একাকী। এভাবে সে আল্লাহর আয়াতকে তামাশার ছলে বিকৃত অর্থ করার কারণে কাফির হবে।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

আমি মনে করি আশুরার দিন সওম পালন করলে তার পূর্বের এক বছরের পাপ মাফ হয়ে যায়।

[সহীহ্ মুসলিম]

যদি কেউ বলে, আমি আশুরার দিন রোজা রাখবো কিন্তু সারা বছর নামায পড়বো না কেননা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আশুরার দিন রোজা রাখলে এক বছরের পাপ মাফ হয়ে যায়। তবে সে কাফির হবে যেহেতু সে হাদীসটি তামাশর ছলে বিকৃত স্থানে ব্যবহার করছে।

একইভাবে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, ভাল-মন্দ সব আল্লাহর তাকদীর

অনুযায়ী হয়। কে জান্নাতী কে জাহান্নামী সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব হতেই লিখিত হয়ে গিয়েছে। এখন যদি কেউ বলে আমি কোনো আমল করবো না যেহেতু সবই পূর্ব হতে লিখিত হয়ে গেছে তবে সে কাফির হবে। কারণ, সে এই সকল দলীল প্রমাণের সঠিক বুঝ গ্রহণ না করে বিকৃত অর্থ গ্রহণ করেছে।

এ বিষয়ে আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে যা এখানে সুবিস্তারে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

২.গ.(৩) আল্লাহর দ্বীনকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করা।

উপরে আমরা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোনো শব্দ প্রয়োগ করা বা কোনো অসঙ্গত স্থানে আল্লাহর দ্বীনকে প্রয়োগ করার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের অবমাননা করা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এছাড়া আরো অনেক পন্থায় আল্লাহর দ্বীনকে অবমাননা করা হয়ে থাকে। নিম্নে সেসব ব্যাপারে তিনটি পৃথক শিরোনামে আলোচনা করা হলো।

⇒ ক) আল্লাহর দ্বীনের সাথে অন্য কিছুকে অসঙ্গতভাবে তুলনা করা।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ স্পষ্ট বলেছেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং অন্য সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই। [বুখারী ও মুসলিম]

সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ ﷻ পিতা, ভ্রাতা, সন্তান, ব্যাবসা, বাসস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করার পর বলেছেন, যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, রসুল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা অপেক্ষা এইসব দুনিয়াবী বিষয় অধিক প্রিয় হয় তবে আল্লাহর শাস্তির জন্য অপেক্ষা কর।

এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে আল্লাহ্, রসুল ও আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ ভালবাসা থাকা ঈমানের জন্য শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো মুমিন এসবের বিপরীতে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রাধান্য দিতে পারে না। যদি কেউ স্পষ্টভাবে দুনিয়াবী কোনো বিষয়কে দ্বীনী বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়ার দাবী করে এবং এভাবে আল্লাহর দ্বীনকে ছোট করে তবে সে কাফির হবে।

ইমাম নাব্বী رحمه الله রাওদাতুত তালিবীন এ গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

وقال قصعة ثريد خير من العلم كفر

যদি কেউ বলে, এক বাটি পায়েস ইলম অর্জন অপেক্ষা উত্তম তবে সে কাফির হবে।

মোল্লাহ্ আলী ক্বারী শারহে ফিকহে আকবারের মধ্যে বর্ণনা করেন, যদি কেউ বলে "লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্"। আর অন্য একজন বলে, এ দিয়ে কি হয়? এতে কি ক্ষিদে মেটে? তবে সে কাফির হবে।

যদি কেউ বলে, আল্লাহ আমাকে দুনিয়ার কোনো সম্পদ ও নেয়ামত দেন নি তাহলে আমাকে সৃষ্টি করলেন কেন? সে কাফির হবে। কারণ সে মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য তথা আল্লাহর ইবাদত করার বিষয়টি অস্বীকার করছে। এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাশকেই একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করছে যা স্পষ্ট নাস্তিকতা।

যদি কেউ বলে, তোমাকে ছাড়া আমি জান্নাতেও যেতে প্রস্তুত নয়, বা বলে আল্লাহ্ যদি অমুক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করান তবে আমি জান্নাতে প্রবেশ করবো না তবে সে কাফির হবে। কারণ সে আল্লাহ্ ﷻ এর নেয়ামতকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে। একইভাবে যদি কেউ বলে, তোমার সাথে আমি জাহান্নামে যেতেও প্রস্তুত আছি তবে সে কাফির হবে কারণ সে আল্লাহর শাস্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে।

যদি কেউ বলে, আমি দুনিয়াতে রুটি-রুজি চাই এর বিনিময়ে আখিরাতে যা হবার হবে। সে কাফির হবে। একইভাবে যদি কেউ অন্য কাউকে বলে তুমি দুনিয়া পরিত্যাগ করো আখিরাত পাবে আর সে বলে, আমি বাকীর বিনিময়ে নগদ পরিত্যাগ করবো না তবে এই ব্যক্তি কাফির হবে। কারণ সে আখিরাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে।

যদি কেউ তার স্ত্রীকে বা অন্য কাউকে বলে আমি তোমাকে আল্লাহর চেয়ে বা আল্লাহর রাসুলের চেয়ে বেশি ভালবাসী তবে সে কাফির হবে কারণ এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তার রাসুলকে অবমাননা করা হয়।

তবে যদি সে আফসোসের সূরে বলে আমাদের ঈমানের অবস্থা এতটাই দূর্বল যে আমরা আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের আল্লাহ্-রাসুলের তুলনায় অধিক ভালবাসি তাহলে কুফরী হবে না বরং এটা ঈমানী চেতনা ও সচেতনতা হিসেবে গণ্য হবে।

যদি কেউ এমন কোনো দাবী করে যাতে ঔদ্ধত্ব প্রকাশ পায় এবং আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয়কে ছোট করা হয় তবে তা কুফরী হবে।

কাজি ইয়াদ رحمه الله বিভিন্ন প্রকার কুফরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

أو أنه يصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين فهؤلاء كلهم كفار

যদি কেউ দাবী করে, সে আকাশে উঠে যায়, জান্নাতে প্রবেশ করে জান্নাতের ফল খায় এবং হুরদের

আলিঙ্গন করে তবে এরা সকলে কাফির হবে। [আশ-শিফা]

এই ব্যক্তি কাফির হওয়ার কারণ সে মৃত্যু ও হাশর-নাশরের পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করা এবং তার নেয়ামত উপভোগ করার দাবী করে ঔদ্ধত্বতা প্রকাশ করেছে। সেই সাথে জান্নাতের মর্যাদা ও সম্মানকে সে খাটো করেছে।

যারা ওলী আওলিয়াদের কারামতের ব্যাপারে বাড়া-বাড়ি করে তারা অনেক সময় কারামতের নামে এমনসব ঘটনা দাবী করে যা ক্ষেত্র বিশেষে নবী-রাসুলদের জন্য সংরক্ষিত মু'জিযার সমপর্যায়ের হয়ে যায়। এভাবে নবী-রাসুলদের মর্যাদাকে খাটো করা হয়। এ ধরণের দাবী কুফরী হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরুপ, যদি কেউ আল্লাহর সাথে সরসরি কথা বলার দাবী করে যেভাবে তিনি মুসা عليه السلام এর সাথে কথা বলেছেন বা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর মতো মিরাজে গমণ করার দাবী করে তবে জান্নাতে প্রবেশ করার দাবী যে করে তার মতই এই ব্যক্তিও কাফির হবে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

⇒ খ) কোনো দ্বীনী বিষয়কে অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করা।

যদি কেউ বলে ইসলামের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই বা আল্লাহ-রাসুলের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই তবে সে কাফির হবে।

যদি কেউ বলে, আমার সাথে হাশরের কি সম্পর্ক বা সে বলে, আমি হাশরের ময়দানকে বা কিয়ামতকে ভয় পায় না তবে সে কাফির হবে।

যদি কেউ বলে, আল্লাহ্ জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারেন! সে কাফির হবে কারণ সে জাহান্নামের শাস্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে।

ইবনে হাযার হাইতামী رحمه الله বলেন,

منها لو قال لا أخاف القيامة كفر كذا أقراه ومحله إن قصد الاستهزاء أما إذا أطلق أو لمح إلي سعة عفو الله تعالي ورحمته وقوة رجائه فلا يكفر

যদি কেউ বলে, আমি কিয়ামতকে ভয় পায় না সে কাফির হবে। ইমাম নাব্বী رحمه الله ও ইমাম রাফেঈ رحمه الله এটা উল্লেখ করেছেন এবং সমর্থন করেছেন তবে এটা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন কিয়ামত দিবসকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার উদ্দেশ্যে এমনটি বলা হয়। আর যখন আল্লাহর অসীম ক্ষমা ও দয়ার দিকে ইঙ্গিত করে এটা বলা হয় বা যে ব্যক্তি একথা বলছে সে আল্লাহর প্রতি তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে একথা বলে তবে তা কুফরী হবে না। [আল-ই'লাম]

যদি কেউ ঔদ্ধত্বের সাথে বলে (لا أصلي) "আমি নামায পড়বো না" বা আমি কখনও নামায পড়বো না

তবে সে কাফির হবে।

যদি কেউ বলে কিবলা পূর্ব দিকে হলে আমি সেদিকে ফিরে নামায পড়তাম না। বা যদি আল্লাহ্ আমাকে অমুক আদেশ করতেন তবে আমি তা করতাম না তবে সে কাফির হবে।

যদি কেউ অন্য কারো সাথে ঝগড়ার সময় বলে, যদি ফেরেশতারা বা নবীরা স্বাক্ষ্য দেয় তবু এমন কথা আমি মেনে নেবো না বা এমন কথা মেনে নেওয়া যায় না তবে সে কাফির হবে।

মোল্লাহ্ আলী কারী ﵀ বলেন, যদি কেউ (স্ত্রী তালাক হয়ে যাওয়ার পর) বলে, (لا أعرف الطلاق والملاق ينبغي أن تكون والدة الولد في البيت) "আমি তালাক-মালাক বুঝি না বউ ঘরে থাকবে এটাই জানি।" এই ব্যক্তি কাফির হবে। [শারহে ফিকহে আকবার]

মোল্লাহ্ আলী কারী ও ইবনে হাযার হাইতামী এ বিষয়ে আরো অনেক উদাহরণ পেশ করেছেন। যার সারমর্ম হলো, ঔদ্ধত্বের সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয় পরিত্যাগ করা বা পরিত্যাগ করার ঘোষণা দেওয়া কুফরী। আল্লাহ্ আমাদের এ ধরনের দূর্মতি হতে রক্ষা করুন, আমীন।

⇒ গ) ক্ষেত্র বিশেষে পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে দ্বীনকে অবজ্ঞা করা।

পূর্বে আমরা বলেছি, আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের সকল ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমতে যে কোনো প্রকার পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে না। যতক্ষণ না সে শিরক-কুফরে লিপ্ত হয়। তবে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া অনেক সময় আল্লাহর দ্বীনকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করা বলে গণ্য হতে পারে সেক্ষেত্রে তা কুফরী বলে গণ্য হবে যেহেতু আল্লাহর দ্বীনকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করা কুফরী যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি।

এ বিষয়ের উদাহরণ স্বরুপ পূর্বে উল্লেখিত কাজি ইয়াদ ﵀ এর কথাটি পুনরায় উপস্থাপণ করা যায়। তিনি বলেন,

أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبيا أو حاربه فهو كافر بإجماع

যে কেউ নবী-রাসুলদের অবমাননা করে এবং তাদের ছোট করে বা তাদের কষ্ট দেয় অথবা কোনো নবীকে হত্যা করে বা তার সাথে যুদ্ধ করে সে কাফির হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [আশ-শিফা]

এখানে তিনি কোনো নবীকে হত্যা করা বা তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কুফরী হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মার ঐক্যমত উল্লেখ করেছেন। হত্যা একটি পাপ কিন্তু কোনো নবীকে হত্যা করা কেবল পাপ নয়

বরং আল্লাহর বিধানকে অবমাননা করা হিসেবে গণ্য ফলে তা কুফরী। কোনো নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বিধানও এটাই।

কেউ কেউ এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন যেগুলো তারা কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তবে ঐ সকল বিষয়ে দ্বীনকে অবমাননা করা হচ্ছে কিনা সেটা স্পষ্ট না হওয়ার কারণে বেশিরভাগ আলেমের নিকট তা কুফরী হিসেবে গণ্য নয়।

ইবলীস আদম ﷺ কে সাজদা না করার মাধ্যমে আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারণে কাফির হলো অথচ আমরা জানি আল্লাহর বিধান অমান্য করলে কেউ কাফির হয় না এর ব্যাখ্যায় হাম্বালী মাজহাবের বিভিন্ন ফিকাহ্ গ্রন্থে বর্ণিত আছে,

وَقِيلَ : كَفَرَ لِمُخَالَفَةِ الْأَمْرِ الشِّفَاهِيِّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَاطَبَهُ بِذَلِكَ

কেউ কেউ বলেছেন, সে (ইবলিস) আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি নির্দেশকে অস্বীকার করার কারণে কাফির হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ্ তার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। [আল-ইনসাফ, আল-ইকনা প্রভৃতি]

তবে বেশিরভাগ আলেমের নিকট এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। এই মতটি উল্লেখের পর আল-ইকনার লেখক শায়েখ বুরহানুদ্দিন থেকে বর্ণনা করেন,

وَقَالَ جُمْهُورُ النَّاسِ كَفَرَ إِبْلِيسُ لِأَنَّهُ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَعَانَدَ ، وَطَعَنَ وَأَصَرَّ ، وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي تَمَرُّدِهِ وَاسْتَدَلَّ بِأَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ، فَكَأَنَّهُ تَرَكَ السُّجُودَ لِآدَمَ تَسْفِيهًا لِأَمْرِهِ تَعَالَى وَحِكْمَتِهِ

তবে বেশিরভাগ আলেম বলেছেন ইবলিস কাফির হয়েছিল কারণ সে অহংকার করেছে এবং একগুয়েমী প্রদর্শন করেছে, সে আল্লাহর বিধানকে ক্রুটিপূর্ণ আখ্যয়িত করেছে ও নিজের মতের উপর দৃঢ় থেকেছে। সে মনে করেছে এ বিষয়ে ঔদ্ধত্ব প্রদর্শন করে সে ঠিকই করেছে। এর স্বপক্ষে দলিল হিসেবে সে বলেছে "আমি তো আদম অপেক্ষা উত্তম" এর অর্থ হলো সে আদম ﷺ কে সাজদা করেনি কারণ এ বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশকে সে যৌক্তিক মনে করে নি। [আল-ইকনা]

এই বিশ্লেষণটি চমৎকার। অর্থাৎ ইবলিস কাফির হয়েছিল আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ অমান্য করার কারণে নয় বরং আল্লাহর বিধানকে অযৌক্তিক সাব্যস্ত করার জন্য। এর সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ সাজদা না করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করেন "তুমি কেন সাজদা করো নি?" যখন সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম আপনি আমাকে আগুণ থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে"। এই যুক্তি প্রদর্শন করার পর আল্লাহ তাকে কাফির হিসেবে ঘোষণা দেন এবং জান্নাত থেকে বের করে দেন। সুতরাং কেবল সাজদা না করার কারণেই সে কাফির হয়নি বরং আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে যুক্তি প্রদর্শন করার মাধ্যমে আল্লাহর বিধানকে অযৌক্তিক সাব্যস্ত করার কারণে সে কাফির হয়েছে। এ বিষয়ে আরেকটি প্রমাণ হলো,

আল্লাহ্ ﷻ ইবলিসকে যেভাবে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিলেন একই পন্থায় আদম ﷺ কে একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল আস্বাদন করতে নিষেধ করেন। আদম ﷺ সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন কিন্তু এটা কুফরী হয় নি। এতে প্রমাণিত হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ নির্দেশ অমান্য করা হলেই কুফরী হবে এমন নয়।

অন্য আরেকটি মাসয়ালাতে হাম্বালী মাজহাবের কিছু আলেম একই পন্থা অবলম্বন করেছেন। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের গন্ডির মধ্যে অবস্থান করে মদ পান করা বা শুকরের মাংস ভক্ষন করা ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে তামাশা করা হয় এমন মনে করে এ বিষয়টিকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হাম্বালী মাযহাবের বিভিন্ন ফিকাহ্ গ্রন্থে কি করলে একজন মুসলিম কাফির হয়ে যায় সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

أَوْ أَتَى بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ صَرِيحٍ فِي الِاسْتِهْزَاءِ بِالدِّينِ . وَقِيلَ : أَوْ كَذَبَ عَلَى نَبِيٍّ ، أَوْ أَصَرَّ فِي دَارِنَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ

যদি এমন কোনো কথা বা কাজ করে যাতে আল্লাহর দ্বীন নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় (তবে সে কাফির হবে)। কেউ কেউ বলেছেন যদি কেউ ইসলামী রাষ্ট্রে বসে মদ পান করে বা শুকরের মাংস ভক্ষন করে (সে কাফির হবে) যদিও সে, ওটা হালাল মনে না করে। [আল-ইনসাফ, আল-ফুরু’ ইত্যাদি]

বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরামের নিকট এবং হাম্বালী মাজহাবের অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের নিকট এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। তারা এধরণের কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে পাপী হিসেবেই আখ্যায়িত করেছেন কাফির নয়। যেহেতু এখানে ইসলামী বিধি-বিধানকে অবজ্ঞা করার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

♦ *সলাত ত্যাগকারীর বিধান*

এই প্রকৃতির আরেকটি মাসয়ালা হলো, সলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলা। যখন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ছিল, রাষ্ট্রীয়ভাবে সলাত কায়েম করা হতো। ছোট বড় সকলে সলাত পড়তে অভ্যস্ত ছিল। সলাত ত্যাগকারীকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে বিভিন্নরকম লাঞ্চনা-গঞ্জনা ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হতো। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে সলাত ত্যাগকারীকে হত্যা করার বিধান ছিল। সেই অবস্থায় সলাত পরিত্যাগ করা অর্থ আল্লাহর দ্বীনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করা এমন মনে করে তৎসময়ের কিছু কিছু ওলামায়ে দ্বীন সালাত পরিত্যাগ কারীকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিশেষ করে যে ব্যক্তিকে সলাত ত্যাগ করার অপরাধে পাকড়াও করা হয় এবং বারবার সতর্ক করে বলা হয় তুমি সলাত না পড়লে তোমাকে হত্যা করা হবে তবু সে সলাত পরিত্যাগ করার ব্যাপারে অনড় থাকে এবং নিহত হয় এই ব্যক্তি সম্পর্কে তারা বলেন যদি তার অন্তরে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ থাকতো তবে হত্যার মোকাবেলায় সালাত পরিত্যাগ করার ব্যাপারে জিদ ধরতো না। তারা এই ব্যক্তিকে কাফির বলেছেন। এটি ইমাম

আহমদ ইবনে হাম্বল এর একটি মত এবং তার মাজাহাবের একদল আলেমের মত তবে আহমাদ ইবনে হাম্বল হতে অন্য আরেকটি বর্ণনা এবং হাম্বালী মাজহাবের অন্য আরেক দল ওলামায়ে কিরাম সহ অন্যান্য সকল ওলাময়ে কিরামের মতে অন্যান্য মাসয়ালার মতো এ বিষয়টিও কুফরী নয়। তারা সলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলেন নি যতক্ষণ না সে সলাতের ফারজিয়্যাত অস্বীকার করে বা অন্য কোনো পন্থায় স্পষ্টভাবে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রোদ্ধা প্রদর্শন করে। কোনো ব্যাখ্যামূলক কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে অবমাননা ও অশ্রোদ্ধা করা হচ্ছে এমন ধরে নিয়ে তারা কাউকে কাফির বলেন নি।

ইমাম নাব্বী ﵀ এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মতামত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন,

وأما تارك الصلاة فان كان منكرا لوجوبها فهو كافر باجماع المسلمين خارج من ملة الاسلام الا ان يكون قريب عهد بالاسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه وان كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فان تاب والا قتلناه حدا كالزانى المحصن ولكنه يقتل بالسيف وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو احدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله وبه قال عبد الله بن المبارك واسحاق بن راهوية وهو وجه لبعض اصحاب الشافعي رضوان الله عليه وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعي رحمهما الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى

যদি সলাত ত্যাগ কারী সলাতের ফরজিয়াত অস্বীকরা করে তবে সে কাফির এবং ইসলাম হতে বহির্ভূত। এ ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। তবে যদি সে নও মুসলিম হয় এবং এমন হয় যে সে মুসলিমদের সাথে এতটুকু সময় মেলামেশা করতে পারেনি যাতে তার নিকট সলাত ফরজ হওয়ার বিষয়টি পৌছায় (তাহলে সে কাফির হবে না)। আর যদি কেউ অলসতা করে সলাত ত্যাগ করে যেমনটি বর্তমানে বহু সংখ্যক লোক করে থাকে তবে তার ব্যাপারে আলেমরা ইখতিলাফ করেছেন। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ এবং পূর্বের ও পরের বেশিরভাগ আলেম বলেছেন সে কাফির হবে না বরং ফাসিক হবে তাকে আমরা তওবা করতে বলব। যদি সে তওবা করে তবে ভাল তওবা না করলে আমরা তাকে হদ হিসাবে হত্যা করবো যেমন হত্যা করা হয় বিবাহিত জেনাকারীকে (অর্থাৎ মুসলিম হওয়া সত্বেও তাকে হত্যা করা হয়) তবে তাকে হত্যা করা হবে তরবারী দিয়ে। পুর্ববর্তীদের কেউ কেউ বলেছেন তাকে কাফির বলা হবে এটা আলী ﵁ এর মত। ইমাম আহমদের দুটি মতের এটি একটি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইসহাক ইবনে রহাওয়াই এবং শাফেঈ মাযহাবের কারো কারো এই মত। আবু হানীফা, কুফার একদল আলেম এবং শাফেঈ মাযহাবের আল মুযনী বলেছেন তাকে কাফিরও বলা হবে না হত্যাও করা হবে না। তাকে তাজীর হিসাবে শাস্তি দেওয়া হবে এবং আটকিয়ে রাখা হবে যতক্ষন না সে সলাত আদায় করে।

[শারহে মুসলিম]

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, সলাত ত্যাগকারীকে যারা কাফির বলেছেন তারা যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে

সলাত ত্যাগ করা কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন প্রকৃতপক্ষেই সে অবস্থাতে সলাত ত্যাগ করা কুফরী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলেই তারা তা বলেছেন। যেহেতু রাষ্ট্রীয়ভাবে ও সামাজিকভাবে সলাত কায়েম রয়েছে এমন একটি পরিবেশে নানাবিধ লাঞ্চনা-গঞ্জনা সহ্য করে এবং হত্যা, জেল-জরিমানা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার শাস্তির সম্ভাবনা উপেক্ষা করে যারা সলাত পরিত্যাগ করতে থাকে তারা যে আসলে দ্বীনকে অশ্রোদ্ধা ও অসম্মান করে এমন আশঙ্কা করা অযৌক্তিক বলা যেতে পারে না। বিশেষত যাকে সলাত পরিত্যাগ করার অপরাধে হত্যা করা হয় তবু সে সলাত আদায় করে না তার ব্যাপারে এই আশঙ্কা আরও তীব্র। এ কারণেই পূর্ববর্তী ওলামেয়ে কিরামের একটি অংশ তাদের সমসাময়িক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সলাত ত্যাগকারীকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু সেই অবস্থাতেও বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। যেহেতু তারা এ বিষয়টিতে নিশ্চিতভাবে ইসলামকে অশ্রোদ্ধা ও অসম্মান করা হচ্ছে এমন মনে করেন নি। বরং অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এমন পাপে লিপ্ত হওয়া সম্ভব বলে তারা মনে করেছেন। একারণে তারা ঐ অবস্থাতেও সলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলেন নি।

এই হচ্ছে ওলামায়ে কিরামের মতামত। কিন্তু তাদের ব্যাপারে অবাক না হয়ে পারি না যারা এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতে সলাত ত্যাগকারীকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করছে যে পরিবেশে সলাত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। এখানে সলাত ত্যাগ করার কারণে নয় বরং সলাত পড়া বা মুখে দাড়ি রাখার কারণে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হতে হয়। যার অন্তরে দ্বীনের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও সীমাহীন দরদ উপস্থিত আছে তার পক্ষেও ইচ্ছা ও অনুভুতি থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন শয়তানী ষড়যন্ত্রের ভয়াল থাবা হতে মুক্ত হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। সলাত সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হলে তাদের অন্তর বিগলিত হয় ক্ষেত্রবিশেষে দু-চোখ অশ্রুশিক্ত হয়। সলাত পড়ানোর জন্য এদের হত্যার ভয় দেখানোর প্রয়োজন নেই বরং তাদের অন্তর সালাতের দিকে ঝুঁকেই রয়েছে কেবল একটু সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হলেই তারা সলাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তো। একারণে দেখা যায় রমজান মাস, শবে কদর ইত্যাদি বিভিন্ন উপলক্ষে তারা কাতারে কাতারে মসজিদে হাজির হয়। যারা এই প্রকৃতির লোকদের কাফির বলে তারা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে লিপ্ত।

ওলামায়ে কিরামের মতামতের আলোকে আমরা তাদের এই ভ্রান্তি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবো ইনশা-আল্লাহ।

যারা সলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলে তারা নিজেদের স্বপক্ষে বেশ কিছু দলিল-প্রমাণ উত্থাপন করে থাকে। তার মধ্যে সর্বাধিক স্পষ্ট ও উল্লেখযেগ্য হলো রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর ঐ সকল হাদীস যাতে সলাত ত্যাগ করা কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ অর্থের বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

কুফর শিরকের সাথে কোনো মুসলিমের পার্থক্য হলো সলাত। [সহীহ্ মুসলিম]

অন্য হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

যে বিষয়টির মাধ্যমে মুসলিম ও কাফিরের পার্থক্য বোঝা যায় তা হচ্ছে সলাত অতএব যে কেউ সলাত পরিত্যাগ করে সে কুফরী করে। (৮১) [তিরমিযী]

শাকীক আল-উকাইলী বর্ণনা করেন,

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবায়ে কিরাম কোনো আমল পরিত্যাগ করা কুফরী মনে করতেন না কেবল সলাত ছাড়া। (৮২) [তিরমিযী]

এই সকল দলিল প্রমাণের আলোকে সলাত পরিত্যাগকারীকে কাফির বলা হয়। এ বিষয়ে জমহুর ওলামায়ে কিরামের বক্তব্য হলো, এই সকল হাদীস এবং এই অর্থের অন্যান্য হাদীসসমূহ যাতে বিভিন্ন আমলকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেখানে কুফরী শব্দটি প্রকৃত কুফরী তথা আল্লাহর দ্বীন থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যাওয়া বোঝানো হয়নি বরং এখানে কুফরী শব্দটি 'তাগলীজ' (تغليظ) বা অধিক কঠোরতা অর্থে ব্যাবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সলাত ত্যাগকারীর অপরাধ এতটাই ভয়াবহ যে তা কুফরীর সাথে তুলনীয়। এধরণের কঠোরতামূলক হাদীস কেবল সলাত ত্যাগ করা সম্পর্কে নয় বরং বিভিন্ন বিষয়ে এসেছে। যেমন,

রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ

যে কেউ নিজের বাবা ছাড়া অন্যকে বাবা বলে পরিচয় দেয় সে কাফির হয়ে যায়।

[সহীহ্ মুসিলম]

মুসলিম বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে, (فالجنة عليه حرام) "তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায়।"

---

(৮১) ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব। ইমাম আজ-জাহাবী কিতাবুল কাবাইর-এ হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন [মিশকাত/৫৭৪]

(৮২) শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন [মিশকাত/৫৭৯]।

রসুলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন,

اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

মানুষের মধ্যে দুটি কুফরী বিদ্যমান রয়েছে বংশ তুলে গালি দেওয়া এবং মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদা। [সহীহ্ মুসলিম]

যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তার সম্পর্কে অন্য হাদীসে বলা হয়েছে,

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

যদি কেউ নিজেকে কোনো লৌহ খন্ড দ্বারা আঘাত করে তবে সেই লৌহ খন্ডটি তার হাতে থাকবে সে ওটি দ্বারা জাহান্নামের মধ্যে চিরকাল চিরস্থায়ীভাবে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।

[বুখারী ও মুসলিম]

এই সকল হাদীসের ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং বিভিন্ন পাপকাজের অধিক ভয়াবহতা প্রকাশ করার জন্য সেগুলোকে কুফরীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখানে প্রকৃত কুফরী উদ্দেশ্য নয়। জমহুর ওলামায়ে কিরাম সলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলা সংক্রান্ত হাদীস সমূহের একই ব্যাখ্যা করে থাকেন।

যে রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কিরাম অন্য কোনো আমল পরিত্যাগ করা কুফরী হিসেবে গণ্য করতেন না সলাত ছাড়া সেটাও একই অর্থে। অর্থাৎ তারা সলাত ত্যাগ করা এবং সলাত ত্যাগকারীর ব্যাপারে অত্যাধিক কঠোরতা করতেন যা অন্য কোনো আমলের ব্যাপারে করতেন না। তারা সলাত ত্যাগ করা প্রকৃত অর্থেই কুফরী মনে করতেন এমন নয়। যদি এই রেওয়াতটিতে কুফরী অর্থ প্রকৃত কুফরী ধরে নেওয়া হয় তবে তার অর্থ হবে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমতে বা কমপক্ষে তাদের মধ্যে বেশিরভাগের মতে সলাত পরিত্যাগ করা প্রকৃত অর্থেই কুফরী যা একজন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। সুতরাং এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমত প্রমাণিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোনো একটি বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমত বা বেশিরভাগ সাহাবায়ে কিরামের মত পরিত্যাগ করে পরবর্তী ওলামায়ে কিরামের বেশিরভাগ অংশ (তিন মাযহাবের সকল ওলামায়ে কিরাম এবং হাম্বালী মাযহাবের আলেমদের একটি বিরাট অংশ) কিভাবে সলাত পরিত্যাগকারী কাফির নয় এমন ফতোয়া দিতে পারেন! সাহাবায়ে কিরামের মতকে এভাবে ঢালাওভাবে উপেক্ষা করা আলেমদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে! এটাই প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কিরাম প্রকৃত কুফরী অর্থে নয় বরং অধিক কঠোরতা প্রদর্শনের জন্য সলাত ত্যাগ করাকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। তাদের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হওয়ার

কারণে তাদের নিকটবর্তী যুগের ওলামায়ে দ্বীন পরবর্তীতে সলাত ত্যাগ করা প্রকৃত অর্থে কুফরী নয় এই মত দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম থেকে এ ধরণের কঠোরতা বিভিন্ন ব্যাপারে বর্ণিত আছে,

ইবনে কাছীর ﵀ তার তাফসীরে বর্ণনা করেন, উমর ﵁ বলেন,

من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا

যে কেউ হজ্জ করার সামর্থ রাখে তবে হজ্জ করে না সে ইয়াহুদী হয়ে মারা যাক বা খৃষ্টান হয়ে মারা যাক তাতে কোনো যায় আসে না।

ইবনে কাছির বলেন, (وهذا إسناد صحيح إلي عمر رضي الله عنه) "উমর ﵁ হতে এটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।"

এর পর তিনি উমর ﵁ হতে আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে তিনি বলেছেন,

لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جَدةٌ فلم يحج، فيضربوا عليهم الجِزْية، ما هم بمسلمين. ما هم بمسلمين

আমার তো ইচ্ছা হয়, কিছু লোককে বিভিন্ন এলাকাতে প্রেরণ করি তারা দেখবে কে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে নি। তাদের উপর জিজিয়া আরোপ করা হবে। ওরা মুসিলম নয়, ওরা মুসিলম নয়।

এই রেওয়য়েতটি দূর্বল। তবে পূর্বের বর্ণনাটির সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে। যেহেতু সেখানে হজ্জ পরিত্যাগ কারীকে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এই সকল বর্ণনার উদ্দেশ্য অধিক কঠোরতা প্রদর্শন করা প্রকৃত অর্থেই অমুসলিম ঘোষণা করা নয়।

ইমাম মালিক ﵀ আরেকটি বর্ণানা উল্লেখ করেছেন।

যেসব মুজাহিদরা যুদ্ধের সময় পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া কাফিরদের বলে, ভয় নেই, বের হয়ে এসো। কিন্তু বের হয়ে আসলে তাদের হত্যা করে তাদের তিরষ্কার করে উমর ﵁ বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَعْلَمُ مَكَانَ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ

আল্লাহর কসম করে বলছি যদি কাউকে এমন করতে শুনি তবে তাকে আমি হত্যা করবো।

[মুয়াত্তা মালিক]

এই রেওয়ায়েতটি উল্লেখের পর ইমাম মালিক নিজেই বলেছেন, (وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ) "এর উপর আমল নেই" ইমাম মালিকের একথা বলার কারণ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) "কোনো মুসলিমকে

কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা হবে না।" মুস্তামান (مستأمن) তথা যাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয় এমন কাফিরের ক্ষেত্রে সকল ওলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তাকে হত্যা করা অপরাধ হলেও তার বিনিময়ে কোনো মুসলিমকে হত্যা করা হবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে উমর ﵁ এর উপরোক্ত কথাটি আসলে ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে প্রকৃতই হত্যা করা হবে এমন নয় এটিই বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের মত।

হাসান বছরী ﵀ থেকে বর্ণিত আছে,

أدركنا أقواماً لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوكم لقالوا شياطين

আমি এমন কিছু লোকের সাক্ষাত পেয়েছি তোমরা তাদের দেখলে বলতে পাগল আর তারা তোমাদের দেখলে বলতো শয়তান। [মিজানুল আমাল]

এখানে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করছেন। এটা সাহাবায়ে কিরামের দুনিয়া বিমুখিতা ও পাপ কাজকে তিরষ্কার করার ব্যাপারে অত্যাধিক কঠোরতার দৃষ্টান্ত স্বরুপ বলা হয়েছে। প্রকৃত অর্থেই তারা হাসান বছরীর সময়কার সকল লোককে দেখামাত্র শয়তান বলে আখ্যায়িত করতেন এমন নয়।

মোট কথা, সলাত ত্যাগকারী কাফির হওয়ার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীসে বা সাহাবায়ে কিরামের আছারে যা কিছু বলা হয়েছে জমহুর ওলামায়ে কিরাম সেগুলোর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেন নি। যেহেতু অন্যান্য বিভিন্ন পাপ কাজের ব্যাপারে একই রকম শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে আর পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া কুফরী নয় এ ব্যাপারে আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের সকল ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া সলাত ত্যাগ কারী কাফির না হওয়ার স্বপক্ষে আরো কিছু স্পষ্ট দলিল রয়েছে।

যেমন, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীস,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আল্লাহ বান্দার উপর ফরজ করেছেন যে এগুলো আদায় করে এবং এর মধ্যে কোনো ত্রুটি করে না, এর হক নষ্ট করে না তবে আল্লাহর নিকট তার জন্য এই ওয়াদা রয়েছে যে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন আর যে এগুলো আদায় করে না আল্লাহর নিকট তার জন্য কোনো ওয়াদা নেই। আল্লাহর ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন ইচ্ছা করলে জান্নাতে দেবেন। [৮৩] [আবু দাউদ, মুয়াত্তা মালিক]

---

[৮৩] ইবনে আব্দিল বার বলেন, (فهو حديث صحيح ثابت) এই হাদীসটি প্রমাণিত ও বিশুদ্ধ। ইবনে হাযার আসক্কালানী ﵀ ইবনে আব্দিল বার এর এই মত উল্লেখ করেছেন।[তালখীস]। শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন [সহীহু আবি দাউদ/১২৭৬]।

হাম্বালী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ ইবনে কুদামা ﵀ এই হাদীটি সলাত ত্যাগকারী কাফির না হওয়ার স্বপক্ষে ব্যবহার করেছেন।

তিনি বলেন,

ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئة

যদি সলাত ত্যাগ কারী কাফিরই হতো তবে তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে জান্নাত দেবেন একথা বলা হতো না (যেহেতু কাফির জান্নাতে প্রবেশ করে না)। [আল-মুগনী]

তিনি সলাত ত্যাগ কারীকে কাফির না বলার বিষয়ে আরো বিস্তারিত বলেন,

ولأن ذلك إجماع المسلمين فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا منع هو ميراث مورثه ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تاركي الصلاة ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام

এ বিষয়ে মুসিলমদের ইজমা হয়েছে। আমরা এমন কোনো ঘটনা শুনি নি যে, কোনো একটি যুগে কোনো একজন সলাত ত্যাগকারীকে (মৃত্যুর পর) গোসল দেওয়া, কাফন পরানো এবং মুসলিমদের কবরস্থানে কবর দেওয়া হয় নি। তার ওয়ারিসদের তার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হয়নি আবার তাকেও তার ফারাজ থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। অথচ প্রচুর সংখ্যক মানুষ ছিল যারা সলাত পরিত্যাগ করতো। যদি সে কাফির বলে গণ্য হতো তবে এই সকল বিধান প্রয়োগ করা হতো। মুসলিমদের মাঝে এ বিষয়ে আমরা কোনো দ্বিমত দেখি না যে, সলাত ত্যাগ কারী পরবর্তীতে সলাত কাজা আদায় করে নেবে। যদি সে মুরতাদ (কাফির) বলেই গণ্য হতো তবে তাকে পূর্বের সলাত বা সওম কাজা করতে হতো না। [আল-মুগনী]

ইবনে কুদামার এই কথার উপর চিন্তা করলেই দেখা যাবে সাধারনভাবে সকল প্রকার সলাত ত্যাগ কারীকে কাফির ঘোষণা করা মূলত উম্মতের ঐক্যমতের বিপরীতে মত দেওয়া। একারণে ইবনে রুশদ আল-মালিকী ﵀ বলেন,

ولهذا صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب

এই মতটি (সলাত ত্যাগ কারীকে কাফির বলা) পাপী মুসলিমকে কাফির বলার মতোই (অর্থাৎ খারেজীদের মতো)। [বিদাইয়াতুল মুজতাহিদ]

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে এসেছে মুমিনরা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে এমন কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে বলবে,

ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه

হে আমাদের রব আমাদের এই সকল মুমিন ভাইরা আমাদের সাথে সলাত আদায় করতো ও সওম পালন করতো। আল্লাহ বলবেন যাও যার মধ্যে এক দিনার পরিমান ঈমান পাওয়া যাবে তাকে বের করে আনো। তখন তারা তাদের বের করে আনবে।

এই হাদীসের শেষে বলা হয়েছে ফেরেস্তা, নবী ও নেককার লোকেরা শাফাআত করার পর আল্লাহ বলবেন সকলে শাফায়াত করেছে এখন কেবল আমার শাফায়াত বাকী আছে। তখন তিনি এমন কিছু লোককে জাহান্নাম হতে বের করবেন যারা কখনও কোনো ভাল আমল করেনি। [সহীহ বুখারী]

শায়েখ আলবানী এই হাদীস থেকে সলাত ত্যগকারী কাফির না হওয়ার ব্যাপারে দলীল দিয়েছেন। কারণ হাদীসের প্রথমেই বলা হয়েছে যারা সলাত পড়তো কিন্তু জাহান্নামী হয়েছিল মুমিনরা শাফাআত করে তাদের বের করে আনবে আর শেষে বলা হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টির শাফাআত শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ ﷻ এমন কিছু লোককে বের করে আনবেন যারা কখনও কোনো ভাল আমল করেনি। এ থেকে বোঝা যায় আল্লাহ ﷻ তাদের জাহান্নাম হতে বের করবেন যারা সলাত ত্যাগ করতো কিন্তু মুমিন ছিল। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

এই সকল দলীল প্রমাণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে জমহুর ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, যেখানে সলাত ত্যাগ করাকে কুফরী বলা হয়েছে সেখানে প্রকৃত কুফরী বোঝানো হয়নি বরং বিষয়টির ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য কুফরীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

প্রশিদ্ধ ওলামায়ে কিরামের মাঝে যারা সলাত ত্যাগ কারীকে কাফির বলার পক্ষে মত ব্যাক্ত করেছেন বলে বর্ণিত আছে তারাও এই সকল দলিল-প্রমানের কারণে বিভিন্নভাবে নিজেদের মতামতের স্বপক্ষে এমন সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছেন যাতে প্রমাণিত হয় সাধারনভাবে সলাত পরিত্যাগ করা তাদের মতেও প্রকৃত অর্থে কুফরী নয়। যদি না তার সাথে আল্লাহর দ্বীনকে অবজ্ঞা করার মতো বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে।

এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম শাওকানী প্রমুখ ওলামায়ে কিরামের বক্তব্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। যদিও তারা সলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলার পক্ষে মত দিয়েছেন কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত মতামত বর্ণনার সময় এমনভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছেন যাতে প্রমাণিত হয় তারা সকল প্রকার সলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলেন নি বরং তাদের মধ্যে যারা অবজ্ঞাভরে সলাত পরিত্যাগ করে মূলত তাদের কাফির বলেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তার

মধ্যে একটি হলো, যখন কাউকে সলাত পরিত্যাগ করার অপরাধে পাকড়াও করা হয় এবং তাকে হত্যা করা হয় তখন সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়। যারা বলে ঐ অবস্থায় যদি তার অন্তরে সলাত ফরজ এই বিশ্বাস থাকে তবে সে কাফির হবে না তিনি তাদের মতামত খন্ডায়ন করে বলেন,

فَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِالصَّلَاةِ فِي الْبَاطِنِ ، مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا ، يَمْتَنِعُ أَنْ يُصِرَّ عَلَى تَرْكِهَا حَتَّى يُقْتَلَ، وَهُوَ لَا يُصَلِّي هَذَا لَا يُعْرَفُ مِنْ بَنِي آدَمَ وَعَادَتِهِمْ

কেউ অন্তরে সলাত পড়ার আবশ্যকতা স্বীকার করবে কিন্তু সলাত পড়ার জন্য তাকে হত্যা করা হলেও সে সলাত পড়বে না এটা সম্ভব নয়। মানুষের অভ্যাস এমন নয়। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, যে ব্যক্তিকে সলাত পরিত্যাগ করার কারণে হত্যা করা হয় তবু সে সলাত পড়ে না তার অন্তরে সলাত পড়া আবশ্যক এই বিশ্বাস নেই তাই সে কাফির হবে।

এরপর তিনি দ্বিতীয় যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন তা হলো, যদি একজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু তার সারাটা জিন্দিগীতে সে একটিবারের জন্যও আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাজদা অবনত হয় না। সে সলাত পড়া আবশ্যক এটা স্বীকার করে এমন বলা যেতে পারে না। একারণে তাকে মুসলিম বলা যায় না।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

فَأَمَّا مَنْ كَانَ مُصِرًّا عَلَى تَرْكِهَا لَا يُصَلِّي قَطُّ ، وَيَمُوتُ عَلَى هَذَا الْإِصْرَارِ وَالتَّرْكِ فَهَذَا لَا يَكُونُ مُسْلِمًا ؛ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يُصَلُّونَ تَارَةً ، وَيَتْرُكُونَهَا تَارَةً ، فَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا يُحَافِظُونَ عَلَيْهَا ، وَهَؤُلَاءِ تَحْتَ الْوَعِيدِ ، وَهُمْ الَّذِينَ جَاءَ فِيهِمْ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي السُّنَنِ حَدِيثُ عبادة عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ كَانَ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ ، إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ }

যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করার ব্যাপারে অনড় থাকে। জীবনে কখনও সলাত পড়ে না এবং এভাবেই মৃত্যুবরণ করে তবে সে মুসলিম নয়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ মাঝে মাঝে সালাত পড়ে আবার মাঝে মাঝে পরিত্যাগ করে এরা নিয়মিত সলাত পড়ে না। এদের ব্যাপারেই শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। এদের ব্যাপারেই রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর এই হাদীসটি প্রযোজ্য- পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আল্লাহ বান্দার উপর ফরজ করেছেন যে এগুলো আদায় করে এবং এর মধ্যে কোনো ত্রুটি করে না এর হক নষ্ট করে না তবে আল্লাহর নিকট তার জন্য এই ওয়াদা রয়েছে যে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন আর যে এগুলো আদায় করেনা আল্লাহর নিকট তার জন্য কোনো ওয়াদা নেই। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন ইচ্ছা করলে জান্নাতে দেবেন। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

এ কথার উপর চিন্তা করলে দেখা যাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া সাধারনভাবে সকল প্রকার সলাত

ত্যাগকারীর উপর কুফরীর ফতোয়া আরোপ করছেন না বরং যে ব্যক্তি সারা জীবনে একবারও সলাত পড়েনি সেই ব্যক্তিকে কাফির বলছেন। তার এ মতটিও জমহুর (বেশিরভাগ) আলেমের মতের বিপরীতে তবু আমরা বলবো, এ মতের আলোকে আমাদের সময়কার বেশিরভাগ লোক কুফরীর আওতা বহির্ভূত। যেহেতু জীবনে একবারও সলাত আদায় করেনি এমন লোক তালাশ করে পাওয়া দূরহ ব্যাপার। যারা যে কোনো প্রকার সলাত ত্যাগকারীকে কাফির মনে করে তারা নিজেদের স্বপক্ষে ইবনে তাইমিয়ার মত উল্লেখ করে থাকেন। এটা সঠিক নয়।

ইমাম শাওকানী ﵀ সলাত ত্যাগ করা কুফরী এটা উল্লেখ করার পর বলেন,

ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون لأنا نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع المغفرة

সলাত ত্যাগ করার গোনা ক্ষমা হতে পার এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো আমাদের মতের বিপরীতে নয়। কেননা আমরা বলবো কিছু কিছু কুফরী তো এমন আছে যা ক্ষমার আযোগ্য নয়। [নিলুল আওতার]

আবুল আলা আল-মোবারোকপুরী তিরমিযীর ব্যাখ্যা তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযীতে বলেন,

لو تأملت في ما حققه الشوكاني في تارك الصلاة من أنه كافر وفي ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يكفر لعرفت أنه نزاع لفظي لأنه كما لا يخلد هو في النار ولا يحرم من الشفاعة عند الجمهور كذلك لا يخلد هو فيها ولا يحرم منها عند الشوكاني أيضا

যদি তুমি ইমাম শাওকানীর এই কথার ব্যাপারে চিন্তা করো তবে দেখবে তিনি সলাত ত্যাগকারীকে কাফির বলেছেন আর জমহুর ওলামায়ে কিরাম কাফির বলেন নি এখানে মূলত শাব্দিক মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে (মৌলিকভাবে এখানে কোনো দ্বিমত নেই)। কারণ জমহুর ওলামায়ে কিরাম যেমন সলাত ত্যাগকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে এমন মনে করেন না এবং সুপারিশ (ক্ষমা) হতে বঞ্চিত হবে এমন মনে করেন না। ইমাম শাওকানীও তা মনে করেন না।

অর্থাৎ ইমাম শাওকানী একটু ভিন্নভাবে সলাত ত্যাগকারীর ব্যাপারে জমহুর ওলামায়ে কিরামের পক্ষেই মত দিয়েছেন।

আমরা পুনরায় বলবো, “সলাত ত্যাগ করা কুফরী” এই অর্থে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে জমহুর ওলামায়ে কিরামের নিকট সেটা প্রকৃত অর্থে কুফরী নয়। যারা ঐ সকল হাদীস হতে সলাত ত্যাগকারীর উপর কুফরীর ফতোয়া আরোপ করেছেন তারাও সাধারনভাবে সকল সলাত ত্যাগকারীর উপর তা প্রয়োগ করেন নি বরং যাকে সলাত পড়ার আদেশ দেওয়া হয় এবং সলাত না পড়লে হত্যার হুমকী দেওয়া হয় তারপরও সলাত পড়ে না বা জিন্দেগীতে একটি বারের জন্যও আল্লাহর সামনে সাজদা অবনত হয়না এমন হতভাগাদের উপর তারা কুফরীর ফতোয়া আরোপ করেছেন। বর্তমানে যারা সকল প্রকার সলাত

ত্যাগকারীর উপর ঐসব হাদীস প্রয়োগ করে তারা এ বিষয়ে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। নিজেদের মতের স্বপক্ষে ঐ সকল হাদীস পেশ করে তারা অদূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছে।

ঐসকল হাদীস ছাড়াও তারা আরো কিছু দলিল উপস্থাপণ করে থাকে যা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অজ্ঞতাপ্রসূত। যেমন,

আল্লাহর বাণী,

{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}

❮ যদি তারা শিরক-কুফর হতে ফিরে আসে, সলাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। ❯ [তাওবা/১১]

তারা বলে এই আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, যারা সলাত কায়েম করে না তারা মুসলিমদের দ্বীনী ভাই নয় অর্থাৎ তারা কাফির।

যে দ্বীনী ভাই নয় সে কাফির এই কথাটি সঠিক নয়। কারণ 'দ্বীনী ভাই' কথাটি সম্মান ও সৌহার্দের প্রতীক। নেককার ও অতি উত্তম লোক ছাড়া কারো ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করা যায় না। একজন মদ্যপ, জেনাকার সন্ত্রাসীকে দ্বীনী ভাই বলা যেতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সে বেদ্বীন, কাফির। এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ}

❮ যারা ঈমান এনেছে কিন্তু (সামার্থ থাকা সত্ত্বেও) হিজরত করে নি তাদের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করে চলে আসে। তবে যদি তারা দ্বীনের খাতিরে তোমাদের সহযোগিতা চায় তবে তাদের সহযোগিতা করা তোমাদের দায়িত্ব। ❯ [আনফাল/৭২]

এই আয়াতে যারা হিজরত করেনি বরং ইচ্ছাকৃতভাবে কাফিরদের ভূখন্ডে অবস্থান করেছে । মুসলিমদের বলা হচ্ছে তোমাদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين) " যে মুসলিম মুশরিকদের এলাকায় বসবাস করে তার সথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" [৮৪] [আবু দাউদ] কিন্তু এই সম্পর্কহীনতা ঐ সকল ব্যক্তিদের কুফরী প্রমাণ করে

---

[৮৪] আল-হাইছামী বলেন, (رجاله ثقات) এই হাদীসের রাবীরা বিশ্বস্ত। শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন [সহীহু আবি দাউদ/২৩৭৭]।

না। একারণে উক্ত আয়াতে এবং এই হাদীসে ‘‘তারা ঈমান এনেছে’’ বা তারা মুসলিম এই কথাটি বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অমুক আমার দ্বীনী ভাই এই সম্পর্ক অস্বীকার করলেই উক্ত ব্যক্তি বেদ্বীন, কাফির এমন প্রমাণিত হয় না।

তাছাড়া উক্ত আয়াতে সলাতের সাথে সাথে যাকাতের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যারা সলাত ত্যাগকারীকে কাফির প্রমান করার জন্য উপরোক্ত আয়াত প্রয়োগ করে তাদের বেশিরভাগই যাকাত না দিলে কাউকে কাফির বলে না। এই ধরনের দ্বিমুখিতা সত্ত্বেও আয়াতটি নিজেদের পক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহার করা তাদের জন্য শোভনীয় নয়।

এ বিষয়ে তাদের পক্ষ থেকে অনুরুপ আরেকটি দলিল উত্থাপন কর হয়। কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (৪২) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (৪৩) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (৪৪) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (৪৫) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ}

তোমাদের কি কারণে সাকার নামক জাহান্নামে প্রবেশ করতে হলো? তারা বলবে, আমরা তো সলাত আদায় করতাম না, গরীব মানুষকে খাবার খাওয়াতাম না, আল্লাহর দ্বীন নিয়ে যারা তামাশা করতো তাদের সাথে তামাশা করতাম এবং আল্লাহর দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম। [মুদ্দাচ্ছির:৪২-৪৬]

তারা বলে, এই আয়াতে কাফিরদের সাকার নামক জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হিসেবে সলাত পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। অতএব, সলাত পরিত্যাগ করা অবশ্যই কুফরী। এই কথাটিও সঙ্গত নয় কারণ এখানে সলাতের সাথে সাথে মিসকীনকে খাবার দিতাম না একথাও বলা হয়েছে। তবে কি মিসকীনকে খাবার না দেওয়া কুফরী? তাছাড়া কোনো অপরাধে জাহান্নামে প্রবেশ করলেই যে, সেটা কুফরী হয়ে যাবে এমন মনে করা কিভাবে সঠিক হতে পারে। একথা তো সকলেই জানে যে সলাত-সওম ইত্যাদি যে কোনো ফরজ আমল পরিত্যাগ করলে তার কারণে জাহান্নামে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তবে তার ঈমান থাকলে একদিন পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদি কেউ বলে, সাকার নামক জাহান্নামে কেবল কাফিররাই যায় মুমিনরা নয় তবে আমরা বলবো, আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আমরা আল্লাহর দ্বীন নিয়ে তামাশা করতাম এবং আল্লাহর দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম। এ দুটি বিষয় স্পষ্ট কুফরী। এই সকল কুফরীর সাথে সাথে অন্য যা কিছু অপরাধ তারা করেছিল সেগুলোর শাস্তি স্বরুপ তারা সাকার নামক জাহান্নামে প্রবেশ করেছে কেবল সলাত ত্যাগ করার কারণে নয়।

এরকম আরেকটি আয়াত হলো,

{فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا}

তাদের পর কিছু লোক আসলো যারা সলাত পরিত্যাগ করলো এবং কামনা-বাসনার অনুসরণ করলো ফলে খুব শীঘ্রই তাদের 'গয়' নাম জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। [মারইয়াম/৫৯]

তারা বলেন, **'গয়'** নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করার মতো ভয়ংকর শাস্তি কেবল কাফিরকেই দেওয়া যায় অন্য কাউকে নয়। অতএব, যে সলাত ত্যাগ করে সে কাফির না হলে 'গয়' নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতো না। এর উত্তরে আমরা একই কথা বলবো অর্থাৎ 'গয়' নামক জাহান্নামে যে কেবল কাফিরকে নিক্ষেপ করা হয় অন্য কানো পাপীকে নয় সেটা প্রমাণিত নয় আর যদি ধরেও নিই 'গয়' নামক জাহান্নামে কেবল কাফিরকে নিক্ষেপ করা হয় তবু এর মাধ্যমে সলাত পরিত্যাগ করা কুফরী প্রমাণিত হয়না যেহেতু আয়াতে কেবলমাত্র সালাত পরিত্যাগ করার কারণে 'গয়' নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করার কথা বলা হয় নি। বরং সেই সাথে তারা কামনা-বাসনার অনুসরণ করেছিল এমন বলা আছে। প্রশ্ন হলো, কামনা-বাসনার অনুসরণ করাও কি তবে কুফরী? যদি বাসনার বশবর্তী হয়ে মদ পান করে বা জেনা করে সেও কি 'গয়' নামক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে কাফির হবে? আর যদি বলা হয় কামনা-বাসনার অনুসরণ করে তারা অন্য কোনো কুফরী কাজে লিপ্ত হয়েছিল তবে বলবো, তারা সেই কুফরীর কারণেই 'গয়' নামক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং সেই সাথে সলাত পরিত্যাগ করার শাস্তিও ভোগ করেছে। মোট কথা, এ আয়াতের মাধ্যমে সলাত ত্যাগ করা কুফরী প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই।

যারা এই সকল অস্পষ্ট ও অসঙ্গত দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করে সাধারন মুসলিমদের কাফিরে পরিনত করার সংগ্রামে লিপ্ত আছেন আমরা তাদের অনুরোধ করে বলবো, আপনারা মুসলিমদের রক্ত-সম্পদ ও ঈমান-আক্বীদার উপর হামলা করা হতে বিরত থাকুন। যেহেতু রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে কেউ অন্য মুসলিমকে কাফির বলে যদি সে কাফির না হয় তবে সে ফতোয়া তার নিজের দিকেই ফিরে আসে। এ কঠোরতার কারণে এবং ঈমান ও ইসলামের সম্মান ও মর্যাদার কারণে ওলামায়ে কিরাম কাউকে কাফির বলার ব্যাপারে অত্যাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। সামান্য পরিমান সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হলেই তারা কাউকে কাফির বলা হতে বিরত থাকতেন। একারণে খারেজী, কাদরিয়া, মু'তাজিলাদের মতো কট্টরপন্থী বিদয়াতীদের ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ আলেম কুফরী ফতোয়া দেন নি। যে বিষয়ে আলেমরা দ্বিমত করেছেন বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম তার উপর নির্ভর করে কাউকে কাফির বলেন না।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহিমাহুল্লাহ বলেন,

أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان

ইসলামের পাঁচটি রুকন। এগুলোর মধ্যে প্রথম হলো কালেমার স্বাক্ষ্য দেওয়া, এর পর চারটি রুকন। যদি কোনো ব্যাক্তি এই চারটিকে মেনে নেই কিন্তু অলসতার কারণে তা পত্যিাগ করে তবে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো কিন্তু তাদের কাফির বলব না। আলেমরা এই চারটি বিষয় যে পরিত্যাগ করে সে কাফির হবে কি না সে ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন। আমরা কেবল সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই কাউকে কাফির বলব যে বিষয়ে সমস্ত আলেম একমত হয়েছেন আর তা হলো কালেমার সাক্ষ্য দেওয়া।

[আদ দুরার আস সানিয়্যা]

কাজি ইয়াদ ﷬ বলেন,

والخطا في ترك ألف كافر أهون من الخطإ في سفك محجمة من دم مسلم واحد

একজন মুসলিমের এক সিঙা পরিমাণ রক্ত ঝরানোর ব্যাপারে ভুল করা এক হাজার জন কাফিরকে ছেড়ে দেওয়ার তুলনায় বেশি মারাত্মক অপরাধ। [আশ শিফা]

উপরের আলোচনাতে আমরা আল্লাহর দ্বীন নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বা হাসি-তামাশা করার বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করেছি। অজ্ঞ ও মুর্খ লোকেরা এছাড়াও আরো বিভিন্ন কথা-বার্তা বলে থাকে যার কিছু অংশ এতটাই ধৃষ্টতাপূর্ণ যে তা মুখে আনা বা কলমে লেখাও বেয়াদবী বলে গণ্য তাই সেসব বিষয় উল্লেখ করা হতে আমরা বিরত থেকেছি। এটিই বরেণ্য ওলামায়ে নিকট অনুসৃত নীতি।

কাজী ইয়াদ ﷬ বলেন,

وقد أسرف كثير من سخفاء الشعراء ومتهميهم في هذا الباب واستخفوا عظيم هذه الحرمة فأتوا من ذلك بما ننزه كتابنا ولسانا وأقلامنا عن ذكره ولولا أنا قصدنا نص مسائل حكيناها لما ذكرنا شيئا مما يثقل ذكره علينا مما حكيناه في هذه الفصول

বহুসংখক নির্বোধ কবিরা (আল্লাহ সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছে) এবং তাদের নিন্দা করে যারা বই লিখেছে তারাও এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। তারা আল্লাহ ﷻ এর সুউঁচ্চ সম্মানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। তারা (ঐ সকল কবিদের কথার প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে) তাদের কিতাব সমূহতে এমন সব কথা উল্লেখ করেছে যা উল্লেখ করা হতে আমরা আমাদের কলম ও কিতাবকে পবিত্র রেখেছি। যদি প্রতিটি কথা যেভাবে বলা হয়েছে যেভাবে উল্লেখ করার ইচ্ছা না করতাম তবে পূর্বে যেসব মারাত্মক কথা উল্লেখ করেছি তাও উল্লেখ করতাম না। [আশ শিফা]

অর্থাৎ তিনি প্রতিবাদের উদ্দেশ্যেও কবি বা নির্বোধ লোকদের কথা অতিরিক্ত উল্লেখের নিন্দা করেছেন। কারণ কুফরী কথার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করার এটাও একটি অংশ যে অতি প্রয়োজন ছাড়া তা উল্লেখ না করা।

বর্তমানে দেখা যায় নাস্তিক-মুরতাদরা ইসলাম ও আল্লাহ-রাসুল সম্পর্কে এমন সব অবমাননামূলক মন্তব্য করে থাকে যা চুড়ান্ত পর্যায়ের অশ্লীল ও অশালীন। তাদের উপর আল্লাহর অভিসাপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, ঐ সকল নাস্তিকদের কথার প্রতিবাদ করতে যেয়ে কেউ কেউ মসজিদে বা ময়দানে সাধারন মুসলিমদের সামনে বারবার ঐ সকল কুরুচিপূর্ণ কথাগুলো হুবহু উল্লেখ করেন। তারা এটা লক্ষ্য করেন না যে, মুর্খ লোকেরা যে ভাষায় আল্লাহ-রাসূলকে গালি দেয় তা হুবহু উল্লেখ করাও এক প্রকার ধৃষ্টতা। এমন বলাই তো যথেষ্ট্য যে, তারা খুব অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেছে যা মুখে আনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি কেউ কারো বাবা-মাকে অশ্লীল ভাষায় গালি দেয় তবে বাবা-মার নিকট নালিশ করার সময় সেটা হুবহু শুনিয়ে দেওয়াটা নিশ্চয় ভদ্রতা ও শালীনতা হতে পারে না। বরং আকারে-ইঙ্গিতে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাই সর্বোত্তম। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কিছু কিছু বিষয় বর্ণনা করা যেতে পারে। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন।

ঈমান ভঙ্গের তৃতীয় কারণ আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা তামাশা করা সম্পর্কিত আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করতে চাই। এখন ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণ সম্পর্কে আলোচনা করবো। ইনশা-আল্লাহ্।

২.(ঘ) *ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণ (الرضا بالكفر) তথা শিরক-কুফরের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা।*

শিরক-কুফরের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা অর্থ হলো, একজন মুমিনের অন্তরে শিরক-কুফরের প্রতি যতটা ঘৃণা উপস্থিত থাকা স্বাভাবিক কারো অন্তরে সেটা অনুপস্থিত থাকার ফলে কুফরীকে সহজভাবে গ্রহণ করা, কুফরীর প্রতি সহনশীল হওয়া বা কুফরীর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রকাশ করা, কুফরী কাজে লিপ্ত হওয়ার আশা বা আকাঙ্খা প্রকাশ করা ইত্যাদি।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ}

❮ আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা সাজিয়ে দিয়েছেন আর তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন কুফর ফিসক ও পাপ কাজকে। এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। ❯ [সূরা হুজুরাত/৭]

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ) "তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে"। এরপর তিনি উক্ত তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে, (وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ) "সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপছন্দ করে তেমনি হেদায়েত

পাওয়ার পর পুনরায় কুফরীতে লিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করবে। [বুখারী ও মুসলিম]

এছাড়া বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে শিরক-কুফরকে সর্বনিকৃষ্ট কাজ এবং কাফির-মুশরিকদের সর্বনিকৃষ্ট জীব হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিপরীত দিকে ঈমান ও ইসলামকে সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম এবং মুমিনদের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সাথে কাফির-মুশরিক ও তাদের যাবতীয় কর্মকান্ডকে ঘৃণাভরে প্রত্যাক্ষান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ}

তোমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে ইব্রাহীম ও তার সঙ্গীদের মাঝে যখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেছিল আমরা তোমাদের থেকে এবং তোমরা যা কিছুর উপসানা করো তা হতে বিচ্ছিন্ন। আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের সাথে আমাদের শত্রুতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেল তোমরা এক আল্লাহ্ তে বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত। [মুমতাহিনা/৪]

সুতরাং কুফরীকে ঘৃণা করা প্রতিটি ঈমানদারের একটি অনিবার্য গুন। যে শিরক-কুফরকে ঘৃণা করে না বরং পছন্দ করে এবং অবলিলায় শিরক-কুফরের সাথে মাখা-মাখি করে, শিরক-কুফরের প্রচার-প্রসার কামনা করে তার ঈমান টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়টিকেই ওলামায়ে কিরাম ‘‘আর-রিদা বিল-কুফরি কুফর’’ (الرضا بالكفر كفر) ‘‘কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করাও কুফরী’’- এভাবে বর্ণনা করেছেন। চার মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত বর্ণনা করেছেন। মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে, মালেকী মাযহাবের ফিকাহ্ গ্রন্থ আল-খারাশী কৃত মুখতাসারুল খলীল এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে, শাফেঈ মাযহাবের ফিকাহ্গ্রন্থ ইমাম নাব্বী কৃত রওদাতুত তালেবীন এবং ইবনে হাযার হাইতামী কৃত তুহ্ফাতুল মুহ্তাজ নামক কিতাবে, তাছাড়া ইবনে হাযার হাইতামী কৃত অমর গ্রন্থ আল-ই’লাম বিকওয়াতিইল ইসলাম নামক কিতাবে, হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্ গ্রন্থ কানযুদ্ দাকাইকের দুটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ বাহ্রুর রায়েক ও তাবইনুল হাকাইক নামক কিতাবে, তাছাড়া মাজমাউল আনহার ও ইবনে আবদীন কৃত রদ্দে মুহতারে এবং হাম্বালী মাযহাবের ইবনে মুফলিহ্ কৃত আল-ফুরু’ নামক কিতাব সহ বিভিন্ন গ্রন্থে এই মুলনীতিটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে মুফলিহ্ রহিমাহুল্লাহ আল-ফুরু নামক কিতাবে বলেন,

وَالرِّضَاءُ بِالْكُفْرِ كُفْرٌ بِالْإِجْمَاعِ

কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করাও কুফরী এ ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

তবে কুফরীর ব্যাপারে যার অন্তর প্রশস্ত হয় তার উপর আল্লাহর গজব এবং ভীষণ শাস্তি।

[সূরা নাহল/১০৬]

⇒ **জিজিয়া গ্রহণ করে কাফিরদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করার সুযোগ দেওয়া কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা হিসেবে গণ্য নয়।**

''কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা কুফরী'' এই মূলনীতিটির উপর আপত্তি করে আধুনা চিন্তাবিদদের অনেকে জিজিয়া গ্রহণ করে কাফিরদের নিজ ধর্ম পালন করার সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি উপস্থাপণ করতে পারেন। তারা মনে করেন ইসলাম কাফিরদের নিকট বাৎসরিক জিজিয়া কর গ্রহণ করার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনের অধিকার দেয়। তাদের কেউ কেউ এতদূর পর্যন্ত বলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কাফিরদের মুসলিমদের সমান সম্মান ও অধিকার নিয়ে বসবাস করার সুযোগ দেওয়া হয়। এটা শিরক-কুফরের প্রতি ইসলামের উদারতা, সহিষ্ণুতা বা সহশীলতার উদাহরণ হিসেবে তারা মনে করেন। অতএব তারা প্রশ্ন তোলেন, কুফরীর প্রতি সহনশীলতা ও সহৃদ্যতা প্রদর্শন করলে তা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে এটা কিভাবে সঠিক হতে পারে? মালেকী মাযহাবের ফকীহ্ আল-খারাশী তাদের এই সংশয়টির সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। ''কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা কুফরী'' এই মূলনীতিটি বর্ণনা করার পর তিনি বলেন,

وَلَا يُقَالُ : يَمْنَعُ كَوْنُ الرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرًا ضَرْبَ الْجِزْيَةِ عَلَى الْكُفَّارِ ، وَالرِّضَا مِنْهُمْ بِذَلِكَ عَلَى الْكُفْرِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَصْلَحَةُ ، وَهِيَ طَمَعُ إِسْلَامِهِمْ وَلَوْ بِحَسَبِ مَا يَتَوَالَدُ فِيهِمْ اقْتَضَتْ ذَلِكَ فَلَا يُرَدُّ

এমন বলা সঙ্গত নয় যে, কাফিরদের নিকট জিজিয়া গ্রহণ করে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে দেওয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় ''কুফরীর প্রতি সন্তোষ জ্ঞাপন করা কুফরী'' এই মূনীতিটি সঠিক নয়। কেননা আমরা বলি বিশেষ উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে অর্থাৎ এই ব্যক্তিরা বা এদের বংশধরেরা ইসলাম গ্রহণ করবে এই উদ্দেশ্যে তাদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে অতএব এর মাধ্যমে উক্ত মূলনীতিটি বাতিল প্রমাণিত হয় না। [শারহে মুখতাসারে খলীল]

এ কথার অর্থ হলো, কাফিরদের কুফরীর প্রতি সদয় হয়ে নয় বরং তারা বা তাদের ঔরশে জন্ম নেওয়া পরবর্তী বংশধরেরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেবে এই আশায় তাদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে জিজিয়া গ্রহণ করার মাধ্যমে কাফিরদের কুফরীর প্রতি সন্তোষ জ্ঞাপন করা হয় এমন যারা

মনে করেন তারা জিজিয়ার স্বরুপ সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। জিজিয়া গ্রহণ করা অর্থ কাফিরদের স্বাধীনভাবে কুফরী করার সুযোগ দেওয়া বা মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাফিরদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান বা কমপক্ষে সহনশীলতা প্রকাশ করা এ ধারনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অগ্রহনযোগ্য। বরং শিরক-কুফরের উপর টিকে থাকার কারণে কাফিরদের লাঞ্চিত ও অপমানিত করার জন্যই তাদের উপর জিজিয়ার বিধান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। জিযিয়া অর্থ কেবল নির্দিষ্ট পরিমান বাৎসরিক ট্যাক্স নয় বরং সেই সাথে এমন বহু সংখ্যক শর্ত ও চুক্তি যা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত জিম্মী অমুসলিমরা মেনে চলতে বাধ্য থাকে। ঐ সকল শর্ত ও চুক্তির ধরন কিরুপ হবে তা পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত এবং ওলামায়ে কিরামের মতামতের আলোকে সুবিস্তারে বর্ণিত। আমরা এখানে তার কিছু অংশ বর্ণনা করতে চাই। এ বিষয়ে মূলনীতি হলো আল্লাহ্ ﷻ এর বাণী,

{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}

﴾ (কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো) যতক্ষণ না তারা অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া প্রদানে সম্মত হয়। ﴿

[তাওবা/২৯]

এই আয়াতে কেবল জিজিয়া প্রদানের কথা বলা হয় নি বরং অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

এই আয়াতে উল্লেখিত অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া প্রদান সংক্রান্ত আলোচনাতে ইবনে কাছির রহিমাহুল্লাহ বলেন

أي: ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صَغَرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه"ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، تلك الشروط المعروفة

অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া কর দেওয়ার অর্থ তারা (ইসলামী রাষ্ট্রে) তুচ্ছ, নগন্য ও হেয় অবস্থায় থাকবে একারনে জিম্মীদের সম্মান করা অথবা মুসলিমদের উপরে স্থান দেওয়া জায়েজ নয় বরং তারা থাকবে অপমানিত, লাঞ্চিত ও হতভাগ্য অবস্থায় যেমনটি মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়েতে এসেছে। হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه বর্ণনা করে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা ইয়াহুদী খৃষ্টানদের আগে সালাম দিওনা আর যখন তাদের সাথে রাস্তায় দেখা হয় তখন তাদের একপাশ দিয়ে যেতে বাধ্য করো।" একারণে উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه শামের ইয়হুদীদের সহিত সেইসব চুক্তি করেছিলেন যা সর্বজন বিদিত।

[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

এরপর তিনি ঐ লম্বা চুক্তিটি সুবিস্তারে বর্ণনা করেছেন আমরা পরবর্তীতে তার কিছু অংশ উল্লেখ করবো।

ইবনে কাছীর উল্লেখিত সহীহ্ মুসলিমের উপরোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম নাব্বী ﷬ বলেন,

قال أصحابنا لايترك للذمى صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه

আমাদের মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, জিম্মী কাফিরকে রাস্তার মাঝখান দিয়ে যেতে দেওয়া হবে না বরং তাকে এক পাশ দিয়ে যেতে বাধ্য করা হবে। [শারহে মুসিলম]

ইবনে কাছীর ﷬ যে লম্বা চুক্তিটির কথা বলেছেন তার মধ্যে উল্লেখ ছিল,

ولا نظهرشركا، ولا ندعو إليه أحدًا؛ ولا نمنع أحدًا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس

(ইয়াহুদীরা চুক্তিতে লিখেছিল) আমরা আমাদের ধর্ম প্রকাশ্যে পালন করবো না আর শিরক কুফরের দিকে কাউকে ডাকবনা আর আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যে কেউ মুসলিম হতে চায় আমরা তাকে বাধা দেব না। আর এও যে, আমরা মুসলিমদের সম্মান করবো। যদি তারা আমাদের মজলিসে বসতে চায় আমরা উঠে যেয়ে তাদের স্থান করে দেব। [তাফসীরে ইবনে কাছীর]

তারিখে ইবনে খালদুনের বর্ননায় এধরনের কথায় আছে তবে (لا نظهر شركا) আমরা শিরক কুফর প্রকাশ্যে পালন করব না এ স্থলে (ولا نظهر شرعنا) আমরা আমাদের ধর্ম প্রকাশ্যে পালন করব না এমন বলা আছে।

ইবনে কায়্যিম ﷬ আহকামু আহলিল জিম্মা আর ইবনে মানযুর মুখতাসার তারিখে দেমেশকে উল্লেখ করেছেন,

ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا

আমরা আমাদের ধর্মের দিকে কাউকে উৎসাহিত করব না এবং কাউকে সেদিকে ডাকব না (আমাদের ধর্মের প্রচার করব না)।

ইবনে তাইমিয়া ﷬ বলেন

بَلْ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالصَّحَابَةُ وَسَائِرُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يُظْهِرُوا أَعْيَادَهُمْ فِي دَارِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَهَا سِرًّا فِي مَسَاكِنِهِمْ

অমুসলিম জিম্মীদের উপর উমর ইবনে খাত্তাব, অন্যান্য সাহাবারা এবং মুসলিমদের সমস্ত খলীফারা এই শর্ত করতেন যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের ধর্মীয় উৎসব সমুহ প্রকাশ্যে পালন করতে পারবে না বরং তাদের বাড়িতে গোপনে পালন করবে। [মাজমুউল ফাতাওয়া]

এছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের নতুনভাবে উপসনালয় নির্মাণ করার অধিকার দেওয়া হবে না। তাদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে নিয়োগ দেওয়া হবে না। মোট কথা, কোনোভাবে তাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হবে না বরং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাদের কেবল অপমানিত ও লাঞ্চিত করা হবে। এটিই হলো মূলত জিজিয়া যা কেবল কুফরীর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞারই প্রমান বহন করে সহনশীলতা বা সহৃদতা নয়। যারা জিজিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ কেবল তারাই জিজিয়ার মাধ্যমে শিরক-কুফরকে মেনে নেওয়া হয়েছে বা স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এমন মনে করে।

এ সংশয়টি নিরসনের পর আমরা ঈমান ভঙ্গের এ মূলনীতিটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করবো।

কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা বলতে বিভিন্ন বিষয়কে বোঝায়। আমরা নিম্নের আলোচনাতে পর্যায়ক্রমে সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ্।

⇒ অন্তরে কুফরীর প্রতি বিশ্বাস না রেখে কেবল মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করাও কুফরী।

ইমাম নাব্বী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناء أو استهزاء

কোনো ব্যাক্তি কুফরী কথা বলার মাধ্যমেই কাফির হবে সে আকীদা রাখুক বা তামাশার ছলে বলুক। [রওদাতুত্ তালেবীন]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَالرَّجُلُ لَوْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِمَصَالِحِ دُنْيَاهُ مِنْ غَيْرِ حَقِيقَةِ اعْتِقَادٍ صَحَّ كُفْرُهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا

কোনো ব্যাক্তি যদি দুনিয়াবী স্বার্থে অন্তরের আক্বীদা ছাড়াই কুফরী কথা মুখে বলে তবে সে আমাদের নিকট এবং আল্লাহর নিকট কাফির বলে সাব্যস্ত হবে। [মাজমুআ এ ফাতাওয়া]

বাহরুর রায়েক এ বলা হয়েছে,

وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ هَازِلًا أَوْ لَاعِبًا كَفَرَ عِنْدَ الْكُلِّ وَلَا اعْتِبَارَ بِاعْتِقَادِهِ

তামাশা বা খেলার ছলে যদি কেউ কুফরী কথা বলে তবে সমস্ত আলেমদের নিকটই তা কুফরী বলে গণ্য হবে তার আকীদা কি তা দেখা হবে না। [বাহরুর রায়েক]

মুল্লা আলী কারী ﷺ বলেন,

ففي حاوي الفتاوي من كفر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان فهو كافر وليس بمؤمن عند الله

হাবীল ফাতাওয়াতে আছে, যদি কেউ মুখে কুফরী কথা বলে আর তার অন্তরে পরিপূর্ন ঈমান থাকে তবু সে কাফির। আল্লাহর নিকটও সে মুমিন নয়। [শারহে ফিকহে আকবার পৃঃ২৪৫]

তিনি আরও বলেন,

ثم اعلم أنه إذا تكلم بكلمة الكفر عالما بمعناها ولا يعتقد معناها لكن صدرت عنه من غير إكراه بل مع طواعية في تأديته فإنه يحكم عليه بالكفر

জেনে নাও, যদি কেউ কোনো কুফরী কথা বলে যার অর্থ তার জানা আছে তবে সে ঐ আকীদা রাখে না যদি কাফিররা তাকে বাধ্য না করে বরং সে স্বেচ্ছায় উক্ত কথা মুখে উচ্চারন করে তবে তাকে কাফির বলা হবে। [শারহে ফিকহে আকবার পৃঃ ২৪৪]

⇒ কুফরী করার সংকল্প করা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া কুফরী।

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে এসেছে,

واذا عزم الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال

যদি কেউ একশ বছর পরে কুফরী করার সংকল্প করে তবে সে তখনই কাফির হবে।

ইমাম আন নাব্বী ﷺ বলেন, لان ارادة الكفر كفر

কুফরী কাজের ইচ্ছা করাটাও কুফরী। [শারহে মুহায্যাব]

তিনি রওদাতে আল মুতাওয়াল্লী ﷺ হতে উল্লেখ করেন,

والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال وكذا التردد في أنه يكفر أم لا فهو كفر في الحال وكذا التعليق بأمر مستقبل كقوله إن هلك مالي أو ولدي تهودت أو تنصرت

ভবিষ্যতে কোনো কুফরী কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলে সে বর্তমানেই কাফির হবে। যদি কেউ বলে আমি কুফরী করব না কি করব না সেও তখনই কাফির হবে। একইভাবে যদি কোনো কাজের সাথে কুফরীকে সংশ্লিষ্ট করে যেমন বলে আমার সম্পদ বা সন্তান ধ্বংস হলে আমি ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হয়ে যাবো (অর্থাৎ সেও তখনই কাফির হবে)। [আর-রাওদা]

ইবনে আবেদীন ﷺ বলেন,

كَقَوْلِهِ إنْ كَانَ كَذَا غَدًا فَأَنَا أَكْفُرُ فَإِنَّهُ يَكْفُرُ مِنْ سَاعَتِهِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لِأَنَّهُ رَضِيَ فِي الْحَالِ بِكُفْرِهِ الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى تَقْدِيرِ حُصُولِ كَذَا فَافْهَمْ

যদি কেউ বলে আগামী কাল এমন ঘটনা ঘটলে আমি কাফির হয়ে যাব তবে সে তখনই কাফির হয়ে যাবে কারন সে উক্ত ঘটনা ঘটলে ভবিষ্যতে কুফরী করার ব্যাপারে বর্তমানে রাজী হয়েছে। [রদ্দুল মুহতার]

অর্থাৎ ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে কুফরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সে এখনই কাফির হবে। একইভাবে কুফরী করবে কি করবে না এ ব্যাপারে পরিকল্পনা ও চিন্তা-ফিকির শুরু করলেও কাফির হবে। নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক বা না করুক। একইভাবে কোনো বিপদ ঘটলে বা কোন উত্তম জিনিস থেকে বঞ্চিত হলে কাফির হয়ে যাবো এমন বললে ঐ ব্যক্তি তখনই কাফির হয়ে যাবে ঐ ঘটনা আদৌ ঘটুক বা না ঘটুক। যেহেতু সে কোনো একটি পর্যায়ে কাফির হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, যদি এমন হয় বা অমুক ঘটনা ঘটে তবে আমি কাফির হয়ে যাবো এ ধরণের কথার দুটি দিক থাকে। যদি এমন হয় যে, উক্ত ঘটনা ঘটলে ঐ ব্যক্তি প্রকৃতই কাফির হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যাক্ত করছে তবে সে তখনই কাফির হবে। আর যদি এমন হয় যে, সে আসলে উক্ত ঘটনা আদৌ ঘটবে না এমন বোঝাচ্ছে তবে সে কাফির হবে না যেহেতু সে কুফরী করার সংকল্প ব্যাক্ত করে নি। মানুষ অনেক সময় বলে, যদি এ কথা ঠিক না হয় তবে আমি আমার কান কেটে ফেলবো। এখানে প্রকৃত অর্থেই কান কেটে ফেলা উদ্দেশ্য হয় না এমনকি যদি তার কথা ভুলও প্রমাণিত হয় তবু সে কান কাটবে এমন নয় বরং কান কেটে ফেলা যেমন অসম্ভব উক্ত কথাটি মিথ্যা হওয়াও তেমনি অসম্ভব এমন বোঝানোর জন্য এভাবে বলা হয়ে থাকে। একজন মুসলিমের নিকট ঈমান যেহেতু সর্বোত্তম নিয়ামত তাই অনেক সময় কোনো বিষয় অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য কেউ কেউ বলে থাকে যদি এমন হয় বা এমন না হয় তবে আমি কাফির বা আমি বেঈমান। এখানে প্রকৃত পক্ষে কাফির বা বেঈমান হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয় বরং উক্ত ঘটনা ঘটা যে অসম্ভব এটাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ }

আপনি বলুন যদি আল্লাহর কোনো সন্তান থাকেই তবে আমিই প্রথম তার ইবাদত করবো।
[জুখরুফ/৮১]

আল্লাহর কোনো সন্তান থাকা অসম্ভব এই আয়াতে এটাই উদ্দেশ্যে। আল্লাহর সন্তান থাকা এবং প্রকৃত পক্ষেই তার ইবাদত করা ইত্যাদি বিষয় এখানে উদ্দেশ্য নয়।

⇒ নিজের জন্য অতীতে বা ভবিষ্যতে কাফির অবস্থা কামনা করা কুফরী।

ইমাম নাব্বী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ولو دام مرضه واشتد فقال إن شئت توفني مسلماً وإن شئت توفني كافراً صار كافراً

যদি কেউ দীর্ঘদিন যাবৎ যন্ত্রনাদায়ক রোগে ভোগে এবং বিরক্ত হয়ে বলে, হে আল্লাহ তুমি আমার মৃত্যু দাও তা কাফির অবস্থায় হোক বা মুসলিম অবস্থায়। [আর-রাওদা]

এই মাসয়ালাটি উল্লেখের পর ইবনে হাযার হাইতামী ﷫ বলেন,

ووجه الأول ما مر من أن تمني الكفر والرضا به كفر

এটা কাফির হওয়ার কারণ যা আমরা পূর্বে বলেছি যে, কুফরী কামণা করা বা কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করাও কুফরী। [আল-ই'লাম]

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে,

نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ فَمَاتَ أَبُوهُ فَقَالَ : لَيْتَ أَنِّي لَمْ أُسْلِمْ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ حَتَّى أَخَذْتُ مَالَ الْأَبِ يَكْفُرُ

যদি কোনো খৃষ্টান মুসলিম হয় পরে তার বাবা মারা যায় আর সে বলে, হায়! যদি আমি এখন মুসলিম না হতাম তাহলে আমার বাবার সম্পদ পেতাম তবে সে কাফির হবে।

অনেকে এই বিষয়টির উপর আপত্তি উত্থাপন করে উসামা ইবনে যায়েদের একটি ঘটনা উল্লেখ করতে পারে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে উসামা ইবনে যায়েদ যুদ্ধের ময়দনে একবার একজন কাফিরকে হাতের নাগালে পেয়ে গেলে সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণ করে। উসামা ﵁ মনে করেন এই ব্যক্তি মৃত্যুর ভয়ে লোক দেখানোর জন্য কালেমা পাঠ করেছে। ফলে তিনি তাকে হত্যা করে ফেলেন। পরে রসুলুল্লাহ্ ﷺ এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাকে ভীষণভাবে তিরষ্কার করেন। তিনি বলেন,

يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

হে উসামা তুমি কি তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার পরও হত্যা করেছো?

উসামা ﵁ বলেন,

فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এভাবে আমাকে বারবার তিরষ্কার করতে থাকলেন এমন কি আমার মনে হলো যদি আমি আজকের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করতাম! [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

ইসলাম গ্রহণ করলে পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। উসামা ﵁ যখন বুঝলেন তিনি মারাত্মক অপরাধ করেছেন তখন আখিরাতে উক্ত অপরাধের কারণে যাতে পাকড়াও না হতে হয় সে উদ্দেশ্যে তিনি ইচ্ছা করেছিলেন যদি তার ইসলাম গ্রহণ এই ঘটনার পরে হতো তবে ইসলাম গ্রহণের কারণে তা ক্ষমা

হয়ে যেতো।

যে ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার পর তার বাবা কাফির অবস্থায় মারা যায় এবং মুসলিম কাফিরের ওয়ারিশ হয় না আর কাফিরও মুসলিমের ওয়ারিশ হয় না ইসলামের এই নীতি অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তি তার পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। তার অন্যান্য (কাফির) ভায়েরা তার পিতার সম্পত্তির অংশ পায়। এটা দেখে সে বলে, ‘‘যদি আমি আজ পর্যন্ত কাফির থাকতাম তবে আমার পিতার সম্পত্তির অংশ পেতাম।’’ এই ব্যাক্তিকে কাফির বলা সম্পর্কে ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন, (في هذا نظر) ‘‘এটা ব্যাখ্যা স্বাপেক্ষ্য’’ এরপর তিনি উসামা ﵁ এর ঘটনাটি উল্লেখ করেন এবং শেষে বলেন, (تويمكن الفرق بينهما) তবে উভয় ঘটনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। [আর-রাওদা]

ইবনে হাযার হাইতামী ইমাম নাব্বীর উপরোক্ত মন্তব্যটি উল্লেখ করার পর বলেন,

وما أشار إليه أخيرا من الفرق بين الصورتين هو الظاهر المعتمد فإن ما ها فيه تصريح بتمني الكفر للدنيا وأما أسامة رضي الله عنه فلم يتمنه وإنما يود أنه لم يكن أسلم إلا ذلك اليوم حتي إنه لم يكن يقتله لأنه لم يكن حزينا عليه أو أن الإسلام يجب ما قبله فيسلم من تلك المعصية العظيمة وليس في ذلك شهوة الكفر ولا تمنيه فيما مضي ألبتة

ইমাম নাব্বী শেষে উভয় ঘটনার মধ্যে যে পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন সেটিই স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য। যেহেতু ঐ ঘটনাতে দেখা গেছে দুনিয়াবী ফায়দা হাসীলের জন্য কাফির অবস্থায় থাকার ইচ্ছা করা হয়েছে কিন্তু উসামা ﵁ তো কাফির হতে চান নি বরং এতটুকু ইচ্ছা করেছেন যে যদি তিনি আজকের পূর্বে মুসলিম না হতেন তবে হয়তো এই ব্যক্তিকে হত্যা করার মতো মারাত্মক অপরাধ করতেন না যেহেতু সে ক্ষেত্রে তিনি উক্ত ব্যক্তির সাথে লড়াই করতেন না। অথবা তিনি উদ্দেশ্য করেছেন যদি তিনি আজ ইসলাম গ্রহণ করতেন তাহলে ইসলাম গ্রহণের কারণে (অন্যান্য পাপের সাথে) তার এই মহা-পাপটি ক্ষমা হয়ে যেতো (যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করলে সকল পাপ ক্ষমা হয়ে যায়)। এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তিনি কাফির হতে চান নি কাফির হওয়ার ইচ্ছাও ব্যাক্ত করেন নি। [আল-ই’লাম]

অতএব, ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো কিছু দুনিয়াবী মাল-সম্পদ বা মান-মর্যাদার লোভে, রোগ-ব্যধি কষ্ট যন্ত্রণা ইত্যাদি হতে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছায় অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যে কোনো সময় কাফির হওয়া বা কাফির অবস্থায় থাকার আকাঙ্খা প্রকাশ করলে সে তৎক্ষনাৎ কাফিরে পরিনত হবে। ওসামা ﵁ এর ঘটনা এ মতের বিরুদ্ধে নয় যেহেতু তিনি কুফরী কামনা করেন নি বরং ইসলাম গ্রহণ করে সকল পাপ মোচন করতে চেয়েছিলেন।

⇒ মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে নিজেকে কাফির হিসেবে পরিচয় দেওয়া।

যদি কেউ তামাশার ছলে বা কোনো দুনিয়াবী ফায়দা হাসীলের উদ্দেশ্যে নিজেকে কাফির হিসেবে পরিচয়

দেয় তবে সে কাফির হবে যদিও তার অন্তরে কুফরীর প্রতি বিশ্বাস না থাকে।

ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন,

ولو غضب على ولده أو غلامه فضربه ضرباً شديداً فقال رجل لست بمسلم فقال لا متعمداً كفر

যদি কেউ রাগান্বিত হয়ে নিজের সন্তানকে বা চাকরকে ভীষণ মারধর করে আর অন্য একজন বলে, তুমি কি মুসলিম নও? আর সে বলে না। তবে সে কাফির হবে। [রাওদাতুত্ তালেবীন]

ইবনে হাযার হাইতামী رحمه الله বলেন,

لو قال لزوجته يا كافرة أو يا يهودية فقالت أنا كما قلت كفرت

যদি কেউ তার স্ত্রীকে গালি দিয়ে বলে, হে কাফির হে ইয়াহুদী আর তার স্ত্রী বলে হ্যাঁ আমি তাই তবে উক্ত স্ত্রী কাফির হবে। [আল-ই'লাম]

বাহরুর রায়েকে বলা হয়েছে,

وَبِقَوْلِهِ لَبَّيْكَ جَوَابًا لِمَنْ قَالَ يَا كَافِرُ يَا يَهُودِيُّ يَا مَجُوسِيُّ وَبِقَوْلِهِ أَنَا مُلْحِدٌ لِأَنَّ الْمُلْحِدَ كَافِرٌ

যদি কেউ কাউকে হে ইয়াহুদী বা হে মাজুসী (অগ্নিপূজক) বলে আহ্বান করে আর সে সাড়া দেয় তবে এই ব্যক্তি কাফির হবে। একইভাবে যদি কেউ বলে আমি ধর্মদ্রোহী তবে সে কাফির হবে কারণ ধর্মদ্রোহী তো কাফির।

কেউ ইয়াহুদী বা কাফির বলে ডাকলে তার উত্তরে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন, (في هذا نظر) এটা ব্যাখ্যা স্বাপেক্ষ। ইমাম নাব্বীর মন্তব্যটি উল্লেখের পর ইবনে হাযার হাইতামী رحمه الله বলেন,

والوجه أنه إن نوي إجابته أو أطلق لم يكفر وإن قال ذالك علي جهة الرضا بما نسبه إليه كفر

এ বিষয়ে ব্যাখ্যা হলো যদি যে, কাফির পরিচয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সাড়া দেয় তবে কাফির হবে আর যদি কেবল কারো ডাকে সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই সাড়া দেয় তবে তা কুফরী হবে না। [আল-ই'লাম]

মোট কথা, কোনোভাবে নিজেকে কাফির হিসেবে ঘোষণা করা বা অন্য কেউ কুফরী পরিচয়ে পরিচিত করলে সেটা মেনে নেওয়া কুফরী হিসেবে গণ্য হবে। এ বিষয়ে আলেমরা অত্যাধিক কঠোরতা করেছেন। তারা বলেছেন,

ولو قال فلان كافر وهو أكفر مني كان كافرا اقرارا بالكفر

যদি কেউ বলে, অমুক কাফির আর সে আমার চেয়ে বেশি কাফির তবে সে কাফির হবে কারণ সে

নিজের কুফরীর স্বীকৃতি দিয়েছে। [আল ইলাম বি কওয়াতিইল ইসলাম]

বর্তমানে মুসলিম নামধারী বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনেক সময় সংখ্যালঘু অমুসলিমদের জন্য বিশেষ সুবিধা সংরক্ষিত থাকে যদি কেউ উক্ত সুবিধা ভোগ করার জন্য নিজেকে অমুসলিম পরিচয় দেয় তবে সে কাফির হবে। অমুসলিম রাষ্ট্রে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজেকে অমুসলিম হিসেবে পরিচয় দেওয়ার বিধানও একই। মোট কথা যে কোনোভাবে নিজেকে কাফির হিসেবে পরিচয় দেওয়া কুফরী হবে যদিও অন্তরে কুফরীর প্রতি প্রকৃত অর্থে বিশ্বাস না থাকে। তবে বাধ্য হয়ে এমন করা হলে তা স্বতন্ত্র। এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশা-আল্লাহ।

⇒ **কাজ-কর্ম ও বেশ-ভূষার মাধ্যমে নিজেকে কুফরী পরিচয়ে পরিচয় দেওয়া।**

যদি কেউ কাফিরদের সাথে মিশে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে বা তাদের মতো পোশাক পরিধান করে কাফির সাজে তবে সে কাফির হবে তার অন্তরের বিশ্বাস যাই হোক না কেন।

কাজি ইয়াদ رحمه الله বলেন,

وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار والسعى إلى الكنائس والبيع مع أهلها والتزيى بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤس فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام

আমরা এমন প্রত্যেক ব্যাক্তিকে কাফির বলব যে এমন কাজ করে যে কাজের ব্যাপারে উম্মতের ইজমা যে, তা কেবলমাত্র কাফিরের মাধ্যমেই হতে পারে। যদিও উক্ত ব্যক্তি উক্ত কাজ করার পরও প্রকাশ্যে ইসলাম পালন করে। যেমন: মূর্তি, চন্দ্র, সূর্য, আগুন, ক্রুশ ইত্যাদিকে সাজদা করা, ইয়াহুদী বা খৃষ্টানদের সাথে তাদের উপাসনালয়ে গমন করা তাদের পোশাক পরিধান করা, খৃষ্টানদের ফিতা গলায় পরা এবং তাদের অনুসরণে মাথার চুল পাখির বাসার মতো জাড়ানো ইত্যাদি। কেননা মুসলিমরা ইজমা করেছেন যে, এসব কাজ কেবল একজন কাফিরই করতে পারে এবং এসব কাজ কুফরীর আলামত যদিও এসব কাজে লিপ্ত ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইসলাম অনুসরণ করে। [আশ শিফা]

কিভাবে একজন মুসলিম কাফির হয় সে অধ্যায়ে ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে

وَبِخُرُوجِهِ إِلَى نَيْرُوزِ الْمَجُوسِ لِمُوَافَقَتِهِ مَعَهُمْ فِيمَا يَفْعَلُونَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

এবং (কোন মুসলিম কাফির হবে) যদি সে মাজুসীদের ধর্মীয় উৎসবের দিন তাদের সাথে গমন করে এবং তারা যা করে তা করে।

বর্তমানে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে "যেমন খুশি তেমন সাজো" উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

যেসব সাজ-সজ্জার মধ্যে অনেক ছেলে-মেয়েকে ধুতি-পৈতা বা শাখা-সিঁদুর পরিধান করে হিন্দু সাজতে দেখা যায়। এটা কুফরী হবে। যারা এসব কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগায় বা এসব কার্য-কলাপের তত্ত্বাবধায়নে থাকে তারাও কাফির হবে। [৮৫] একইভাবে খৃষ্টানদের বড়দিনে অনেক মুসলিম খৃষ্টানদের সাজে সজ্জিত হয়ে তাদের সাথে উৎসবে মেতে ওঠে। এটাও কুফরী হিসেবে গণ্য হবে।

⇒ **কাফিরদের কুফরী কাজে সহযোগিতা করা।**

যে কোন কুফরী কাজে কাউকে যে কোনোভাবে সহযোগিতা করা কুফরী।

রুদ্দুল মুহতারে ইমাম কারাফী ﷬ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে,

لَا يُعَادُ مَا انْهَدَمَ مِنْ الْكَنَائِسِ ، وَأَنَّ مَنْ سَاعَدَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ رَاضٍ بِالْكُفْرِ وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ

যে সকল গীর্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেগুলো পুননির্মাণ করা যাবে না। যে ব্যক্তি ওগুলো পুননির্মানে সহযোগিতা করবে সে কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করছে বলে গণ্য হবে আর কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা কুফরী।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ

মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি শাস্তি হবে তাদের যারা চিত্র বা মূর্তি নির্মাণ করে। [সহীহ্ বুখারী]

এখানে প্রশ্ন হতে পারে কাফিরদের সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি দেওয়া হবে বলে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু হাদীসে বলা হচ্ছে চিত্রকরদের সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর শাস্তি দেওয়া হবে এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য ইমাম ইবনে জারীর তাবারী ﷬ বলেন,

المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله تعالى وهو عارف بذلك قاصد له فإنه يكفر بذلك

এই হাদীসে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপসনা করা হয় এমন মূর্তি বা চিত্র নির্মাণ করে। কারণ যে স্বেচ্ছায় জেনে-শুনে এমন চিত্র বা মূর্তি নির্মাণ করে যার উপসনা করা হবে সে কাফির হয়ে যায়। [ফাতহুল বারী ও উমদাতুল কারী]

বর্তমানে এমন লোক পাওয়া যায় যারা নিজেদের প্রগতিশীল ও উদারপন্থী প্রমাণ করার জন্য কাফিরদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করে। তাদের কেউ কেউ কাফিরদের বিভিন্ন শিরক-কুফরে সরাসরি

---

[৮৫] একাজ স্পষ্ট কুফরী তবে এসব ব্যক্তিরা অজ্ঞতার কারণে ছাড় পেতে পারে। এ বিষয়ে এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সহযোগিতা প্রদান করে । কাফিরদের মন্দির, মঠ বা গীর্জা নির্মাণে আর্থিক বা শারিরীকভাবে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি তো বর্তমানে ফ্যাশানে পরিনত হয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে একটি সংবাদপত্রে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক খবরটি পড়েছিলাম। একজন মুসলিম নামধারী যুবক হিন্দুদের দূর্গাপূজা উপলখ্যে মূর্তি নির্মাণ করেছিল। তার যুক্তি ছিল, আমার পেশা মূর্তি নির্মাণ করা আমি তাই করেছি, আমি তো মূর্তির পূজা করছি না। তখন রমজান মাস ছিল। সে এও দাবী করেছিল যে, আমি রোজা পালন করি। এর অর্থ, আমি পূজা করার জন্য মুশরিকদের মূর্তি নির্মাণ করে দিলেও আমি একজন ভাল মুসলিম। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে সাধারনভাবে মূর্তি নির্মাণ বা চিত্র অংকন হারাম আর যেসব মূর্তি বা চিত্রের ইবাদত করা হয় সেগুলো নির্মাণ করা কুফরী যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতাদের বদ অভ্যাস হলো, সব ধর্মের লোকদের ভোট নিশ্চিত করার জন্য তাদের নিকট ধরনা দেওয়া। ক্ষেত্র বিশেষে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বা তাদের মন্দির, গীর্জা, মঠ ইত্যাদি উপাসনালয় বিনির্মাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। নিজেকে আলেম দাবী করে বা সাধারন মানুষ তাকে আলেম মনে করে এমন কিছু দাড়ি-টুপি ওয়ালা ইসলামপন্থী নেতাও এধরণের ঈমান বিধ্বংশী কর্মকান্ডে লিপ্ত। তাদের যুক্তি হলো, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান সর্বশ্রেণীর জনগণ আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। অতএব, তাদের সবার স্বার্থে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এরা আরো বলে, একজন নেতা সকল ধর্মের লোকদের নেতা এবং একজন রাজা সকল ধর্মের লোকদের রাজা অতএব তিনি সকল ধর্মের লোকদের সমান দৃষ্টিতে দেখবেন।

তাদের এই সকল যুক্তির সুস্পষ্ট জবাব হলো, ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনবিধান। সকল স্তর এবং সকল পেশার লোকেরা ইসলামী বিধান মেনে চলতে বাধ্য। কেউ বলবে, আমার পেশা মূর্তি নির্মাণ করা অতএব, আমি মূর্তি নির্মাণ করলে কোনো ক্ষতি নেই। আরেকজন বলবে, আমার পেশা পতীতাবৃত্তি অতএব, জেনা-ব্যাভিচার আমার জন্য দোষনীয় নয়। আবার অন্য আরেকজন বলবে, আমি রাজনৈতিক নেতা জাত-পাত দেখতে গেলে আমার চলবে না। ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে এসব যুক্তি প্রমাণ ধার্তব্য নয়। দল-মত শ্রেণী-সংঘ নির্বিশেষে সকলেই নিজ নিজ স্থানে ইসলামী বিধানের আনুগত্য করতে বাধ্য। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ নিজে এবং তারপর তার অনুসারী সত্যপন্থী খোলাফায়ে রাশেদা দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তাদের অধীনে একদিকে মুসলিম প্রজারা ছিল অপর দিকে অমুসলিম জিম্মীরাও ছিল। পূর্বে জিজিয়া সম্পর্কিত আলোচনাতে আমরা স্পষ্ট করে দেখিয়েছি যে, তারা মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে সমতা বন্টন করেন নি। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের প্রকাশ্যে ধর্মপালনের স্বাধীনতাও দেওয়া হয়নি। তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে প্রচার করার অধিকারও তারা পায় নি। উমর ইবনে খাত্তাব رضي الله عنه শামের খৃষ্টানদের নিকট শর্ত করেছিলেন,

তারা নতুন কোনো গীর্জা নির্মাণ করতে পারবে না। ইবনে কাছীর সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। যেখানে তারা নিজেরাই কোনো গীর্জা নির্মাণ করতে পারবে না সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান নিজ তত্ত্বাবধায়নে তাদের গীর্জা নির্মাণ করে দেবেন এটা কেমন হতে পারে! একারণে ওলামায়ে কিরাম স্পষ্ট করে বলেন,

لَا يُعَادُ مَا انْهَدَمَ مِنْ الْكَنَائِسِ ، وَأَنَّ مَنْ سَاعَدَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ رَاضٍ بِالْكُفْرِ وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ

যে সকল গীর্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেগুলো পুননির্মাণ করা যাবে না। সে ব্যক্তি ওগুলো পুননির্মানে সহযোগিতা করবে সে কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করছে বলে গণ্য হবে আর কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা কুফরী। [রুদ্দুল মুহতার]

সুতরাং পেশা, রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের অজুহাতে বিধর্মীদের ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রদান করার মাধ্যমে পূজা-উপাসনা ও শিরক-কুফরের আড্ডাখানা নির্মাণ করা শিরক-কুফরীতে সহযোগিতা করা তথা স্পষ্ট কুফরী হিসাবে গণ্য।

◆ ***মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফিরদের সহযোগিতা করার বিধান।***

উপরে আমরা স্পষ্ট উল্লেখ করেছি যে, কুফরী কাজে কাফিরদের সহযোগিতা করা কুফরী। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো পাপ কাজে যে কাউকে সহযোগিতা করা পাপ কাজ, কিন্তু কুফরী নয়। এ মূলনীতির আলোকে কোনো মুসলিম যদি তথ্য প্রদান করে বা অন্য কোনো উপায়ে মুসলিমদের বিপরীতে কাফিরদের সহযোগিতা করে তার ব্যাপারে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা যায়। যদি সে কুফরীর প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে এবং ইসলাম ধর্মকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে এটা করে তবে তা কুফরী বলে গণ্য হবে কিন্তু কেবল মাত্র পূর্ব শক্রুতা বা দুনিয়াবী মাল-সম্পদের লোভে যারা এমন করে তারা ভীষণ অপরাধী বলে গণ্য হবে তবে কাফির হবে না। বর্তমানে এই মাসয়ালাটি বিতর্কের লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত হয়েছে। তাই এ বিষয়ে সুবিস্তারে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। সমসাময়িক আলেম ওলামাদের কেউ কেউ মুসলিম কিভাবে কাফির হয় সে প্রসঙ্গে নতুন একটি বিষয় সংযোজন করে থাকেন। তারা বলেন, " মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের যে কোনো প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা কুফরী "। যদি কোনো মুসিলম এমনটি করে সে কাফির হবে। এ বিষয়ের উপর নির্ভর করে যেসব মুসলিম গোয়েন্দা কাফিরদের নিকট মুসলিমদের গোপন খবর পৌছে দেয় তারা তাদের কাফির বলেন। একইভাবে কাফির ও মুরতাদ রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে যেসব মুসিলম সৈন্য রয়েছে, তারা তাদের স্পষ্ট কাফির হিসেবে ঘোষণা করে থাকেন। কেউ কেউ এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে এমন অযৌক্তিক দাবী করে।

সমসায়িক যুগের কিছু আলেম এটা বর্ণনা করেছেন আর আবেগপ্রবন তরুনরা তা লুফে নিয়েছে। কুরআন হাদীসের দলীল প্রমাণ ও পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীনের মতামতের আলোকে বিষয়টি যাচাই করে দেখার মতো নিরপেক্ষতা খুব কম লোকই প্রদর্শন করেছে। আমরা এখানে সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করতে চাই আর আল্লাহই তৌফিক দাতা।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব ﷺ বলেন,

الثامن: مُظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين

ঈমান ভঙ্গের অষ্টম কারণ হলো মুসলিমদের বিপক্ষে মুশরিকদের সাহায্য করা।

[নাওয়াকিদ আল ইসলাম]

শায়েখ আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদীর অনুসারী সমসাময়িক অন্যান্য নজদী ও সালাফী ওলামায়ে কিরাম অনুরুপ কথা বলে থাকেন। কেউ কেউ এ বিষয়ে ইজমাও উল্লেখ করে থাকেন। এ বিষয়ে ইজমার প্রমাণ স্বরুপ অনেকে বলেন, ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণের মধ্যে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব এ বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন এটা প্রমাণ করে এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে। অথচ এ দশটি বিষয়ের মধ্যে সপ্তম বিষয়টি হলো, জাদু। আর জাদু সম্পর্কে হানাফী ও শাফেঈ মাজহাবের স্পষ্ট মত হলো তা নিজে কুফরী নয় যতক্ষণ না তার মধ্যে অন্য কোনো কুফরী পাওয়া যায়। এটাই প্রমাণ করে ইজমা উল্লেখের ব্যাপারে তারা কতটা অসতর্ক!

এ বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করে শায়েখ বিন বায বলেন,

وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة, فهو كافر مثلهم

মুসলিম উম্মার আলেমরা ইজমা করেছেন, যে ব্যাক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের যে কোনো প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে সে তাদের মতই কাফির হবে। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়ায়ে বিন বায]

এই সকল ওলামায়ে দ্বীন কি উদ্দেশ্যে এই মূলনীতিটি বর্ণনা করেছেন তা স্পষ্ট নয় তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যারা এই সকল মূলনীতিটি অকাট্য ও অলংঘনীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এর উপর নির্ভর করে মুসলিমদের বিপরীতে কাফির-মুশরিকদের যে কোনো প্রকার সহযোগিতা করা স্পষ্ট কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করে তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। যেহেতু এর মাধ্যমে যে মুসলিম কাফিরদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরী করবে বা কাফির-মুশরিক ও মুরতাদ শাসকের অধীনে সৈনিক হিসেবে কর্মরত থাকে সে কাফির প্রমাণিত হয়। অথচ এই ধরনের ব্যক্তি কাফির না হওয়ার পক্ষে ওলামায়ে

কিরামের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে যা আমরা পরবর্তীতে বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ।

শায়েখ বিন বায যে ইজমা উল্লেখ করেছেন তার মাধ্যমে তিনি কি উদ্দেশ্য করেছেন সে বিষয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, কারণ তিনি নিজে ইরাকের সাবেক রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসনকে কুফরী মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু তার সাথে সহযোগী মুসলিম সৈন্যরা যদি তার মতবাদে বিশ্বাসী না হয় তবে কাফির হবে না এমন মন্তব্য করেছেন। সাদ্দাম হোসেন কাফির কিনা সে সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,

هو كافر وإن قال : لا إله إلا الله , حتى ولو صلى وصام , ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعثية الإلحادية , ويعلن أنه تاب إلى الله منها وما تدعو إليه , ذلك أن البعثية كفر وضلال , فما لم يعلن هذا فهو كافر

সে কাফির, যদিও সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করে, এমনকি যদি সলাত-সওমও পালন করে যতক্ষণ না সে, ধর্মদ্রোহী বা'ছ মতবাদ পরিত্যাগ করে এবং প্রকাশ্যে সেসব আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে তওবা না করে। কেননা বা'ছ মতবাদ হলো, কুফরী ও পথভ্রষ্টতা। অতএব, তা থেকে তওবা না করা পর্যন্ত সে কাফির।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায]

অন্য এক স্থানে তিনি বলেন,

صدام الذي هو أكفر من اليهود والنصارى

সাদ্দাম ইয়াহুদী খৃষ্টানদের চেয়ে বেশি কাফের। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায]

কিন্তু সাদ্দাম হোসেনের সহযোগি মুসলিম সৈনিকদের তিনি কাফির বলেন নি। সাদ্দাম হোসেন কুয়েতের উপর হামলা করলে বিন বায মুসলিমদের তার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে নির্দেশ দেন। সাদ্দাম হোসেনকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের চেয়ে অধিক কাফির হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা পবিত্র জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাকে প্রশ্ন করা হয় সাদ্দামের পক্ষে তো অনেক মুসলিম লড়াই করছে। তিনি বলেন,

والمقاتل مع صدام متوعد بالنار ؛ لأنه أعانه على الظلم والعدوان , ويخشى أن يكون كافرا إذا وافقه على بعثيته وإلحاده , أو استحل قتل المسلمين

যে মুসলিম সাদ্দামের পক্ষে যুদ্ধ করছে তার ব্যাপারে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয় রয়েছে যেহেতু সে জুলম-অত্যাচারের ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করছে। সে কাফির হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কাও রয়েছে যদি সে তার (সাদ্দামের) কুফরী মতবাদ গ্রহণ করে অথবা মুসলিমদের হত্যা করা বৈধ মনে করে।

মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়ায়ে ইবনে বায]

অর্থাৎ তিনি কুফরী মতবাদ গ্রহণ করা বা মুসলিমকে হত্যা করার মতো হারাম কাজকে হালাল মনে করা ছাড়া কেবলমাত্র মুসলিমদের বিপক্ষে সাদ্দামের মতো একজন কাফির সর্দারকে সহযোগিতা করা কুফরী বলে মনে করেন নি।

সুতরাং "মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের যে কোনো সহযোগিতা প্রদান করা কুফরী" ইবনে বায নিজেও এই ফতোয়াটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন নি। বরং যে ব্যক্তি কাফিরদের কুফরী মতবাদ গ্রহণ করে তাদের সহযোগিতায় লিপ্ত হয় তার ব্যাপারে এটা প্রয়োগ করেছেন।

শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদীর কথার উদ্দেশ্যও এমন হতে পারে। শায়েখ সালিহ্ আল-ফাওজান নাওয়াকিদুল ইসলামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদীর উপরোক্ত কথার ব্যাখ্যায় "কাফিরদের সহযোগিতা করার বিষয়টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেখানে তিনি বলেন,

فمن ظاهرهم وأعانم وساعدهم علي المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه والرضا عنهم وهو مختار غير مكره فإنه يكون كفرا أكبر مخرج من الملة

যদি কেউ কাফিরদের দ্বীনকে ভালবেসে এবং তারা যা কিছু করে তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় তাদের সহযোগিতা করে তবে এটা হবে বড় কুফর যার মাধ্যমে সে আল্লাহর দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে।

[দুরুস ফি শারহি নাওয়াকিদিল ইসলাম]

এর পর তিনি বলেন,

من يعين الكفار علي المسلمين وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه فهذا لا شك أنه فاعل كبيرة من كبائر الذنوب ويخشي عليه من الكفر.

যে কেউ মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করে কিন্তু সে কাফিরদের দ্বীনকে ঘৃণা করে এবং সেটা মেনে না নেই তবে নিঃসন্দেহে এটা কবীরা গোনা হিসেবে গণ্য হবে আর এই ব্যক্তির ব্যাপারে কাফির হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। [দুরুস ফি শারহি নাওয়াকিদিল ইসলাম]

তিনি বলেছেন, কাফির হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এর অর্থ কাফিরদের দ্বীন মেনে না নিয়ে তাদের সহযোগিতা করা স্পষ্ট কুফরী নয় তাই এর মাধ্যমে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা যাবে না। যেহেতু আশঙ্কা বা সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা যায় না। এটা সর্ব স্বীকৃত মূলনীতি যেমনটি আমরা পূর্বে বহুবার বলেছি।

শায়েখ সালিহ্ আল-ফাওজান যে ব্যাখ্যা করেছেন শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদীর কথার ব্যাখ্যা যদি এটিই হয় তবে তা নিঃসন্দেহে সঠিক। এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করাও সঠিক। কিন্তু যদি শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদীর কথা থেকে এমন প্রমাণ করা হয় যে, মুসলিমদের বিপরীতে কাফিরদের যে কোনো প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা সর্বাবস্থায় কুফরী হবে তবে তা উম্মতে মুসলিমার আলেমদের মতমতের আলোকে স্পষ্ট ভ্রান্তি হিসেবে গণ্য হবে।

এ মূলনীতিটির স্বপক্ষে একটি আয়াত বারবার পেশ করা হয়। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}

﴾ হে ঈমানদাররা, তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত হয়। ﴿

[সূরা মায়েদা/৫১]

কুরআন-হাদীস হতে কোনো বিষয়ে দলিল পেশ করা এবং তার আলোকে বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রমাণ করার পন্থা পদ্ধতি সম্পর্কে যারা অবগত নয়, তারা এই আয়াতটিকে "মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের সহযোগিতা করা কুফরী" এ মূলনীতির স্বপক্ষে অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয় দলিল হিসেবে মনে করে। সত্য কথা হলো, এই আয়াতটি হতে কোনো বিধান প্রমাণ করার জন্য সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু এখানে স্পষ্ট করে এমন বলা হয় নি যে, "মুসিলমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য যে করে সে কাফির হয়ে যায়।" বরং এখানে বলা হয়েছে, "মুসলিমদের মধ্যে যে কেউ কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে সে তাদের মধ্যে অন্তভূক্ত"। সুতরাং আয়াতটির দুটি অংশ রয়েছে।

ক. কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা।

খ. যে এটা করে সে কাফিরদের মধ্যে অন্তভূক্ত হওয়া।

এই আয়াতটি হতে "মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের সহযোগিতা করা কুফরী" এটা প্রমাণ করতে হলে এর দুটি অংশের উপরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন, বন্ধু গ্রহণ করা বলতে কি বোঝায়?

বন্ধু গ্রহণ করা অর্থে উপরোক্ত আয়াতে আরবী শব্দ তাওয়াল্লী (تولي) ব্যাবহার করা হয়েছে, যা মূল শব্দ, ওয়ালাইয়া (ولاية) বা ওয়ালা (ولاء) থেকে উদ্‌গত। যার অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, ভালবাসা, সাহায্য করা, সম্পর্ক গড়া ইত্যাদি। [মু'জামুল ওয়াসিত] বাংলাতে বন্ধু গ্রহণ করা বা সম্পর্কিত হওয়া এখানে সমার্থবোধক

শব্দ। এ দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা করলে দেখা যাবে, কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন,

ক. ইসলামের বিপরীতে কাফিরদের ধর্ম মেনে নেওয়া।

খ. কাফিরদের সাথে ওঠা-বসা ও চলা-ফেরা করা।

গ. সুন্দর চেহারা বা অন্য কোনো দুনিয়াবী কারণে কোনো কাফিরকে ভালবাসা।

ঘ. যুদ্ধ-বিগ্রহে কাফিরদের পক্ষাবলম্বন করা।

ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক হিসেবে গণ্য করা যায়। এখন প্রশ্ন হলো, উপরোক্ত আয়াতের অর্থ কি এটা যে, কাফিরদের সাথে যে কোনো প্রকার বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক স্থাপণ করাই কুফরী হবে? স্বাভাবিক চিন্তার মাধ্যমেই এটা অসম্ভব প্রমাণিত হয়।

যদি কোনো মুসিলম হিন্দু বন্ধু-বান্ধবের সাথে ওঠা-বসা বা চলা-ফেরা করে তাকে কাফির বলা যেতে পারে না। যদিও এ কাজ প্রশংসিত নয়।

আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে বা অন্য কোনো বৈধ কারণে কোনো কাফিরকে ভালবাসলে সেটি কুফরীও নয় নিষিদ্ধও নয়।

আল্লাহর ﷻ তার রসুল ﷺ কে বলেন,

{إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}

আপনি যাকে ভালবাসেন তাকে তো পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম নন। [কাসাস/৫৬]

মুফাস্‌সিরীনে কিরামের নিকট এই আয়াতের একটি অর্থ হলো, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আবু তালেবকে আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে ভালবাসতেন তাই তার হেদায়েত কামণা করতেন কিন্তু আল্লাহ্ তাকে জানিয়ে দেন যে, আপনি যাকে ভালবাসেন তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারেন না বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। [আল-মাওরুদী তার তাফসীরে]

কাফিরদের প্রতি এই প্রকৃতির ভালবাসা নিষিদ্ধ নয়।

এমনকি শরীয়তে নিষিদ্ধ পন্থায় কাফিরদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলাও ক্ষেত্র বিশেষে কুফরী না হতে পারে। যদি কোন মুসিলম পুরুষ একজন হিন্দু মহিলার সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং তার সাথে জেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবু এই ব্যক্তিকে কাফির বলা যায় না। যদিও একাজ ঘৃণিত পাপ হিসেবে

গণ্য।

মুসিলদের বিপক্ষে কাফিরদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এর মাধ্যমে কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং তাদের সাথে সম্পর্ক করা হয় এটা সঠিক কিন্তু এটা কুফরী বলা যেতে পারে না যদিও এটা মারাত্মক অপরাধ। যেহেতু পাপ ও অপরাধের কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা যায় না যতক্ষণ না সে কাফিরদের ধর্মকে পছন্দ করে বা তাদের কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের পক্ষাবলম্বন করে।

যদি প্রথম অংশের অর্থ ধরা হয়, কাফিরদের সাথে যে কোনো প্রকার বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক করা তবে দ্বিতীয় অংশে ‘‘সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত’’ এর মাধ্যমে সে কাফির এমন অর্থ করা যাবে না। বরং এর উদ্দেশ্য হবে অধিক কঠোরতা প্রদর্শন। যেমনটি আমরা পূর্বেও বেশ কিছু আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে দেখেছি।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, (من تشبه بقوم فهو منهم) ‘‘যে কেউ কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত’’ [৮৬] [আবু দাউদ] এই হাদীসটির অর্থের ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কিরাম একমত যে, কাফিরদের সাথে যে কোনো প্রকার সাদৃশ্য রাখলেই একজন মুসলিম কাফির হয়ে যাবে তা নয় বরং হাদীসটির উদ্দেশ্য অধিক কঠোরতা প্রদর্শন করা এবং এধরণের কাজ থেকে সতর্ক করা। মোট কথা আয়াতটির প্রথম অংশে যদি আমরা সকল প্রকার বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক বুঝি তবে শেষের অংশে কুফরী নয় বরং পাপ ও নিষিদ্ধ কর্ম বুঝতে হবে এবং সেক্ষেত্রেও বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের কিছু বিষয় এই আয়াতের বাইরে থাকবে যেহেতু কাফিরদের সাথে সম্পর্ক রাখা কিছু ক্ষেত্রে বৈধ যেমনটি আমরা দেখেছি।

আর যদি দ্বিতীয় অংশের অর্থ করা হয়, ‘‘সে কাফির হবে’’ তবে প্রথম অংশে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক বলতে কাফিরদের সাথে যে কোনো প্রকার বন্ধুত্ব বোঝাবে না। বরং তাদের দ্বীন গ্রহণ করা এবং তাদের কুফরী আক্বীদা-বিশ্বাসকে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক করা বোঝাবে।

ইমাম আল-মাওরুদী ﷺ তার তাফসীরে বলেন,

{ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم } يحتمل وجهين : أحدهما : موالاتهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر .والثاني : موالاتهم في الدين فإنه منهم في حكم الكفر

‘‘তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত হবে’’ এর দুটি

[৮৬] হাফিজ ইবনে হাজার আসক্বালানী ﷺ বলেন, (اخرجه ابو داود بسند حسن) ‘‘হাদিসটিকে আবুদাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। ‘‘ [ফাতহুল বারী] অন্য স্থানে তিনি বলেন, (أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان) ‘‘হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে হিব্বাস সহীহ্ বলেছেন’’ শায়েখ আলবানীও হাদীসটিকে হাসান বলেছেন [মিশকাত/৪৩৪৭]

অর্থ রয়েছে,

এক: কাজে-কর্মে তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা। সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হওয়া অর্থ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার ব্যাপারে। (অর্থাৎ সে পাপী হবে, কাফির হবে না।)

দুই: যদি তাদের দ্বীন (ধর্ম) মেনে নিয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা হয় তবে এখানে কুফরীর ব্যাপারেই তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে (এই ব্যক্তি কাফির হবে)। [আন-নিকাত ওয়াল উয়ূন]

এই আয়াতটি যে, কুফরী ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা রয়েছে। ইমাম মালিক ﷺ তার মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, যেসব আরব পরবর্তীতে খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল, অন্যান্য খৃষ্টানদের মতো তাদের যবেহ করা পশুর মাংস খাওয়া যাবে কি না সে সম্পর্কে ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, (لا بأس بها) "এতে কোনো সমস্যা নেই এবং এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন"

আল্লাহ্ ﷻ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের যবেহ করা পশুর মাংস খাওয়া মুসলিমদের জন্য বৈধ করেছেন। [মায়েদা/৫] এ আয়াতের উপর নির্ভর করে জন্মগত ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের যবেহ করা পশু খাওয়া সকল আলেম বৈধ বলেছেন। কিন্তু যারা জন্মগত খৃষ্টান নয় তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, অগ্নিপূজা ইত্যাদি ধর্ম থেকে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে তাদের যবেহ করা পশু খাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে। যারা এই ধরণের ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের যবেহ করা পশু খাওয়া যাবে এমন মত দিয়েছেন তারা এই আয়াত থেকে দলিল পেশ করেছেন। যেহেতু এখানে বলা হয়েছে যে কেউ ইয়াহুদী খৃষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত হয়। অর্থাৎ যে কেউ ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ধর্ম গ্রহণ করে সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত হবে। ফলে তার উপর তাদের যাবতীয় বিধান প্রযোজ্য হবে। মুসলিমদের জন্য তার যবেহ করা পশু খাওয়া এবং তার কন্যা বিবাহ করা বৈধ হবে ইত্যাদি। ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনাটিতে এ কথাই বলা হয়েছে।

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, উপরোক্ত আয়াতটি ব্যবহার করে, "মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের যে কোনো প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা কুফরী" এই মূলনীতি সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের কারো স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে এই মুলনীতি সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কেউ কেউ ইমাম কুরতুবী, ইবনে জারীর তাবারী, ইমাম বাগাবী প্রমুখ ওলামায়ে দ্বীনের কথা ভুলভাবে উপস্থাপণের মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ, এই সকল ওলামায়ে কিরামের যে কথার মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় তা অস্পষ্ট এবং তার বিপরীতে তাদের স্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম কুরতুবী ﷬ থেকে উল্লেখ করা হয়, তিনি সূরা মায়েদার উপরোক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন,

(وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ) أي يعضدهم على المسلمين (فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) بين تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة

"যে কেউ তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে" অর্থাৎ তাদের মুসলিমদের বিপক্ষে সাহায্য করে "তবে সে তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত" আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, তার বিধান তাদের মতই হবে। এটা প্রমাণ করে, কোনো মুসলিম মুরতাদের ওয়ারিশ হবে না। কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিল আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই। আর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া (মুসলিম মুরতাদের ওয়ারিশ না হওয়া) কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। [তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম কুরতুবীর এই কথাটিকে "যে কেউ মুসলিমদের বিপরীতে কাফিরদের যে কোনো প্রকার সহায়তা প্রদান করে সে কাফির" এ বিষয়ে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তি যুক্ত নয়। কারণ, ইমাম কুরতুবী এখানে "তারা কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে" এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তারা মুসলিমদের বিপক্ষে তাদের সাহায্য করে" কি প্রকার সাহায্য তা তিনি স্পষ্ট করেন নি। যদি ধরে নেওয়া হয়, ইমাম কুরতুবী এখানে যে কোনো প্রকার সাহায্য উদ্দেশ্য করেছেন এবং তার উপর কুফরীর বিধান জারী করেছেন তবে তা ভুল হবে কারণ অন্য স্থানে তিনি স্পষ্ট বলেন,

من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين

যে ব্যক্তি বারবার মুসলিমদের গোপন বিষয় কাফিরদের নিকট ফাস করে সে একাজের মাধ্যমে কাফির হবে না। যদি তার এ কাজ দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্যে হয় এবং তার আকীদা সঠিক থাকে যেমনটি হাতিব ﷠ করেছেন যেহেতু তিনি তার আত্মীয় স্বজনদের নিরাপত্তার জন্য একাজ করেছিলেন দ্বীন ত্যাগের উদ্দেশ্যে নয়। [তাফসীরে কুরতুবী]

সুতরাং মুসলিমদের গোপন খবর কাফিরদের নিকট নিয়মিত আদান-প্রদানের মাধ্যমে কাফিরদের সাহায্য করা ইমাম কুরতুবী ﷬ কুফরী ও দ্বীনত্যাগ বলে মনে করেন নি। অতএব, উপরের উদ্ধৃতিতে "মুসলিদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করে" ইমাম কুরতুবীর এ কথাটি যে কোনো প্রকার ও যে কোনো অবস্থার সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এর স্পষ্ট অর্থ হলো, ইমাম কুরতুবী মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের সাহায্য করা সর্বাবস্থায় কুফরী হবে এটা মনে করেন না। এখানে বড় জোর এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, তিনি মুসলিমদের বিপরীতে কাফিরদের সহযোগিতা করা কোনো কোনো অবস্থায় কুফরী হতে পারে এমন মনে করেন। মুসলিম গোয়েন্দার ব্যাপারে তার মতামত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, অন্য সকল ওলামায়ে কিরামের মতো ইমাম কুরতুবীও আল্লাহর দ্বীন ত্যাগের উদ্দেশ্য ছাড়াই এবং কাফিরদের দ্বীনকে পছন্দ না

করেই কেবলমাত্র মুসলিমদের বিপরীতে কাফিরদের সহায়তা করা কুফরী মনে করেন না। অতএব, "মুসলিমদের বিপরীতে কাফিরদের যে কোনো প্রকার সহায়তা প্রদান করা কুফরী" এ মতের স্বপক্ষে ইমাম কুরতুবীর এই কথাটি উপস্থাপণ করা স্পষ্ট জুলুম ও অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়। একজন আলেমের স্পষ্ট বক্তব্য পরিত্যাগ করে তার অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা স্বাপেক্ষ্য মতামতের মাধ্যমে কোনো বিষয় প্রমাণ করার চেষ্টা কখনই সুবিবেচনা বলে গণ্য হতে পারে না।

এ বিষয়ে ইমাম বাগাবীর যে কথাটি উল্লেখ করা হয় সেটিও অনুরুপ। সূরা আলে ইমরানের ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

{ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ } أي موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهم وإظهارهم على عورة المسلمين { فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ } [أي ليس من دين الله في شيء]

"যে কেউ এমন করে" অর্থাৎ যে কেউ মুসলিমদের গোপন খবর কাফিরদের নিকট পাচার করার মাধ্যমে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। "তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই" অর্থাৎ তার সাথে আল্লাহর দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই। [তাফসীরে বাগাবী]

তারা বলেন, ইমাম বাগাবী ﷺ বলেছেন, তার সাথে আল্লাহর দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ সে মুরতাদ।

এখানে দুটি মারাত্মক ভ্রান্তি রয়েছে। প্রথমত আল্লাহর দ্বীনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই এর অর্থ সে কাফির হয়ে গেছে এমন মনে করা সঠিক নয়। এধরণের বাক্য সাধারনত কঠোরতা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ খারেজীদের সম্পর্কে বলেছেন, যেভাবে তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায় তারা আল্লাহর দ্বীন থেকে সেভাবে বের হয়ে যাবে। এ সত্ত্বেও বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরাম খারেজীদের কাফির বলেন নি। সুতরাং ইমাম বাগাবী ﷺ বলেছেন, যে মুসলিমদের গোপন খবর কাফিরদের নিকট পাচার করে তার সাথে আল্লাহর দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই অতএব তিনি গোয়েন্দাকে কাফির বলছেন এমন মন্তব্য করা ভীষণ অসচেতনতা হিসেবে গণ্য। এর চেয়েও বেশি অসতর্কতা ও অসচেতনতা হলো, গোয়েন্দা সম্পর্কে ইমাম বাগাবীর স্পষ্ট ফতোয়াকে পরিত্যাগ করা। তিনি গোয়েন্দার বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট বলেন,

ومن تجسس للكفار من أهل الذمة ، كان ذلك منه نقضا للعهد ، وإن فعله مسلم ، فلا يحل قتله ، بل يعزر

জিম্মী কাফিরদের মধ্যে যে কেউ কাফিরদের পক্ষ হয়ে গোয়েন্দাগিরী করে তার সাথে চুক্তি ভঙ্গ হবে না (তাকে হত্যা করা হবে না)। যদি কোনো মুসলিম এটা করে তবে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না বরং

অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হবে। [শারহুস্ সুন্নাহ্]

সুতরাং শাফেঈ মাযহাবের অন্যান্য আলেমদের মতো ইমাম বাগাবীও মুসলিম গোয়েন্দাকে হত্যা করা বৈধ মনে করেন না। এই স্পষ্ট ফতোয়াটি পরিত্যাগ করে উপরোক্ত কথাটির মাধ্যমে ইমাম বাগাবী মুসলিম গোয়েন্দাকে মুরতাদ মনে করেন এমন দাবী করা কিভাবে সুবিচার হতে পারে!

এ বিষয়ে ইবনে জারীর তাবারী ﵀ হতে যে কথাটি বর্ণনা করা হয় তা আরো স্পষ্ট। সূরা আলে ইমরানের আয়াতটির ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

ومعنى ذلك: لا تتخذوا، أيها المؤمنون، الكفارَ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلُّونهم على عوراتهم، فإنه مَنْ يفعل ذلك "فليس من الله في شيء"، يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر

আয়াতটির অর্থ হলো, হে মুমিনরা, তোমরা কাফিরদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করো না যে, তোমারা তাদের দ্বীন মেনে নিয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, মুসলিমদের পরিবর্তে তাদের সহযোগিতা করবে এবং মুসলিমদের গোপন খবর তাদের জানিয়ে দেবে। যে এমন করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এর অর্থ সে কুফরীর মধ্যে প্রবেশ করে আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগ করার কারণে আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন হয়ে যাবে।

এর পর তিনি নিজের কথার স্বপক্ষে ইমাম সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন,

أما"أولياء" فيواليهم في دينهم، ويظهرهم على عورة المؤمنين، فمن فعل هذا فهو مشرك، فقد برئ الله منه

এখানে বন্ধু গ্রহণ করা বলতে বোঝানো হয়েছে, তাদের ধর্মের ব্যাপারে তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদের নিকট মুসলিমদের গোপন খবর ফাস করে দেওয়া। যে এটা করে সে মুশরিক। সে আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন। [তাফসীরে তাবারী]

এই বর্ণনাটি উল্লেখ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় কাফিরদের নিকট মুসলিমদের গোপন সংবাদ বলে দেওয়া ইবনে জারীর তাবারীর নিকট কুফরী হিসেবে গণ্য। অথচ ইবনে জারীর তাবারী নিজে এবং ইমাম সুদ্দী থেকে যে তাফসীর তিনি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে মুসিলমদের সংবাদ কাফিরদের জানিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং কেবলমাত্র গোয়েন্দা সম্পর্কে তারা এ বিধান দেন নি বরং যে গোয়েন্দা কাফিরদের ধর্মকে মেনে নেয় এবং মুসিলমদের গোপন সংবাদ সম্পর্কে তাদের অবহিত করে ইবনে জারীর তাবারী ও ইমাম সুদ্দী

তাদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, তাদের এ কথার মাধ্যমে উপরোক্ত মূলনীতি প্রমাণিত হয় না।

সূরা মায়েদার আয়াতটি সম্পর্কে ইবনে হিযাম ﷺ বলেন,

وَصَحَّ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} إِنَّمَا هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ بِأَنَّهُ كَافِرٌ مِنْ جُمْلَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ - وَهَذَا حَقٌّ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

এটা সঠিক যে, আল্লাহর বাণী, (ومن يتولهم منكم فانه منهم) "তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত হয়। এই আয়াতটির বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ যোগ্য যে সে কাফির হবে। সাধারন ভাবে সে কেবল কাফির হবে। এ বিষয়ে দুজন মুসলিমও দ্বিমত করতে পারে না।

[আল-মুহাল্লা]

এই উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করে কেউ কেউ দাবী করেন, মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের সহযোগিতা করা কুফরী এ ব্যাপারে ইবনে হিযাম ﷺ ইজমা উল্লেখ করেছেন। এমন দাবী তাদের নির্বুদ্ধিতার প্রমান বহন করে। ইবনে হিযাম ﷺ কি প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন এবং কি উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কথাটি বলেছেন তারা সেটা লক্ষ্য করেন নি।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (الاسلام يجب ما كان قبله) ইসলাম গ্রহণ করলে পূর্বের সকল পাপ মাফ হয়ে যায়। [মুসনাদে আহমদ] এ বিষয়ে উম্মতের ওলামায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন যে, জন্মগত কাফির যদি মুসলিম হয় তবে তার পূর্বের যে কোনো অপরাধ মাফ হয়ে যাবে। এমনকি যদি সে মুশরিক থাকা অবস্থায় কোনো মুসলিমকে হত্যা করার পর মুসলিম হয়ে যায় তবে সে মৃত্যুদন্ড থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু যদি কোনো মুসলিম এধরণের অপরাধ করে কাফির হয়ে যায় এই মুরতাদ যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয় তবে তার এ অপরাধ ক্ষমা হবে কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত আছে। যারা জন্মগত কাফিরের মতোই উক্ত মুরতাদের অপরাধ ক্ষমা হবে এমন মত দিয়েছেন তারা নিজেদের স্বপক্ষে উপরোক্ত আয়াতটিকে দলিল হিসেবে উপস্থাপণ করেছেন যেখানে আল্লাহ বলেন, "যে কেউ তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত হবে।" তারা বলেন, যেহেতু ইসলাম পরিত্যাগ করে যে কাফির হয়ে যায় সে কাফির বলেই গণ্য হবে অতএব, একজন জন্মগত কাফির যেমন ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হয় একইভাবে ইসলাম পরিত্যাগ করে যে কাফির হয়ে যায় তথা মুরতাদ যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

এই প্রসঙ্গে ইবনে হিযাম উপরোক্ত কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, (بِأَنَّهُ كَافِرٌ مِنْ جُمْلَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ)

"সাধারন ভাবে সে কেবল কাফির-" অর্থাৎ এ আয়াত শুধু এতটুকু প্রমাণ করে যে, ইসলাম ত্যাগ করে যে কাফির হয়ে যায় সেও কাফির কিন্তু সকল ব্যাপারে জন্মগত কাফিরদের সাথে তার বিধান একই হবে এটা সঠিক নয়। এ অর্থে তিনি বলেছেন, (وَهَذَا حَقٌّ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) "এ ব্যাপারে দুজন মুসলিমও দ্বিমত করতে পারে না"। অর্থাৎ মুরতাদ যে কাফির তার ব্যাপারে দুজন মুসলিমও দ্বিমত করতে পারে না।

যারা মনে করে, "মুসলিমদের বিপরীতে কাফিরদের সহযোগিতা করা কুফরী" এ ব্যাপারে ইবনে হিযাম ﵀ কেউ দ্বিমত করতে পারে না একথা বলেছেন এটা তাদের অন্যান্য অজ্ঞতার মধ্যে একটি বাড়তি সংযোজন ছাড়া কিছু নয়।

তবে এ বিষয়ে ইবনে হিযাম ﵀ থেকে আরেকটি ফতোয়া আছে। যে মুসলিম ইসলামী রাষ্ট্র পরিত্যাগ করে কাফিরদের রাষ্ট্রে চলে যায় সে কি মুরতাদ হবে? এই শিরোনামে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين) " যে মুসলিম মুশরিকদের এলাকায় বসবাস করে তার সথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" [৮৭] [আবু দাউদ] এই হাদীসটি উল্লেখ করে তিনি (ইবনে হিযাম) বলেন,

فَصَحَّ بِهَذَا أَنَّ مَنْ لَحِقَ بِدَارِ الْكُفْرِ وَالْحَرْبِ مُخْتَارًا مُحَارِبًا لِمَنْ يَلِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ بِهَذَا الْفِعْلِ مُرْتَدٌّ لَهُ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ كُلُّهَا: مِنْ وُجُوبِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، مَتَى قُدِرَ عَلَيْهِ، وَمِنْ إبَاحَةِ مَالِهِ، وَانْفِسَاخِ نِكَاحِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَبْرَأْ مِنْ مُسْلِمٍ

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি কাফিরদের এলাকায় বসবাস করে এবং আশেপাশের মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় সে এই কাজের মাধ্যমে মুরতাদে পরিনত হয়। মুরতাদের যাবতীয় বিধান তার উপর প্রযোজ্য হয়। তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হলে হত্যা করা ওয়াজিব হয়, তার সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া বৈধ হয়। তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয় ইত্যাদি। যেহেতু রাসুলুল্লাহ্ ﷺ যার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন সে মুসলিম হতে পারে না। [আল-মুহাল্লা]

তিনি আরো বলেন,

فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُحَارِبًا لِلْمُسْلِمِينَ مُعِينًا لِلْكُفَّارِ بِخِدْمَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ: فَهُوَ كَافِرٌ

[৮৭] এই হাদীসটি সহীহ এর সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত কথা পূর্বে গত হয়েছে।

যদি সে সেখানে (কাফিরদের রাষ্ট্রে) অবস্থান করে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এবং কাফিরদের সেবা-যত্ন বা লেখালেখির মাধ্যমে সহযোগিতা করে তবে সে কাফির হবে। [আল-মুহাল্লা]

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, ইবনে হিযাম ﵀ এ বিষয়ে যে মত বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করেন নি। শুধু তাই নয়, তিনি এ বিষয়ে অন্য কোনো আলেমের মতও বর্ণনা করেন নি। এর অর্থ উপরোক্ত মতামতটি একান্তই তার নিজস্ব মত।

ইবনে হিযাম ﵀ এর পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে যারা জানেন তারা অবগত আছেন যে, তিনি শরীয়তের ব্যাপারে মতামত বর্ণনার ক্ষেত্রে নিজে যা সঠিক মনে করেন সেটাই ব্যক্ত করেন যদিও তা সমস্ত ফুকাহায়ে কিরামের মতের বিরুদ্ধে হয়। একারণে বহু ক্ষেত্রে তিনি বিরল ও অগ্রহণযোগ্য মতামত ব্যাক্ত করেছেন। ইমাম যাহাবী ﵀ এ সম্পর্কে বলেন,

وعيب بالشذوذ، ثم عدل إلى قول أصحاب الظاهر، فنقحه، وجادل عنه، وثبت عليه إلى أن مات

তাকে বিরল মত গ্রহণ করার দোষে দুষ্ট করা হয়েছে। এরপর তিনি জাহেরীদের মাজহাব গ্রহণ করেন, তাদের মতামত বিন্যস্ত করেন সেই মতের পক্ষে তর্ক-বিতর্ক করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এর উপরই টিকে থাকেন। [সিয়ার]

এ সম্পর্কে তিনি (ইবনে হিযাম) নিজেই বলেন,

وأما الذي يعيبني به جهال أعدائي من أني لا أبالي - فيما اعتقده حقاً - عن مخالفة من خالفته ولو أنهم جميع من على ظهر الأرض،

আমার কিছু নির্বোধ প্রতিপক্ষ আমাকে দোষ দিয়ে বলে, আমি যে বিষয় সঠিক মনে করি সে বিষয়ে অন্য কারো মতের দিকে ভ্রুক্ষেপ করি না যদিও সেটা সারা পৃথিবীর লোকের বিপরীতে হয়।

এরপর তিনি বলেন,

فهذه الخصلة عندي من أكبر فضائلي التي لا مثيل لها ولعمري لو لم تكن في - وأعوذ بالله - لكانت من أعظم متمنياتي وطلباتي عند خالقي عز وجل

এটা আমার এমন একটি গুণ যার তুলনা হয় না। যদি এটা আমার মধ্যে না থাকতো - আর আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চায় - তবে আমার সৃষ্টিকর্তার নিকট এটি আমি সর্বাধিক গুরুত্বসহকারে প্রার্থনা করতাম। [রাসায়েলে ইবনে হিযাম]

ওলামায়ে কিরামের মতামত থেকে ইবনে হিযামের এই বিমুখীতা সঠিক পন্থা কিনা সে বিষয়ে আলোচনা এখানে গরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, ইবনে হিযাম ﵀ যখন এককভাবে কোন মতামত

উল্লেখ করেন তখন তার সমসাময়িক বা তার পূর্বের অন্যান্য ফুকাহায়ে কিরামের পক্ষ থেকে তা বলেন না। সুতরাং মতটিকে তার একক মত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

এটা জেনে নেওয়ার পর কথা হলো, ইবনে হিযামের উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে "মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের যে কোনভাবে সহায়তা প্রদান করা কুফরী" এভাবে বলেন নি। বরং ইসলামী রাষ্ট্র থেকে কাফিরদের রাষ্ট্রে পালিয়ে যাওয়া বা কাফিরদের রাষ্ট্রে অবস্থান করে তাদের সাহায্য করা এসব ব্যাপারে কুফরীর ফতোয়া আরোপ করেছেন। তার আলোচনার শিরোনামও তাই। তিনি যে হাদীস থেকে দলিল পেশ করেছেন সেখানে কাফিরদের রাষ্ট্রে অবস্থানের বিষয়েই আলোচনা এসেছে। এই আলোচনার আগে ও পরে কাফিরদের রাষ্ট্রে অবস্থানের ব্যাপারেই আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি ইসলামী রাষ্ট্র থেকে পালিয়ে যেয়ে বা কাফিরদের রাষ্ট্রে অবস্থান করে কাফিরদের সাহায্য করা কুফরী বলছেন এটা স্পষ্ট কিন্তু কেবল মাত্র মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের সাহায্য করা কুফরী কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই বলেন নি। সর্বপরি এ বিষয়ে তিনি যা কিছুই বলেছেন তা তার নিজস্ব মত যা অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের মতের বিপরীত। তিনি এ বিষয়ে ইজমা তো নয়ই এমনকি অন্য কোনো আলেমের মতও উল্লেখ করেন নি। কেবল একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যেখানে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন "যে মুসলিম কাফিরদের ভূখন্ডে অবস্থান করে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" ইবনে হিযাম বলেছেন, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন সে মুসলিম হতে পারে না। তার এই দাবীটি কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি তার জাহেরী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই হাদীসটি হতে এমন বুঝ গ্রহণ করেছেন।

অন্য হাদীসে এসেছে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ

বিপদে পড়লে যে, মাথার চুল কেটে ফেলে, উচ্চস্বরে চিৎকার করে পোশাক-পরিচ্ছদ ছিড়ে ফেলে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। [বুখারী ও মুসলিম]

এই হাদীসটিতেও "তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই" এমন কথা বলা হয়েছে, তবে কি ইবনে হিযাম رحمه الله ঐ সকল মেয়ে লোককে কাফির বলবেন, যারা বিপদে পড়ে চিৎকার করে কেঁদে, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিড়ে ফেলে বা চুল কামিয়ে শোক প্রকাশ করে?

দেখা যাচ্ছে, ইবনে হিযাম رحمه الله যে মত দিয়েছেন তা একটি স্বতন্ত্র ও বিরল মত এবং তিনি যে যুক্তির মাধ্যমে দলিল পেশ করেছেন তা অগ্রহণযোগ্য।

চিন্তার বিষয় হলো, যে মুলনীতিটির স্বপক্ষে এই ধরণের অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা স্বাপেক্ষ বিষয়াবলী ছাড়া স্পষ্ট

কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় না, ঈমান-ইসলাম ও কুফর-শিরকের ক্ষেত্রে সেটার উপর নির্ভর করা কিভাবে যৌক্তিক হতে পারে! বিশেষত যখন এর বিপরীতে স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ রয়েছে যে সম্পর্কে কিছু আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে এবং পরবর্তীতে বিস্তরিত আলোচনা করা হবে ইনশা-আল্লাহ্।

উপরের আলোচনাতে আমরা, ‘‘মুসলিমদের বিপরীতে কাফিরদের যে কোনো ভাবে সহযোগিতা করা কুফরী’’ এ মূলনীতিটির স্বপক্ষে যেসব দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয় সেগুলো খন্ডায়ন করেছি। এখন আমরা এর বিপরীতে স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করবো।

এ বিষয়ে সর্বাধিক প্রানিধানযোগ্য হাতিব ইবনে আবি বালতায়া ﵁ এর ঘটনা।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গের পর রসুলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কার উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন বদরী সাহাবী হাতিব ইবনে আবী বালতাআ ﵁ মক্কার মুশরিকদের নিকট একটি চিঠি লিখে তাদের এ সম্পর্কে সতর্ক করেন। রসুলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে বিষয়টি জেনে ফেলেন এবং মক্কায় পৌছানোর পূর্বেই চিঠিটি উদ্ধার করেন। হাতিব ইবনে আবী বালতায়া ﵁ কে ডেকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন,

قال يا رسـول الله لا تعجل علي إني كنت أمرأ ملصـقا في قريش ولم أكن من أنفسـها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام

হে আল্লাহর রসুল ﷺ আপনি আমার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশদের ভিতর বহিরাগত ছিলাম তাদের বংশের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না। আপনার সাথে অন্য আর যেসব মুহাজির আছে তাদের মক্কাতে আত্মীয় স্বজন রয়েছে যারা মক্কাতে তাদের সম্পদ ও পরিবারকে রক্ষা করে। যেহেতু মক্কাতে আমার কোনো আত্মীয় নেই তাই আমি চেয়েছি মক্কার কাফিরদের সাথে আমার একটি সুসম্পর্ক তৈরী হোক যাতে তারা আমার আত্মীয় স্বজনদের তারা নিরাপত্তা দেয়। আমি এ কাজ কুফরী বা দ্বীন ত্যাগের উদ্দেশ্যে করিনি, ইসলামের পর কুফরীকে পছন্দ করার কারণেও নয়।

উমর ﵁ বললেন,

يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال

হে আল্লাহর রসুল আমাকে আদেশ দিন আমি এই মুনাফিককে হত্যা করি।

রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

সে তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে আর তুমি কি জানো না যে, হয়তো আল্লাহ বদরে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমরা যা খুশি আমল করো কারণ আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকদের যে কোনোভাবে সাহায্য সহযোগীতা করা কুফরী মনে করেন এ হাদীস তাদের বিপক্ষে স্পষ্ট দলীল। যেহেতু হাতিব ﷺ মুশরিকদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তাদের রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর অভিযানের খবর জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন কিন্তু তাকে কাফির বলা হয় নি। হাতিব ইবনে আবি বালতায়া ﷺ নিজেই বলেন, (وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام) "আমি এ কাজ কুফরী বা দ্বীন ত্যাগের উদ্দেশ্যে করিনি, ইসলামের পর কুফরীকে পছন্দ করার কারণেও নয়।" রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এই কথা সত্যায়ন করে বলেন, (لقد صدقكم) "সে সত্যই বলেছে" [সহীহ্ মুসলিম] এই স্পষ্ট বর্ণনার কারণে সকল ওলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, হাতিব ﷺ যে কাজ করেছেন তথা মুসিলমদের গোপন খবর কাফিরদের নিকট পৌছে দেওয়া কুফরী নয়। এর উপর নির্ভর করে তারা মুসলিম গোয়েন্দা সম্পর্কে একমত হয়েছেন যে, সে কাফির নয়।

ইমাম আন নাব্বী ﷺ বলেন,

وفيه أن الجاسوس وغيره من اصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك وهذا الجنس كبيرة قطعا

এই হাদীস দলীল যে, গোয়েন্দা ও এধরণের কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যাক্তি কাফির হবে না তবে এধরণের কাজ নিশ্চয় কবীরা গোনাহ হবে। [শারহে মুসিলম]

পরে তিনি বলেন,

ومذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله وقال بعض المالكية يقتل إلا أن يتوب وبعضهم يقتل وإن تاب وقال مالك يجتهد فيه الامام

ইমাম শাফেঈ এবং অন্য একদলের মত হলো মুসলিম গোয়েন্দাকে তাজীর হিসাবে শাস্তি দেওয়া হবে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না মালেকী মাজহাবের কেউ কেউ বলেছেন তাওবা না করলে তাকে হত্যা করা হবে কেউ কেউ বলেছেন তওবা করলেও হত্যা করা হবে। ইমাম মালিক বলেছেন তার ব্যাপারে ইমাম ইজতিহাদ করবে। [শারহে মুসলিম]

মুসলিম গোয়েন্দাকে হত্যা করা হবে কিনা সে সম্পর্কে ইমাম শাফেঈকে প্রশ্ন করা হলে তিনি হত্যা করা যাবে না এমন মত দেন এবং একটি হাদীস উল্লেখ করেন যেখানে বলা হয়েছে, বিয়ের পর জেনা করা, কোনো মুসলিমকে হত্যা করা এবং স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হওয়া ছাড়া কোনো মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। এর পর তিনি বলেন,

وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين

মুসিলমদের গোপন খবর কাফিরদের জানিয়ে দেওয়া, কাফিরদের সাহায্য করা যেমন, মুসলিমরা কাফিরদের উপর গোপনে আক্রমণ করতে চাইলে কাফিরদের সতর্ক হওয়ার জন্য বা মুসলিমদের বিপরীতে লড়াইয়ে রওয়ানা হওয়ার জন্য সে খবর জানিয়ে দেওয়ার স্পষ্ট কুফরী নয়।

তখন একজন বলল, (أقلت هذا خبرا أم قياسا) "এ বিষয়ে কি কোনো দলিল আছে না কি আপনি কিয়াস করে বলছেন?"

এর জবাবে ইমাম শাফেঈ বলেন,

قال قلته بما لا يسع مسلما علمه عندي أن يخالفه

এ বিষয়ে আমার নিকট এমন দলিল রয়েছে যার বিরুদ্ধাচারণ করা কোনো মুসলিমের পক্ষে সম্ভব নয়।

এরপর তিনি হাতিব ইবনে আবি বালতায়ার ঘটনাটি বর্ণনা করেন। [আল-উম্ম]

ইমাম শাফেঈ ঠিকই বলেছেন, যেহেতু কেউই এই দলিলটিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি বিধায় গোয়েন্দাগিরী কুফরী নয় এ ব্যাপারে সকল আলেম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। যদিও বর্তমান সময়ের কিছু ব্যক্তি এর বিপরীত মত পোষণ করার সাহসিকতা প্রদর্শন করেছে।

কাজী ইবনুল আরাবী ﵀ বলেন,

من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين

যে ব্যাক্তি বারবার মুসলিমদের গোপন বিষয় কাফিরদের নিকট ফাঁস করে সে একাজের মাধ্যমে কাফির হবে না যদি তার এ কাজ দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্যে হয় এবং তার আকীদা সঠিক থাকে। যেমনটি হাতিব ﵁ করেছেন যেহেতু তিনি তার আত্মীয় স্বজনদের নিরপত্তার জন্য একাজ করেছিলেন দ্বীন ত্যাগের উদ্দেশ্যে নয়। [আহকামুল কুরআন]

ইমাম কুরতুবী ﵀ তার তাফসীরে হুবহু একই কথা বলেছেন যেমনটি আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

হাতিব ইবনে আবি বালতায়া ﵁ এর ঘটনা প্রসঙ্গে ইবনে হাযার আসকালানী ﵀ বলেন,

وفيه الرد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب وعلى من جزم بتخليده في النار

এই হাদীস তাদের বিপক্ষে দলীল যারা কোনো পাপে লিপ্ত হলেই মুসলিমকে কাফির ও চিরোস্থায়ী

জাহান্নামবাসী বলে। [ফাতহুল বারী]

অর্থাৎ তিনি মুসিলম গোয়েন্দাকে কাফির বলা খারেজী সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যে গণ্য করেছেন, যারা পাপকাজে লিপ্ত মুসলিমকে কাফির বলতো।

তিনি আরও বলেন,

وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه وقال الشافعية والأكثر يعزر وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه

ইমাম তাহাবী মুসলিম গোয়েন্দার রক্ত হালাল না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেঈ ও বেশিরভাগ আলেম বলেছেন তাকে তাজীর (লঘু শাস্তি) দেওয়া হবে আর যদি মুসলিমদের মাঝে সম্মানী ব্যাক্তি হয় (অর্থাৎ তার পূর্ব আমল ভাল হয়) তবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। [ফাতহুল বারী]

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় ইবনে বাত্তাল رحمه الله বলেন,

ومن قال بقتل الجاسوس المسلم فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين من العلماء، فلا وجه لقوله

যিনি গোয়েন্দাকে হত্যা করার মত দিয়েছেন তার মত এই হাদীস ও পূর্ববর্তী আলেমদের মতের বিপক্ষে ফলে তার মত গ্রহনযোগ্য নয়। [শারহে ইবনে বাত্তাল]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন,

وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم

কোনো কোনো ব্যক্তি কখনও কখনও কাফিরদের সাথে আত্মীয়তার কারণে বা অন্য কোনো স্বার্থের কারণে এমন সম্পর্ক গড়ে তোলে যাতে তার ঈমানে কমতি ঘটার মতো অপরাধ হয় তবে সে এর মাধ্যমে কাফির হয় না। যেমন হাতিব ইবনে আবি বালতায়া رضي الله عنه এর সাথে মুশরিকদের ঘটেছে। যেহেতু তিনি রসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কিছু গোপন খবর মুশরিকদের চিঠির মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা করেছিলেন।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, ওলামায়ে কিরাম গোয়েন্দাবৃত্তিকে সর্বসম্মতিক্রমে হারাম হিসেবে গণ্য করেছেন। এটা যে কুফরী নয় সে বিষয়ে তারা দ্বিমত করেন নি। তবে যে গোয়েন্দাবৃত্তি করে তাকে হত্যা করা হবে কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। সে ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ওলামায়ে দ্বীনের মতে তাকে হত্যা করা হবে না তবে বিশেষত মালেকী মাযহাবের কোনো কোনো আলেম বলেছেন তাকে হত্যা করা হবে। তাদের সংখ্যা এতই কম যে, ইমাম তাহাবী رحمه الله গোয়েন্দাকে হত্যা না করার ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ

করেছেন এবং ইবনে বাত্তাল ﵀ গোয়েন্দাকে হত্যা করার মতটিকে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামতের বিপরীতে হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। যেখানে গোয়েন্দাকে হত্যা করার মতটিকেই এভাবে তিরষ্কার করা হয়েছে সেখানে তাকে কাফির সাব্যস্ত করার বিষয়টি কেমন হতে পারে! পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের কেউ গোয়েন্দাবৃত্তির অপরাধে কোনো মুসলিমকে কাফির বলেছেন এটা প্রমাণিত নয়। বর্তমান যুগের অনেকে অবশ্য পূর্ববর্তী সকল ওলামায়ে কিরামের মত অগ্রাহ্য করে গোয়েন্দাবৃত্তিকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা পূর্বে বর্ণিত কল্পিত মূলনীতিটির উপর নির্ভর করেছেন। তারা বলেছেন, যেহেতু যে কোনো প্রকারে মুসলিমদের বিপরীতে কাফিরদের সহায়তা করা কুফরী অতএব মুসলিমদের গোপন খবর কাফিরদের পৌঁছে দেওয়াও কুফরী হবে। এই মূলনীতিটির স্বরুপ সম্পর্কে আমরা পূর্বে কথা বলেছি। আমরা প্রমাণ করেছি, এর স্বপক্ষে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। মুসলিম গোয়েন্দা যে কাফির নয় এ বিষয়ে আলেমদের ঐক্যমত সেই একই কথা প্রমাণ করে। কেউ কেউ বহু তল্লাশী করে কিছু কিছু আলেম-ওলামার বক্তব্য থেকে গোয়েন্দাবৃত্তি কুফরী হওয়ার প্রমাণ উত্থাপনের চেষ্টা করেছেন। দুঃখের বিষয় হলো, এ ক্ষেত্রে তারা যেসব দলিল-প্রমাণ হাজির করেছেন তা পূর্বের মতোই দুর্বল ও অস্পষ্ট।

তাহির ইবনে আশুর ﵀ গোয়েন্দা সম্পর্কে মালেকী মাজহাবের দুজন প্রখ্যাত ইমাম ইবনে ওয়াব এবং ইবনে কাসিমের মত বর্ণনা করে বলেন,

وقال ابن القاسم : ذلك زندقة لا توبة فيه ، أي لا يستتاب ويقتل كالزنديق ، وهو الذي يُظهر الإسلام ويسر الكفار ، إذَا اطّلع عليه ، وقال ابن وهب رِدّة ويستتاب ، وهما قولان ضعيفان من جهة النظر

ইবনে কাসিম বলেছেন, "এটা যানদাকা (ধর্মদ্রোহিতা) তার কোনো তাওবা নেই।" এর অর্থ তার বিধান যিনদিকের (ধর্মদ্রোহী) মতো। তাকে তাওবা করতে না বলেই হত্যা করা হবে। যিনিদিক হলো সে যে প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলে, কিন্তু অন্তরে কুফরী গোপন রাখে। যখন তার ভিতরের কুফরী সম্পর্কে অবগত হওয় সম্ভব হয়। (তখন তাকে তওবার সুযোগ না দিয়েই হত্যা করা হয়; এটা ইমাম মালিকের মত)। ইবনে ওয়াহব বলেছেন, এটা ধর্ম ত্যাগ বলে গণ্য হবে তাকে হত্যা করার পূর্বে তওবা করতে বলা হবে। তবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এ দুটি মত দূর্বল।[আত-তাহরীর ওয়াত-তানবীর]

ইবনে ওয়াহব এবং ইবনে কাসিম মালেকী মাযহাবের প্রথম যুগের ওলামায়ে কিরামের মধ্যে গণ্য। উপরোক্ত বর্ণনাটিতে তাদের যে মত উল্লেখিত হয়েছে তার উপর নির্ভর করে কেউ কেউ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন মুসলিম গোয়েন্দা কাফির নয় এ বিষয়ে আলেমরা একমত নন বরং তাদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে।

দুটি দৃষ্টি কোন থেকে এর উত্তর দেওয়া যায়।

প্রথমত: ইবনে কাসিম বা ইবনে ওয়াহব মালেকী মাযহাবের প্রথম যুগের ওলামায়ে কিরামের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। তাদের মতামত ও চিন্তাধারা বিশেষকরে মালেকী মাযহাবের আলেমদের নিকট এবং সাধারণভাবে সকল ওলামায়ে কিরামের নিকট ব্যাপক গুরুত্বহ। মালেকী মাযহাবের গ্রন্থসমূহতে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়েছে। গোয়েন্দা সম্পর্কে মালেকী মাযহাবের পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম এবং অন্যান্য মাযহাবের বরেণ্য ওলামায়ে কিরাম তাদের মতামত বর্ণনা প্রসঙ্গে কেবল হত্যা করার বিষয়টিই উল্লেখ করেছেন। ইবনে বাত্তাল ﵀ ও বদরুদ্দীন আইনী ﵀ বুখারীর ব্যাখ্যায় গোয়েন্দা সম্পর্কে তাদের মত বর্ণনা করেছন। সেখানে কেবল গোয়েন্দাকে হত্যার করার বিষয়টিই বর্ণিত আছে। তারা যে বিষয়টিকে কুফরী মনে করেন এটা কোথাও উল্লেখ নেই। প্রায় বারো শতাব্দী পর জন্মগ্রহণকারী একজন আলেম তাহির ইবনে আশুর এটা বর্ণনা করেছেন। একটি বর্ণনা দূর্বল হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। বর্ণনাকারী তাহির ইবনে আশুর নিজেও ইবনে কাসিম ও ইবনে ওয়াহবের মত বর্ণনার পর বলেছেন, চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যাবে এ দুটি মত দূর্বল।

দ্বিতিয়ত: যদি ধরেও নিই দুজন আলেম গোয়েন্দাগিরীকে কুফরী বলেছেন তবে সমস্ত ওলামায়ে কিরামের মতের বিপরীতে দুজন আলেমের মত কি শায বা বিরল মত হিসেবে গণ্য হবে না? তাছাড়া যদি কোনো বিষয়ে প্রথম যুগের দু'একজন আলেমের দ্বিমত থাকে কিন্তু তাদের পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কিরাম উক্ত দ্বিমত পরিত্যাগ করে ঐক্যমত পোষণ করেন তবে প্রথম যুগের মতপার্থক্য অনুসরণ করার সুযোগ থাকে না। যেমন, তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে উমর ؓ এর বক্তব্য, মুতা বিবাহ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস ؓ এর বক্তব্য, তাইয়াম্মুম সম্পর্কে উমর ؓ ও ইবনে মাসউদ ؓ এর বক্তব্য, সম্পদ জমা করা সম্পর্কে আবু জর আল-গিফারীর বক্তব্য, সলাতের মধ্যে ফারসী ভাষায় কুরআন তেলওয়াত করা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য ইত্যাদি। সুতরাং যদি ধরেও নিই ইমাম মালিকের দুই ছাত্র ইবনে কাসিম এবং ইবনে ওহাব গোয়েন্দাকে কাফির বলেছেন, সেক্ষেত্রে গোয়েন্দা কাফির নয় এ ব্যাপারে হয়তো ইজমা প্রমাণিত হবে না কিন্তু গোয়েন্দা যে কাফির এটা মনে করার কোনো সুযোগ থাকবে কি? বিশেষ করে শিরক-কুফরের ক্ষেত্রে সকল ওলামায়ে কিরামের বিপরীতে দু'একজন আলেমের মতামতের উপর নির্ভর করা সঠিক হতে পারে না। আলেমরা তো সামান্য দ্বিমত থাকলেই সে বিষয়ের উপর নির্ভর করে কোনো মুসলিমকে কাফির বলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন যেমনটি আমরা বহু বার বর্ণনা করেছি। তাহলে সকল ওলামায়ে কিরামের বিপরীতে দু'একজন আলেমের মত অনুসরণ করে একজন মুসলিমকে কাফির সাব্যস্ত করার বিষয়টি কেমন হতে পারে! সর্বপরি যদি এই দু'একজন আলেমের মতের উপর

নির্ভর করে বলা হয়- কাফিরদের যে কোনোভাবে সহযোগিতা করা কুফরী এ ব্যাপারে আলেমরা ইজমা করেছেন তবে সেটা কোন পর্যায়ের মিথ্যাচার বলে গণ্য হবে?

মালেকী মাযহাবের কোনো কোনো আলেম গোয়েন্দার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে থাকেন, "তার বিধান যিনদিকের (ধর্মদ্রোহী) মতো" এর উপর নির্ভর করে অনেকে বলতে চান মালেকী মাযহাবের আলেমরা গোয়েন্দাকে যিনদিক তথা ধর্মদ্রোহী বলে ফতোয়া দিয়েছেন। ফিকাহর গ্রন্থ সমূহ যথাসামান্য পড়া-শুনা করার অভ্যাস যার আছে এমন ব্যক্তি এধরণের কথা বলতে পারেন না। যেহেতু ঐ সকল আলেমরা গোয়েন্দাকে কাফির বলেন না বরং গোয়েন্দাকে পাকড়াও করার পর হত্যা করতে হবে তওবা করার সুযোগ দেওয়া হবে না যেভাবে ইমাম মালিকের মতে যিনদিককে পাকড়াও করার পর তওবা করার সুযোগ না দিয়ে হত্যা করা হয় এই অর্থে তারা গোয়েন্দাকে যিনদিকের সাথে তুলনা করেন কুফরীর দিক থেকে নয়। তারা এই অর্থেই কথাটি বলে থাকেন এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম তাদের কথার এই অর্থই অনুধাবন করে থাকেন। তাদের কথা মনযোগ দিয়ে পাঠ করলে যে কারো নিকট এই অর্থটিই স্পষ্ট হবে। তবে যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তাদের কথা ভিন্ন।

হাম্বালী মাযহাবের কাজি আবু ইয়া'লা থেকে আব্দুর রহমান আল-জাওজী বর্ণনা করেন, হাতিব ইবনে আবি বালতায়ার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

في هذه القصة دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم

এই ঘটনা প্রমাণ করে, নিজের জীবন সম্পর্কে ভয় থাকলে কুফরী কথা বলা যেমন বৈধ হয় নিজের সম্পদ বা সন্তানের উপর ভয় থাকলে কুফরী কথা বলা বৈধ হয় না। এটা আরো স্পষ্ট হয় যেহেতু আল্লাহ্ হিজরত করা ফরজ করেছেন কিন্তু সম্পদ ও সন্তান হারানোর ভয়ে হিজরত করা হতে বিরত হওয়া বৈধ করেন নি। [যাদুল মুইয়াস্‌সার]

হাতিব رضي الله عنه এর ঘটনাটি হতে কাজি আবু ইয়া'লা সন্তান ও সম্পদের ভয়ে কুফরী করা বৈধ নয় এটা প্রমাণ করেছেন। এ থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন তাহলে নিশ্চয় তিনি হাতিব رضي الله عنه এর কাজ তথা কাফিরদের নিকট মুসলিমদের গোপন খবর জানিয়ে দেওয়া কুফরী হিসেবে গণ্য করেছেন। যারা এমন মনে করে তারা আসলে আলেমদের বক্তব্য যথাযোগ্যভাবে অনুধাবনে সক্ষম নয়। এখনে মুল ঘটনা হলো, নিজের জীবন হারানোর ভয়ে হারাম বা কুফরীতে লিপ্ত হওয়া বৈধ এ বিষয়ে আলেমদের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু নিজের সন্তান বা সম্পত্তি হারানোর ভয়ে তা করা যাবে কিনা সেটা নিয়ে দ্বিমত আছে। কাফিরদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরী করা একটি হারাম কাজ। এ কারণে হাতিব ইবনে আবি বালতায়াকে

তিরষ্কার করে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। তবে তিনি বদরী সাহাবা হওয়ার কারণে তার এ পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। নেক আমলের কারণে শিরক-কুফর ছাড়া অন্য যে কোন পাপ ক্ষমা করা যেতে পারে এ বিষয়ে সকল আলেম এক মত। হাতিব ইবনে আবি বালতায়া সন্তান ও সম্পদের ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় এ কাজ করেছিলেন। তবু তাকে ওযর দেওয়া হয়নি বরং তিরষ্কার করা হয়েছে। তাকে যতটুকু ওযর দেওয়া হয়েছে তা বদরী সাহাবা হওয়ার কারণে, সন্তান-সম্পদের ক্ষতির আশঙ্কার কারণে নয়। এটা প্রমাণ করে সন্তান বা সম্পদের ক্ষতির আশঙ্কায় হারাম কাজ করা বৈধ নয়। অতএব, এ আশঙ্কায় যে কুফরী করা যাবে না সেটিও প্রমাণিত হয়। এ অর্থে কাজি আবু ইয়া'লা হাতিব ﵁ এর ঘটনা থেকে সন্তান সম্পদের ক্ষতির আশঙ্কায় কুফরী করা যাবে না এ বিধান বর্ণনা করেছেন। হাতিব ﵁ এর কাজটি কুফরী ছিল এটা বোঝানোর জন্য নয়। এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ হলো তিনি হাতিব ﵁ এর ঘটনার পাশাপাশি সন্তান-সম্পদের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও হিজরত করা ফরজ এই বিধানটি উল্লেখ করেছেন এবং নিজের মতের স্বপক্ষে তথা সন্তান-সম্পদের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও কুফরী করা যাবে না এ বিষয়ে উক্ত ঘটনাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, সন্তান বা সম্পদের ক্ষতি হবে এই ভয়ে হিজরত না করা তিনি কুফরী মনে করেন। হিজরত না করার কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা যেতে পারে না যেহেতু আল্লাহ নিজেই তাকে মুমিন হিসেবে গণ্য করেছেন। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ}

﴾ যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে নি তাদের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করে চলে আসে। তবে যদি তারা দ্বীনের খাতিরে তোমাদের সহযোগিতা চায় তবে তাদের সহযোগিতা করা তোমাদের দায়িত্ব। ﴿ [আনফাল/৭২]

এ আয়াতে যারা হিজরত করেনি তাদের তিরষ্কার করা সত্ত্বেও মুমিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং মুসলিমদের নিকট দ্বীনের খাতিরে সাহায্য প্রার্থনা করার অধিকার তাদের আছে এটা উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين) " যে মুসলিম মুশরিকদের এলাকায় বসবাস করে তার সথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" [আবু দাউদ] কিন্তু এই সম্পর্কহীনতা ঐ সকল ব্যক্তিদের কুফরী প্রমাণ করে না। একারণে তিনি তাদের মুসলিম হিসেবে স্বীকার করেছেন।

অতএব, কাজি আবু ইয়া'লা যারা হিজরত করেনি তাদের কাফির বলতে পারেন না। তিনি সেটা উদ্দেশ্যও করেন নি। একইভাবে মুসলিমদের গোপন খবর কাফিরদের নিকট পৌছে দেওয়া তিনি কুফরী মনে

করেন না। এ বিষয়ে তার স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। ইবনে তাইমিয়া ﷺ মুসলিম গোয়েন্দার বিধান সম্পর্কে বলেন,

فَإِنَّ أَحْمَد تَوَقَّفَ فِي قَتْلِهِ وَجَوَّزَ مَالِكٌ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ - كَابْنِ عَقِيلٍ - قَتْلَهُ وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ كَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى

ইমাম আহমদ তাকে হত্যা করার ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। ইমাম মালিক ও হাম্বালী মাযহাবের কোনো কোনো আলেম যেমন ইবনে আকীল তাকে হত্যা করা বৈধ বলেছেন। হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম এবং হাম্বালী মাযহাবের কেউ কেউ যেমন কাজি আবু ইয়ালা গোয়েন্দাকে হত্যা করা হতে নিষেধ করেছেন। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

সুতরাং কাজি আবু ইয়া'লা গোয়েন্দাকে হত্যা করাই বৈধ মনে করেননি কাফির মনে করা তো সুদূর পরাহত।

কাজি আবু ই'লার মতো হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু বকর আল জাস্সাসও হাতিব ইবনে আবি বালতায়ার ঘটনা হতে সন্তান-সম্পদের ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় কুফরী করা বৈধ নয় এটা প্রমাণ করেছেন। তার কথার উদ্দেশ্যও তাই যা আমরা কাজি আবু ইয়া'লার কথা সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। যেহেতু হানাফী মাযহাবের কেউই গোয়েন্দাকে কাফির বলেন না হত্যাও করতে বলেন না।

কেউ কেউ আবার সরাসরি হাতিব ؓ এর ঘটনা হতেই মুসলিমদের খবর মুশরিকদের নিকট পৌছে দেওয়াকে কুফরী প্রমাণের চেষ্টা করেন। তাদের যুক্তি হলো, উমর ؓ বললেন, হে আল্লাহর রসুল আমাকে নির্দেশ দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দানে আঘাত করি। তারা বলেন, উমর ؓ এর মতে হাতিব ؓ যা করেছে তা কুফরী ছিল বলেই তিনি তাকে মুনাফিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এটা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কিরাম এধরণের কাজকে কুফরী মনে করতেন। যার হাতে কড়ি থাকে না কেবল সেই কানা কড়ি নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করে। উমর ؓ এর এই কথাটি হতে দলিল পেশ করাও অনুরুপ। প্রথমত সাহাবায়ে কিরাম কারো মধ্যে নিষিদ্ধ বা এমনকি অপছন্দনীয় কিছু দেখলেই তার ব্যাপারে মুনাফিক শব্দ প্রয়োগ করতেন। এর মাধ্যমে তারা উক্ত ব্যক্তি কাফির এটা উদ্দেশ্য করতেন না। এ বিষয়ে প্রচুর উদাহরণ পেশ করা যায়:

সহীহ হাদীসে এসেছে, একদিন মুয়াজ ؓ ঈশার সলাতে ইমাম হিসেবে সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকারা শুরু করলেন। একজন ব্যক্তি অধিক লম্বা কিরায়াতে সবর করতে না পেরে জামাত পরিত্যাগ করে মসজিদে একাকী সলাত আদায় করে। পরবর্তীতে লোকে তাকে ঘিরে ধরে এবং বলে, (أنافقت) তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেছো? [মুসলিম] এমনকি মুয়াজ ؓ নিজেও ঐ ব্যক্তিকে মুনাফিক হিসেবে আখ্যায়িত

করেন। পরে ঐ ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসে সব ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, (فزعم أني منافق) মুয়াজ আমাকে মুনাফিক বলেছে। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এটা শুনে মুয়াজ ؓ কে তিরষ্কার করে বলেন, (يا معاذ أفتان أنت) "হে মুয়াজ তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করতে চাও?" [সহীহ্ বুখারী]

এর পর তিনি জামাতে সলাত আদায়ের সময় লম্বা কিরাত পড়তে নিষেধ করেন। এখন যদি কেউ বলে যেহেতু মুয়াজ ইবনে জাবাল ؓ এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম এই ব্যক্তিকে জামাতে সলাত পরিত্যাগ করার কারণে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করেছে এর অর্থ যে ব্যক্তি জামাতে সলাত পড়েনা সাহাবায়ে কিরাম তাকে কাফির মনে করতেন তবে কেমন হবে?

হানজালা ؓ একবার রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর দরবারে এসে নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলেন, (نافق حنظلة يا رسول الله) " হে আল্লাহর রসুল, হানজালা মুনাফিক হয়ে গেছে" রাসুলুল্লাহ ﷺ কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ نَكُونُ عِنْدَكَ، تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، نَسِينَا كَثِيرًا

হে আল্লাহর রাসূল, যখন আমরা আপনার নিকট থাকি তখন জান্নাত জাহান্নাম যেন আমাদের চোখের সামনে থাকে কিন্তু যখন আমরা আপনার নিকট থেকে ফিরে যায় এবং ক্ষেত খামার ও স্ত্রী সন্তানদের সাথে অবস্থান করি তখন আখিরাতকে ভুলে যায়।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এটা শুনে শান্তনা দিয়ে বলেন,

لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً

আমার নিকট তোমরা যেমন থাকো যদি সর্বদা তেমন থাকতে তবে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে রাস্তা-ঘাটে দেখা করে মোসাফা করতো। হে হানজালা সব সময় সমান অবস্থা থাকে না। [মুসলিম]

এই হাদীসের অর্থও এটা নয় যে, সাহাবায়ে কিরাম সামান্য সময়ের জন্যও আখিরাতকে ভুলে থাকাটা কুফরী মনে করতেন।

আয়েশা ؓ এর অপবাদের ঘটনা প্রসঙ্গে একবার সা'দ ইবনে উবাদা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর পক্ষে কিছু কথা বললে, উসাইদ ইবনে খুদাইর বলেন, (فانك منافق تجادل عن المنافقين) "তুমি নিজে মুনাফিক এবং অন্য একজন মুনাফিকের পক্ষে তর্ক করছো"। [বুখারী ও মুসলিম]

এই ঘটনাতেও সা'দ ؓ কে কাফির বলা উদ্দেশ্য নয়।

এমন বহু উদাহরণ রয়েছে। সুতরাং উমর ﵁ হাতিব ﵁ কে মুনাফিক বলেছেন অতএব তিনি গোয়েন্দাগিরীকে কুফরী মনে করেন এই দলিল অজ্ঞতাপ্রসূত। অন্য আরেকটি বর্ণনাতে অবশ্য মুনাফিক শব্দের পরিবর্তে (لقد كفر) "সে কুফরী করেছে" এমন বর্ণিত আছে। কিন্তু এখানে ঘটনা একটিই অতএব উমর ﵁ যে কোনো একটি শব্দ ব্যাবহার করেছেন। তিনি হয়তো মুনাফিক বলেছেন নয়তো সে কুফরী করেছে এটা বলেছেন। যদি সনদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় তবে নিঃসন্দেহে মুনাফিক বলার সম্ভাবনাটিই প্রাধান্য পাবে। যেহেতু এটিই অধিক সংখ্যক বর্ণনাতে এসেছে এবং শাব্দিকভাবে বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখিত রয়েছে। তাছাড়া যদি ধরেও নিই উমর ﵁ "সে কুফরী করেছে" একথা বলেছেন তবু তার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থেই হাতিব ﵁ কে কাফির বলতে চেয়েছেন এটা প্রমাণিত হয় না। যেহেতু কুফরী শব্দটি বিভিন্ন হাদীসে এবং সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্যে অনেক সময় অধিক কঠোরতা অর্থে ব্যাবহৃত হয় প্রকৃত কুফরী অর্থে নয় যেমনটি আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি। সর্বপরি যদি এটাও মেনে নিই যে, উমর ﵁ হাতিব ইবনে আবি বালতায়া কাফির হয়ে গেছে এটিই বলতে চেয়েছেন তার পরও কিভাবে এটা বলা যায় যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কথা পরিত্যাগ করে উমর ﵁ এর কথা অনুসরণ করতে হবে? উমর ﵁ যে অর্থেই মুনাফিক বা কাফির শব্দ প্রয়োগ করে থাকুন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ সে কারণে তাকে ধমক দিয়েছেন এবং বলেছেন,

إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

সে তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, (হে উমর) তুমি কি জানো না যে, হয়তো আল্লাহ বদরে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমরা যা খুশি আমল করো কারণ আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

সহীহ্ বুখারীতে এসেছে,

فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

একথা শুনে উমর ﵁ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আল্লাহ্ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। [সহীহ বুখারী]

তাছাড়া হাতিব ইবনে আবি বালতায়া ﵁ যখন বললেন, আমি তো কুফরী করি নি আমি তো দ্বীন ত্যাগ করি নি তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সে সত্য বলেছে।

সুতরাং যে মত স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছেন এবং উক্ত মতের প্রবক্তা নিজেই সেটা পরিত্যাগ করেছেন সেটার অনুসরণ করা কি ধরণের ইলম চর্চা হবে তা আমাদের নিকট বোধগম্য নয়।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মুসিলমদের গোপন খবর কাফিরদের জানিয়ে

দেওয়ার মাধ্যমে একজন মুসলিম কাফিরে পরিনত হয় না। হাতিব ইবনে আবি বালতায়ার ঘটনা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দলিল। যেহেতু তিনি মুসলিমদের গোপন খবর সম্পর্কে কাফিরদের অবহিত করে চিঠি লেখা সত্ত্বেও স্পষ্ট দাবী করেন, আমি তো কুফরী করি নি, আমি তো দ্বীন ত্যাগ করি নি। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তার এই দাবীর সত্যতা স্বীকার করেন। পরবর্তীতে সকল ওলামায়ে কিরাম হাতিব ؓ এর ঘটনাটিকে মুসলিম গোয়েন্দা কাফির না হওয়ার ব্যাপারে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা কেউই হাতিব ؓ এর এই কাজটিকে কুফরী হিসেবে মনে করেন নি এবং অন্য যে কোন মুসলিমই কাফিরদের নিকট মুসলিমদের গোপন সংবাদ পাচার করে তারা তাদের কাফির বলেন নি। এই বিষয়টি "মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের যে কোনো ভাবে সাহায্য করা কুফরী" এই মূলনীতি বাতিল প্রমাণ করে। এ পর্যায়ে উক্ত মূলনীতিটিকে রক্ষার নিমিত্তে সমসাময়িক কিছু ব্যক্তি একটি হাস্যকর পন্থা অবলম্বন করেছেন।

তারা বলেন, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম যে গোয়েন্দা সম্পর্কে কাফির নয় এমন মন্তব্য করেছেন বর্তমান গোয়েন্দাদের উপর সেই একই বিধান প্রযোজ্য হবে না। যেহেতু বর্তমানে গোয়েন্দারা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যাবহার করে এবং আগের চেয়ে বহুগুণ বেশি ক্ষতি সাধন করে। এরা মুজাহিদদের অবস্থান ও কার্যক্রম সম্পর্কে লম্বা লম্বা রিপোর্ট লেখে, মাসিক বেতন পায় ইত্যাদি।

ব্যাপারটা যেন এমন যে, আগের চোররা ছুরি, চাকু, দা ইত্যাদি হাতিয়ার ব্যাবহার করে চুরি করতো আর বর্তমানের চোর-ডাকাতরা পিস্তল, রাইফেল, বোমা ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যাবহার করে অতএব বর্তমান সময়ের চোররা কাফির। এ ধরণের যুক্তি প্রমাণের উপর লম্বা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এতটুকু বলব, বর্তমানে গোয়েন্দারা কি কি কাজ করে সেটা এখানে মূল বিষয় নয়। এখানে মূল বিষয় হলো, মুসলিমদের গোপন খবর কাফিরদের নিকট পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের সাহায্য করা কুফরী নয়। যে ব্যক্তি এ কাজ করে সে কাফির নয়। যদি এমন প্রমাণ করা সম্ভব হয় যে, ঐ ব্যক্তির মধ্যে অন্য কোনো কুফরী রয়েছে তবে সে কাফির হবে। কিন্তু সে কাফির হবে তার গোয়েন্দাবৃত্তির কারণে নয় বরং তার মধ্যে অন্য যে কুফরীটি রয়েছে সে কারণে। অতএব, বর্তমানে গোয়েন্দারা নতুন যা কিছুই সংযোজন করুক গোয়েন্দাবৃত্তি যে কুফরী নয় এ বিধান অপরিবর্তিত থেকে যাবে। যেভাবে চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষন ইত্যাদি সকল অপরাধ কিয়ামত পর্যন্ত অপরাধ হিসেবেই গণ্য হবে কুফরী নয়। আধুনিক যুগে চোর-ডাকাত বা ধর্ষকরা কি পন্থা পদ্ধতি অবলম্বন করছে এর উপর ভিত্তি করে চুরি করা বা ডাকাতি করা কুফরী প্রমাণিত হবে না। যদি চোরের মধ্যে অন্য কোনো কুফরী পাওয়া যায় তবে সে কাফির হবে কিন্তু সে ক্ষেত্রেও চুরি করা কুফরী এমন বলা যাবে না বরং সে অন্য যে কুফরীটি করেছে সেটি উল্লেখ করে তাকে কাফির বলতে হবে চুরি করার কারণে নয়।

গোয়েন্দা সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের মতামতের বিপরীতে "মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের যে কোনো ভাবে সহায়তা করা কুফরী" এই মূলনীতিটি অক্ষত রাখতে আরো একটি হাস্যকর পন্থা অবলম্বন করা হয়। কেউ কেউ বলে, আসলে কাফিরদের হয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে গোয়েন্দাগিরী করা তথা মুসলিমদের গোপন খবর কাফিরদের নিকট পৌছে দেওয়া তাদের সাহায্য করা হিসেবে গণ্য নয়। নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষ কতটা আবেগপ্রবন হতে পারে এই কথাটি তার সুস্পষ্ট উদাহরণ। যুদ্ধের ময়দানে শত্রু পক্ষের সংখ্যা, অবস্থান তাদের চিন্তা-ভাবনা, প্লান-পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ের খবর সংগ্রহ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা স্বাভাবিক বুদ্ধির যে কেউই অনুধাবনে সক্ষম। এটা বললে, অতিরঞ্জন হবে না যে, শত্রু পক্ষের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারা যুদ্ধে বিজয় অর্জনের প্রধান শর্ত। এর বিপরীতে শত্রুপক্ষকে নিজেদের সম্পর্কে যতটা কম তথ্য দেওয়া যায় বিজয় অর্জনের সম্ভাবনা ততটাই প্রকট হয়। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (الحرب خدعة) "যুদ্ধ হচ্ছে ধোঁকা" [বুখারী ও মুসলিম] নিজেরদের আক্রমণের খবর গোপন রেখে হঠাৎ আক্রমণ করে বা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শত্রু পক্ষের দূর্বল স্থান চিহ্নিত করে সেখানে আঘাত হানতে সক্ষম হলে শত্রুকে ধোঁকায় ফেলে সহজে বিজয় অর্জন সম্ভব। তাছাড়া শত্রুর মোকাবিলায় কি পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলেও শত্রুর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন। এসব কারণে যুদ্ধের ময়দানে সসস্ত্র সৈনিকের পূর্বে গোয়েন্দাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ সত্ত্বেও যদি কেউ মনে করে মুসলিমদের খবর কাফিরদের জানিয়ে দেওয়া কোনো প্রকার সহযোগিতা নয় এবং এই বোকামীর মাধ্যমে একটি কল্পিত মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তবে আমাদের কিছুই বলার নেই।

সবিশেষে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে বলবো, কাফিরদের কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বা ইসলামকে অপছন্দ করে নয় বরং দুনিয়াবী কোনো স্বার্থে বা অন্য কোনো আবেগ অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়ে মুসলিমদের বিপরীতে কাফিরদের সহযোগিতা করা মারাত্মক অপরাধ তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু কুফরী নয়। এই সহযোগিতা গোয়েন্দাগিরীর মাধ্যমে হোক বা সরসরি কাফিরদের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হোক। এটিই ওলামায়ে কিরামের নিকট গৃহীত মূলনীতি।

হানাফী মাযহাবের তৃতীয় ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শাইবানী رحمه الله বলেন,

وَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا كَانَ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ يُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَلَبُهُ .لِأَنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُبَاحَ الْقَتْلِ وَلَكِنَّ سَلَبَهُ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ .لِأَنَّهُ مَالُ الْمُسْلِمِ ، وَمَالُ الْمُسْلِمِ لَا يَكُونُ غَنِيمَةً لِلْمُسْلِمِينَ بِحَالٍ كَأَمْوَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

যদি কেউ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধ করছিল এমন কোনো মুসলিমকে হত্যা করে তবে উক্ত মুসলিমের সম্পদ যে হত্যা করলো সে (গনিমত হিসেবে) পাবে না। কেননা (কাফিরদের

পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কারণে) এই ব্যক্তির হত্যা করা যদিও বৈধ কিন্তু তার সম্পদ গনিমত নয়। যেহেতু এটা মুসলিমের সম্পদ আর মুসলিমের সম্পদ কখনও গনিমত হতে পারে না যেমন খলীফার বিরুদ্ধে যেসব মুসলিম বিদ্রোহ করে তাদের সম্পদ গনিমত হয় না। [শারহে সিয়ারে কাবীর]

অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মাদ ﵀ কাফিরদের পক্ষে অংশগ্রহণকারী মুসলিমকে কাফির হিসেবে গণ্য করেন নি।

মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ আল-কয়রাওয়ানী অনুরুপ ফতোয়া উল্লেখ করেছেন। যারা কাফিরদের নেতৃত্বে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি তাদের বিদ্রোহী মুসলিম হিসেবে গণ্য করেছেন। এবং তাদের সম্পদ সম্পর্কে বলেন, (ولايؤخذ لأهل البغي شيء) "বিদ্রোহী মুসলিমদের কোনো সম্পদ গ্রহণ করা হবে না।[নাওয়াদির ওয়া ঝিয়াদাত]

বিভিন্ন ওলামায়ে কিরাম থেকে এর স্বপক্ষে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে এবং এর বিপরীতে কোনো আলেম হতে স্পষ্ট মন্তব্য বর্ণিত নেই।

অতএব, যারা খবর পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে কাফিরদের সহযোগিতা করা আর সরাসরি কাফিরদের পক্ষাবলম্বন করে মুসলিমদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার মধ্যে পার্থক্য করতেই চায় এবং এই পন্থায় "মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের যে কোনো প্রকারে সহযোগিতা করা কুফরী" এই মূলনীতিটি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে তাদের এই চেষ্টা একইসাথে অযৌক্তিক এবং অসম্পূর্ণ।

উপরোক্ত আলোচনার উপর নির্ভর করে নিম্মোক্ত সিদ্ধান্তগুলো নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা যায়।

ক. "মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের যে কোনো ভাবে সহযোগিতা করা কুফরী" এই মূলনীতিটি পূর্ববর্তী কোনো আলেম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন নি। তারা যা কিছু বর্ণনা করেছেন সেগুলোর ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে এবং তার সাথে অন্য শর্ত যুক্ত আছে যেমন, কাফিরদের ধর্ম মেনে নিয়ে তাদের সহযোগিতা করা, তাদের ধর্মের কারণে তাদের ভালবাসা, কুফরীর বিজয় কামনা করা ইত্যাদি।

খ. যারা এই মূলনীতির পক্ষে কথা বলেন, তারা কিছু আলেমের দূর্বল ও অস্পষ্ট বক্তব্যের উপর নির্ভর করেছেন। যদি ধরেও নিই সেগুলো সঠিক তবু বলতে হয় উপরোক্ত মূলনীতিটির উপর ইজমা সম্পাদিত হয়েছে এ দাবী করা স্পষ্ট মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। আর যেহেতু অস্পষ্ট ও মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর নির্ভর করে মুসলিমদের কাফির বলা উচিৎ নয় -এটিই ওলামায়ে কিরামের নিকট সর্বস্বীকৃতি মূলনীতি অতএব, দু একজন আলেমের মত পেয়ে গেলেই সমস্ত ওলামায়ে কিরামের মতের বিপক্ষে সেটি গ্রহণ করে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা সঠিক পন্থা হতে পারে না।

গ. কাফিরদের মুসিলমদের বিপক্ষে সাহায্য করা আমরা কুফরী বলছি না এর অর্থ এই নয় যে, আমরা এ ভয়াবহ অপরাধটিকে তুচ্ছ জ্ঞান করছি। একটি মারাত্মক অপরাধ তাতে সন্দেহ নেই। এমন কি বিষয়টি ক্ষেত্র বিশেষে কুফরী পর্যন্ত পৌছাতে পারে। যদি বোঝা যায় উক্ত ব্যক্তি ইসলামের ধ্বংস এবং কুফরীর বিজয় কামনা করেই কাফিরদের সহায়তা করছে। সেক্ষেত্রে তার বাহ্যিক আমল-আখলাকের মাধ্যমে অন্তরের বিষয়টি অনুধাবনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। কেবলমাত্র মুসলিমদের বিপরীতে কাফিরদের সাহায্য করলেই তাকে কাফির বলা যাবে না বরং তার সাথে এমন কোনো কার্যকারণ থাকতে হবে যা প্রমাণ করে সে কুফরীকে পছন্দ করে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন।

♦ *কাফিরদের মজলিসে হাজির হওয়া বা কাফিরদের ভূখন্ডে বসবাস করা।*

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ }

﴾ তোমাদের উদ্দেশ্যে পূর্বেই এ হুকুম নাযিল হয়েছে যে, যখন তোমরা কোথাও আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করতে ও তা নিয়ে তামাশা করতে দেখো তবে অন্য প্রসঙ্গ না আসা পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে বসবে না তাহলে তোমরা তাদের মতো হয়ে যাবে। ﴿ [সূরা নিসা / ১৪০]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ

যদি কেউ মুশরিকদেশ সাথে একত্রিত হয় বা তাদের সাথে বসবাস করে তবে সে তাদের মতই।

[আবু দাউদ]

এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে তবে এটা ঐ হাদীসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, যাতে রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে মুসলিম মুশরিকদের মধ্যে অবস্থান করে আমি তার সাথে সম্পর্কহীন।

বর্তমান সময়কার তাকফীরী চিন্তাধারার লোকেরা এই সকল আয়াত ও হাদীসের সঠিক অর্থ এবং এগুলোর ব্যাপারে ওলামায়ে দ্বীনের মতামত কি সেটা লক্ষ্য না করে এগুলোর স্পষ্টভাষ্যের উপর নির্ভর করে যে কেউ কাফিরদের মজলিসে হাজির থাকে বা হিজরত না করে কাফিরদের ভুখন্ডে বসবাস করে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এ চিন্তাধারা সঠিক নয়। কাফিরদের মজলিসে হাজির থাকা বা

কাফিরদের ভুখন্ডে বসবাস করা কুফরী নয় যদি না কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

আবু বকর আল জাসসাস رحمه الله বলেন,

وقوله إنكم إذا مثلهم قد قيل فيه وجهان أحدهما في العصـيان وإن لم تبلغ معصـيتهم منزلة الكفر والثاني إنكم مثلهم في الرضـى بحالهم في ظاهر أمركم والرضـى بالكفر والاستهزاء بآيات الله تعالى كفر ولكن من قعد معهم ساخطا لتلك الحال منهم لم يكفر وإن كان غير موسع عليه في القعود معهم

আল্লাহ ﷻ যে বললেন (إنكم اذا مثلهم) তাদের সাথে বসলে তোমরা তাদের মতো হয়ে যাবে এর ব্যাখ্যায় দুধরণের কথা বলা হয়েছে।

একঃ তোমরা পাপী হবে যেমন তারাও পাপী যদিও তোমাদের পাপ কুফরীর পর্যায়ের নয়।

দুইঃ তোমরা তাদের মতই যেহেতু বাহ্যিকভাবে বোঝা যাচ্ছে তোমরা কুফরীর উপর সন্তুষ্ট রয়েছো আর কুফরী ও আল্লাহর আয়াত নিয়ে তামাশার উপর সন্তুষ্ট থাকাটা কুফরী। তবে যদি কেউ তাদের সাথে বসে কিন্তু এ অবস্থাকে অপছন্দ করে সে কাফির হবে না যদিও তাদের সাথে বসা তার জন্য বৈধ নয়।

[আহকামুল কুরআন]

ইবনে হাযার আল আসকালানী رحمه الله বলেন,

ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة لأن الإقامة معهم من القاء النفس إلى التهلكة هذا إذا لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم فان أعان أو رضي فهو منهم

এই আয়াত হতে বোঝা যায় কাফির ও জালিমদের নিকট হতে দূরে থাকতে হবে। কেননা তাদের ভিতরে অবস্থান করাটা নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা। এটা তখন যখন সে তাদের সহযোগীতা না করে বা তাদের কাজে সন্তুষ্ট না থাকে। আর যদি সে তাদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে সে তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত বলেই গন্য হবে। [ফাতহুল বারী]

ইমাম আল বায়দাবী رحمه الله বলেন,

{ إنكم إذا مثلهم } في الإثم لأنكم قادرون على الاعراض عنهم والانكار عليهم أو الكفر إن رضيتم بذلك

তোমরা তাদের মতো এর অর্থ হলো পাপের দিক হতে তোমরা তাদের মতো। যেহেতু ইচ্ছা করলে তোমরা তাদের কাজের প্রতিবাদ করতে পারতে বা কমপক্ষে তাদের পরিত্যগ করতে পারতে। আর যদি তোমরা তাদের কুফরীকে মেনে নাও তবে তোমরা কুফরীর দিক হতে তাদের মতো। [তাফসীরে বায়দাবী]

ইমাম বাগাবী رحمه الله বলেন,

إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم

যখন তারা আল্লাহ্ দ্বীন নিয়ে তামাশা করে তখন যদি তোমরা তাদের মজলিসে বসে থাকো এবং এ কাজে সন্তোষ প্রকাশ করো তবে তোমরা তাদের মতোই কাফির। [তাফসীরে বাগাবী]

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী رحمه الله বলেন,

فقد أتيتم من معصية الله نحو الذي أتَوْه منها، فأنتم إذًا مثلهم في ركوبكم معصية الله، وإتيانكم ما نهاكم الله عنه

(তাদের সাথে বসে) তোমরাও আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে যেভাবে তারাও অবাধ্য হয়েছে। অতএব পাপে লিপ্ত হওয়ার দিক থেকে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিষিদ্ধ তাতে লিপ্ত হওয়ার দিক হতে তোমরা সমান। [তাফসীরে তাবারী]

ইবনে কাছির رحمه الله তার তাফসীরে অনুরুপ কথা বলেছেন, এখানে তোমরা তাদের মতো এই অংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন (في المأثم) পাপে লিপ্ত হওয়ার দিক থেকে তোমরা তাদের মতো।

ইমাম কুরতুবী رحمه الله বলেছেন, "وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات" (তোমরা তাদের মতো) এই কথার মধ্যে যে তুলনা করা হয়েছে তা সকল দিক থেকে নয়।

অর্থাৎ তারা যেমন কাফির তোমরাও অনুরুপ কাফির এমন নয় বরং তারাও অপরাধী তোমরাও অপরাধী এখানে এই ধরনের তুলনা বোঝানো হয়েছে।

উপরে আমরা যা কিছু বর্ণনা করলাম তার আলোকে যে বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণিত হয় তা হলো- যে মসলিসে কুফরী কথা-বার্তা আলোচিত হয় শুধুমাত্র সেখানে উপস্থিত থাকার মাধ্যমে একজন মুসলিম কাফির হবে এমন নয় যদি না সে কোনোভাবে ঐ সকল কাজের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে।

সূরা তাওবাতে আল্লাহর দ্বীন নিয়ে তামাশা করা কুফরী এটা বর্ণনা করার পর যারা তামাশা করে তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,

{إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ}

﴾ তোমাদের একদলকে আমি ক্ষমা করতে পারি কিন্তু অন্য দলকে শাস্তি দেবো যেহেতু তারা পাপী ছিল। ﴿ [তাওবা/৬৬]

এ আয়াত সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া رحمه الله বলেন,

و الكفر لا يعفى عنه : فعلم أن الطائفة المعفو عنها كانت عاصية لا كافرة ـ إما بسماع الكفر دون إنكاره و الجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله أو بكلام هو ذنب و ليس هو كفرا أو غير ذلك

কুফরী তো ক্ষমা করা হয় না অতএব এটা নিশ্চিত বোঝা যায় যে, যে দলটিকে ক্ষমা করার কথা বলা

হচ্ছে তারা পাপী ছিল কাফির নয়। হয়তো তারা যারা কুফরী করেছিল তাদের সাথে বসেছিল এবং কোনো প্রতিবাদ না করেই কুফরী কথা শুনেছিল অথবা তারা এমন কিছু কথা বলেছিল যা কুফরী নয় তবে পাপ বা এই প্রকার কিছু ঘটেছিল। [আস-সারিম আল-মাসলুল]

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার এই কথার মাধ্যমে বোঝা যায় যেখানে কুফরী কথা বলা হয় সেখানে বসা বা বিনা প্রতিবাদে কুফরী কথা শোনার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি কাফিরে পরিনত হয় না।

তবে যদি কোনোভাবে কুফরীর প্রতি সমর্থন প্রমাণিত হয় তবে তা কুফরী হবে। যেহেতু কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা কুফরী। যেমন, কাফিরদের ধর্মীয় উৎসবে তাদের সাথে আনন্দে মেতে ওঠা তাদের পোষাকে সজ্জিও হওয়া ইত্যাদি। কাজি ইয়াদ ও হানাফী মাজাহাবের ওলামায়ে কিরাম হতে এ বিষয়ে কিছু বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে।

মোট কথা কাফিরদের মজলিসে হাজির হওয়া নিজেই কুফরী নয় যতক্ষণ না তার মাধ্যমে কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা হচ্ছে এমন বোঝা যায়। এ বিষয়টি স্মরণ রেখে বিভিন্ন অবস্থার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সাধারনভাবে পুথিবদ্ধ একটি নিয়ম সর্বাবস্থায় সকল মানুষের উপর প্রয়োগ করা সঠিক পন্থা নয়। কাফিরদের রাষ্ট্রে বসবাস করার বিধানও একই। সামার্থ থাকা সত্ত্বেও হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রে গমন না করে কুফরী রাষ্ট্রে বসবাস করার কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা যেতে পারে না যদিও এটা অপরাধ হিসেবে গণ্য। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর কথা, ''যে মুশরিকদের সাথে অবস্থান করে সেও তাদের মধ্যে গণ্য'' এর মাধ্যমে সে কাফির এটা উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ}

৺ যারা ঈমান এনেছে কিন্তু (সামার্থ থাকা সত্ত্বেও) হিজরত করে নি তাদের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করে চলে আসে। তবে যদি তারা দ্বীনের খাতিরে তোমাদের সহযোগিতা চায় তবে তাদের সহযোগিতা করা তোমাদের দায়িত্ব। ৺ [আনফাল/৭২]

এই আয়াতে যারা হিজরত করেনি তারা ঈমান এনেছে এ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেই সাথে মুসলিমদের নিকট দ্বীনের খাতিরে সাহায্য প্রার্থনা করার অধিকারও তাদের দেওয়া হয়েছে। অতএব, তারা যে কাফির নয় সে ব্যাপারে এই আয়াত স্পষ্ট দলিল।

যে হাদীসে বর্ণিত আছে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে কাফিরদের সাথে বসবাস করে সে তাদের মতো ঐ হাদীসের ব্যাখ্যায় আজীম আবাদী বলেন, (فَإِنَّهُ مِثْلُهُ: أَيْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوْه) ''সে তাদের মতো এর অর্থ হলো, কিছু দৃষ্টি কোন থেকে (সার্বিকভাবে নয়)'' [আওনুল মা'বুদ] অর্থাৎ সে তাদের মতোই কাফির এমন

নয়। এ বিষয়ে অনেকে আরেকটি আয়াত উল্লেখ করে থাকেন। আল্লাহ্ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

যেসব লোকেরা নিজেদের উপর জুলুম করেছেন ফেরেস্তারা তার জান কবজের সময় প্রশ্ন করে তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে আমরা তো ঐ এলাকায় (কাফিদের এলাকায়) দূর্বল অবস্থায় ছিলাম। ফেরেস্তারা তখন বলেন, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না? তোমরা হিজরত করতে। এই সকল লোকের স্থান হবে জাহান্নাম আর তা খুবই নিকৃষ্ট স্থান। [নিসা/৯৭]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই আয়াতে হিজরত না করলে তাদের জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে এমন বলা হচ্ছে এখানে ঐ ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে এমন বলা হয় নি। এটা তো নিশ্চিত যে কাফিরদের এলাকা হতে হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রে গমণ করা ফরজ। যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হিজরত না করে তারা শাস্তি হিসাবে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা কাফির হয়ে যাবে বা জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

⇒ কুফরী ধর্ম যে মেনে চলে তাকে উক্ত ধর্মের পূজা-উপসনা ও আচার-অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি শিক্ষা দেওয়াও কুফরী।

বাহরুর রায়েকে বলা হয়েছে,

ويكفر بتلقين كلمة الكفر ليتكلم بها ولو علي وجه اللعب

কুফরী কালিমা যে পাঠ করতে চায় তাকে তা শিক্ষা দিলে একজন মুসলিম কাফির হবে। যদিও এটা হাসি তামাশার ছলে হয়।

বর্তমানে অনেক স্কুলে দেখা যায় হিন্দু ধর্ম শিক্ষার জন্য পৃথক শিক্ষক না থাকায় কোনো একজন মুসলিম শিক্ষককে তা শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই দায়িত্ব যে প্রদান করে এবং যে এই দায়িত্ব পালন করে উভয়ে কাফির হবে। এখানে এমন বলা চলবে না যে, আমি বেতনভূক্ত চাকর, কর্তৃপক্ষ যে নির্দেশ দেয় তাই পালন করি। কারণ প্রতিটি মুসলিম অন্য কারো চাকর হওয়ার পূর্বে আল্লাহর চাকর। আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মানা যাবে না।

কিছু আধুনা ইসলামী চিন্তাবিদ নিজেদের সর্ব ধর্মের ছাত্র হিসেবে পরিচয় দেন। ফলে সর্ব ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্মীয় উপসনার পদ্ধতি ও পন্থা সম্পর্কে তাদের নিকট প্রশ্ন করলে তারা তাদের তা শিক্ষা দেন। ঐ সকল ব্যক্তিরা এই কুফরী কর্ম পালন করার জন্যই তার শিক্ষা নিয়ে থাকে। এভাবে কাফিরদের তাদের

ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা দান করাও কুফরী।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে, যদি কোনো মুসলিম অন্য কাউকে কুফরী থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বা কুফরীর বাতুলতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে কুফরী কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করে তবে তা উত্তম বলে বিবেচিত হবে।

⇒ কুফরী কাজের আদেশ বা উপদেশ দেওয়া কুফরী একইভাবে কাউকে কুফরীর প্রতি উৎসাহিত করা বা কুফরী করতে বাধ্য করাও কুফরী।

ইমাম নাব্বী ﷬ বলেন,

والرضي بالكفر كفر حتي لو سأله كافر يريد الاسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فلم يفعل أو أشار عليه بأن لا يسلم أو علي مسلم بأن يرتد فهو كافر

কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা কুফরী। এমনকি যদি কোনো কাফির মুসলিম হতে চায় এবং কোনো মুসলিমের নিকট এসে কালিমা পাঠ করাতে অনুরোধ করে আর উক্ত মুসলিম তা না করে বা তাকে ইশারা ইঙ্গিতে মুসলিম না হতে পরামর্শ দেয় বা কোনো মুসলিমকে কাফির হওয়ার ইঙ্গিত দেয় তবে উক্ত ব্যক্তি কাফির হবে। [আর-রাওদা]

বাহরুর রায়েকে বলা হয়েছে,

وبأمره امرأة بالارتداد والافتاء بذالك وإن لم تكفر المرأة

যদি কেউ কোনো মহিলাকে স্বামীর নিকট হতে তালাক পাওয়ার কৌশল হিসাবে কুফরী করার পরামর্শ দেয় বা কোনো মুফতি এমন ফতোয়া দেয় তবে উক্ত মহিলা কুফরী না করলেও উক্ত মুফতি কাফির হবে।

ইমাম নাব্বী ﷬ বলেন,

ولو أكره مسلماً على الكفر صار المكره كافراً

যদি কেউ কোনো মুসলিমকে কাফির হতে বাধ্য করে তবে যে বাধ্য করলো সে কাফির হয়ে যাবে।

[আর-রাওদা]

মোল্লাহ আলী ক্বারী আল-হানাফী বলেন,

وفي الفتاوي الصغري اسلم كافر فقال له مسلم لو لم تسلم حتي ترفع ميراثا أي تأخذه كفر أي المسلم القائل

ফতোয়ায়ে সুগরাতে আছে একজন কাফির মুসলিম হলে অন্য একজন মুসলিম তাকে বলল, তুমি যদি মিরাছের সম্পদ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। যে মুসলিম একথা বলল সে কাফির হবে।

[শারহে ফিকহে আকবার/২৭২]

কুফরী কাজের আদেশ-উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবে সর্বাধিক কঠোর ফতোয়া বর্ণিত আছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন,

وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَشَدِّ الْمَذَاهِبِ تَغْلِيظًا لِمِثْلِ هَذَا وَهُوَ مِنْ أَبْلَغِ الْمَذَاهِبِ فِي تَكْفِيرِ مَنْ يَأْمُرُ بِالْكُفْرِ

যে কুফরী কাজের আদেশ দেয় তাকে কাফির বলার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার মাযহাব সর্বাধিক কঠোর। [ফাতওয়া এ কুবরা]

হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন ফিকাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে,

ولو قال كافر لمسلم اعرض علي الاسلام فقال حتي أري أو اصبر إلي الغد أو طلب عرض الاسلام من واعظ فقال اجلس إلي آخر المجلس كفر

যদি কোনো কাফির কোনো মুসলিমকে বলে আমাকে ইসলামের দীক্ষা দেন আর সে বলে আমাকে একটু চিন্তা করার সুযোগ দিন বা আগামী কাল পর্যন্ত সবর করুন। অথবা কোনো কাফির যদি কোনো বক্তার মজলিসে উপস্থিত হয়ে ইসলামের দীক্ষা চায় আর উক্ত বক্তা বলে সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন তবে সে কাফির হবে। [শারহে ফিকহে আকবার]

ইবনে তাইমিয়া ﵀ এই ফতোয়াটি উল্লেখের পর বলেন,

لانه امر بالبقاء في الكفر ساعة

কেননা সে কিছু সময়ের জন্য হলেও উক্ত কাফিরকে কুফরীর উপর টিকে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

ইমাম নাব্বী ﵀ আর-রাওদাতে হানাফী ওলামায়ে কিরাম থেকে উক্ত ফতোয়া উল্লেখ করে বলেন, (وقد حكينا نظيره عن المتولي) আমরা পূর্বে আল-মুতাওয়াল্লী হতে অনুরুপ বর্ণনা উল্লেখ করেছি। এর মাধ্যমে তিনি ঐ বর্ণনাটি উদ্দেশ্য করেছেন যা আমরা এই শিরোনামের প্রথমেই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ এ বিষয়ে শাফেঈ মাযহাবের ওলামায়ে কিরামও একই ফতোয়া দিয়েছেন।

বর্তমানে দেখা যায় প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মীরা বিভিন্ন সভা বা সমাবেশে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পাশা-পাশি একজন হিন্দু বা খৃষ্টান ডেকে এনে গীতা, ত্রিপিটক বা বাইবেল পাঠ করিয়ে থাকে। রাষ্ট্রের বড় পর্যায়ের কোনো ব্যক্তি অসুস্থ বা ইন্তেকাল করলে তার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল ধর্মের অনুসারীদের নিজ নিজ উপসনালয়ে প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

“কাউকে কুফরী করার নির্দেশ বা পরাশর্ম দেওয়া কুফরী” এ মূলনীতিরি আলোকে এসব কাজ স্পষ্ট

কুফরী হিসেবে গণ্য।

⇒ অন্য কেউ কুফরী করুক এটা কামনা করার বিধান।

উপরে আমরা বর্ণনা করেছি, যে ব্যক্তি নিজের কুফরী কামনা করে সে কাফির হয় কিন্তু অন্য করো কুফরী কামনা করলে সে কাফির হবে কিনা সে বিষয়ে আলেমদের মঝে দ্বিমত আছে। হানাফী মাজাহাবের ফিকাহ্ গ্রন্থ মাজমাউল আনহারে বলা হয়েছে,

وَالرِّضَى بِكُفْرِ نَفْسِهِ كُفْرٌ بِالِاتِّفَاقِ وَأَمَّا الرِّضَى بِكُفْرِ غَيْرِهِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الرِّضَى بِكُفْرِ الْغَيْرِ إنَّمَا يَكُونُ كُفْرًا إذَا كَانَ يَسْتَجِيزُ الْكُفْرَ وَيَسْتَحْسِنُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَلَكِنْ أَحَبَّ الْمَوْتَ أَوْ الْقَتْلَ عَلَى الْكُفْرِ لِمَنْ كَانَ شِرِّيرًا مُؤْذِيًا بِطَبْعِهِ حَتَّى يَنْتَقِمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ فَهَذَا لَا يَكُونُ كُفْرًا وَعَلَى هَذَا إذَا دَعَا عَلَى ظَالِمٍ فَقَالَ أَمَاتَك اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْكُفْرِ أَوْ قَالَ سَلَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْك الْإِيمَانَ وَنَحْوَهُ فَلَا يَضُرُّهُ إنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنْ يَنْتَقِمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ عَلَى ظُلْمِهِ وَإِيذَائِهِ الْخَلْقَ

নিজের ব্যাপারে যে ব্যক্তি কুফরী কামণা করে সে কাফির এ ব্যাপারে সকলে একমত কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের ব্যাপারে কুফরী কামনা করে তার সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে। শাইখুল ইসলাম বলেন, অন্যের কুফরী কামনা করা কেবল তখন কুফরী হবে যখন কুফরীকে উত্তম ও শ্রেয় মনে করে এটা করা হয় কিন্তু যখন এভাবে নয় বরং কোনো অত্যাচারী ব্যক্তিকে আল্লাহ শাস্তি দিক এই ইচ্ছায় সে কাফির হয়ে মারা যাক বা কাফির অবস্থায় নিহত হোক এটা কামনা করা হয় তবে তা কুফরী হবে না। এই দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায়, যদি কেউ কোনো জালিমের উপর বদ দোয়া করে বলে আল্লাহ তোর কাফির অবস্থায় মৃত্যু দিক বা আল্লাহ তোর ঈমান ছিনিয়ে নিক তবে যে এই দোয়া করবে তার কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে কষ্ট দেওয়া বা জুলম করার বিনিময়ে আল্লাহ তার নিকট হতে প্রতিশোধ নিক।

বাহরুর রায়েক ও হানাফী মাযহাবের অন্যান্য ফিকাহ্গ্রন্থে অনুরুপ কথা বলা হয়েছে। শাফেঈ মাযহাবের ফিকাহ্ গ্রন্থ আর-রাওদাতে ইমাম নাব্বী ﵀ আল-মুতাওয়াল্লী থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন,

لو قال لمسلم سلبه الله الإيمان أو لكافر لا رزقه الله الإيمان فليس بكفر لأنه ليس رضى بالكفر لكنه دعا عليه بتشديد الأمر والعقوبة عليه

যদি কোনো মুসলিম অন্য কোনো মুসলিমকে বলে আল্লাহ তোমার ঈমান ছিনিয়ে নিক বা কোনো কাফিরকে বলে আল্লাহ তোমাকে ঈমান আনার তাওফীক না দিক তবে এটা কুফরী হবে না যেহেতু এটা কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা হিসেবে গণ্য নয় বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে কঠোর শাস্তি প্রার্থনা করে বদ-দোয়া হিসেবে এটা করা হয়।

কোনো অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করুক এটা কামণা করা যে দোষের কিছু নয় মুসা ﵇ এর ঘটনা এ ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল। তিনি ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের উপর বদদোয়া

করে বলেছিলেন,

{رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ}

হে আমাদের রব তাদের সম্পদ ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তর কঠোর করে দিন যাতে তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিতে পতিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ঈমান না আনে। [ইউনূস/৮৮]

অতএব, যে ব্যক্তি কুফরী কাজের প্রতি সন্তোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে অন্য কেউ কাফির হয়ে যাক এটা কামনা করে সে কাফির হবে কিন্তু যে জালিম ও পাপচারী ব্যক্তির শাস্তি কামনা করে কাফির অবস্থায় তার মৃত্যু হোক এমন দোয়া করে তার এ কাজ কুফরী নয় এমন কি পাপও নয়। তবে রাসুলূল্লাহ্ ﷺ এর সুন্নাত হলো, বিশেষ অবস্থায় ছাড়া এমন না বলা।

এখনে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, অন্য কেউ কুফরী করুক এটা কেবল অন্তরে কামনা করা আর তাকে কুফরী কাজে সহযোগিতা করা বা ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদান করা একই বিষয় নয়। কুফরী কাজে সহাযোগিতা করা বা ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদান করা সর্বাবস্থায় কুফরী কিন্তু কেবল অন্তরে কারো কুফরী কামনা করা বা তার জন্য কাফির অবস্থায় মৃত্যু চেয়ে বদ দোয়া করার ক্ষেত্রে উপরে আমরা যা উল্লেখ করেছি সেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন প্রযোজ্য।

⇒ কুফরী কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া কুফরী।

ইবনে আবেদীন رحمه الله বলেন,

لان الرضا بالكفر كفر، فكيف بتعظيم الكفر

যদি কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করাই কুফরী হয় তবে কুফরীকে সম্মান করার অবস্থা কি হতে পারে।

[রদ্দুল মুহতার]

হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন ফিকহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে,

لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ اللَّهَ تَعَالَى خَمْسِينَ سَنَةً ثُمَّ جَاءَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ وَأَهْدَى إلَى بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ بَيْضَةً يُرِيدُ تَعْظِيمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدْ كَفَرَ وَحَبَطَ عَمَلُهُ

যদি কোন ব্যাক্তি পঞ্চাশ বছর আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে কিন্তু নওরোজের (মাজুসীদের ধর্মীয় উৎসব) দিন একজন মুশরিককে একটি ডিমও উপহার দেয় যদি তার উদ্দেশ্য হয় উক্ত দিনকে সম্মান করা তবে সে কাফির হয়ে যাবে এবং তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে।

[রদ্দুল মুহ্তার, বাহরুর রায়েক ও অন্যান্য]

এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। একজন মুসলিম নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, ইসলাম একমাত্র সত্য ধর্ম এবং অন্য সকল ধর্ম নিশ্চিতভাবে ভ্রান্ত ও বাতিল। ইসলাম হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তির একমাত্র পথ আর সকল ধর্ম ও মতবাদ জাহেলী যুগের অন্ধারময় ভয়ংকর মৃত্যুকূপ। মুসলিমরা এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, শিরক-কুফর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পাপাচার ও মারাত্মক অপরাধ। একজন চোর, মদ্যপ, ব্যাভিচারী মুসলিম একজন ভদ্র, অমায়িক, মার্জিত স্বভাবের অমুসলিম অপেক্ষা আল্লাহর দরবারে অধিক সম্মানিত। এধরণের আক্বীদা বিশ্বাসের কারণে মুসলিমরা শিরক-কুফর এবং তার ধারক-বাহকদের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমানে ঘৃণা করে থাকে। এটাই ঈমানের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ }

৺ আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা সাজিয়ে দিয়েছেন আর তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন কুফর ফিসক ও পাপ কাজকে। এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। ৺ [সূরা হুজুরাত/৭]

তিনি আরো বলেন,

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ}

৺ তোমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে ইব্রাহীম ও তার সঙ্গীদের মাঝে যখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেছিল আমরা তোমাদের থেকে এবং তোমরা যা কিছুর উপসানা করো তা হতে বিচ্ছিন্ন। আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের সাথে আমাদের শত্রুতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেল তোমরা এক আল্লাহ্ তে বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত। ৺ [মুমতাহিনা/৪]

এই স্বয়ংক্রিয় ও সর্ব স্বীকৃত বিশ্বাসের বিপরীতে বর্তমানে কিছু নামধারী ইসলামী চিন্তাবিদ সাধারন মুসলিমদের অন্য ধর্মের অনুসারী ও তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার দীক্ষা দিচ্ছেন। তারা বলেন, বিধর্মীদের সামনে তাদের ধর্মের সমালোচনা করো না। তোমার ধর্মের সমালোচনা করা হলে তুমি যেমন কষ্ট পাও তাদের ধর্মের সমালোচনা করা হলে তারাও কষ্ট পায়। তুমি যেমন পছন্দ করো তোমার ধর্মের প্রতি অন্যেরা শ্রদ্ধাশীল হোক তেমনি তোমারও অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিৎ।

তারা নিজেদের মতামতের স্বপক্ষে কিছু আয়াতকে ভুলভাবে উপস্থাপণ করে থাকে। যেমন, আল্লাহর বাণী,

{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}

﴾ এবং তোমরা মন্দ বলো না তারা যাদের উপাসনা করে ঐসব উপাস্যদের। কারন তাহলে তাহারাও শত্রুতা ও অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে। ﴿ [আনআম/১০৮]

তারা বলতে চায়, এই আয়াতে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলিমদের স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা অন্য ধর্মকে কোনোভাবে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত করবে না। যেহেতু সেক্ষেত্রে কাফিররাও ইসলামের সমালোচনা করবে।

সেই সাথে আরো একটি আয়াত পেশ করা হয়। তা হলো,

لكم دينكم ولي دين

﴾ হে নবী, আপনি বলুন, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম। ﴿

[সূরা কাফেরুন/৬]

তারা এ আয়াতের অর্থ করে থাকেন এমন; "তোমরা স্বাধীনভাবে তোমাদের দ্বীন মেনে চলো আর আমি স্বাধীনভাবে আমার দ্বীন মেনে চলবো। আমাদের মাঝে কোনো বিরোধ বা বিবাদ থাকবে না।

এই দুটি আয়াতের এমন অর্থ করে তারা চরমভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে। যদি কাফিরদের ধর্মকে মেনেই নেওয়া হবে, তাদের শিরকী আক্বীদা-বিশ্বাস সমূহের নিন্দা-মন্দ ও সমালোচনা করা যদি নিষেধই হয় তবে নবী-রাসুলরা কেন আগমন করেছিলেন! তারা কি কেবল এতটুকু বলতে এসেছিলেন যে, "যে ব্যক্তি কাফির অবস্থায় আছে সে ওভাবেই থাক এটা কোনো সমস্যার বিষয় নয়।"? প্রশ্ন হলো, শুধু এতটুকু বলার জন্য নবী-রাসুল আগমন করা এবং কাফিরদের সাথে জীবন-মরন সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কি আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল?

এ বিষয়টির উদাহরণ হলো, ঐ নির্বোধের মতো যার উট হারিয়ে গিয়েছিল। সে দিন-রাত সারা এলাকা ঘোষণা করে বেড়াচ্ছিল "আমার একটি উট হারিয়ে গেছে। উটটি যে পাবে তাকেই দান করে দেওয়া হবে।"

তার এই ঘোষণা শুনে একজন বৃদ্ধ ধমক দিয়ে বলল, উট যে পাবে যদি তাকেই দিয়ে দেওয়া হয় তবে তোমার এতো হৈ-চৈ করে মানুষের ঘুম নষ্ট করার কি দরকার?

যার যা বিশ্বাস যদি তার উপরই ছেড়ে দেওয়া হয় তবে সে জন্য নবী-রাসুল প্রেরণ করে সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম-সংঘর্ষের কি প্রয়োজন ছিল? এই সহজ প্রশ্নটি এইসব অবচেতন মস্তিষ্কের চিন্তাবিদদের মাথায় ঢোকে না।

সত্য কথা হলো রাসুলরা আগমন করেছিলেন, কুফরী ধর্ম বিশ্বাস পৃথিবী হতে চিরতরে নিঃচিহ্ন করার জন্য। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر

আমিই বিনাশকারী আল্লাহ আমার মাধ্যমে কুফরীকে বিনাশ করবেন [সহীহ বুখারী]

আমর ইবন আবাসা رضي الله عنه রসুলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করলেন (بأي شيء أرسلك) আল্লাহ আপনাকে কি উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন? রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء وكسر الأوثان وصلة الرحم

যাতে লা শরীক এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়, মুর্তি ভেঙে ফেলা হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হয়। [সহীহু মুসলিম]

অন্য বর্ননায় এসেছে,

أن تعبد الله و تكسر الأوثان و الأديان

আমাকে পাঠানো হয়েছে সকল মূর্তি ও অন্য সকল ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য।

আমর ইবন আবাসা رضي الله عنه এটা শুনে বললেন, (نعم ما أرسلك به) "আল্লাহ আপনাকে কত উত্তম দায়িত্ব দিয়ে প্রেরন করেছেন!" [মুস্তাদরাকে হাকীম]

আল্লাহ ﷻ সুস্পষ্ট করে বলেন,

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ}

﴾ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না সকল প্রকার ফিতনা (শিরক-কুফর) শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। ﴿ [আনফাল/৩৯]

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতে ফিতনা অর্থ শিরক-কুফর বলা হযেছে। অর্থাৎ শিরক-কুফর নিঃশেষ হয়ে কেবল মাত্র আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই ঘোষণা পুনরাবৃত্তি করে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِى وَبِمَا جِئْتُ بِهِ

আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আর আমার উপর ও আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

[সহীহ মুসলিম]

এই নির্দেশের আলোকে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ সুযোগ পাওয়া মাত্র সকল মূর্তি ধ্বংস করতে শুরু করেন। মক্কা বিজয়ের পরই পবিত্র কা'বা শরীফে তিনশ ষাটটি মূর্তি তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। এ বিষয়ে সহীহ্ বুখারীতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। অনেকে এখানে ওযর পেশ করে বলেন, মূর্তি গুলো কা'বা শরীফের মধ্যে ছিল তাই কা'বাকে পবিত্র করার স্বার্থেই সেগুলো ভেঙে ফেলতে হয়েছিল। অর্থাৎ কা'বাকে পবিত্র করার বাধ্য-বাধকতা না থাকলে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ সেগুলোর সাথে এহেন আচরণ করতেন না। প্রশ্ন হলো, কা'বাকে পবিত্র করাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হবে তাহলে মূর্তিপূজারীদের নির্দেশ দিলেই তো তারা পরম শ্রদ্ধাভারে সেগুলো সরিয়ে নিতে পারতো। সেগুলো ভেঙে ফেলার প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া পবিত্র কা'বা শরীফের মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলার পরেই রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বিভিন্ন এলাকাতে লোক প্রেরণ করেন যারা ঐ সকল এলাকার মন্দিরসমূহে প্রবেশ করে সেখানকার সকল মূর্তি ধ্বংস করেন। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আমর ইবনে আস, মুগীরা ইবনে শো'বা ইত্যাদি বিভিন্ন সাহাবাকে বিভিন্ন এলাকায় এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়।

সাহাবায়ে কিরাম নিজ উদ্দ্যোগেও বহু সংখ্যক মূর্তি নিধন করেছেন বলে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। সেসব ঘটনা এখানে সুবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নয় তবে তার মধ্যে কিছু চমকপ্রদ ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি যাতে মূর্তি-প্রেমিক চিন্তাবিদদের কিছু সুচিন্তা জাগ্রত হয়।

১. হযরত আবু দারদা رضي الله عنه ও আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা رضي الله عنه জাহেলী যুগে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন রওয়াহা رضي الله عنه আবু দারদা এর পুর্বেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা رضي الله عنه প্রায়ই তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন কিন্তু তিনি তার ডাকে সাড়া দিতেন না। তার একটি মুর্তি ছিল তিনি সেটির উপাসনা করতেন। একদিন আবুদারদা رضي الله عنه এর অনুপস্থিতিতে আব্দুল্লাহ ইবরে রওয়াহা رضي الله عنه তার মুর্তির ঘরে প্রবেশ করে কুড়াল দিয়ে আঘাত করে মুর্তিটি ভাঙতে লাগলেন। আবু দারদা رضي الله عنه এর স্ত্রী কুড়ালের শব্দে শুনে ছুটে এসে বললেন

- ওহে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহাহ رضي الله عنه তুমি তো আমাকে ধংস করে ফেললে

মুর্তি ভাঙার কাজ সমাপ্ত করে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা رضي الله عنه প্রস্থান করলেন। আবুদারদা رضي الله عنه ফিরে এসে তার স্ত্রীকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখলেন সব কিছু শুনে এবং নিজ চোখে দেখে তিনি ভীষন রেগে গেলেন পরক্ষণেই চিন্তা করলেন যদি সত্যিই এর কোন ক্ষমতা থাকত তবে নিজেকে নিশ্চয় রক্ষা করতে পারত। ফলে তিনি মুসলিম হয়ে গেলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম]

২ . মদিনাতে যখন ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যুবকদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের জোয়ার

পড়ে গিয়েছিল সে সময়ও যেসব প্রবীন ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তি ইসলাম থেকে দূরে থেকে গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আমর ইবন আলজামুহ। তার একটি কাঠের মূর্তি ছিল। তিনি সেটিকে পবিত্র জ্ঞান করতেন এবং সম্মান করতেন। সেটিতে সুগন্ধি মাখাতেন, এবং তার উপাসনা করতেন। তার ছেলে মুআজ এবং অন্যান্য মুসলিম যুবকেরা প্রতি রাতে মূর্তিটিকে চুরি করে নিয়ে যেতেন এবং এমন আবর্জনাময় গর্তে নিক্ষেপ করতেন যেখানে অন্যান্য আবর্জনা তো বটেই এমনকি মানুষের মল মুত্র ফেলা হত। আমর সকালে পূজা করতে যেয়ে মূর্তিটিকে না পেয়ে ভীষন রেগে যেতেন। এদিক সেদিক খোজ করে যখন আবর্জনাময় গর্তে সেটিকে উল্টো হয়ে পড়ে থাকতে দেখতেন তখন তার মনের অবস্থা কি হত তা আশা করি মুর্তির প্রতি মমতাশীল পন্ডিতবর্গ টের পাবেন। মুর্তিটিকে ওভাবে আবিষ্কার করে তিনি বলতেন,

أما والله لو أعلم من يصنع هذا بك لأحرقه

যদি আমি জানতাম কে তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে তবে আমি তাকে পুড়িয়ে মারতাম।

এরপর তিনি মূর্তিটাকে আবার পবিত্র করতেন সুগন্ধি মাখাতেন এবং তার জন্য নির্ধারিত স্থানে রেখে দিতেন। এ ঘটনা প্রায়ই ঘটতে থাকায় শেষে বিরক্ত হয়ে মুর্তিটির গলায় একটি তরবারী ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন,

- যদি তোমার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকে তবে নিজেকে নিজে রক্ষা করো।

সেদিনও পুর্বের মত মূর্তিটি চুরি করা হল। মূর্তিটির গলা হতে তরবারীটি কেড়ে নিয়ে একটি মৃত কুকুর ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তারপর সেটিকে গর্তে নিক্ষেপ করা হল। পরদিন সকালে মূর্তিটিকে মৃত কুকুরের সাথে গলাগলি করে পড়ে থাকতে দেখে আমরের হুশ ফিরল। তিনি বললেন

لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن

যদি তুমি সত্যিই ইলাহ হতে তবে নিশ্চয় একটি কুকুরের সাথে গলা জড়িয়ে কুপের মধ্যে পড়ে থাকতে না। [বায়হাকী দালাইলুন নুবুওয়া, সীরাতে ইবন হিশাম]

এ ঘটনার পর তিনি মুসলিম হয়ে যান।

এই ঘটনা প্রমান করে, মূর্তির প্রতি মমতা দেখিয়ে নয় বরং সেগুলোর প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করলেই একজন মূর্তি পূজারী বুঝতে সক্ষম হবে, আসলে ওগুলোর কোনে ক্ষমতা নেই।

৩ . হিজরতের পর হযরত আলী ﵁ দেখলেন একজন মুসলিম মেয়ের বাড়িতে রাত্রে একজন পুরুষ আগমন করে তার দরজাতে টোকা দেয়। মেয়েটি দরজা খুললে তার হাতে কিছু একটা দিয়ে ছেলেটি বিদায় হয়ে যায়। হয়রত আলী ﵁ মেয়েটিকে প্রশ্ন করলে সে বলে,

“ঐ ব্যক্তি হলেন সাহল ইবন হুনাইফ তিনি তার নিজ সম্প্রদায়ের মুর্তিগুলো ভেঙে আমাকে দিয়ে যান আমি তা দ্বারা উনুন জ্বালাই।” [সীরাতে ইবনে হিশাম, উয়ূনুল আছার, ইবন কাছীরের সীরাত গ্রন্থ]

এত কিছুর পরও কিভাবে দাবী করা সম্ভব যে, ইসলাম শিরক-কুফরকে শ্রদ্ধা-সম্মান করা বা শিরক কুফরের প্রতি সহনশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে!

এখন উপরোক্ত আয়াতদুটি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলবো।

♦ *আল্লাহর বাণী “তাদের উপাস্যদের মন্দ বলো না” এর সঠিক অর্থ।*

যে আয়াতে অন্য ধর্মের সমালোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে সেখানে এই নিষেধাজ্ঞার কারণও বলে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ বলেছেন, (فيسبوا الله عدوا بغير علم) “তাহলে তারা শত্রুতা ও অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে”। এই আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ও তার সাহাবায়ে কিরাম মুশরিকদের উপাস্য সমূহের সমালোচনা করতেন। এ অবস্থায় কাফিররা বলে,

يا محمد، لتنتهين عن سبك آلهتنا، أو لنهجون ربك

হে মুহাম্মাদ, তুমি যদি আমাদের উপাস্যসমূহের নিন্দা করা হতে বিরত না হও তবে আমরাও তোমার ইলাহকে নিন্দা করবো। [ইবনে কাছির]

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ও তার সাহাবারা কাফিরদের উপাস্যসমূহের নিন্দা-মন্দ করেই আসছিলেন। এটা বন্ধ করার জন্য মুশরিকরা বলে, যদি তোমরা আমাদের উপাস্যদের নিন্দা করা হতে বিরত না হও তবে আমরাও তোমাদের উপাস্য সম্পর্কে মন্দ কথা বলবো। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাদের উপাস্য সম্পর্কে মন্দ কথা বলতে নিষেধ করেন। আল্লাহর সম্মান সুরক্ষিত রাখার জন্যই এটা করা হয়েছে বাতিল উপাস্য সমূহকে সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে নয়।

নিতান্ত ঝগড়াটে ও নির্বোধ প্রকৃতির লোকদের এড়িয়ে চলা উচিৎ এই অর্থে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) “যখন তাদের সাথে মুর্খ লোকেরা কথা বলে তখন তারা বলে সালাম”। [সূরা ফুরকান/৬৩] এখানে সালাম অর্থ অবজ্ঞাভরে এড়িয়ে চলা, সম্মান প্রদর্শন বা সম্ভাষণ করা নয়। এই বাচনভঙ্গি যারা বোঝে না তারাই সূরা আনয়ামের উপরোক্ত আয়াতে কাফিরদের উপাস্যদের সম্মান প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে এমন মনে করে।

প্রকৃত কথা হলো, কাফিরদের ধর্ম ও তাদের উপাস্যদের সম্পর্কে সমালোচনা করা নিজে একটি বৈধ ও

উত্তম কাজ। কিন্তু এর ফলস্রুতে আল্লাহর সম্মানে আঘাত আসতে পারে এই আশঙ্কায় এটা পরিত্যগ করতে বলা হয়েছে।

ইমাম বায়দাবী رحمه الله এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,

وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر شر

এই আয়াত প্রমাণ করে একটি অপছন্দনীয় কাজ ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় অনেক সময় একটি উত্তম কাজ পরিত্যাগ করতে হয়। কেননা যা কিছু খারাপের দিকে নিয়ে যায় তা খারাপ বলে গণ্য।

কাজি ইবনুল আরবী رحمه الله এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

فَمَنَعَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ أَحَدًا أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا جَائِزًا يُؤَدِّي إِلَى مَحْظُورٍ

আল্লাহ ﷻ তার কিতাবে প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা আসলে বৈধ কিন্তু তা অন্য আরেকটি অবৈধ কাজের কারণ হয়। [আহকামুল কুরআন]

এরপর তিনি বিষয়টির আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,

هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْمُحِقِّ أَنْ يَكُفَّ عَنْ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ إذَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى ضَرَرٍ يَكُونُ فِي الدِّينِ ؟ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ طَوِيلٌ ، اخْتِصَارُهُ : أَنَّ الْحَقَّ إنْ كَانَ وَاجِبًا فَيَأْخُذُهُ بِكُلِّ حَالٍ ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فَفِيهِ يَكُونُ هَذَا الْقَوْلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, একজন ব্যক্তির উচিৎ কোনো একটি সঠিক কাজ পরিত্যাগ করা যদি তার মাধ্যমে দ্বীনের কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। সংক্ষেপে কথা হলো, যদি বিষয়টি ফরজ হয় তবে যে কোনো অবস্থায় তা আদায় করতে হবে আর যদি এমন হয় যে, বিষয়টি করলে করা যায় কিন্তু না করলেও দোষ নেই তবে তার উপর এই কথা (সতর্কতার কারণে পরিত্যাগ করা) প্রযোজ্য হবে। আর আল্লাহই ভাল জানেন। [আহ্কামুল কুরআন]

ইমাম ইবনুল আরাবীর এই ব্যাখ্যাটি এই বিষয়ে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কাফিরদের উপাস্যসমূহের নিন্দা-মন্দ করা নিজে একটি ভাল কাজ তবে কাফিররা আল্লাহকে নিন্দা-মন্দ করবে এই কারণে এটা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এই বিধান কেবল সেখানে প্রযোজ্য হবে যেখানে মনগড়া ধর্ম-বিশ্বাস ও বাতিল উপাস্যদের সমালোচনা করা ফরজ বা আবশ্যক না হয়। কিন্তু যখন দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে ও ইসলামের প্রচার করার স্বার্থে ঐ সকল বিষয়ের সমালোচনা জরুরী হয়ে পড়ে তখন কে কি বলবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে শিরক-কুফরের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। একারণে পবিত্র কুরআনে এবং রাসুলের হাদীসে বহুভাবে কাফিরদের ধর্ম-বিশ্বাস ও তাদের উপাস্যদের সমালোচনা করতে দেখা যায়।

পবিত্র কুরআনে কাফিরদের উপাস্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, ওরা কি শুনতে পায়? [শোয়ারা/৭২] ওদের কি

হাত-পা আছে? [আ'রাফ/১৯৫] ওরা তো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়, মাছি কিছু ছিনিয়ে নিলে তা ফিরিয়ে নিতেও সক্ষম নয়। এই উপাস্যরা এবং তাদের পূজারীরা কত দূর্বল! [হাজ্জ/৭৩] ইত্যাদি।

মুশরিকদের উদ্দেশ্যে দ্যার্থহীনভাবে বলা হয়েছে,

{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ}

তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যরা জাহান্নামের খড়ি। [আম্বিয়া/৯৮]

ইব্রাহীম ﷺ মূর্তি পূজারীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

{أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ}

ধিক! তোমাদের এবং তোমরা যা কিছুর উপসানা কর তাদের। তোমরা কি কিছুই বোঝো না? [আম্বিয়া/৬৭]

বিধর্মীদের ধর্ম ও উপাস্য সম্পর্কে এই প্রকৃতির সমালোচনা থেকে মুমিনরা কখনই বিরত হবে না যেহেতু শিরক-কুফরের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রচার প্রচারনা চালানো তাদের উপর অর্পিত ঈমানী দায়িত্ব। এ ধরণের সমালোচনার কারণে যদি কাফিরা রাগান্বিত হয়ে আল্লাহ-রাসুল বা ইসলাম সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে তবে তার জন্য তারা দ্বিগুণ অপরাধী হবে। যেহেতু একদিকে তারা নিজেরা বাতিলের উপর টিকে রয়েছে এবং অন্য দিকে সত্য ধর্মকে বাতিল বলে আখ্যায়িত করছে।

এখন পাঠক চিন্তা করে দেখতে পারেন, "তোমরা তাদের উপাস্যদের মন্দ বলো না" এই আয়াতের মধ্যে আদৌ কাফিরদের ধর্ম-বিশ্বাস ও উপাস্যদের সম্মান প্রদর্শন করতে বলা হচ্ছে কি না।

♦ *"তোমার দ্বীন তোমার আমার দ্বীন আমার" এই আয়াতটির সঠিক মর্মার্থ।*

যারা মনে করে "তোমার দ্বীন তোমার আমার দ্বীন আমার" এ আয়াতে কাফিরদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার পরিপূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। তারা উপরের আয়াতটির মতো এ আয়াতটির ব্যাপারেও স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। একটি উদহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়।

ধরুন একদিন সন্ধ্যায় আপনার একজন বন্ধু আপনার নিকট আবদার করে বলল,

- চলো এখন গহরহাটির মেলা থেকে ঘুরে আসি।

আপনি ভাবলেন গহরহাটি বহুদুর, তাছাড়া গয়েষ পুরের মোড় পার হওয়ার পর থেকে আর কোন জনবসতি নেই। জিন-ভুত যদি ছেড়েও দেয় চোর ডাকাত যে আক্রমন করতে পারে তার সম্ভবনা প্রকট। দু একদিন

অন্তর অন্তর সেধরনের খবরও আপনার কানে আসে। আপনি নিতান্ত মমতা মাখা কণ্ঠে বন্ধুকে সব ঘটনা খুলে বললেন এবং তাকে বারবার নিষেধ করলেন। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। বন্ধুর অসহনীয় পিড়াপিড়িতে বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়ে আপনি চিৎকার করে বললেন,

- তোর কাজ তুই কর আমার কাজ আমি করি।

আপনার এই কথা শুনে যদি আপনার বন্ধু মনে করে আপনি তাকে গহরহাটির মেলা দেখতে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন বা তাকে যেখানে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করছেন তবে এটা কি সুস্থ ভাষা জ্ঞান বলে গণ্য হবে?

উপরোক্ত আয়াতটির অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও একই বোকামী করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ নবুয়ত প্রাপ্তির পর হতে দিন-রাত পরিশ্রম করে কাফির-মুশরিকদের বাতিল ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করছেন। তাদের শিরক-কুফরের ভয়বাহতা সম্পর্কে সতর্ক করছেন। কিন্তু তারা সেসব সতর্কবাণী দম্ভভরে উপেক্ষা করে চলেছে। এ কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য মুসলিমদের সাথে কাফিরদের সংঘর্ষ তীব্র থেকে তীব্র হয়ে উঠেছে। এমন এক পরিস্থিতিতে একবার কাফিররা সম্মিলিত হয়ে এসব সংঘর্ষ নিরসনকল্পে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট সর্বধর্মীয় জোট গঠন করার প্রস্তাব নিয়ে আসে। তারা বলে, আমরা কিছু দিন আপনার ধর্ম পালন করবো আর আপনারা কিছুদিন আমাদের ধর্ম পালন করবেন।

তাফসীরে তাবারীতে বিষয়টি এভাবে লেখা আছে,

وكان المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا عليه أن يعبدوا الله سنة، على أن يعبد نبيّ الله صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة

"মুশরিকরা বলল আমরা, একবছর আল্লাহর ইবাদত করব আর আপনি এক বছর আমাদের ইলাহসমুহের ইবাদত করবেন।"

তখন আল্লাহ্ ﷻ সূরা কাফিরুণে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেন, "হে রসুল আপনি বলে দিন তোমাদের দ্বীন তোমার আর আমার দ্বীন আমার" [সূরা কাফেরুন/৬]

এখানে কুফরী ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বা কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি প্রদান করে একথা বলা হয়নি। বরং কুফরীর প্রতি বিরক্ত হয়ে এবং কুফরী-কার্যক্রমকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেই এটা বলা হয়েছে। একারণে সূরা কাফেরুন সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ ﷺ নিজেই বলেন, (أنها براءة من الشرك) " এটা হলো, শিরক

থেকে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা।" [৮৮] [আবু দাউদ, তিরমিযী] অন্য আরেকটি আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

{وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ}

﴿ যদি তারা আপনার কথাকে মিথ্যা বলে তবে আপনি বলুন, আমার কাজ আমি করি তোমাদের কাজ তোমরা করো। আমার কাজের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই তোমাদের কাজের সাথেও আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ﴾ [ইউনূস/৪১]

এই স্পষ্ট বিষয়টি যারা বুঝে উঠতে সক্ষম হন না ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার কোনো অধিকারই তাদের নেই। এই সব চিন্তাবিদদের কারণে মুসলিম উম্মার দুঃচিন্তাই কেবল বাড়তে থাকবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সুতরাং একজন মুসলিম কখনই বিধর্মীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও তাদের উপাস্যসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না। যে এমন করে সে কাফির হয়ে যায়।

⇒ কুফরী মনে করে কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া অথচ তা কুফরী নয়।

উপরে আমরা দেখেছি কুফরী কাজে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা কুফরী কাজে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করাও কুফরী যদিও সে আসলে কুফরীতে লিপ্ত না হয়। এ হিসেবে বলা যায় যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়কে কুফরী মনে করে যা আসলে কুফরী নয় বা সেটা কুফরী কিনা তা নিয়ে দ্বিমত আছে কিন্তু সে উক্ত কাজে লিপ্ত হয় তবে উক্ত ব্যক্তি কাফির হবে। উদাহরণ স্বরুপ, খারেজীরা মনে করে যে কোনো কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির। এখন যদি তারা কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয় তবে তাদের কাফির বলা উচিৎ। যদিও সে যাতে লিপ্ত হয়েছে তা কুফরী নয়। যেহেতু সে বিষয়টিকে কুফরী মনে করার পরও স্বেচ্ছায় তাতে লিপ্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে সে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও সন্তুষ্ট হয়েছে। যদি কেউ মনে করে সলাত পরিত্যাগ করলে নিশ্চিত কাফির হয়ে যায় কিন্তু সে সলাত পরিত্যাগ করে তার ব্যাপারেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

যদি কেউ বলে, আমি যদি চুরি করে থাকি তবে আমি ইয়াহুদী বা খৃষ্টান অথচ সে আসলে চুরি করেছে তবে সে কাফির হবে কিনা সে বিষয়ে মতপার্থক্য উল্লেখ করার পর হানাফী মাজাহাবের বিভিন্ন ফিকাহ্

---

[৮৮] আল-হাইছামী বলেন, এর রাবীরা বিশ্বস্ত। ইবনে হাযার আসক্বালানী ফাতহুল বারীতে বলেন, (وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقِرَاءَة عِنْد النَّوْم عِدَّة أَحَادِيث صَحِيحَة) "ঘুমের সময় কুরআন তেলাওয়াত করা সম্পর্কে বেশ কিছু সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে"। এরপর তিনি ঐ সকল হাদীসের মধ্যে উপরোক্ত হাদীসটিও উল্লেখ করেন।

গ্রন্থে বলা হয়েছে। যদি সে মনে করে এমন করলে সে কাফির হয়ে যাবে তবে সে আসলেই কাফির হয়ে যাবে। কারণ,

لِأَنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ يُكَفِّرُ فَقَدْ رَضِيَ بِالْكُفْرِ

সে যে বিষয়কে কুফরী মনে করে তাতে লিপ্ত হয়েছে অতএব, সে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। [আল-মাবসুত, বাহ্‌রুর রায়েক]

যে কোনো বিষয় কুফরী মনে করার পরও তাতে লিপ্ত হওয়া মূলত কুফরী কাজ করার সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করা হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণে এটা কুফরী হওয়ার বিষয়টিই সঠিক। তবে শর্ত হলো,

১. উক্ত বিষয়টি কুফরী হওয়া সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতে হবে।

২. উক্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় এ বিষয়টি তার স্মরণে ছিল কি না তা লক্ষ্য করতে হবে।

যদি এমন হয় যে, একজন ব্যক্তি সলাত পরিত্যাগ করা কুফরী মনে করে। সাধারভাবে মতামত ব্যাক্ত করার সময় সে এই রায়ই ঘোষণা করে কিন্তু এ বিষয়ে দুই রকম দলিল প্রমাণ এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের দ্বিমত থাকার কারণে এটা কুফরী নাও হতে পারে এমন সম্ভাবনা তার অন্তরে উদিত হয়। অর্থাৎ সে বিষয়টি কুফরী হওয়ার মতটিকেই অধিক সঠিক ও প্রানিধানযোগ্য মনে করে ঠিকই কিন্তু কুফরী না হওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি অমূলক মনে করে না। এমতাবস্থায় সে সলাত পরিত্যাগ করলে তাকে কাফির বলা যেতে পারে না যেহেতু সে নিশ্চিতভাবে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন বলা যায় না।

একইভাবে যদি এমন হয় যে, উক্ত ব্যক্তি কোনো একটি বিষয়কে নিশ্চিতভাবে কুফরী মনে করে কিন্তু যখন সে উক্ত কাজে লিপ্ত হয়েছিল তখন তার বিষয়টি স্মরণে ছিল না তাহলে সে কাফিরে পরিনত হবে না। তবে যদি উক্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় তার এটা স্মরণ হয় যে, এতে লিপ্ত হলে আমি কাফির হয়ে যাবো এরপরও সে উক্ত কাজে লিপ্ত হয় তখন সে কুফরী কাজ করা বা কাফির হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এমন বলা যায় ফলে সে কাফির হবে। উদাহরণস্বরুপ, হয়তো সে মদ পান করা বা জিনা করাকে কুফরী মনে করে। কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় ঘটনাক্রমে সে এসব কাজে লিপ্ত হয়ে গেল। উক্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় তার একবারও একথা মনে হয় নি যে আমি তো কুফরী করছি। তবে এই ব্যক্তি কুফরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন বলা যায় না। আর যদি উক্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় তার মনে হয় এ বিষয়টি নিশ্চিত কুফরী তবু সে তাতে লিপ্ত হয় তবে সে মানসিক দিক থেকে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কারণে কাফির হবে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বোঝা যায়, কোনো একজন ব্যক্তি ভুল বুঝের কারণে বা মতপার্থক্যের কারণে কোনো একটি বিষয়কে কুফরী মনে করার পরও ঐ কাজে লিপ্ত হলেই সে কুফরী করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং কাফির হয়েছে এমন বলা যায় না। যতক্ষণ না প্রমাণিত হবে সে উক্ত বিষয়টিকে নিশ্চিত কুফরী মনে করে এবং উক্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় বিষয়টি তার স্মরণে ছিল। অর্থাৎ সে নিশ্চিত কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েই উক্ত কাজে লিপ্ত হয়েছে। যেহেতু কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া বা কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়াও কুফরী।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, মূর্তির সামনে সাজদা করা বা হারামকে হালাম মনে করা ইত্যাদি কুফরী কর্মকান্ডে কেউ লিপ্ত হলে তাকে সাধারনভাবে কাফির বলা হয়। এখানে সে ঐ বিষয়টিকে নিশ্চিতভাবে কুফরী মনে করে কিনা বা উক্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় সেটা তার স্মরণে ছিল কি না তা শর্ত করা হয় না তবে এক্ষেত্রে এসব শর্ত কেন আরোপ করা হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, যেসব কাজ কুফরী হওয়ার বিষয়টি কুরআন-হাদীস ও উম্মতের ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে এবং সাধারন মুসলিমদের মাঝে বিষয়টির ব্যাপক প্রচার প্রসার আছে ঐ সকল বিষয় কুফরী কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার অধিকার কারো নেই। সুতরাং কেউ এব্যাপারে সন্দেহ করলেও তাকে ছাড় দেওয়া হবে না। বিপরীত দিকে যেসব বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে বা উক্ত বিষয়ের জ্ঞান মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার লাভ করে নি সেসব বিষয়ে যে কারো অন্তরে সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। তাই ঐ সব ব্যাপারে সাধারনভাবে কাউকে কাফির বলা হবে না। যদি কেউ উক্ত বিষয়টি কুফরী হওয়ার মত গ্রহণ করার পরও তাতে লিপ্ত হয় তবে দেখতে হবে সে ওটাকে নিশ্চিত কুফরী মনে করে, নাকি তার অন্তরে এ ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ বিদ্যমান? যেহেতু বিষয়টি সন্দেহের উর্দ্ধে নয় তাই এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করলে তাকে ছাড় দেওয়া হবে।

এখন উক্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় সেটা যে কুফরী এটা স্মরণ থাকা শর্ত হওয়ার ব্যাপারে কথা হলো, মানুষের উপর যে কোনো রায় দেওয়া হয় দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, (১) স্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে (২) তার নিজস্ব স্বীকৃতির ভিত্তিতে। ইসলামের যে কোনো বিধানের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। কোনো ব্যাপারে বিশ্বস্ত সাক্ষীরা স্বাক্ষ্য দিলে এবং তার অপরাধ সম্পর্কে স্পষ্ট প্রামান পাওয়া গেলে তার স্বীকৃতির কোনো গুরুত্ব দেওয়া হবে না বরং তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু যদি তার অপরাধ স্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমানের ভিত্তিতে প্রমাণিত না হয় তবে উক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে কিনা সেটা লক্ষ্য করতে হবে। যদি কেউ এমন কোনো কাজে লিপ্ত হয় যা স্পষ্ট কুফরী তবে ঐ কাজের উপর নির্ভর করেই তাকে কাফির বলা হবে তার অন্তরের অবস্থা লক্ষ্য করা হবে না। কিন্তু যদি সে এমন কাজে লিপ্ত হয় যা আসলে স্পষ্ট কুফরী নয় তবে উক্ত ব্যক্তিকে ঐ কাজের উপর নির্ভর করে কাফির

বলা যায় না। এখন ঐ ব্যক্তি যেহেতু বিষয়টিকে কুফরী মনে করে তাই ঐ কাজে লিপ্ত হওয়ার অর্থ কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া এই মূলনীতির আলোকে তাকে কাফির বলতে হলে তার অন্তরে প্রকৃতপক্ষে কুফরী করার সিদ্ধান্ত ছিল কিনা সেটা সুক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করতে হবে। যেহেতু এ বিষয়ে উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বলার ব্যাপারটি তার অন্তরের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে বাইরের কাজটির উপর নয়। উক্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার সময় ঐ কাজটি কুফরী এটা যদি তার স্মরণ নাই থাকে তবে সে কুফরী কাজের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন বলা যায় না অতএব তাকে কাফিরও বলা যায় না। এখানে এই ব্যক্তির বাইরে কাজটি স্পষ্ট কুফরী নয় ফলে তাকে কাফির বলার ক্ষেত্রে আমাদের তার অন্তরের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে একারণে এ ক্ষেত্রে তার অন্তরে প্রকৃতই কুফরী করার সিদ্ধান্ত ছিল কিনা তা গুরুত্বসহকারে লক্ষ্য করতে হবে। যদি সে এমন কোনো কাজ করতো যা উম্মতের ইজমার আলোকে স্পষ্ট প্রমাণিত এবং সর্ব স্তরের মুসলিমদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রশিদ্ধ ও পরিচিত তবে এই কাজে লিপ্ত হওয়া স্পষ্ট কুফরী হিসেবে গণ্য। এখানে বাহ্যিক কাজটিই কুফরীর স্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য ফলে উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বলার ক্ষেত্রে তার অন্তরের অবস্থা বিবেচ্য নয়। উদাহরণস্বরুপ যদি কেউ তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি তবে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে ঐ ব্যক্তি আসলেই তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটা বলেছে কিনা তা দেখা হবে না কারণ তালাক শব্দটি এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কিন্তু যদি সে বলে, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করছি তবে ঐ ব্যক্তি তালাকের উদ্দেশ্যে এটা বলেছে না কি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বলেছে তা তাকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে। যেহেতু ''পরিত্যাগ করা'' স্পষ্টভাবে তালাকের অর্থ বহন করে না তাই এক্ষেত্রে বাহ্যিক শব্দের উপর বিধান দেওয়া যায় না বরং অন্তরের উদ্দেশ্য বিবেচ্য বিষয় হয়।

♦ ***জাদুর বিধান***

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ}

❮ সুলাইমান তো কুফরী করেন নি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিতো। ❯ [বাকারা/২]

একই আয়াতে হারুত ও মারুত দুজন ফেরেশতা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

{وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ}

❮ তারা যে কাউকে তা (জাদু) শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে বলতো আমরা তো পরীক্ষা মাত্র অতএব কুফরী

করো না। কিন্তু তারা তাদের দুজনের নিকট হতে এমন কিছু শিক্ষা করতো যার মাধ্যমে তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতো। তারা তো আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ওগুলোর মাধ্যমে কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। ﴿ [বাকারা/১০২]

এই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ অনুসারে কেউ কেউ জাদুকে সাধারনভাবে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বর্তমানে এ মতটি ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। যারা শিরক-কুফর ও তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করেন তাদের বেশিরভাগই এই আয়াতটি উল্লেখ করে জাদুকে কুফরী প্রমাণের চেষ্টা করেন। অথচ এই আয়াত সাধারনভাবে সকল প্রকার জাদুকে কুফরী প্রমান করে না বরং শয়তানরা মানুষকে যে জাদু শিক্ষা দিতো এবং হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয় মানুষকে যা শেখাতো এই আয়াতে সেই সব বিষয়কে কুফরী বলা হয়েছে। পৃথিবীতে যত রকম জাদু দেখা যায় বা জাদু বলতে যা কিছু বোঝায় তার সব কিছু এই আয়াতে উদ্দেশ্য নয়। সকল প্রকার জাদুকে কুফরী বলা সম্ভবও নয়। যারা সকল প্রকার জাদুকে কুফরী বলার পক্ষে মত দেন তাদের নিকট প্রশ্ন হলো জাদু বলতে তারা কি বুঝবেন?

সাধারনভাবে জাদু বলতে আমরা বুঝি, তন্ত্র-মন্ত্র পাঠ করে বা কায়দা-কসরতের মাধ্যমে বিভিন্ন বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করা।

আল-আজহারী ﵀ বলেন,

وأَصل السِّحْرِ صَرْفُ الشيء عن حقيقته إِلى غيره فكأَنَّ الساحر لما أَرَى الباطلَ في صورة الحق وخَيَّلَ الشيءَ على غير حقَيقته قد سحر الشيء عن وجهه أَي صرفه

জাদু হলো, কোনো বিষয়কে তার প্রকৃত রুপ হতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। যেহেতু জাদুকর একটি জিনিসকে তার প্রকৃত রুপ হতে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং সেটা দর্শকের সামনে এমনভাবে উপস্থাপণ করে যা তার আসল রুপ নয় তাই বলা হয় সে উক্ত জিনিসটিকে জাদু করেছে অর্থাৎ তার পকৃত রুপ পরিবর্তন করে ভিন্নভাবে উপস্থাপণ করেছে। [লিসানুল আরব]

আব্দুর রহমান আল জাযাইরী ﵀ বলেন,

وقد فسر بعض الفقهاء السحر بأنه أمر خارق للعادة ينشأ عن سبب معتاد

কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন জাদু হলো স্বাভাবিক কিছু বিষয়কে ব্যাবাহার করে অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনা ঘটানো। [আল-ফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবায়া]

সুতরাং সাধারনভাবে জাদুর অর্থ হলো, কোনো একটি স্বাভাবিক বিষয়কে মানুষের সামনে অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনকভাবে তুলে ধরা।

কিন্তু আশ্চর্যজনক যে কোন ঘটনার উপর কুফরী ফতোয়া আরোপ করা যায় না। যেহেতু এধরনের আশ্চর্যজনক ঘটনা যারা প্রদর্শন করে তারা বিভিন্ন প্রকার পন্থা ও পদ্ধতির উপর নির্ভর করে থাকে। যেমন,

ক. কেউ কেউ দুষ্টু জিন তথা শয়তানের পূজা উপাসনা করার মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্ট করে বা শিরক-কুফর সম্বলিত তন্ত্র-মন্ত্র পাঠ করে এধরনের বিস্ময়কর ঘটনা প্রদর্শন করে। এই প্রকৃতির জাদু কুফরী হবে তাতে কেউ সন্দেহ করতে পারে না।

খ. কেউ কেউ সাধারন জিনদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের মাধ্যমে কিছু ঘটনা প্রদর্শন করে। পূর্বে আমরা বৈধ ভাবে জিনদের কোনো কাজে ব্যাবহার করার পক্ষে ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও অন্যান্য কিছু ওলামায়ে কিরামের মতামত উল্লেখ করেছি। অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি জিনদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে কিছু অস্বাভাবিক ক্রিয়া-কর্ম প্রদর্শন করে যেমন, শূন্যে ভেসে ওঠা, হাতের ইশারায় গাছের ডাল ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি তবে তা কোনোভাবেই কুফরী হতে পারে না। একইভাবে, যেসব দোয়া-মন্ত্রে শিরক কুফর নেই এমন কিছু পাঠ করে যদি কেউ কাউকে ক্ষতি করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে এমন বলা যায় না। তবে অপরাধ প্রমাণিত হলে, উক্ত ক্ষতির পরিমান অনুযায়ী এই ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে।

গ. আল্লাহ ﷻ নিজে কারো মাধ্যমে অনেক সময় অতি আশ্চর্যজনক কিছু ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে এধরনের ঘটনা ভাল লোকের মাধ্যমেও ঘটে আবার খারাপ লোকদের মাধ্যমেও ঘটে। ভাল লোকের মাধ্যমে আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটলে সেটাকে কারামত এবং খারাপ লোকের মাধ্যমে এটা ঘটলে তাকে ইস্তিদরাজ বলা হয়। বিষয়টির নামকরন যায় করা হোক যদি সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে কারো মাধ্যমে আশ্চর্যজনক কোনো ঘটনা ঘটে তবে তাতে উক্ত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা যায় না। যেমন কারো দৃষ্টি লেগে কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে বা মারা গেলে উক্ত ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না। একইভাবে যদি কারো উপর কেউ বদদোয়া করে আর সাথে-সাথেই ঐ ব্যক্তি মারা যায় তবু যে বদ দোয়া করলো তাকে কাফির বলা হবে না। কারণ, কারো ব্যাপারে বদদোয়া করা কুফরী নয় আবার কাউকে হত্যা করে ফেলাও কুফরী নয়।

ঘ. বর্তমানে যাদের জাদুকর বলা হয় তাদের বেশিরভাগই হাতের কৌশল ব্যাবহার করে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার মাধ্যমে বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রদর্শন করে থাকে। বিশেষ কিছু কৌশল ব্যবহার করে তারা কিছু সাধারন ঘটনাকে মানুষের সামনে আশ্চর্যজনকভাবে তুলে ধরে। তারা কোনো মন্ত্রও পাঠ করে না জিনদের

সাথেও যোগাযোগ করে না। এই ধরনের কাজকে কুফরী বলা যেতে পারে না।

ঙ. অনেক সময় দেখা যায় জাদুকররা বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যাবহার করে। সাধারন মানুষ ঐ সকল প্রযুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারনে এই সব কাজকে জাদু মনে করে। এই সকল বিষয়ও কুফরী নয়।

এ কারণে বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরাম সাধারনভাবে সকল প্রকার জাদুকে কুফরী বলেন নি। তবে কুফরী কথা ও কাজের মাধ্যমে যে জাদু করা হয় তারা সেগুলোকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সকল প্রকার জাদু যে, কুফরী নয় সে বিষয়ে একটি হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপণ করা হয়।

আয়েশা ﵂ হতে বর্ণিত আছে যে তার এক দাসী তাকে জাদু করেছিল তিনি তাকে করলেন,

سحرتينى فقالت نعم فقالت ولم لا تنجين أبدا ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة

তুমি কি আমাকে জাদু করেছো? সে বলল হ্যা। তিনি বললেন, কেনো? (কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে জবাবে উক্ত দাসী বলেছিল (أحببت العتق) আমি মুক্তি পাওয়ার আশায় জাদু করেছি) তিনি বললেন, তুমি কখনই মুক্তি পাবে না তারপর বললেন, আরবের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট আচরণের মালিকের নিকট একে বিক্রয় করো।[৮৯] [মুস্তাদরাকে হাকিম]

যদি সর্বক্ষেত্রেই জাদু কুফরী হতো তবে আয়েশা ﵂ এই দাসীকে হত্যা করতে আদেশ করতেন কিন্তু তিনি তা করেন নি বরং তাকে বিক্রয় করে দিয়েছেন।

কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, উক্ত দাসী হয়তো নিজে জাদু করেনি বরং অন্য কারো দিয়ে জাদু করিয়েছিল। আতএব, এই হাদীসের মাধ্যমে জাদু কুফরী নয় তা প্রমানিত হয় না। কিন্তু এ যুক্তি সঠিক নয় যেহেতু কুফরী কাজ অন্য কারো দিয়ে কারানোও কুফরী যেমনটি আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম আননাব্বী ﵀ বলেন,

السحر حرام وهو من الكبائر بالاجماع وقد سبق فى كتاب الايمان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عده من السبع الموبقات وسبق هناك شرحه ومختصر ذلك أنه قد يكون كفرا وقد لايكون كفرا بل معصيته كبيرة فان كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر كفر وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه فحرام فان تضمن ما يقتضى الكفر كفر والا فلا واذا لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر واستتيب منه ولا يقتل عندنا

এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে যে জাদু হারাম। কিতাবুল ঈমানে গত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ ﷺ এটাকে সাতটি

---

[৮৯] হাকিম তার মুস্তাদরাকে হাদিসটিকে সহীহ্ বলেছেন এবং আজ-জাহাবী তার তালখীসে সহীহ বলেছেন। শায়েখ আলবানী ইরওয়াউল গালিলে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [হা:১৭৫৭]।

ধ্বংসাত্মক বিষয়ের মধ্যে গণ্য করেছেন। সেখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত রুপ এই যে, কখনও কখনও জাদু কুফরী হয় কখনও কখনও কুফরী হয়না বরং কবীরা গোনাহ হয়। যদি জাদুর মধ্যে এমন কোনো কথা বা কাজ থাকে যা কুফরী তবে তা কুফরী হবে আর তা না থাকলে কুফরী হবে না। আর জাদু শেখানো বা শিক্ষা করা হারাম যদি যা শেখা হচ্ছে তার মধ্যে কুফরী থাকে তবে (তা শিক্ষা করা) কুফরী হবে যদি কোনো কুফরী না থাকে তবে কুফরী হবে না। যদি জাদুর মধ্যে কোনো কুফরী না থাকে তবে জাদুকরকে লঘু শাস্তি দেওয়া হবে এবং তওবা করতে বলা হবে তাকে হত্যা করা হবে না এটাই আমাদের (শাফেঈ মাযহাবের) মত। [শারহে মুসলিম]

শাফেঈ মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ ইবনে হাযার হাইতামী ﵀ বলেন,

ومن المكفرات أيضا السحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها فإن خلا عن ذلك كان حراما لا كفرا فهو بمجرده لا يكون كفرا ما لم ينضم إليه مكفر

কুফরী কাজ সমূহের মধ্যে একটি হলো, ঐ প্রকৃতির জাদু যার মধ্যে সূর্যকে পূজা করা বা এই প্রকৃতির কর্মকান্ড থাকে। যদি এসব কিছু না পাওয়া যায় তবে জাদু হারাম হবে কুফরী হবে না। অতএব, জাদু নিজে কুফরী নয় যতক্ষণ না তার মধ্যে কোনো কুফরী পাওয়া যায়।

এরপর তিনি শাফেঈ মাযহাবের অন্য এক আলেম আল-মাওরুদী থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন,

مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه لا يكفر بالسحر ولا يجب به قتله

ইমাম শাফেঈর মাজহাব হলো, জাদুর মাধ্যমে কাউকে কাফির বলা হবে না হত্যাও করা হবে না।

[আল-ই'লাম বিকওয়াতিইল ইসলাম]

ইমাম আল-কুরতুবী ﵀ ইবনে মুনযির থেকে বর্ণনা করেন,

قال ابن المنذر : وإذا أقر الرجل أنه سحر بكلام يكون كفرا وجب قتله إن لم يتب ، وكذلك لو ثبتت به عليه بينة ووصفت البينة كلاما يكون كفرا. وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سحر به ليس بكفر لم يجز قتله ، فإن كان أحدث في المسحور جناية توجب القصاص اقتص منه إن كان عمد ذلك ، وإن كان مما لا قصاص فيه ففيه دية ذلك

যদি কোনো ব্যাক্তি স্বীকার করে যে, সে কুফরী বাক্য দ্বারা জাদু করেছে তবে তওবা না করলে তাকে হত্যা করা হবে। একইভাবে যদি স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হয় যে, সে কুফরী কালাম ব্যাবহার করেছে তবে তাকে হত্যা করা হবে আর যদি সে এমন কিছু ব্যাবহার করে যা কুফরী নয় তবে তাকে হত্যা করা জায়েজ হবে না। কিন্তু জাদুর মাধ্যমে যদি কোনো ব্যাক্তির এমন ক্ষতি করে থাকে যাতে কিসাস আছে তবে কিসাস অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেওয়া হবে আর যদি এমন কোনো অপরাধ করে যাতে কিসাস নেই তবে জরিমানা আদায় করা হবে। [তাফসীরে কুরতুবী]

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ ইবনে আবেদীন ﵀ উল্লেখ করেন,

فَلَيْسَ كُلُّ مَا يُسَمَّى سِحْرًا كُفْرًا ، إِذْ لَيْسَ التَّكْفِيرُ بِهِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ بَلْ لِمَا يَقَعُ بِهِ مِمَّا هُوَ كُفْرٌ كَاعْتِقَادِ انْفِرَادِ الْكَوَاكِبِ : بِالرُّبُوبِيَّةِ أَوْ إهَانَةِ قُرْآنٍ أَوْ كَلَامٍ مُكَفِّرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

জাদু বলতে যা কিছু বোঝায় তার সবই কুফরী নয়। যেহেতু জাদুর মাধ্যমে যেসব ক্ষয়-ক্ষতি করা হয় তার উপর কুফরীর ফতোয়া আরোপ করা যায় না বরং তার মধ্যে যেসব কুফরী কথা ও কাজ থাকে তার উপর নির্ভর করে তাকফীর করা হয়। যেমন নক্ষত্ররাজির স্বতন্ত্র ক্ষমতায় বিশ্বাস করা তথা নক্ষত্ররাজিকে রুবুবিয়্যাতের ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী মনে করা বা কুরআনকে অবমাননা করা বা কোনো কুফরী কথা বলা ইত্যাদি। [রদ্দে মুহতার]

এরপর তিনি বলেন,

ثُمَّ إنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ كُفْرِهِ مُطْلَقًا عَدَمُ قَتْلِهِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ بِسَبَبِ سَعْيِهِ بِالْفَسَادِ كَمَا مَرَّ .فَإِذَا ثَبَتَ إضْرَارُهُ بِسِحْرِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ مُكَفِّرٍ : يُقْتَلُ دَفْعًا لِشَرِّهِ كَالْخُنَّاقِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ

তবে সে কাফির নয় এর অর্থ এই নয় যে, তাকে কোনো অবস্থাতেই হত্যা করা যাবে না। যেহেতু তার উপর হত্যার বিধান পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপরাধে (কুফরীর অপরাধে নয়) যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি। অতএব, যদি প্রমাণিত হয় যে, সে জাদুর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি সাধন করে তবে এই ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য উক্ত জাদু কুফরী না হলেও তাকে হত্যা করা হবে। যেভাবে ডাকাত ও সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোককে হত্যা করা হয়। [রদ্দে মুহতার]

ইবনুল হুমাম ﵀ ফাতহুল কাদীরে হানাফী মাযহাবের আলেমরা জাদুকে কুফরী বলেছেন এমন উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে আবেদীন ﵀ বলেন,

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا نَقَلَهُ فِي الْفَتْحِ عَنْ أَصْحَابِنَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ السِّحْرَ لَا يَكُونُ إلَّا إذَا تَضَمَّنَ كُفْرًا

এটা স্পষ্ট যে, ফাতহুল কাদীরে যা বলা হয়েছে সেখানে জাদু বলতে ঐ সকল বিষয় উদ্দেশ্য যা কুফরীর মাধ্যমে করা হয়। [রদ্দে মুহতার]

মোট কথা, জাদু নিজে কুফরী নয় এ বিষয়ে হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। তবে মালেকী ও হাম্বালী মাযহাবে জাদুকে সাধারনভাবে কুফরী বলা হয়েছে। একারণে কেউ কেউ মনে করেছে মালেকী ও হাম্বালী মাযহাবে সকল প্রকার জাদুই কুফরী। প্রকৃত অবস্থা এমন নয়। জাদু বলতে আমরা যা কিছু বুঝি তারা সেসবকে ঢালাওভাবে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেন এমন নয়। স্বয়ং ইমাম মালিক ও আহমদ ইবনে হাম্বাল থেকে এ বিষয়ে ভিন্নমত বর্ণিত আছে এবং জাদু

সম্পর্কে এই দুই ইমামের বক্তব্য নিয়ে তাদের মাজহাবের ওলামায়ে কিরামের বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে।

ইবনে কুদামা ﷫ বলেন,

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يُكَفَّرُ

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে এমন বর্ণনাও রয়েছে যাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি জাদুকরকে কাফির বলেন না।

এরপর তিনি উক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করেন যেখানে আহমাদ ইবনে হাম্বাল জাদুকরকে হত্যা না করে আটকে রাখার বিধান দিয়েছেন। বর্ণনাটি উল্লেখ করে ইবনে কুদামা বলেন,

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُكَفِّرْهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَفَّرَهُ لَقَتَلَهُ

এটা প্রমাণ করে যে, তিনি জাদুকরকে কাফির মনে করেন নি যেহেতু কাফির মনে করলে তিনি তাকে হত্যা করার আদেশ দিতেন। [আল-মুগনী]

আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে জাদুকর কাফির এমন রেওয়ায়েতও আছে। তবে হাম্বালী মাযহাবের বেশিরভাগ ফোকাহায়ে কিরাম এটা সকল প্রকার জাদুর উপর প্রয়োগ করেন নি।

হাম্বালী মাজহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ আল-মারদাবী ﷫ বলেন,

وَالسَّاحِرُ الَّذِي يَرْكَبُ الْمِكْنَسَةَ ، فَتَسِيرُ بِهِ فِي الْهَوَاءِ وَنَحْوُهُ كَالَّذِي يَدَّعِي أَنَّ الْكَوَاكِبَ تُخَاطِبُهُ يَكْفُرُ وَيُقْتَلُ هَذَا الْمَذْهَبُ

যে জাদুকর ঝাড়ু–র উপর ভর করে আকাশে উড়ে বেড়ায় বা এই ধরনের জাদু প্রদর্শন করে বা তারকারাজি তার সাথে কথা বলে এমন দাবী করে তবে সে কাফির হবে এটিই আমাদের মাজহাব।

পরে তিনি বলেন,

فَأَمَّا الَّذِي يُعَزِّمُ عَلَى الْجِنِّ ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَجْمَعُهَا فَتُطِيعَهُ : فَلَا يَكْفُرُ وَلَا يُقْتَلُ .وَلَكِنْ يُعَزَّرُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ

আর যে ব্যক্তি জিনদের কাজে লাগায় আর দাবী করে সে জিনদের আদেশ করলে তারা তা পালন করে তবে এটা কুফরী হবে না। তাকে হত্যাও করা হবে না তবে লঘু শাস্তি দেওয়া হবে। এটিই আমাদের মাযহাব। [আল-ইনসাফ]

এই বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় আশ্চর্যজনক কিছু ঘটলেই সেটাকে ঢালাওভাবে কুফরী বলে আখ্যায়িত করা হাম্বালী মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ বিষয়ে তারা বিভিন্নভাবে

পার্থক্য করে থাকেন। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের মতো জাদুকরকে কাফির বলার বিষয়টিকে তার আক্বীদা-বিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ইবনে মুফলিহ্ رحمه الله বলেন,

وَحَمَلَ ابْنُ عَقِيلٍ كَلَامَ أَحْمَدَ فِي كُفْرِهِ عَلَى مُعْتَقَدِهِ ، وَأَنَّ فَاعِلَهُ يُفَسَّقُ وَيُقْتَلُ حَدًّا

ইবনে আকীল জাদুকরকে কাফির বলা সম্পর্কে আহমাদ ইবনে হাম্বালের মতটি যার আক্বীদার মধ্যে কুফরী রয়েছে তার ব্যাপারে প্রযোজ্য মনে করেছেন। আর আক্বীদার বিকৃতি ছাড়ায় যে জাদু করে তাকে ফাসিক বলা হবে এবং হদ হিসেবে হত্যা করা হবে (কাফির হিসেবে নয়)। [আল-ফুরু’]

এ বিষয়ে ইমাম মালিকের মন্তব্য এবং সে আলোকে তার মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের মতামত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও এটা প্রমাণ করে যে, তারা তন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে বা অন্য যে কোনোভাবে কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় ঘটানো ঢালাওভাবে কুফরী মনে করেন নি।

ইমাম মালিক হতে বর্ণিত আছে,

في المرأة تقعد زوجها على نفسها أو غيرها أنها تعقب ولا تقتل

যে স্ত্রী (জাদুর মাধ্যমে) তার স্বামীকে মিলনের ব্যাপারে অক্ষম করে ফেলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, হত্যা করা হবে না। [তাফসীরে কুরতুবী]

এ থেকে বোঝা যায় তিনি এই প্রকারের জাদুকে কুফরী মনে করেন নি।

ইমাম মালিক থেকে সাধারনভাবে জাদু শিক্ষা করা কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করার মতও বর্ণিত আছে। মালেকী মাযহাবের বিভিন্ন ফুকাহায়ে কিরাম এই মতটিকে অস্পষ্ট ও জটিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই জটিলতা নিরসনে তারা বিষয়টির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

মালেকী মাজহাবের ফকীহ্ আল-আদাবী বলেন,

وَقَدْ أَطْلَقَ مَالِكٌ فِي التَّكْفِيرِ بِهِ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ كَمَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ .نَعَمْ إنْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ كَلَامٌ يُعَظَّمُ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ وَتُنْسَبُ إلَيْهِ الْمَقَادِيرُ وَالْكَائِنَاتُ ظَهَرَ قَوْلُ مالك

ইমাম মালিক সাধারনভাবে জাদুকরকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তার এই কথটি ভীষণ অস্পষ্ট আল-কারাফী এমনটিই বলেছেন। তবে যদি ইমাম মালিকের কথার ব্যাখ্যা এভাবে করা হয় যে, জাদু বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, গয়রুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সৃষ্টিরাজির নিয়ন্ত্রণে গয়রুল্লাহর সম্পর্ক রয়েছে এমন দাবী করা তবে ইমাম মালিকের কথার মধ্যে কোনো জটিলতা থাকে না। [শারহে কিফাইয়া]

মালেকী মাজহাবের বিভিন্ন ফিকাহ্গ্রন্থে জাদু সম্পর্কে অনুরুপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

মালেকী মাজহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ কাজী ইবনুল আরবী ﷺ বলেন,

وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ كَلَامٌ مُؤَلَّفٌ يُعَظَّمُ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَتُنْسَبُ إِلَيْهِ فِيهِ الْمَقَادِيرُ وَالْكَائِنَاتُ

জাদুর প্রকৃত মর্মার্থ হলো, এটা এমন কিছু কথার মাধ্যমে করা হয় যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি সৃষ্টিরাজির কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়। [আহকামুল কুরআন]

ইবনে আরবীর এই সংজ্ঞাটি মালেকী মাযহাবের ওলামায়ে কিরাম অত্যাধিক গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছেন। তারা যে কোনো আশ্চর্য ঘটনাকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেন নি। এ বিষয়ে তাদের বেশ কিছু স্পষ্ট ফতোয়া বিদ্যমান রয়েছে।

মালেকী মাজহাবের বিভিন্ন ফিকাহ্গ্রন্থে এসেছে,

فَالَّذِي يَقْطَعُ أُذُنَ الرَّجُلِ أَوْ يُدْخِلُ السَّكَاكِينَ فِي جَوْفِ نَفْسِهِ إنْ كَانَ سِحْرًا قُوتِلَ ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَهُ عُوقِبَ

যদি কেউ অন্য কারো কান কেটে দেয় (এবং পরে তা ভাল করে দেয়) এবং নিজের পেটে ছুড়ি ঢুকিয়ে দেয় যদি এটা জাদু হয় তবে তাকে হত্যা করা হবে আর যদি এটা জাদু না হয় তবে তাকে অন্য কোন শাস্তি দেওয়া হবে। [আত-তাজ ওয়াল ইকলিল]

দেখা যাচ্ছে নিজের পেটের মধ্যে ছুড়ি ঢুকিয়ে দেওয়া বা অন্যের কান কেটে আবার তা ভাল করে দেওয়ার মতো কর্মকান্ডও মালেকী মাজহাবের ওলামায়ে কিরামের নিকট নিশ্চিত জাদু তথা কুফরী হিসেবে গণ্য নয় বরং তারা বলেছেন দেখতে হবে তা জাদু কিনা। অতএব, বর্তমান সময়ের প্রচলিত সকল প্রকার জাদুর উপর তাদের ফতোয়া আরোপ করা যায় না।

একইভাবে তারা বলেছেন,

لَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ أَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْ السِّحْرِ الَّذِي أَعْلَمَ اللَّهُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ وَيُتَوَصَّلُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ بِإِخْبَارِ مَنْ يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ بِالْإِخْبَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ

জাদুকরকে হত্যা করা হবে না যতক্ষণ না এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ﷻ যে প্রকারের জাদুকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন সে ঐ প্রকারের জাদু করেছে কিনা। যারা জাদু সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাদের নিকট প্রশ্ন করে এ বিষয়ে জানতে হবে এবং যে শাসক জাদুকরকে হত্যার রায় দেবেন তার নিকট এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হতে হবে। [শারহে কিফাইয়া]

এই মতটি উল্লেখ করে আল-আদাবী বলেন,

فَعَلَى هَذَا لَوْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِنَحْوِ آيَةِ { وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ } لَا يَكُونُ هَذَا مِنْ السِّحْرِ الْمُكَفِّرِ

এই হিসেবে বলা যায় যদি কেউ কুরআনের কোনো আয়াত যেমন "আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে দিলাম" এই আয়াতটি পাঠ করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে তবে তা কুফরী হবে না।

[শারহে কিফাইয়া]

জাদুকরকে হত্যার করার পূর্বে আল্লাহ যে প্রকৃতির জাদুকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ঐ ব্যক্তি আসলেই ঐ প্রকৃতির জাদু করেছে কিনা সেটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হওয়ার শর্তটি উল্লেখ করার পর আল-খারাশী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

لِأَنَّهُ مَعْنًى يَجِبُ بِهِ الْقَتْلُ فَلَا يُحْكَمُ بِهَا إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَتَحَقُّقِهِ كَسَائِرِ مَا يَجِبُ بِهِ الْقَتْلُ

যেহেতু এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা হচ্ছে অতএব, অন্যান্য যা কিছুর মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় সেসব ব্যাপারের মতো এ বিষয়েও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে।

[শারহে মুখতাসারে খলীল]

কাউকে হত্যা করা বা কাফির বলার ক্ষেত্রে এধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা ওলমায়ে কিরামের নিকট সর্বসম্মত মূলনীতি।

ইমাম আল-কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করার পর জাদুকরকে হত্যা না করার মতটিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন,

قلت : وهذا صحيح ، ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف. والله تعالى اعلم.
وقال بعض العلماء : إن قال أهل الصناعة أن السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار ، أو تعظيم الشيطان فالسحر إذا دال على الكفر على هذا التقدير ، والله تعالى اعلم

আমি বলব, এটাই সঠিক কেননা নিশ্চিত প্রমান না পাওয়া পর্যন্ত কোনো মুসলিমের রক্ত ঝরানো বৈধ নয় আর যে ক্ষেত্রে ইখতিলাফ রয়েছে সে ক্ষেত্রে নিশ্চিত প্রমাণের দাবি কিভাবে করা যেতে পারে?

[তাফসীরে কুরতুবী]

বর্তমানে যারা সাধারনভাবে সকল প্রকার জাদুকরকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন এবং নিজেদের স্বপক্ষে ইমাম মালিক বা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের মতকে ব্যাবহার করেন তারা এই উভয় ইমামের বক্তব্যকে তাদের মতালম্বী বরেণ্য ওলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যার মাধ্যমে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন না। জাদু সম্পর্কে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের মতামততের উপর স্থিরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে

দেখা যাবে তারা কেউই সাধারনভাবে জাদু বলতে যা কিছু বোঝায় তার উপর ঢালাওভাবে কুফরী ফতোয়া আরোপ করেন নি। বরং জাদুর বিশেষ কিছু প্রকার ও পদ্ধতিকে তারা কুফরী বলেছেন। এই প্রকার ও পদ্ধতি নির্ধারনে তাদের মধ্যে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে তবে বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যেটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় তা হলো সাধারনভাবে জাদু কুফরী নয় যতক্ষণ না এর মধ্যে কোনো কুফরী কথা বা কাজ পাওয়া যায়।

আব্দুর রহমান আল-যাঝাইরী এ বিষয়ে চার মাজহাবের ফুকাহায়ে কিরামের মতামত আলোচনা করার পর বলেন,

وحاصله أنه إذا كان أقوالاً وأفعالاً تنافي الدين وتوجب تكفير صاحبها، كان كفراً بصرف النظر عما يترتب عليه من الآثار، وإن كانت هذه الأقوال أو الأفعال محرمة كان حراماً، أما إن كانت جائزة فإنه ينظر لما يترتب عليها من الآثار. فإن كانت محرمة كان حراماً، وإلا فلا

মোট কথা, জাদুর মধ্যে যখন এমন কোনো ইসলাম বিরোধী কথা ও কাজ থাকে যা কুফরী হিসেবে গণ্য তবে জাদু কুফরী হবে। তার মাধ্যমে কি করা হচ্ছে তা দেখা হবে না। আর যদি তার মধ্যে কোনো হারাম কথা ও কাজ থাকে তবে তা হারাম বলে গণ্য হবে। আর যদি বৈধ কাজ-কর্মের মাধ্যমে জাদু করা হয় তবে দেখতে হবে সেটা কি কাজে ব্যাবহার করা হচ্ছে। যদি অবৈধ কাজে ব্যাবহার করা হয় তবে হারাম হবে আর তা না হলে হারাম হবে না।

এরপর তিনি বলেন,

هذا هو حكم الفقهاء في السحر ويكاد يوكون مجمعا عليه في المذاهب وهو حكم صحيح صادق وفتوي لا غبار عليها

ফুকাহায়ে কিরামের নিকট জাদুর বিধান এটাই। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এ বিষয়ে চার মাজহাবের ওলামায়ে কিরামের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। [আল-ফিকহু আলাল মাজাহিব আল আরবায়া]

উপরোক্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা স্পষ্ট অবগত হয়েছি যে, জাদু নিজে কুফরী নয় যদি না তার মধ্যে অন্য কোনো কুফরী থাকে। জাদুর মধ্যে কি ধরনের কুফরী থাকতে পারে তার উপর নির্ভর করে জাদুকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. স্পষ্ট কুফরী কথা ও কাজের মাধ্যমে যে জাদু করা হয়।

খ. কোনো এক প্রকার জাদু সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় যে, এই প্রকৃতির জাদু শিরক-কুফরের মাধ্যমে ছাড়া ঘটানো সম্ভব নয় তবে উক্ত জাদুকে কুফরীর প্রতীক বা চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং উক্ত জাদু যে দেখায় তার মধ্যে অন্য কোনো কুফরীর প্রমাণ না পাওয়া গেলেও তাকে কাফির বলা হবে।

তবে অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের স্পষ্ট বক্তব্যের আলোকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

ইমাম আল-কুরতুবী ﷺ বলেন,

وقال بعض العلماء: إن قال أهل الصناعة أن السحر لا يتم إلا مع الكفر ولاستكبار، أو تعظيم الشيطان فالسحر إذا دال على الكفر على هذا التقدير، والله تعالى أعلم

আলেমদের একটি অংশ বলেছেন, যদি জাদু বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এটা নিশ্চিত করে বলে যে, কুফরী, ধর্মদ্রোহীতা ও শয়তানকে পূজা করা ছাড়া জাদু প্রদর্শন করা সম্ভব নয় তবে সেক্ষেত্রে জাদু কুফরীর প্রতীক হিসেবে গণ্য হবে (অর্থাৎ তা কুফরী হবে) আর আল্লাহই ভাল জানেন। [তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম কুরতুবীর এই কথাটির উপর সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এখানে একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো কিছু যখন কুফরীর স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রতীকে পরিনত হয় তখন সেটা নিজেই কুফরী হিসেবে গণ্য হয়। ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ মূলনীতি তথা "রিদা বিল কুফরী কুফর" সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ে সুবিস্তারে আলোচনা করেছি। জাদুর ক্ষেত্রে এই মূলনীতিটি কেবল তখন প্রয়োগ করা যায় যখন প্রমাণিত হবে জাদু কেবল কুফরীর মাধ্যমেই করা সম্ভব বা স্পষ্ট শিরক-কুফরে লিপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জাদু প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। জাদু সম্পর্কে উপরে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে সে আলোকে এটা স্পষ্ট যে, সকল প্রকার জাদুর ব্যাপারে এমন বলা সম্ভব নয়। জাদু বলতে আমরা যা কিছু বুঝি তা কেবল শিরক-কুফরের মাধ্যমে করা হয় বা কেবল কাফির-মুশরিকরাই সেটা প্রদর্শন করে এমন নয় বরং বিভিন্ন মত ও পথের লোকেরা নানা রকম পন্থা ও পদ্ধতিতে জাদু প্রদর্শন করে থাকে। অতএব, সাধারনভাবে সকল প্রকার জাদুকে কুফরীর প্রতীক বা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। একারণে ওলামায়ে কিরাম জাদুকে সর্বাবস্থায় কুফরী মনে করেন নি। তবে এটা নিশ্চয় বলা যায় যে, ক্ষেত্র বিশেষে কোনো একটি বিশেষ প্রকারের জাদু কুফরীর প্রমাণ বা প্রতীক হিসেবে গণ্য হতে পারে। উদাহরণস্বরুপ ধরে নিই একজন ব্যক্তি জাদুর মাধ্যমে নিজেকে গাধায় পরিনত করে এবং পুনরায় মানুষ রুপে আবির্ভূত হয়। দুনিয়ার বুকে এই প্রকৃতির জাদু অন্য কেউ প্রদর্শন করে না। ঐ ব্যক্তির নিকট শিক্ষা নিয়ে অন্য অনেকে একই প্রকার জাদু প্রদর্শন করা শুরু করলো। পরবর্তীতে বিশ্বাসযোগ্য স্বাক্ষ্য-প্রমানের ভিত্তিতে প্রমাণিত হলো ঐ ব্যক্তি উক্ত জাদু প্রদর্শনের সময় কুফরী কালাম উচ্চারণ করে। এর ফলে ঐ ব্যক্তি কাফিরে পরিনত হবে এবং যারা ঐ প্রকৃতির জাদু প্রদর্শন করে তারাও কাফিরে পরিনত হবে। যদিও তারা সকলেই কুফরী কালাম পাঠ করে কিনা সে বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে জানা সম্ভব না হয়। কেননা এক্ষেত্রে একজনের মাধ্যমে বাকীদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা সৃষ্টি হচ্ছে। যেহেতু তারা একই ব্যক্তির নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং একই প্রকৃতির জাদু প্রদর্শন করছে অতএব, তারাও ঐ ব্যক্তির

মতোই একই পন্থায় জাদু প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তারাও কুফরী কালাম ব্যাবহার করে এটা প্রমাণিত হচ্ছে ফলে তাদের কাফির বলা হবে।

এভাবে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যখন নিশ্চিত হওয়া যায় যে, কোনো একটি বিশেষ প্রকৃতির জাদু কুফরী কালামের মাধ্যমেই করা হয় তবে উক্ত জাদু যে প্রদর্শন করে তাকে কাফির বলা হবে যদিও সে নিজে কুফরী কালাম ব্যাবহার করেছে এমন প্রমাণ পাওয়া না যায়। তবে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং নিশ্চিতভাবে উক্ত প্রকারের জাদু কুফরী কালামের মাধ্যমেই করা হয় তা প্রমাণিত হচ্ছে কিনা লক্ষ্য করতে হবে।

গ. যদি কোনো জাদুকর জাদুর মাধ্যমে গায়েবী বিষয়ের উপর অসীম কর্তৃত্ব দাবী করে তবে সে কাফির হবে। যেহেতু এটা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের ক্ষমতায় শরীক করা হিসেবে গণ্য হবে। উদাহরণ স্বরুপ যদি কোনো জাদুকর তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে বলে তোমরা যে যেখানে থাকো আমি জাদুর মাধ্যমে সেটা দেখতে পায় এবং তোমাদের কথা শুনতে পায়। তোমরা আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে আমি জাদুর মাধ্যমে সাহায্য করতেও সক্ষম। তবে এই ব্যক্তি নিজে এবং তার এই ক্ষমতায় যারা বিশ্বাস করে তারা সকলে কাফিরে পরিনত হবে। আল্লাহর কর্তৃত্বে অংশীদারিত্ব প্রমাণ করে এমন যে কোনো ঔদ্ধত্বপূর্ণ দাবীই কুফরী বলে গণ্য হবে। ওলামায়ে কিরাম এর বিভিন্ন উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এক্ষেত্রে মানুষকে গাধা বানিয়ে দেওয়া বা জড় বস্তুতে প্রাণ সৃষ্টি করা এবং প্রাণীকে জড় বস্তুতে পরিনত করা ইত্যাদি বিষয়কে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আল-কুরতুবী رحمه الله বলেন,

من السحر ما يكون كفرا من فاعله ، مثل ما يدعون من تغيير صور الناس ، وإخراجهم في هيئة بهيمة ، وقطع مسافة شهر في ليلة ، والطيران في الهواء ، فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق فذلك كفر منه

জাদুর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা কেউ করলে সে কাফির হবে যেমন যদি কেউ মানুষের আকৃতি পাল্টে দেওয়ার দাবি করে বা তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে পশু বানিয়ে ফেলা, এক মাসের রাস্তা এক রাতে অতিক্রম করা, আকাশে উড়া ইত্যাদির দাবি করে। যে এমনটি করে এবং মানুষকে এটা বোঝায় যে সে সত্যবাদি তবে সে কাফির হবে। [তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম কুরতুবী উল্লেখিত উপরোক্ত উদাহরণসমূহের মধ্যে এক মাসের রাস্তা এক রাতে অতিক্রম করা এবং আকাশে ওড়ার বিষয়টি কুফরীর পর্যায়ে পড়তে পারে বলে মনে হয় না। যেহেতু জিনদের সহযোগিতায় এটা ঘটা সম্ভব। তবে মানুষের আকৃতি পাল্টে দেওয়া বা মানুষকে পশু বানিয়ে ফেলার দাবী করা হলে তা কুফরী হিসেবে গণ্য হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। যেহেতু এটা আল্লাহর ক্ষমতার সাথে ঔদ্ধত্বোপূর্ণ

আচরণ বলে গণ্য।

এখানে লক্ষ্যনীয় হলো, যদি কোনো জাদুকর প্রকৃতই মানুষকে গাধাতে পরিনত করা বা জড় বস্তুকে প্রাণীতে পরিনত করার দাবী করে তবে সে উপরোক্ত মতামতের আলোকে কাফির হবে। কিন্তু যে নজরবন্দি করার মাধ্যমে মানুষের নিকট একটি জড় বস্তু প্রাণীতে পরিনত হয়ে গেছে বা মানুষ গাধায় পরিনত হয়েছে এমন ধারনা সৃষ্টি করে এবং সে এটা স্বীকারও করে যে, এটা আসলে দেখার ভুল প্রকৃত ঘটনা নয় তবে সে কাফির হবে না।

আলেমদের কেউ কেউ জাদুর মাধ্যমে নবীদের মুজিযার সমপর্যায়ের ঘটনা প্রদর্শনের দাবী করাও কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু এর মাধ্যমে নবীদের মর্যাদাকে খাটো করা হয়। ইমাম কুরতুবী কিছু কিছু আলেম থেকে এ মত বর্ণনা করেছেন। জাদুকরকে কাফির বলার ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে। উপরে আমরা দেখেছি আল্লাহর ক্ষমতায় অংশী স্থাপণ করা হয় এমন ঔদ্ধত্বপূর্ণ দাবী করা কুফরী। একইভাবে নবী-রাসুলদের মু'জিযাকে ছোট করা হয় এমন দাবী করাও কুফরী। যেমন যদি কেউ বলে, আমি (জাদুর মাধ্যমে) চাঁদকে দ্বি-খন্ডিত করতে পারি, জাদুর মাধ্যমে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারি ইত্যাদি। তবে সেক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রকৃত পক্ষেই সে অসম্ভব ও অসঙ্গতিপূর্ণ দাবী করেছে কিনা।

(৩) উপসংহার

উপরে আমরা ঈমান ভঙ্গের বিভিন্ন কারণ তথা শিরক-কুফরের বিভিন্ন প্রকার ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, যেসব কুফরী কাজ-কর্মে লিপ্ত হলে ঈমান ভঙ্গ হয় তা চারটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি মূলনীতি কুরআন-সুন্নার আলোকে এবং উম্মতের ওলামায়ে কিরামের ইজমার মাধ্যমে প্রমানিত। এই সকল মূলনীতির বাইরে কোনো বিষয় ওলামায়ে কিরামের নিকট কুফরী হিসেবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য নয়। পূর্ববর্তী ওলামায়ে দ্বীন শিরক-কুফর বলতে তাই বুঝতেন যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। এই সকল মূলনীতির আলোকেই তারা ঈমান ও কুফরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। উদাহরণস্বরুপ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (من قال لا اله الا الله دخل الجنة) "যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" [৯০] [তিরমিযী] এই হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের উপর নির্ভর করে কিছু লোক দাবী করেছে, কেবলমাত্র কালেমা পাঠ করলেই একজন ব্যক্তি জান্নাতী হবে যদিও সে শিরক-কুফরে লিপ্ত হয়। এমনকি কারামিয়া সম্প্রদায় দাবী করেছে যদি কেউ মুখে কালেমা পাঠ করে তবে তার

---

[৯০] সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে এই অর্থের বিভন্ন হাদীস বর্ণিত আছে।

অন্তরে বিশ্বাস না থাকলেও সে মুমিন হবে। [তাফসীরে কুরতুবী] এসবই স্পষ্ট ভ্রান্তি ও নিকৃষ্ট বিদয়াত। বিপরীত দিকে আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কিরামের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, কালেমা পাঠ করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মুক্তি পাবে যদি সে ইসলামের সকল বিধি-বিধানকে মেনে নেয় এবং সকল প্রকার শিরক-কুফর থেকে বেঁচে থাকে। তারা বিভিন্ন দলিল-প্রমানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেই এই মত ব্যাক্ত করেছেন।

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে,

مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ

যে আমাদের মতো সলাত আদায় করে, আমাদের কিবলাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করে, আমাদের যবেহকরা পশু খাওয়া বৈধ মনে করে তবে সে মুসলিম। তার (জান ও মালের ব্যাপারে) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা রয়েছে। অতএব, কেউ যেন আল্লাহর দেওয়া নিরাপত্তা ভঙ্গ না করে। [সহীহ্ বুখারী]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, (لا تكفروا أحدا من أهل قبلتكم بذنب) "তোমরা কোনো পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে তোমাদের কিবলার অনুসারী কাউকে কাফির বলো না। [তিবরানী]

এই হাদীসটির সনদ সহীহ নয় তবে এর মূলভাব বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসটির অনুরুপ।

এই সকল হাদীসের কারণে বিভিন্ন ওলামায়ে কিরাম বলেছেন,

لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب

আমরা কিবলার অনুসারী কাউকে কোনো পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফির বলি না।

বাহরুর রায়েকে হাবিল ফাতাওয়ার বরাতে এই আক্বীদাটি আহ্লুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। শাফেঈ মাজহাবের ফিকাহ গ্রন্থ আত-তাজকিরাতে একই কথা বলা হয়েছে।

উপরোক্ত হাদীস এবং ওলামায়ে কিরামের এই সকল বক্তব্যের মাধ্যমে কেউ কেউ মনে করেছে কিবলামূখী হয়ে সলাত আদায় করে এমন কাউকে কাফির বলা যেতে পারে না। কিন্তু এখানে তা উদ্দেশ্য নয়। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীস এবং ওলামায়ে কিরামের বক্তব্যে কিবলার অনুসারী বলতে কেবলমাত্র কেবলার দিকে মুখ করে সলাত আদায় করা উদ্দেশ্য নয় বরং কিবলার অনুসারী বলতে এখানে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে নেওয়া এবং ঈমান ভঙ্গ করে এমন কর্মকান্ড তথা সকল-প্রকার শিরক-কুফর থেকে দূরে থাকাই উদ্দেশ্য।

মোল্লাহ্ আলী কারী رحمه الله বলেন,

ثم اعلم أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا علي ما هو من ضرورات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الله بالكليات والجزئيات وما أشبه ذلك من المسائل من واظب طول عمره علي الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئيات لا يكون من أهل القبلة وإن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة أنه لا يكفر ما لم يوجد من أمارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شيء من موجباته

জেনে নাও, আহলুল কিবলা (কিবলার অনুসারী) বলতে বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর দ্বীনের অকাট্যভাবে প্রমাণিত প্রতিটি বিষয় মেনে নেয় যেমন, পৃথিবী ধ্বংসশীল, পুনরুত্থান দিবস, ছোট-বড় সকল বিষয়ে আল্লাহ জ্ঞান রাখেন ইত্যাদি। যদি কেউ সারাজীবন ইবাদত ও আনুগত্য করে কিন্তু সে বিশ্বাস করে পৃথিবী অবিনশ্বর বা পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে অথবা আল্লাহ ﷻ ছোট-বড় সকল বিষয়ে জ্ঞান রাখেন এটা অস্বীকার করে তবে এই ব্যক্তি আহলে কিবলা (কিবলার অনুসারী) বলে বিবেচিত হবে না। অতএব, আহলুস্‌সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের নিকট কিবলার অনুসারী কাউকে কাফির না বলার অর্থ হলো, কাউকে কাফির বলা হবে না যতক্ষণ না সে এমন কোনো কাজে লিপ্ত হয় যা কুফরীর প্রমাণ ও প্রতীক হিসেবে গণ্য এবং তার মধ্যে এমন কোনো কর্মকান্ড পাওয়া না যায় যা মানুষকে কাফিরে পরিনত করে। [শারহে ফিকহে আকবার/পৃষ্ঠা:২৩০]

সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো একটি স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয় সে কাফির বলে গণ্য হবে এবং তার যাবতীয় আমল বিনষ্ট হবে। তার কালেমা পাঠ করা বা সলাত-সওম পালন করা কোনোই কাজে আসবে না। এই সুস্পষ্ট মূলনীতিটি অস্বীকার করা ঘৃণিত বিদয়াত ও স্পষ্ট বিভ্রান্তি হিসেবে গণ্য। একইভাবে এই সকল কুফরী কর্মকান্ড ছাড়া অন্য কোনো পাপ ও অপারাধের কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির বলাও বিদয়াত ও পথভ্রষ্টতা। এটা খারেজী সম্প্রদায়ের আক্বীদা। উপরে বর্ণিত কোনো মুসলিমকে পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফির না বলা সংক্রান্ত মূলনীতিটি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্তমানেও দেখা যায় কিছু লোক খারেজীদের মতামত অনুসারে মানুষকে এমন কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাকফীর করে থাকে যা আসলে কুফরী নয়। নিজেদের স্বপক্ষে তারা এমন কিছু আয়াত ও হাদীসকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করে যেখানে শিরক-কুফর শব্দগুলো রূপক অর্থে ব্যাবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে, আত্মহত্যা করা, নিজের পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা বলে পরিচয় দেওয়া, মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদা, বংশ তুলে গালি দেওয়া, আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা, তাবীজ ঝুলানো ইত্যাদি বিষয়কে শিরক বা কুফর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে অধিক কঠোরতার উদ্দেশ্যে রূপক অর্থে শিরক-কুফর শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে প্রকৃত অর্থে নয়। কিন্তু কেউ কেউ এই সকল হাদীসের কোনো কোনোটি প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করে সাধারন মুসলিমদের তার উপর নির্ভর করে কাফির আখ্যায়িত করে থাকে। একইভাবে আল্লাহ ﷻ বলেন, যে কোনো মুসলিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে [নিসা/৯৩], যে সুদ গ্রহণ করে সে আল্লাহ ও রাসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুক

[বাকারা/২৭৯], যে সুদ পরিত্যাগ করে সে মুলধন ফেরত পাবে কিন্তু যে পুনরায় তাতে লিপ্ত হয় সে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল অবস্থান করবে [বাকারা/২৭৫] এই সকল আয়াত থেকে কেউ কেউ মুমিনকে হত্যা করা বা সুদ গ্রহণ করা কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, “যে কেউ আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না সে কাফির” [মায়েদা/৪৪] এই আয়াতের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ সাধারনভাবে যে কেউ রাষ্ট্রে অন্য কোনো আইন চালু করে বা অন্য আইন দিয়ে বিচার করে তাদের কাফির বলে থাকে যদিও সে আল্লাহর আইনকে অস্বীকার না করে বা মানবরচিত আইনকে উত্তম ও বৈধ মনে না করে। এসবই বিভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস হিসেবে গণ্য। ওলামায়ে কিরাম পূর্বে উল্লেখিত মুলনীতির আলোকেই এসব আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। হারামকে হালাল মনে করা বা ইসলামী বিধি-বিধানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা ছাড়াই শুধুমাত্র হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে তারা কাউকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেন না। তারা বিভিন্ন প্রকার দলিল-প্রমাণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে রায় ঘোষণা করে থাকেন। কোনো একটি বা কয়েকটি আয়াত ও হাদীসকে আলাদাভাবে উপস্থাপণ করে তারা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না।

শিরক-কুফর শব্দের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে যেমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তাওহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু শব্দ যেমন, ইবাদত, ইলাহ, রব, দ্বীন, তাগুত ইত্যাদির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও অনুরুপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল শব্দের শাব্দিক অর্থ ও ব্যাবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের একই মুলনীতি স্মরণ রাখতে হবে আর তা হলো, উপরে ঈমান ভঙ্গের কারণ তথা শিরক-কুফর সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা গত হয়েছে সেগুলোর উপর উম্মতের ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমত সম্পাদিত হয়েছে অতএব, তার বাইরে কোনো বিষয়কে শিরক-কুফর হিসেবে প্রমাণ করার জন্য ইবাদত, ইলাহ, রব, দ্বীন, তাগুত ইত্যাদি শব্দের ভুল ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই সকল শব্দের ঐ ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য হবে না যাতে এমন কেনো বিষয় কুফরী হিসেবে প্রমাণিত হয় যা মূলত কুফরী নয়। এই ধরণের যে কোনো ব্যাখ্যা বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ এই সকল শব্দ আসলে উপরে ঈমানভঙ্গের কারণ সম্পর্কে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি সেই অর্থই বহন করে। সুতরাং এগুলোর উপর পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে আমরা এগুলোর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করবো।

৩.(ক) তাওহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

৩.ক.(১) ইবাদত

‘ইবাদত’ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। এখানে

সংক্ষিপ্ত কথা হলো, শাব্দিকভাবে ইবাদত শব্দের অর্থ কারো প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অত্যাধিক শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করা। তবে তাওহীদ ও শিরক-কুফরের ক্ষেত্রে ইবাদতের এই অর্থ প্রযোজ্য নয় বরং **কারো অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা তথা রুবুবিয়াতে বিশ্বাস স্থাপণ করা, তার নিকট মঙ্গল-অমঙ্গলের বিষয়ে প্রার্থনা করা এবং উক্ত শক্তির সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছু করা হয় তাই ইবাদত হিসেবে গণ্য।** ইবাদতের এই অর্থটিই শিরক-কুফরের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই অর্থে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদত করা হলেই কেবল শিরক হয়। উপরে আমরা এই সংজ্ঞাটির যথার্থতা ও এর স্বপক্ষে দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করেছি। এর বিপরীতে ইবাদত শব্দটির যেসব সংজ্ঞা পেশ করা হয় সেগুলোর অগ্রণযোগ্যতা ও বৈপরিত্ব সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করেছি।

৩.ক.(২) ইলাহ

শাব্দিকভাবে ইলাহ (إله) শব্দটি হয়তো ওয়ালিহা (وله) থেকে এসেছে অথবা আলিহা (أله) থেকে এসেছে। [লিসানুল আরব]

আরবী ভাষায় এই দুটি শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যাবহৃত হয়।

বলা হয়, (وله) সে হতবাক বা হয়রান হয়েছে, (يَوْلَهُ كل طِفْل إلى أُمه) "শিশু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার মায়ের নিকট ছুটে গিয়েছে" (وله الأم إلي طفلها) "মা তার সন্তানের প্রতি মমতা প্রকাশ করেছে" (أله إليه) "তার নিকট আশ্রয় নিয়েছে" (وله منه) "তাকে দেখে ভীত হয়েছে" ইত্যাদি।

লিসানুল আরব, মু'জামুল ওয়াসীত ইত্যাদি আরবী অভিধানে এভাবেই বলা হয়েছে। লিসানুল আরবে আরো বলা হয়েছে,

ومعنى ولاهٍ أَن الخَلْق يَوْلَهُون إليه في حوائجهم ويَضْرَعُون إليه فيما يصيبهم ويَفْزَعون إليه في كل ما ينوبهم كما يَوْلَهُ كل طِفْل إلى أمه

ইলাহ্ অর্থ হলো, যার নিকট সমস্ত সৃষ্টি তাদের নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণের জন্য ধরনা দেয়। যে কোনো বিপদে পতিত হলে তার নিকট মিনতি করে এবং তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। যেভাবে শিশু তার মায়ের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে।

মোট কথা শাব্দিকভাবে ইলাহ অর্থ হবে অসীম ও অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী এমন একটি সত্ত্বা যার সুবিশাল সৃষ্টিরাজি এবং সুনিপুন কর্ম-কৌশলের রহস্য অবলোকন করে সমস্ত সৃষ্টি হতবাক ও হয়রান হয়ে যায়। তার ক্ষমতা ও সৃষ্টিকর্মের রহস্য উম্মোচন করা কারো পক্ষে সম্ভব হয় না। যিনি তার সৃষ্টির প্রতি মমতা প্রদর্শন করেন আর তার নিকট সকল সৃষ্টি তাদের বিপদ-আপদে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং

নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করে।

ইলাহ্ শব্দের পারিভাষিক অর্থও মূলত এটাই। আর তা হলো কারো অতিপ্রকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস করা এবং তার নিকট বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রার্থনা করা। উপরে আমরা ইবাদত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলেছি কারো অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করা এবং তার নিকট মঙ্গল-অমঙ্গলের ব্যাপারে প্রার্থনা করাই ইবাদত। তার সাথে সমন্বয় সাধন করলে দেখা যাবে, যার ইবাদত করা হয় তাকে মূলত ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অন্য কোথায় কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা অর্থ তার ইবাদত করা।

লিসানুল আরবে বলা হয়েছে, (وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إلَهٌ عند متخذه) "যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করে তার নিকট তাই ইলাহ হিসেবে গণ্য।" আরো বলা হয়েছে, (ولا يكون إلَهاً حتى يكون مَعْبُوداً) "কোনো কিছু কখনই ইলাহ্ হবে না যতক্ষণ না সেটার ইবাদত করা হয়।

সুতরাং পারিভাষিকভাবে যা কিছুর ইবাদত করা হয় তাই ইলাহ। অতএব, ইলাহ্ শব্দের অর্থ সম্পূর্ণভাবে ইবাদত শব্দের অর্থের উপর নির্ভরশীল। এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা ইবাদত শব্দের যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছি 'ইলাহ' শব্দের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য।

৩.ক.(৩) রব

রব (رب) অর্থ কোনো কিছুর মালিক হওয়া এবং সেটার রক্ষনাবেক্ষন করা। কোনো কিছুর উপর কর্তৃত্ব করা এবং তার উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করা।

الرَّبُّ يُطْلَق في اللغة على المالكِ والسَّيِّدِ والمُدَبِّر والمُرَبِّي والقَيِّمِ والمُنْعِم

আরবী ভাষায় রব শব্দটি মলিক, মনিব, পরিচালক, প্রতিপালক, তত্ত্বাবধায়ক, অনুগ্রহকারী ইত্যাদি অর্থে ব্যাবহৃত হয়। [লিসানুল আরব]

এই সকল অর্থে 'রব' শব্দটি আরবী ভাষায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ব্যাবহার করার রীতি প্রচলিত ও প্রশিদ্ধ। সাধারনভাবে বলা হয়, (رب المال) "সম্পদের মালিক" (رب الناقة) "উটের মালিক" ইত্যাদি। কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (تلد الأمة ربها) "দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে" [বুখারী ও মুসলিম]। হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে তিনি বলেন, (فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) "তাকে ছেড়ে দাও তার মালিকই তাকে খুঁজে নেবে।" [বুখারী ও মুসলিম] পবিত্র কুরআনে এসেছে ইউসুফ عليه السلام অন্য আরেকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, (أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا) "তোমাদের মধ্যে একজন তো তার মনিবকে মদ পান করাবে" [ইউসূফ/৪১] এই সকল স্থানে মালিক বা মনিব অর্থে রব শব্দটি ব্যাবহার করা হয়েছে।

এই বিশ্লেষণের পর এটা সহজেই অনুমেয় যে, রব শব্দটির শাব্দিক অর্থের উপর শিরক-কুফরের বিধান আরোপ করা সম্ভব নয়। যেহেতু কাউকে কোনো কিছুর মালিক ও মনিব হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া উক্ত ব্যক্তিকে প্রকৃত অর্থে রব হিসেবে গ্রহণ করা বলে গণ্য হতে পারে না। আল্লাহকে যে অর্থে রব বলা হয় সেটিই মূলত ঈমান ও কুফরের সাথে সম্পর্কিত।

আল্লাহ 'রব' এর অর্থ হলো, তিনি মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, সুবিশাল সৃষ্টিরাজির উপর স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণরুপে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধিকারী, অদৃশ্য হতে সৃষ্টিরাজির রক্ষনাবেক্ষন ও প্রতিপালনকারী। তিনি প্রতিটি সৃষ্টির প্রয়োজন পূর্ণ করেন এবং বিপদ-আপদে আশ্রয় প্রদান করেন ইত্যাদি।

এই অর্থের উপর সামান্য চিন্তা করলে দেখা যাবে উপরে 'ইলাহ' শব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে 'রব' শব্দটির অর্থ ও ব্যাখ্যা তার চেয়ে কিছুমাত্র আলাদা নয়। প্রকৃতপক্ষে যে ধরণের ক্ষমতা ও শক্তিতে বিশ্বাস করলে কাউকে 'ইলাহ' হিসেবে গহণ করা হয় সেই একই পরিমান ও প্রকারের ক্ষমতাতে বিশ্বাস করলেই তাকে 'রব' হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অন্য কথায় কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা অর্থ তাকে রব হিসেবে গ্রহণ করা একইভাবে কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করা অর্থ তাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা। এ দুটি বিষয়ের একটিকে আরেকটি হতে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। অতএব, আলাদাভাবে 'রব' শব্দটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

মক্কার মুশরিকরা যাদের পূজা করতো ঐ সকল মূর্তিদের তারা যেমন 'ইলাহ' হিসেবে আখ্যায়িত করতো একইভাবে তারা তাদের 'রব' নামেও আখ্যায়িত করতো। লিসানুল আরবে বলা হয়েছে তারা লাত নামক যে, পাথরের মূর্তিটিকে পূজা করতো সেটাকে রব্বা (ربة) হিসেবে আখ্যায়িত করতো যা মূলত রব শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। [লিসানুল আরব]

যারা মনে করে মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক করতো না। অর্থাৎ তাদের উপাস্য সমূহকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছিল রব হিসেবে নয়। তাদের এই দাবী নিতান্তই অযৌক্তিক। পূর্বে আমরা স্পষ্ট দলিল-প্রমাণের আলোকে তা প্রমাণ করেছি।

৩.ক.(৪) দ্বীন

আরবী দ্বীন (دين) শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যার একটি অর্থ অন্যটির বিপরীত। একদিকে যেমন দ্বীন অর্থ আনুগত্য করা বিপরীত দিকে এর অর্থ অন্যের উপর কর্তৃত্ব করা। বলা হয়, (دنته فدان) আমি তার উপর কর্তৃত্বশীল হয়েছি ফলে সে আমার অনুগত হয়েছে। এখানে কর্তৃত্ব করা ও আনুগত্য করা উভয় অর্থে দ্বীন শব্দটি ব্যাবহার করা হয়েছে। একইভাবে দ্বীন শব্দটি কর্ম ও কর্মফল তথা ভাল-

মন্দ আমল করা এবং কারো ভাল-মন্দের বিচার করা ইত্যাদি অর্থে ব্যাবহৃত হয়। বলা হয়, (كما تدين تدان) ‘‘তুমি যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে’’। এখানে কর্ম করা ও ফল পাওয়া উভয় অর্থে দ্বীন শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে, (ان الله ليدين الناس يوم القيامة) ‘‘নিশ্চয় আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন মানুষের বিচার করবেন’’ [তিবরানী] সূরা ফাতিহাতে বলা হয়েছে, (مالك يوم الدين) ‘‘তিনি (আল্লাহ) বিচার দিবসের মালিক’’। এছাড়া কোনো মতবাদ গ্রহণ করা বা কোনো কাজ অভ্যাসে পরিনত করা অর্থেও দ্বীন শব্দটি ব্যাবহৃত হয়। আল্লাহ্ বলেন, (وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ) ‘‘তারা সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না’’ [তাওবা/২৯] রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ) ‘‘মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন গ্রহণ করে’’ [আবু-দাউদ, তিরমিযী]

এই হাদীসে দ্বীন গ্রহণ করে এর অর্থ সম্পর্কে আওনুল মা’বুদে বলা হয়েছে, (أَيْ عَلَى عَادَةِ صَاحِبِهِ وَطَرِيقَتِهِ وَسِيرَتِهِ) ‘‘অর্থাৎ তার বন্ধুর স্বভাব-চরিত্র ও মতবাদ গ্রহণ করে’’।

এই হলো, দ্বীন শব্দটির শাব্দিক ব্যাখ্যা। এই সকল ব্যাপক ও বিপরীত অর্থসমূহকে একত্রিত করে দ্বীন শব্দটির প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করা বা শাব্দিক জটিলতার সৃষ্টি করা আমাদের ইচ্ছা নয়। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, দ্বিন শব্দটির ঐ অর্থ নির্ধারন করা যে অর্থে ইসলামকে দ্বীন বলা হয় এবং ইসলাম ছাড়া অন্য সকল দ্বীন শিরক-কুফর এবং সেসব দ্বীনের অনুসারীদের কাফির ও মুশরিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন, (وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) ‘‘আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনিত করেছি’’ [মায়েদা/৩]; (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) ‘‘নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম’’ [আলে-ইমরান/১৯]; (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ‘‘যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অনুসন্ধান করে আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে।’’ [আলে-ইমরান/৮৫]

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) যে দ্বীন পরিবর্তন করে (দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করে অর্থাৎ কাফির হয়ে যায়) তাকে হত্যা করো। [সহীহ্ বুখারী]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহতে দ্বীন শব্দটি যে অর্থে ব্যাবহার করা হয়েছে তা নির্ণয় করা কঠিন কাজ নয়। দ্বীন শব্দটি এখানে নিয়ম-নীতি, পন্থা-পদ্ধতি ও বিধি-বিধান অর্থে ব্যাবহার করা হয়েছে।

ফিকহুল আকবারে এসেছে,

والدين اسم واقع علي الايمان والاسلام والشرائع كلها

দ্বীন বলতে বোঝায় ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় বিধি-বিধানকে।

মোল্লাহ্ আলী কারী ﷬ এই কথাটির ব্যাখ্যায় বলেন,

أن الدين إذا أطلق فالمراد به التصديق والإقرار وقبول الأحكام للأنبياء عليهم الصلاة والسلام

দ্বীন শব্দটি যখন সাধারনভাবে ব্যাবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় নবীদের উপর যেসব বিধি-বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে সেগুলো মেনে নেওয়া তার উপর বিশ্বাস স্থাপণ করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া।

[শারহে ফিকহে আকবার:পৃষ্ঠা;১৩১]

মোট কথা, ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একমাত্র সত্য দ্বীন এর অর্থ পবিত্র কুরআন ও রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীসে যেসব নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো চিরন্তন সত্য আর তার বিপরীতে যেসব মতবাদ ও চিন্তাধারা আছে তা ভ্রান্ত ও পরিত্যাক্ত। যে কেউ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান সত্য হিসেবে স্বীকার করে নেয় সে ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে গণ্য হয়। বিপরীত দিকে যদি কেউ কুরআন হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত কোনো একটি বিধানকে অস্বীকার করে বা ইসলামের বিপরীত কোনো বিধানকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে তবে সে দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করেছে বলে গণ্য হয় এবং কাফির হয়ে যায়। সুতরাং বিষয়টি ঈমান ভঙ্গের দ্বীতীয় মূলনীতি তথা আল-ইনকার অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অস্বীকার করার সাথে সম্পর্কিত। পূর্বে এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে। আল্লাহর বিধান অস্বীকার করা বলতে কি বোঝায় এবং কি ধরনের বিধান অস্বীকার করলে কুফরী হয় সেসব বিষয়ের বিভিন্ন মূলনীতি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। তাছাড়া কিভাবে একজন ব্যক্তি দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে এবং কিভাবে দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় সে বিষয়ে পূর্বে সুবিস্তারে আলোচনা করেছি। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে দ্বীন বলতে কি বোঝায় এবং দ্বীন ইসলাম কিভাবে গ্রহণ করতে হয় আর কিভাবে একজন ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম হতে বের হয়ে যায় এসব বিষয়ে সহজে ও সুস্পষ্টভাবে ধারনা লাভ করা সম্ভব। সুতরাং দ্বীন শব্দটির অর্থ সম্পর্কে নতুন কোনো জটিল আলোচনার অবতারণা করা বুদ্ধি সম্মত নয়। যেহেতু এটা সময়ের অবচয় ও বাক্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়।

৩.ক.(৫) ঈমানের শর্তাবলী

শাব্দিকভাবে ঈমান অর্থ অন্তরে বিশ্বাস করা কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় অন্তরে বিশ্বাস করার পাশা-পাশি মুখে স্বীকার করা এবং কাজে পরিনত করার নামই ঈমান।

এ বিষয়ে আহলুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের স্পষ্ট বক্তব্য হলো,

الإيمان عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان

ঈমান হলো, তিনটি জিনিসের সমন্বয়। অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং আমলে পরিনত করা।

[উমদাতুল কারী]

এটি একটি প্রশিদ্ধ মূলনীতি। এখানে ঈমানের সাথে তিনটি বিষয়কে যুক্ত করা হয়েছে।

ক. অন্তরে বিশ্বাস করা

খ. মুখে স্বীকার করা

গ. আমলে পরিনত করা

এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটি সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনার প্রয়োজন।

⇒ **অন্তরে বিশ্বাস করা।**

এ বিষয়ে পূর্ব ও পরের সকল ওলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, অন্তরে প্রকৃত বিশ্বাস ছাড়া একজন ব্যক্তি মুমিন বলে গণ্য হতে পারে না যদিও সে মুখে ঈমানের স্বীকৃতি দেয় এবং সারা জীবন ভাল আমল করে। এ বিষয়ে কেবল বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট কারামিয়্যা সম্প্রদায় দ্বিমত করেছে। এ বিষয়ে তারা নিজেদের মতের স্বপক্ষে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর এই হাদীসটি দলিল হিসেবে পেশ করেছে (من قال لا اله الا الله دخل الجنة) "যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" [তিরমিযী] তারা দাবী করেছে মুখে কালেমা পাঠ করলেই একজন ব্যাক্তি মুমিন হিসেবে গণ্য হবে যদিও তার অন্তরে সে বিষয়ে বিশ্বাস না থাকে।

ইমাম নাব্বী রহিমাহুল্লাহ ইবনে বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ থেকে উল্লেখ করেন,

وقالت الكرامية وبعض المرجئة الايمان هو الاقرار باللسان دون عقد القلب ومن أقوى ما يرد به عليهم اجماع الأمة على اكفار المنافقين وان كانوا قد أظهروا الشهادتين

কারমিয়্যা সম্প্রদায় এবং মুরজিয়াদের একটি অংশ বলেছে, ঈমান হচ্ছে মুখে স্বীকার করা অন্তরে বিশ্বাস থাক বা না থাক। তাদের মতের বিপক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় দলিল হলো উম্মতের আলেমরা ইজমা করেছেন মুনাফিকরা কাফির যদিও তারা মুখে কালেমার স্বাক্ষ্য দিয়েছিল। [শারহে মুসলিম]

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ ঈমান আনার দাবী করা সত্ত্বেও মুনাফিকদের ঈমান অগ্রহণযোগ্য এই সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

ففي هذا رد على الكرامية حيث قالوا: إن الايمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب

এই আয়াতে করামিয়্যা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দলিল রয়েছে যারা বলেছে ঈমান হলো, মুখে স্বীকার করা যদিও অন্তরে বিশ্বাস না থাকে। [তাফসীরে কুরতুবী]

মোট কথা অন্তরের বিশ্বাস ছাড়া একজন ব্যক্তি মুমিন হিসেবে গণ্য হতে পারে না এ বিষয়ে মুসলিম উম্মার ওলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ বিষয়ে কারামিয়্যা সম্প্রদায়ের এই আক্বীদা স্পষ্ট ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য। সুতরাং যার অন্তরে বিশ্বাস নেই সে মুখে কালেমার স্বীকৃতি দিলেও আল্লাহর নিকট মুমিন হিসেবে গণ্য হবে না। অর্থাৎ আখিরাতে সে মুনাফিক ও কাফির হিসেবে জাহান্নামে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। তবে দুনিয়ার বিধানে কেবল মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি মুমিন ও মুসলিম বলে গণ্য হবে। যেহেতু একজন মানুষের অন্তরের খবর জানা সম্ভব নয়। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

فَإِذَا قَالُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, নির্দিষ্ট কিছু কারণ ছাড়া তার রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ হবে আর তার (অন্তরের) হিসাব আল্লাহর নিকট। [বুখারী ও মুসলিম]

অর্থাৎ মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি দুনিয়ার বিধানে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে এবং রক্ত ও সম্পদের নিরাপত্তা, উত্তরাধিকার, বিবাহ, ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে তার উপর একজন মুসলিমের বিধান প্রযোজ্য হবে। একজন ব্যক্তি প্রকৃতই অন্তরে বিশ্বাস করে কিনা সেটা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় বিধায় দুনিয়ার বিধানে অন্তরের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করা হবে না। যদি কারো অন্তরে বিশ্বাস না থাকে কিন্তু সে মুখে কালেমার স্বীকৃতি দেয় তবে দুনিয়ার বিধান তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে কিন্তু সে আল্লাহর নিকট কাফির হিসেবে গণ্য হবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

ইবনে হাযার আল-আসক্বালানী ﵀ ঈমানে শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করার পর বলেন,

وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر الا أن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم

এগুলো আল্লাহর নিকট সে মুমিন হবে কিনা সে ব্যাপারে প্রযোজ্য কিন্তু আমাদের নিকট মুমিন হওয়ার বিষয়টি কেবলমাত্র মৌখিক স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল। কেবলমাত্র মুখে স্বীকার করলেই একজন ব্যাক্তি দুনিয়ার বিধানে মুমিন হিসেবে গণ্য হবে এবং তাকে কাফির বলা হবে না। যদি না তার মধ্যে এমন কোনো কাজ পাওয়া যায় যা তার অন্তরের কুফরীর প্রমাণ বহন করে। যেমন, মূর্তির উদ্দেশ্যে সাজদা

করা। [ফাতহুল বারী]

⇒ মুখে স্বীকার করা।

উপরে আমরা ইবনে হাযার আসক্বালানী থেকে বর্ণনা করেছি যে, দুনিয়ার বিধানে একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র মুখে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে মুমিন বলে গণ্য হবে। এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, দুনিয়ার বিধানে মৌখিক স্বীকৃতির বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। একজন ব্যক্তি অন্তরে ঈমান এনেছে কিনা সেটা আমরা তার মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে ছাড়া জানতে সক্ষম নই। সুতরাং যে মুখে ঈমানের স্বীকৃতি দেয় নি তার অন্তরে বিশ্বাস আছে কি নেই দুনিয়ার বিধানে সেটা ধার্তব্যের বিষয় নয়। এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু যে ব্যাক্তি অন্তরে আল্লাহর দ্বীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে তবে মুখে ঈমানের স্বীকৃতি দেয়নি আখিরাতে সে মুমিন হিসেবে গণ্য হবে কিনা সে ব্যাপারে আলেমদের মাঝে কিছু দ্বিমত রয়েছে। তবে প্রশিদ্ধ ও সঠিক মতে সে ব্যাক্তি দুনিয়া-আখিরাতে উভয় জাহানে কাফির হিসেব গণ্য হবে এবং চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে।

বদরুদ্দিন আল-আইনী ﵀ বলেন,

وقد حكى القاضي عياض فيمن اطمأن قلبه بالإيمان ولم يتلفظ وتمكن من الإتيان بكلمتي الشهادة فلم يأت بها هل يحكم بإسلامه أم لا اختلافا بين العلماء مع أن المشهور لا يحكم به

কাজি ইয়াদ বলেছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে ঈমান রয়েছে কিন্তু সে মুখে তা উচ্চারণ করেনি বা সে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কালেমা পাঠ করে নি সে মুসলিম বলে গণ্য হবে কিনা সে ব্যাপারে আলেমদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে তবে প্রশিদ্ধ মত হলো সে মুসলিম হবে না। [উমদাতুল ক্বারী]

ইবনুল আরবী ﵀ এ বিষয়ে দ্বিমত উল্লেখ করার পর সঠিক মতটি বর্ণনা করে বলেন,

وَأَمَّا إِذَا نَوَى الْإِيمَانَ بِقَلْبِهِ فَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَتَلَفَّظَ بِلِسَانِهِ

যদি কেউ অন্তরে ঈমান আনার সংকল্প করে সে মুখে উচ্চারণ না করা পর্যন্ত মুমিন বলে গণ্য হবে না।

[আহকামুল কুরআন]

এবিষয়ে এটিই সঠিক মত যে, অন্তরে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করা ছাড়া কেউ মুমিন বলে গণ্য হতে পারে না। এ বিষয়ে সর্বাধিক স্পষ্ট প্রমাণ হলো, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর চাচা আবু তালিবের ঘটনা। যদি মুখে স্বীকার করা ছাড়া কেবল অন্তরের বিশ্বাসের মাধ্যমে কেউ মুমিন হতো তবে রাসুলূল্লাহ্ ﷺ এর চাচা আবু তালিব আল্লাহর নিকট মুমিন বলে গণ্য হতেন যেহেতু তিনি অন্তরে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রচারিত দ্বীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন তবে মানুষ তিরষ্কার করবে এই ভয়ে তা মুখে স্বীকার করেন নি। যদি

মৌখিক স্বীকৃতি ছাড়াও কারো অন্তরের বিশ্বাস ঈমান আনা বলে গণ্য হতো তবে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ নিজেও তার চাচা আবু তালেবকে বলতেন, আপনি তিরষ্কারের ভয়ে মুখে স্বীকার করছেন না তবে কেবল অন্তরে বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করুন আমি আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য সাফায়াত করবো। কিন্তু তিনি এমন বলেন নি বরং বলেছেন, হে চাচা আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলুন আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবো। [সহীহ বুখারী] এই ঘটনা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, অন্তরে বিশ্বাস করার পাশপাশি মুখে স্বীকার করা ছাড়া ঈমান আনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তবে যে ব্যক্তি কথা বলতে সক্ষম নয় তার জন্য মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করা শর্ত নয়। যেহেতু আল্লাহ্ ﷻ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। [বাকারা/২৮৬] তবে তাকে ইশারা-ইঙ্গিত বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে ঈমানের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ঈমান কবুল হওয়ার শর্ত হিসেবে যে মৌখিক স্বীকৃতির কথা বলা হচ্ছে তার মাধ্যমে কেবল কালেমা পাঠ করা বা মুখে ঈমানের স্বীকৃতি দেওয়াই উদ্দেশ্য নয় বরং সঠিক মতে যে কোনো কথা ও কাজের মাধ্যমে ঈমান গ্রহণ করার ঘোষণা দেওয়াই এখানে উদ্দেশ্য। যেমন, যদি কোনো কাফির বলে, আমি মুসলিম হলাম বা আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম তবে সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে। একইভাবে যদি কোনো কাফির মুসলিমদের সামনে সলাত আদায় করে তবে একদল আলেমের মতে সে মুসলিম বলে গণ্য হবে। যেহেতু সলাত আদায় করার মাধ্যমে সে নিজের ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে। মোট কথা কালেমা পাঠ করা ছাড়াও যে কোনো মাধ্যমে ঈমান গ্রহণের ঘোষণা দিলেই সেটা স্বীকৃতি বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে অবশ্য কিছু দ্বিমতও রয়েছে সেসব বিষয়ে আমরা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে কেবল এতটকু স্মরণ রাখাই যথেষ্ট্য হবে যে, ঈমানের স্বীকৃতি বলতে কেবল মুখে উচ্চারণ করা বোঝায় না বরং কথা ও কাজের মাধ্যমে যে কোনো ভাবে নিজের ঈমান আনয়নের ঘোষণা দেওয়াই স্বীকৃতি বলে গণ্য।

⇒ **কাজে পরিনত করা।**

উপরে আমরা দেখেছি, ঈমানের সংজ্ঞায় অন্তরে বিশ্বাস স্থাপণ ও মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে আমলে পরিনত করার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে অনেকে বিভ্রান্তির স্বীকার হয়েছে। খারেজীরা এই বিষয়টিকে পূর্বের দুটি শর্তের মতোই ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য অলংঘনীয় শর্ত হিসেবে মনে করেছে। একারণে আমলের ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিলে অর্থাৎ কোনো ফরজ আমল পরিত্যগ করলে বা কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হলে তারা মানুষকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করতো। মু'তাজিলাদের আক্বীদাও অনুরুপ তবে তারা বলে, পাপী ব্যক্তি মুমিনও নয় কাফিরও নয়। তারা ঈমান

ও কুফরের মাঝামাঝি একটি স্তরের দাবী করে। এদের বিপরীতে মুরজিয়ারা মনে করে ঈমান হলো, কেবলমাত্র অন্তরে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করা। আমল করার সাথে ঈমানের কোনো সম্পর্ক নেই। একারণে তারা নেককার ও বদকার সকলকে ঈমানের দিক থেকে সমান মনে করে। এবিষয়ে আহলুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা হলো, ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আমল শর্ত নয় তবে ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য আমল করা শর্ত। একজন ব্যাক্তির আমল-আখলাক যত উত্তম হবে তার ঈমান তত পরিপূর্ণ হবে। একারণে তারা নেককার-বদকার সকলের ঈমান সমান এমন মনে করেন নি আবার পাপে লিপ্ত হলেই কাউকে কাফিরও বলেন নি। তাদের নিকট ঈমানের দুটি অর্থ রয়েছে।

ক. নুন্যতম যতটুকু ঈমান অর্জন করলে একজন ব্যক্তি কাফির হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং এক দিন না এক দিন জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি পায়। এই পর্যায়ের ঈমান অর্জনের জন্য আমল শর্ত নয় বরং কেবলমাত্র অন্তরে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমেই একজন ব্যাক্তি এই পর্যায়ের মুমিন বলে গণ্য হয়।

খ. যে পর্যায়ের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমল আখলাক অর্জন করলে একজন ব্যাক্তিকে প্রশংসার স্বরে মুমিন আখ্যায়িত করা যায় সেই পর্যায়ের ঈমান। এই পর্যায়ের ঈমান অর্জনের জন্য অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন ও মুখে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশা-পাশি আমল করতে হবে। যেহেতু একজন চোর-ডকাত বা ব্যাভিচারীর উদ্দেশ্যে এমন বলা সঙ্গত নয় যে, তিনি একজন মুমিন ব্যাক্তি। প্রশংসার স্বরে এভাবে তাকে মুমিন হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না কিন্তু আসলে সে মুমিন এবং তার উপরে ঈমানের যাবতীয় বিধান কার্যকর হবে।

আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কিরাম ঈমানের সংজ্ঞায় আমলের কথা উল্লেখ করেন অথচ আমল পরিত্যগ করলে তারা কাউকে কাফির বলেন না এ বিষয়টি অনেকের নিকট জটিল ও অস্পষ্ট মনে হয়েছে। এই জটিলতা নিরসনে বদরুদ্দিন আইনী رحمه الله উমদাতুল কারীতে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। সেখানে ঈমানকে উপরোক্ত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেছেন,

الإيمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان وهو الذي لا يعتبر فيه كونه مقرونا بالعمل .... وقد جاء بمعنى الإيمان الكامل وهو المقرون بالعمل

শরীয়তে ঈমান শব্দটি কখনও কখনও প্রকৃত অর্থে ঈমান বলতে যা বোঝায় (যার বিপরীত হলো কুফর) সেই অর্থে এসেছে। সে ক্ষেত্রে আমল শর্ত নয়। ..... আবার কখনও কখনও ঈমান বলতে পরিপূর্ণ ঈমান বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে আমল শর্ত। [উমদাতুল ক্বারী]

এরপর তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের ঈমান সম্পর্কে বলেন,

والإيمان بهذا المعنى هو المراد بالإيمان المنفي في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীস, ব্যাভিচারী যখন ব্যাভিচার করে এবং চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না [বুখারী ও মুসলিম] এখানে এই পর্যায়ের ঈমান উদ্দেশ্য।

আর প্রথম পর্যায়ের ঈমান সম্পর্কে ঐ হাদীসটি উল্লেখ করেন যেখানে বলা হয়েছে, কালেমার উপর বিশ্বাস স্থাপণ করে মৃত্যু বরণ করলে একজন ব্যাক্তি (আগে হোক পরে হোক) জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদিও সে চুরি করে যদিও সে জিনা করে। [বুখারী ও মুসলিম]

এই হাদীসে ঈমান বলতে বোঝানো হয়েছে প্রথম প্রকারের ঈমান অর্থাৎ যতটুকু ঈমানের কারণে একজন ব্যাক্তি কাফির হওয়া থেকে বেঁচে যায় এবং একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ করে সেই পর্যায়ের ঈমান।

এরপর তিনি বলেন,

الإيمان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين والإيمان المنجي من الخلود في النار هو الأول باتفاق أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج

যে ধরনের ঈমান থাকলে আদৌ জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে না এমন ঈমান (অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঈমান) হলো, দ্বিতীয় পর্যায়ের ঈমান এ বিষয়ে সকল মুসলিম একমত আর যে ধরনের ঈমান থাকলে জাহান্নামে স্থায়ীভাবে বসাবাস করতে হবে না (বরং একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে) এমন ঈমান হলো প্রথম পর্যায়ের ঈমান। আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত। তবে খারেজী ও মু'তাজিলারা এ ব্যাপারে দ্বিমত করেছে।

এ বিষয়ে ইবনে হাযার আসক্কালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

والمعتزله قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف إنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله

মু'তাজিলারাও বলেছে ঈমান হলো, অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার করা এবং আমলে পরিনত করা তবে তাদের সাথে সালাফদের পার্থক্য হলো, তারা বলেছে ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আমল করা শর্ত আর সালাফরা বলেছেন, ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য আমল করা শর্ত। [ফাতহুল বারী]

দেখা যাচ্ছে ইবনে হাযার আসক্কালানী রহিমাহুল্লাহ মূলত উপরোক্ত লম্বা ব্যাখ্যাটিই সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন।

এ বিষয়ে ইমাম শাফেঈ থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন,

الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل فالمخل بالأول وحده منافق وبالثاني وحده كافر وبالثالث وحده فاسق ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنة

ঈমান হলো, অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং আমলে পরিনত করা। যার অন্তরে বিশ্বাস নেই (কিন্তু মুখে স্বীকার করে) সে মুনাফিক, যে মুখে স্বীকার করে না সে কাফির আর যে কেবল আমলের ক্ষেত্রে ত্রুটি করে সে ফাসিক। সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়া থেকে বেঁচে যাবে এবং (কোনো একদিন) জান্নাতে প্রবেশ করবে। [উমদাতুল ক্বারী]

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের সকল ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমত অনুসারে আমল ঈমানের বিশুদ্ধতার জন্য শর্ত নয় তবে ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য শর্ত। এই স্পষ্ট সিদ্ধান্তের মাধ্যমে খারেজীদের মতবাদ খন্ডিত হয় যারা আমলে ত্রুটি থাকলে তথা পাপে লিপ্ত হলে একজন মুসলিমকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করতো।

ঈমানের সাথে আমলের সম্পর্কের বিষয়ে বর্তমানে আরেকটি ভুল ধারনা প্রচার করা হয়। কেউ কেউ বলেন, ঈমানের সাথে কোনো না কোনো আমল করতে হবে। যে ব্যাক্তি অন্তরে বিশ্বাস করে এবং মুখে স্বীকার করে কিন্তু সারাজীবনে কোনো আমলই করে না সে কাফির। মুমিন হতে হলে, অন্তরে বিশ্বাস এবং মুখে স্বীকারের পাশা-পাশি কিছু সংখ্যক আমলও অবশ্যই করতে হবে। কিছু সংখ্যক আমল বলতে কয়টি আমল বোঝায় সে বিষয়েও তারা বিভিন্ন রকম মতামত দিয়ে থাকেন কেউ বলেন, একটি কেউ বলেন, তিনটি ইত্যাদি। উপরোক্ত বিশ্লেষণ স্বাপেক্ষে এই মতটির ভ্রান্তিও প্রমাণিত হয়। যেহেতু ওলামায়ে কিরাম সাধারনভাবে আমলকে ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঈমান শুদ্ধ হওয়ার জন্য নয়। সুতরাং কমপক্ষে একটি, তিনটি বা পাঁচটি আমল করতে হবে এধরণের মতবাদ উপস্থাপণ করা অবশ্যই অযৌক্তিক। যেহেতু এর বিপরীতে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর স্পষ্ট হাদীস এবং ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমত রয়েছে।

একটি হাদীসে এসেছে, নবী-রাসুল, ফেরেশতা ও নেককার ব্যাক্তিদের শাফায়াতের মাধ্যমে সকল প্রকার পাপীদের জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর স্বয়ং আল্লাহ্ ﷻ এমন কিছু লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন যাদের সম্পর্কে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ) "তারা কখনও কোনো ভাল আমল করে নি।" [বুখারী ও মুসলিম]

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে ব্যক্তি কোনো ভাল আমলই করে নি সেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে। এটিই আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কিরামের ঐক্যমতের মাধ্যমে প্রমাণিত আক্বীদা।

মোল্লাহ্ আলী ক্বারী رحمه الله বলেন,

فترك الطاعات بالكلية وارتكاب السيئات بأسرها لا يخرج المؤمن عن الإيمان عند أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمعتزلة

সকল প্রকারের ভাল আমল পরিত্যাগ করা এবং সকল প্রকার পাপে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমেও একজন মুমিন ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না। এটিই আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা। খারেজী ও মু'তাজিলারা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছে। [শারহে ফিকহে আকবার/২৫৫]

উপরে ঈমান ভঙ্গের তৃতীয় ও চতুর্থ মূলনীতি সম্পর্কিত আলোচনাতে আমরা দেখেছি আল্লাহর দ্বীনের সাথে অবমাননাকর কথা ও কাজের মাধ্যমে একজন ব্যাক্তি কাফিরে পরিনত হয়। যেমন, পবিত্র কুরআন ময়লা-আবর্জনার মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেওয়া, আল্লাহ, নবী-রাসুল ও ফেরেশতাদের শানে অশালীন ভাষা প্রয়োগ করা। [নাউযু বিল্লাহ্] একইভাবে মূর্তির সামনে সাজদা করা, কাফিরদের সাজে সজ্জিত হওয়া এবং তাদের উপসনালয়ে গমণ করে তারা যা করে তাই করা ওলামায়ে কিরামের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে কুফরী হিসেবে গণ্য। এক্ষেত্রে বাহ্যিক কাজটির মাধ্যমেই তাকে কাফির বলা হবে যদিও সে দাবী করে যে, তার অন্তরে ঈমান রয়েছে।

এখন কেউ বলতে পারে, যদি কোনো আমলের মাধ্যমে ঈমান বিনষ্ট নাই হয় তবে এই সকল আমলের মাধ্যমে ঈমান ভঙ্গ হচ্ছে কিভাবে?

এই প্রশ্নের সহজ ও সুস্পষ্ট উত্তর হলো, আমরা বলেছি, আমল পরিত্যাগ করার মাধ্যমে বা পাপ কাজের কারণে ঈমান ভঙ্গ হয় না কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে এবং সেই অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি না দিলে কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। এখন একজন ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বাস আছে কিনা সেটা আমরা তার অন্তর ভেদ করে জানতে পারি না বরং তার মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে বুঝতে পারি। একারণে মৌখিক স্বীকৃতিও ঈমাণ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, ওলামায়ে কিরাম এই সকল কাজকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন কারন এই সকল কার্যকলাপ উক্ত ব্যাক্তির অন্তরে কুফরী থাকার প্রমাণ বহন করে।

উপরে আমরা ইবনে হাযার আসক্বালানী ও কাজি ইয়াদ থেকে উল্লেখ করেছি যে, তারা এই সকল কার্যকলাপ কুফরী হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলেছেন, যেহেতু এগুলো কুফরীর প্রমান ও প্রতীক হিসেবে গণ্য তাই কেবলমাত্র যার অন্তরে কুফরী আছে সে ছাড়া এসব কাজে কেউ লিপ্ত হতে পারে না একারণে এসব কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে। অর্থাৎ এসকল কার্যকলাপ ঈমানের প্রথম শর্ত তথা অন্তরে বিশ্বাস থাকার ব্যাপারটিকেই নাকোচ করে। কেননা এটা নিশ্চিত যে, যার অন্তরে প্রকৃত বিশ্বাস রয়েছে এবং সে বিশ্বাসকে জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করার প্রবল আগ্রহ রয়েছে সে কোনোরুপ বাধ্যবাধকতা

ছাড়াই স্বেচ্ছায় এসব কুফরী কর্মকান্ডে লিপ্ত হবে না। অতএব, এসব কাজে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, সে অন্তরে ঈমান গ্রহণ করে নি।

তাছাড়া পূর্বে আমরা বলেছি, ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য অন্তরে বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখে স্বীকৃতি দেওয়া শর্ত। যদি কেউ মুখে ঈমানের স্বীকৃতি দেওয়ার পর পুনরায় কাফির হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় তবে এর মাধ্যমে তার পূর্বের স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ কুফরীর ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে ঈমানের ঘোষণা বাতিল হয় এবং ঈমানের দ্বিতীয় শর্ত ভঙ্গ হয়। যদি কেউ কালেমা পাঠ করে মুসলিম হওয়ার পর বলে আমি পুনরায় কাফির হয়ে গেলাম তবে তার অন্তরের বিশ্বাস যাই হোক সে কাফিরে পরিনত হবে যেহেতু এর মাধ্যমে মৌখিক স্বীকৃতির বিষয়টি বাতিল হয়। আর মুমিন হওয়ার জন্য অন্তরের বিশ্বাসের পাশাপাশি বাহ্যিক স্বীকৃতি প্রদান করাও শর্ত। এখন যদি কেউ সরাসরি মুখে কুফরীর স্বীকৃতি প্রদান না করে তবে এমন কোনো কাজ করে যা কুফরীর পরিচয় বহন করে এবং কুফরীর প্রমাণ ও প্রতীক হিসেবে কাজ করে তবে এটা মুখে কুফরীর স্বীকৃতি দেওয়া মতোই। যেহেতু স্বীকৃতি অনেক সময় কথার মাধ্যমে হয় আবার অনেক সময় কাজের মাধ্যমে হয়। অতএব, এধরনের কাজে লিপ্ত ব্যক্তি তার পূর্বের ঈমানের স্বীকৃতি বাতিল করার কারণে কাফিরে পরিনত হয়। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করা বা বাহ্যিকভাবে কুফরী কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে ঈমান গ্রহনযোগ্য হওয়ার উভয় শর্ত প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এ কারণে এসকল বিষয় কুফরী হিসেবে গণ্য। সাধারনভাবে পাপ কাজ ও আল্লাহর অবাধ্যতা করার কারণে নয়।

এই বিশ্লেষণস্বাপেক্ষে বলা যায় যেসব কাজ ঈমানের প্রথম দুটি শর্তকে বাতিল করে কেবল সেই সকল কাজ কুফরী হিসেবে গণ্য এছাড়া অন্যান্য কাজ-কর্মের ব্যাপারে কথা হলো সেগুলো ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত নয় তবে ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য শর্ত। উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম এটাই।

৩.ক.(৬) ঈমান ও ইসলাম

শাব্দিকভাবে ঈমান (إيمان) অর্থ বিশ্বাস। পারিভাষিকভাবে ঈমান বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি শাব্দিকভাবে ঈমান অর্থ বিশ্বাস হলেও পারিভাষিকভাবে ঈমান বলতে অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখে স্বীকার করা এবং আমলে পরিনত করাকে বোঝায়। তবে ঈমান শব্দটি দুটি অর্থে ব্যাবহৃত হয়। মৌলিকভাবে যতটুকু ঈমান আনলে একজন ব্যাক্তি কাফির হওয়া থেকে বেঁচে যায় ততটুকু ঈমান। এবং পরিপূর্ণ ঈমান। আমলে পরিনত করা প্রথম প্রকার ঈমানের জন্য শর্ত নয়। কিন্তু যে প্রকারের ঈমান পরিপূর্ণ হিসেবে গণ্য এবং যার উপর নির্ভর করে একজন ব্যাক্তিকে প্রশংসার স্বরে মুমিন ব্যাক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় তার জন্য আমল শর্ত। সুতরাং ঈমান বলতে

বোঝায়, আল্লাহ তার রাসুলের উপর যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করা। একজন ভাল মুমিন হওয়ার জন্য এর সাথে সাথে আমল করাও শর্ত।

একইভাবে ইসলাম (إسلام) অর্থ আত্মসমর্পণ করা। এটা শাব্দিক ব্যাখ্যা। পরিভাষায় ইসলাম বলতে বোঝায় আল্লাহর দ্বীন তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যবাতীয় বিধি-বিধান ও আইন-কানুন। ইসলাম গ্রহণ করতে হলে ঐ সকল বিধি-বিধানকে অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে এবং মুখে স্বীকার করতে হবে। একজন ভাল মুসলিম হওয়ার জন্য অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির পাশা-পাশি ঐ সকল বিধি-বিধানের উপর আমলও করতে হবে। সমান্য চিন্তা করলেই অনুধানব করা সম্ভব হবে যে, ঈমান ও ইসলাম মূলত একই বিষয়কে বোঝাচ্ছে।

অনেকে মনে করেন ইসলাম বলতে যেহেতু বাহ্যিকভাবে আত্মসমর্পণ করা বোঝায় তাই মুসলিম হওয়ার জন্য বাহ্যিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া ও আমল করাই যথেষ্ট্য অন্তরে বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। শারয়ী পরিভাষায় অন্তরে বিশ্বাস ছাড়া একজন ব্যাক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে বা মুসলিম হয়েছে একথা বলা যায় না। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর বিভিন্ন হাদীসে মুসলিম শব্দটি যে অন্তরে বিশ্বাস করে এবং মুখে স্বীকার করে তার ক্ষেত্রেই ব্যাবহার করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (أَنَّ الجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ) "মুসলিম ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না" [সহীহ্ বুখারী] আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (خَصْلَتَانِ، أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) "এমন দুটি আমল রয়েছে যদি কোনো মুসলিম সেটা নিয়মিত আদায় করে তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে" এরপর তিনি দুটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। [আবু দাউদ] সন্দেহ নেই যে, এখানে মুসলিম বলতে এমন কাউকে বোঝানো হচ্ছে না যে বাহ্যিক ভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু তার অন্তরে ঈমান নেই। যেহেতু এমন ব্যক্তি মুনাফিক হিসেবে গণ্য আর মুনাফিক জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং জাহান্নামের সর্ব নিকৃষ্ট স্তরে থাকবে। [নিসা/১১৫]

এছাড়া অন্য বিভিন্ন হাদীসে মুসলিম ব্যক্তির বিভিন্ন মর্যাদা ও সম্মানের কথা বর্ণিত আছে যা এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না যে মুমিন নয়। এসব বর্ণনা প্রমান করে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলিম বলতে তাকেই বোঝায় যে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার অন্তরেও ঈমান রয়েছে। যার অন্তরে ঈমান নেই সে মুসলিম হতে পারে না যদিও সে মুসলিম হওয়ার ভান করে। অর্থাৎ ঈমান ও ইসলাম মুলত একই জিনিস। উভয়ের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি কল্পণা করা যায় না।

ফিকহে আকবারে বলা হয়েছে,

فمن طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا يوجد إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن

শাব্দিকভাবে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তবে (শরীয়তের পরিভাষায়) ইসলাম ছাড়া ঈমান হতে পারে না এবং ঈমান ছাড়া ইসলাম হতে পারে না অতএব এদুটি বিষয় একই ব্যক্তির পিঠ ও পেটের মতো একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ইবনে বাত্তাল ﷺ আল-মুহাল্লাব থেকে উল্লেখ করেন,

الإسلام على الحقيقة، هو الإيمان الذى هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان، الذى لا ينفع عند الله غيره

প্রকৃত অর্থে ইসলামই হলো ঈমান অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং মুখে স্বীকৃতি দেওয়া। এটা ছাড়া আল্লাহর নিকট কেউ মুক্তি পাবে না। [শারহে বুখারী]

অনেকে অবশ্য ঈমান ও ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে পার্থক্য করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে তারা বিভিন্ন দলিল প্রমানও উপস্থাপণ করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .... وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}

হে ঈমানদাররা .... তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [আলে-ইমরান/১০২]

অনেকে মনে করেছেন এই আয়াতে যেহেতু মুমিনদের মৃত্যুর আগে মুসলিম হতে আদেশ করা হচ্ছে এর অর্থ মুমিন হওয়ার পরও একজন ব্যক্তি মুসলিম নাও হতে পারে। একারণে মুমিনদের মুসলিম হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

এ আয়াতে আসলে এমন কিছু বোঝানো হচ্ছে না বরং এ আয়াতে যারা ঈমান এসেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা যেনো মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর টিকে থাকে অর্থাৎ মুমিন ও মুসলিম অবস্থায় মৃতুত্যবরণ করে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু মৃত্যুর আগে ঈমান পরিত্যাগ করে কাফির অবস্থায় মারা যায় তার পূর্বের ঈমান আনা কোনো কাজে আসে না। একারণে বলা হয়েছে যারা ঈমান এনেছো তারা যেনো মৃত্যুর পূর্বে ঈমান পরিত্যাগ করো না বরং ঈমানের উপর টিকে থেকে মৃত্যুবরণ করো। সুতরাং ঈমান ও ইসলাম এখানে একই অর্থে ব্যাবহার করা হয়েছে। ভিন্ন অর্থে নয়। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) "হে ঈমানদাররা তোমরা আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রতি ঈমান আনো। [নিসা/১৩৬] এ আয়াতে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুনরায় ঈমান আনতে আদেশ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরীনে কিরাম বলেছেন যারা ঈমান এনেছে তাদের আজীবন ঈমানের উপর টিকে থাকতে আদেশ করা হয়েছে। [বাইদাবী]

বিপরীত দিকে অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ}

গ্রাম্য লোকেরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আপনি বলুন তোমরা তো ঈমান আনো নি বরং তোমরা বলো আমরা মুসলিম হয়েছি। তাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করে নি। [হুজুরাত/১৪]

এই আয়াতটির মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, ইসলাম গ্রহণ করলেই ঈমান আনা হয় এমন নয়। বরং এমনও হতে পারে যে, একজন ব্যক্তি মুসলিম কিন্তু এখনও তার অন্তরে ঈমান প্রবেশই করে নি।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, এই আয়াতে ইসলাম শব্দটির শাব্দিক অর্থে অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস না থাকলেও কেবল বাহ্যিকভাবে কোনো কিছু মেনে নেওয়া তথা আত্মসমর্পন করা অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে প্রকৃত অর্থে নয়। যেহেতু প্রকৃত অর্থে ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া দ্বীন। যে এই দ্বীনের যাবতীয় বিষয়াবলী মেনে নেয় সেই মুসলিম। আর যে, এই দ্বীনের কোনো কিছু অস্বীকার করে সে মুসলিম নয়। এটা সকলের জানা যে, ঈমান আনতে হবে তথা অন্তরে বিশ্বাস স্থাপণ করতে হবে এটিও আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হওয়া একটি বিধান সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়ার যাবতীয় বিধানবলীর প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপণ করাও আল্লাহর দ্বীন ইসলামের একটি অংশ অর্থাৎ ঈমান ইসলামের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। ঈমান বাদ দিয়ে ইসলাম হতে পারে না।

ইবনে বাত্তাল ﵀ উল্লেখ করেন,

يدل على أن الإسلام يكون بمعنى الاستسلام فيحقن به الدم، ولا يكون بمعنى الإيمان لقوله تعالى: {وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِى قُلُوبِكُمْ} فكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانًا، إلا الإسلام الحقيقى، فهو إيمان.

এই আয়াত প্রমাণ করে, ইসলাম শব্দটি কখনও কখনও আত্মসমর্পন অর্থেও ব্যাবহার করা হয় সেক্ষেত্রে সেটা ইমান আনা বলে গণ্য হবে না কেননা আল্লাহ বলেছেন "তাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করে নি"। অতএব, এই দৃষ্টি কোন থেকে ঈমান আনলে ইসলাম গ্রহণ করা বলে গণ্য হবে কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করলে ঈমান আনা বলে গণ্য হবে না। তবে এটা ইসলামের প্রকৃত অর্থ নয় যেহেতু প্রকৃত অর্থে ইসলাম ও ঈমান একই জিনিস। [শারহে বুখারী]

উপরে ঈমান শব্দটির যে দুটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ প্রকৃত ঈমান আর পরিপূর্ণ ঈমান তার আলোকেও উপরোক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। অর্থাৎ এখানে তোমরা ঈমান আনো নি এর অর্থ হচ্ছে তোমাদের ঈমান এখনও পরিপূর্ণ ও পশংসিত পর্যায়ে পৌছায় নি।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে একজন ব্যাক্তি বললেন, (لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا) ‘‘আমি অমুককে মু’মিন মনে করি’’ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেন, (أو مسلما) ‘‘বলো মুসলিম মনে করি’’ [বুখারী ও মুসলিম] অর্থাৎ তিনি একজন ব্যাক্তিকে মুমিন বলতে নিষেধ করেছেন বরং মুসলিম বলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

উপরোক্ত আয়াতের সাথে এই হাদীসটির সাদৃশ্য রয়েছে। এই হাদীসটির মাধ্যমে অনেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন ঈমান ও ইসলাম আলাদা জিনিস। একজন ব্যাক্তি মুসলিম হলেই যে সে মুমিন হবে এমন নয়। কিন্তু এখানে ইমানের দ্বতীয় অর্থ তথা পরিপূর্ণ ঈমান উদ্দেশ্য প্রকৃত অর্থে যে ঈমান কুফরীর বিপরীতে ব্যাবহার করা হয় সে ঈমান নয়। রাসুলুল্লাহ্ উক্ত ব্যাক্তিকে সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে তিনি যাকে-তাকে মু’মিন হিসেবে সম্মোধন না করেন যতক্ষণ না তার আমল-আখলাকের মধ্যে প্রশংসিত ও সন্তোষজনক গুণাবলী দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া কারো মুমিন হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করার ব্যাপারেও এই হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে। যেহেতু ঈমান অন্তরের বিষয় তাই সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়।

ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন,

وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه

এই হাদীস প্রমণ করে, যে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা উচিৎ নয়।

[শারহে মুসিলম]

তিনি আরো বলেন,

وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين الا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم وهذا مجمع عليه عند أهل السنة

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, নির্দিষ্টভাবে কারো ব্যাপারে জান্নাতের গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না কেবল তারা ছাড়া যাদের ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল-প্রমান রয়েছে যেমন আশারে মুবাশশারা। এ বিষয়ে আহলুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়া ঐক্যমত পোষণ করেছেন। [শারহে মুসলিম]

সুতরাং এই হাদীসটি নিশ্চিতভাবে কারো অন্তরে ঈমান আছে এমন স্বাক্ষ্য দেওয়া বা প্রশংসার স্বরে পাপচারী ব্যাক্তিকে মুমিন হিসেবে আখ্যায়িত করার ব্যাপারে প্রযোজ্য। সাধারনভাবে কাউকে মুমিন বলতে এখানে নিষেধ করা হচ্ছে না এবং প্রকৃত অর্থে ঈমান ও ইসলামের মাঝে কোনো পার্থক্য করাও এখানে উদ্দেশ্য নয়।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় ঈমান ও ইসলাম বলতে বোঝায় আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া প্রতিটি বিধি-বিধান মেনে নেওয়া। অন্য কথায় আল্লাহর দ্বীন কবুল করাই হলো ঈমান আনা ও ইসলাম গ্রহণ করা। সুতরাং উপরে দ্বীন সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে ঈমান ও ইসলামের বিষয়টিও মূলত তাই।

৩.ক.(৭) আনদাদ

আরবী আনদাদ (أنداد) শব্দটি নিদ (ند) শব্দের বহুবচন যার অর্থ সমকক্ষ।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ}

﴾ মানুষের মধ্যে একদল লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে। যেভাবে আল্লাহকে ভালবাসা উচিৎ তারা তাদের সেভাবেই ভালবাসে। কিন্তু যারা মুমিন তারা আল্লাহকেই অধিক ভালবাসে। ﴿

[বাকারা/১৬৫]

অন্য আয়াতে এসেছে,

{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا}

﴾ তোমরা আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থির করো না। ﴿ [বাকারা/২২]

এছাড়া আরো কিছু আয়াতে আল্লাহর বিপরীতে কোনো সমকক্ষ স্থির করা অর্থে আনদাদ (أنداد) শব্দটি ব্যাবহার করা হয়েছে। আনদান শব্দটির অর্থ সম্পর্কে তাফসীরে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। যথা,

১. আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর ইবাদত করা হয়।

জালালাইনে এসেছে, (شركاء في العبادة) ‘‘আল্লাহর ইবাদতে যাদের শরীক করা হয়’

ইমাম তাবারী رحمه الله বলেন,

فقال بعضهم: هي آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله

তাফসীরকারকদের কেউ কেউ বলেছেন আনদাদ হলো ঐ সকল উপাস্যসমূহ আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হতো। [তাফসীরে তাবারী]

এরপর তিনি এর স্বপক্ষে কাতাদা, মুজাহিদ, ইবনে যায়েদ প্রমুখ ব্যাখ্যাকারদের মত বর্ণনা করেন।

এই অর্থে বিভিন্ন তাফসীরগ্রন্থে আনদাদ অর্থ করা হয়েছে মূর্তি (أصنام)। যেহেতু মূর্তির ইবাদত করা হয়। [বাইদাবী ও জালালাইন]

ইমাম কুরতুবী ﷺ বলেন,

والمراد الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها

আয়াতে আনদাদ অর্থ হলো, ঐ সকল মূর্তি ও প্রতিমা যাদের তারা ইবাদত করতো।

[তাফসীরে কুরতুবী]

২. আল্লাহর বিপরীতে যাদের আনুগত্য করা হয়।

আনদাদ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে আরেকদল মুফাস্‌সির বলেছেন, যেসব নেতা-নেত্রীদের নির্দেশে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা হয় তারাই আসলে আনদাদ।

ইবনে জারীর তাবারী আস-সুদ্দী থেকে উল্লেখ করেন,

الأنداد من الرجال، يطيعونهم كما يطيعون الله، إذا أمروهم أطاعوهم وعَصَوا الله

আনদাদ হচ্ছে ঐ সকল লোক আল্লাহকে যেভাবে আনুগত্য করা হয় তাদের ঐভাবে আনুগত্য করা হয়। তারা কোনো বিষয়ে আদেশ দান করলে তার আনুগত্য করা হয় এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করা হয়।

ইমাম কুরতুবী ﷺ বলেন,

وقال ابن عباس والسدي: المراد بالأنداد الرؤساء المتبعون، يطيعونهم في معاصي الله

ইবনে আব্বাস এবং আস-সুদ্দী বলেছেন, আনদাদ বলতে বোঝায় ঐ সকল নেতা-নেত্রীবর্গ আল্লাহর আদেশের বিপরীতে যাদের আনুগত্য করা হয়। [তাফসীরে কুরতুবী]

৩. কেউ কেউ বলেছেন, যা কিছু আল্লাহর দ্বীন হতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় তাই আনদাদ।

ইমাম বাইদাবী বলেন,

ولعل المراد أعم منهما وهو ما يشغله عن الله

সম্ভবত আনদাদ শব্দের সঠিক অর্থ এমন যে কোনো ব্যাক্তি বা বস্তু যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ বা আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। [তাফসীরে বাইদাবী]

'আনদাদ' শব্দের অর্থ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরীনে কিরামের মতামত এটাই। এখন তাওহীদের আলোচনার সাথে আনদাদ শব্দটির সম্পর্কের ব্যাপারে কথা হলো, যদি আনদাদ অর্থ হয় বাতিল উপাস্য সমূহ আল্লাহর

পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয় তবে এ বিষয়ে পূর্বে ইবাদতের যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রযোজ্য হবে। এবং এ অর্থে কাউকে আনদাদ হিসেবে গ্রহণ করলে তা কুফরী হবে।

আর যদি আনদাদ অর্থ হয় নেতা-নেত্রীবর্গকে আল্লাহর আদেশের বিপরীতে আনুগত্য করা তবে কারো আনুগত্য কখন কুফরী হয় সে বিষয়ে যে আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে তার উপর নির্ভর করতে হবে। এখানে সংক্ষেপে কথা হলো, কারো নির্দেশে কোনো একটি হারাম কাজে লিপ্ত হলেই কেউ কাফির হয়ে যায় না যতক্ষণ না সে উক্ত হারাম কাজটিকে হালাল মনে করে। সুতরাং কারো আনুগত্যের মাধ্যমে আনদাদ হিসেবে গ্রহণ করলে তা শিরক-কুফরী হবে কিনা সেটা উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে নির্ধারন করতে হবে। ঢালাওভাবে কারো আনুগত্য করলেই তাকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে না। আল্লাহর আনুগত্য বা স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এমন ব্যাক্তি বা বস্তুকে আনদাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হলে, এর উপর নির্ভর করে কাউকে কাফির বলা যাবে না যতক্ষণ না সে আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগ করে বা কোনে স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয়। উদহারণস্বরুপ যদি স্ত্রী-সন্তানের সুখের কারণে কেউ চুরি-ডাকতি, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয় তবে তাকে কাফির বলা যাবে না। কিন্তু কারো স্ত্রী যদি খৃষ্টান হয়ে যায় এবং উক্ত স্ত্রীকে পাওয়ার জন্য স্বামীও খৃষ্টান হয়ে যায় তবে উক্ত ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে আনদাদ হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে গণ্য হবে এবং কাফির হবে।

মোট কথা 'আনদাদ' শব্দটির মাধ্যমে শিরক-কুফরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে উপরোক্ত মূলনীতিসমূহের আলোকেই তা করতে হবে। 'আনদাদ' শব্দটির যতগুলো অর্থ আছে তার সবগুলোর উপর ঢালাওভাবে শিরক-কুফরীর ফতোয়া আরোপ করা যাবে না।

৩.ক.(৮) তাগুত

''তাগুত'' (طاغوت) শব্দটি ''তুগইয়ান'' (طغيان) মাসদার হতে উদ্গত যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর বিভিন্ন হাদীসে তাগুত শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى}

যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে শক্ত হাতল ধরে।

[বাকারা/২৫৬]

অন্য আয়াতে এসেছে,

{يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}

তারা তো তাগুতের নিকট বিচারপ্রার্থী হতে চায় অথচ তাদের তাগুতকে অস্বীকার করতেই বলা হয়েছিল। [নিসা/৬০]

আল্লাহ্ ﷻ আরো বলেন,

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}

আমি প্রতিটি উম্মতের নিকট রসুল প্রেরণ করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে পরিত্যাগ করো। [নাহল/৩৬]

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ) ‘‘তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষের নামে এবং তাগুতের নামে কসম করো না। [সহীহ্ মুসলিম মুসলিম]

সহীহ্ মুসলিমের অন্য একটি রেওয়য়েতে এসেছে, কিয়ামতের দিন বলা হবে, (مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ) ‘‘যে যার ইবাদত করতো সে তার সাথে চলে যাও’’ এর ফলে যে যার ইবাদত করতো সে তাকে অনুসরন করবে। সেখানে বলা হয়েছে, (وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ) ‘‘যারা তাগুতের ইবাদত করতো তারা তাগুতকে অনুসরণ করবে’’ [সহীহ্ মুসলিম]

তাগুতের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরে বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরাম যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছেন তা দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. তাগুত হলো বাতিল উপাস্যসমূহ, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয়।

ইবনে কাছির রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وقال الإمام مالك: "الطاغوت": هو كل ما يعبد من دون الله

ইমাম মালিক বলেছেন, আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছুর ইবাদত করা হয় তাই তাগুত।

ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরেও ইমাম মালিক হতে অনুরুপ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

এই অর্থে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে তাগুতের ব্যাখ্যায় মূর্তি (أصنام) উল্লেখ করা হয়েছে।

২. তাগুত হলো, মানুষকে আল্লাহর দ্বীন হতে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার ব্যাপরে ভূমিকা রাখে এমন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তি। এই অর্থে যারা কোনো বাতিল উপাস্যের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে বা যে কোনো প্রকার শিরক-কুফর ও পথভ্রষ্টতার প্রচার-প্রসার করে তারা সকলে তাগুত বলে গণ্য হবে। এ হিসেবে শয়তান, জাদুকর, গনক, পথভ্রষ্ট শাসক, নীতিভ্রষ্ট বিচারক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোককে তাগুত বলা যায়।

ইমাম বাইদাবী ﵀ তাগুতের অর্থ সম্পর্কে বলেন,

الشيطان أو الأصنام أو كل ما عبد من دون الله أو صد عن عبادة الله

শয়তান, মূর্তি বা আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছুর ইবাদত করা হয় অথবা যারা আল্লাহর ইবাদত থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে। [তাফসীরে বাইদাবী]

অন্য স্থানে তিনি বলেন, (والطاغوت يطلق لكل باطل من معبود أو غيره) ‘‘তাগুত শব্দটি প্রতিটি ভ্রান্ত বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা হয় তা উপাস্য হোক আর যাই হোক।’’

শা’বী আতা এবং মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে, তারা বলেন,

والطاغوتُ الشيطان والكاهِنُ وكلُّ رأْسٍ في الضَّلال

তাগুত হলো, শয়তান, গনক এবং বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তি। [লিসানুল আরব]

এই অর্থে কা’ব ইবনে আশরাফকেও তাগুত বলা হয়েছে। যেহেতু সে ইয়াহুদীদের মধ্যে নেতৃত্বস্থানীয় ছিল এবং মানুষকে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরিয়ে রাখার ব্যাপারে তার ব্যাপক ভূমিকা ছিল। সে মানুষের মাঝে বিভিন্ন সমস্যায় বিচারক হিসেবেও ভূমিকা রাখতো।

ইমাম কুরতুবী ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন,

والطاغوت كعب ابن الاشرف، دليله قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت

তাগুত হলো কা’ব ইবনে আশরাফ। এর প্রমাণ হলো, আল্লাহর বাণী, ‘‘তারা তো তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থী হতে চায়’’। [তাফসীরে কুরতুবী]

ইবনে আব্বাস ﵁ থেকেও অনুরুপ বর্ণনা আছে। [লিসানুল আরব]

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, তাগুত শব্দটি মূলত দুটি অর্থে ব্যাবহৃত হয়। আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয় ঐ সকল বাতিল উপাস্যসমূহ এবং পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করে

এমন নেতা-নেত্রীবর্গ।

যদি প্রথম অর্থে তাগুত শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তবে আল্লাহর পরিবর্তে মানুষ, জ্বিন, মূর্তি ইত্যাদি যা কিছুর ইবাদত করা হয় তাই তাগুত হিসেবে গণ্য হবে। তবে তাগুত শব্দটি এমন কারো ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাবে না যাদের সম্মান করতে শারয়ীভাবে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেমন, ঐ সকল নবী-রাসুল বা নেককার ব্যাক্তিরা যাদের মৃত্যুর পর কিছু নির্বোধ লোক তাদের ইবাদত করা শুরু করেছে। না তারা এর নির্দেশ দিয়েছেন আর না তারা এব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মোটকথা, শারয়ী দৃষ্টিকোন থেকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যাক্তি বা বিষয়ের উদ্দেশ্যে 'তাগুত' শব্দটি প্রয়োগ করা যাবে না। এছাড়া অন্য যে কোনো বাতিল উপাস্যের ব্যাপারে তাগুত শব্দ প্রয়োগ করা যাবে তা জড় বা জীব যাই হোক না কেনো।

আর যদি দ্বিতীয় অর্থে তাগুত শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তবে, যে কোনো প্রকার পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত ও নিবেদিত যে কাউকে তাগুত নামে আখ্যায়িত করা যায়। এ অর্থে শয়তান, গনক, জাদুকর, মানব রচিত আইন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করে এমন শাসক বা এই সকল আইনে বিচার-ফয়সালা করে এমন বিচারক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর উপর তাগুত শব্দ প্রয়োগ করা যায়।

'তাগুত' শব্দটির প্রয়োগ সম্পর্কে জেনে নেওয়ার পর প্রশ্ন হলো, সকল তাগুতই কি কাফির? এ বিষয়ের উত্তরে আমরা পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করবো। আর তা হলো, 'তাগুত' শব্দটি যত অর্থে প্রযোজ্য হয় প্রতিটি ক্ষেত্রে শিরক-কুফর বা কাফির-মুশরিক বিধান জারী করা সম্ভব নয়। বরং পূর্বে বর্ণিত মূলনীতিটির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে একজন ব্যাক্তির উপর কুফরীর ফতোয়া আরোপ করতে হবে কেবলমাত্র 'তাগুত' শব্দটির উপর নির্ভর করে নয়। উদাহরণ স্বরুপ যে মূর্তিকে ইবাদত করা হয় তাকে তাগুত বলা হয়েছে কিন্তু মূর্তিকে কাফির বা মুশরিক বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ঐ মূর্তিকে যে ইবাদত করে তাকে তাগুত বলা যাবে না তবে তাকে মুশরিক বলা হবে। উক্ত মূর্তির ইবাদতের দিকে যে আহ্বান করে তাকে তাগুত বলা হবে কাফির বা মুশরিকও বলা হবে, যেহেতু শিরক-কুফরের দিকে আহ্বান করাও কুফরী যেমনটি আমরা পূর্বে বলেছি। একইভাবে জাদুকর, গনককে তাগুত বলা হয়েছে কিন্তু সকল প্রকার জাদুকর ও গনককে কাফির বলা যায় না। বরং যে জাদুকর কুফরী কালামের মাধ্যমে জাদু করে এবং যে গনক সকল বিষয়ে গায়েব জানার দাবী করে তারা কাফির হবে। আর যেসব জাদুকর ও গনকের মধ্যে কোনো কুফরী পাওয়া যায় না তারা কাফির হবে না। পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তিতে নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তিরা বা মানব রচিত আইনের প্রতিষ্ঠাতা ও সেগুলোর মাধ্যমে যারা বিচার করে তাদের তাগুত হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় তবে তারা ঢালাওভাবে কাফিরে পরিনত হবে না। বরং দেখতে হবে তারা মানবরচিত আইনকে উত্তম

ও বৈধ আইন মনে করে কিনা। এই সকল বিবেচনা স্বাপেক্ষেই এসব ব্যাক্তিদের উপর শিরক-কুফরের বিধান প্রয়োগ করা যায়। কারো ব্যাপারে ‘তাগুত’ শব্দ প্রয়োগ করা হলেই তাকে কাফির হিসেবে ঘোষণা করা সঠিক কর্মপন্থা নয়।

৩.(খ) বর্তমান সময়ে প্রচলিত কুফরী মতবাদ সমূহ।

আল্লাহ ﷻ মানুষ সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তার ইবাদত করার জন্য। মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা এবং শিরক-কুফরের অন্ধকার হতে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি যুগে যুগে নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় পথভ্রষ্ট হয়ে মানুষ নবী-রাসুলদের শিক্ষা হতে দূরে সরে গিয়েছে এবং আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগ করে কাফির মুশরিকে পরিনত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন মুখরোচক স্লোগান ও মুখভরা বুলির মাধ্যমে শিরক-কুফর ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানবতা, নারী স্বাধীনতা, শান্তি এবং সহিঞ্চুতার মোড়োকে কুফরী মতবাদ প্রচার করা হচ্ছে। স্বাধারন মানুষ তো বটেই এমনকি নামধারী ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুসলিম গবেষকরাও এসব মতবাদের অভ্যন্তরভাগে কি লুকিয়ে আছে তা অনুধাবনে ব্যার্থ হয়েছে ফলে লেখা-লেখি ও বক্তব্যের আলোকে তারা জনমানুষের সামনে এসব মতবাবাকে সাধুবাদ জানাতে শুরু করেছে। বিরতিহীন প্রচার-প্রসারের ফলে এই সকল ভ্রান্ত মতবাদ এখন মানুষের মনে চুড়ান্তভাবে স্থান গেড়ে নিয়েছে। এখানে আমরা এই ধরণের কিছু মতবাদের স্বরুপ সম্পর্কে আলোচনা করবো। আর আল্লাহই তাওফিকদাতা।

৩.খ.(১) মানবতাবাদ

মানবতাবাদ এমন একটি স্লোগান, সাধারনভাবে যে কোনো মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। খেটে খাওয়া ও খুটে খাওয়া মানুষের প্রতি মায়া-মমতা প্রদর্শন, শোকাহত ও ব্যাথিত মানুষের পাশে দাড়ানো, অভূক্ত বা অর্ধভূক্ত মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়া, সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে মনে প্রাণে কাজ করে যাওয়া ইত্যাদি সুন্দর-সুন্দর স্লোগানের খোলসে মানবতাবাদ প্রচার করা হয়। এই সকল মধুর বাণীর আড়ালে কি শিরক-কুফর লুকিয়ে আছে তা অনুধাবনে ব্যার্থ হওয়ার কারণে সাধারন মানুষ বিষেশত যুবকরা এই মতবাদে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সময়ের মানবতাবাদ মানুষকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা বা কমপক্ষে মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ের তুলনায় মানুষ পরিচয়কে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি উপস্থাপন করে। আক্বীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ইত্যাদি ধর্মীয় মূলনীতিকে বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র

মানুষ হিসেবে প্রতিটি ধর্মের লোককে নিজের ভাই হিসেবে মনে করা এবং সকল ধর্মের মানুষকে সমান দৃষ্টিতে বিচার করার নামই হলো মানবতাবাদ। তাছাড়া ধর্মকে শুধুমাত্র মানুষের দুনিয়াবী কল্যাণে ব্যাবহার করা এবং ধর্মের যেসব বিধি-বিধানে মানুষের উপর কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে বা মানুষের স্বাধীনতা হরন করা হয়েছে সেগুলো বর্জন করা এবং ধর্মের যেসব নিয়ম-নীতি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে হাসিমুখে সেসব বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি পরিত্যগ করার নামই মানবতাবাদ।

এই মূলনীতির আলোকে তারা ইসলামের দাসপ্রথা, পর্দা প্রথা, জেনা-ব্যাভিচারের শাস্তি, চোরের শাস্তি, তালাকের পদ্ধতি, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আপত্তি-অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। তাওহীদের প্রচার-প্রসার ও শিরক-কুফরের বিনাশের উদ্দেশ্যে জিহাদ করার বিষয়টিকেও তারা তীব্রভাবে নিন্দা জানায়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে মানুষকে মুমিন ও কাফির দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করাও মানবতার প্রতি অবমাননা হিসেবে গণ্য করা হয়।

মানবতাবাদ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষনা করে, **"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"** অর্থাৎ ধর্ম বিশ্বাস ও কর্ম-কাজের উর্দ্ধে একজন মানুষের মানুষ পরিচয়ই প্রধান। মুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি সকল ধর্মের লোকেরা এক ও অভিন্ন। তারা সকলেই মানুষ। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এই কথাটির অর্থ এও যে, মানুষের উপর অন্য কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ক্ষমতা বলবৎ নেই। আসমান থেকে কেউ কোনো বিধান অবতীর্ণ করবে আর মানুষ সেটা মেনে চলবে এটা হতে পারে না। এরা বলে, **"মানুষ এনেছে কিতাব, কিতাব আনে নি মানুষ কোনো"।** অর্থাৎ পবিত্র কুরআন বা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ কোনো ঐশী শক্তির নিকট হতে আসে নি বরং মানুষ এগুলো তৈরী করেছে অতএব, এগুলো মানুষের তুলনায় বেশি মর্যাদার অধিকারী নয়। সুতরাং যে কোনো মূল্যে এসব গ্রন্থের বিধানাবলী মেনে চলতে হবে এমন নয়। এই অর্থে এরা এমনও বলে, **"মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়।"**

এই সকল মূলনীতির প্রতিটিই স্পষ্ট কুফরী হিসেবে গণ্য। যেহেতু ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ জীবন-বিধান। যিনি সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তাদের রিযিকদাতা এবং পালনকর্তা। সকল মানুষ তার গোলাম এবং তিনি তাদের অভিভাবক। নিঃসন্দেহে চাকরের খেয়াল-খুশি ও স্বাধীনতার তুলনায় অভিভাবকের নির্দেশ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে চাকর অভিভাবকের নির্দেশ মানে না সে অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে এবং শাস্তির যোগ্য হবে আর যে অভিভাবকের নির্দেশ মেনে চলে সে পুরষ্কৃত হবে এটাই স্বাভাবিক। এই দুজন কখনও সমান হতে পারে না। মনিবের নির্দেশের বিরুদ্ধে অবাধ্য এবং বাধ্য উভয় চাকর যদি পরস্পরকে ভাই-ভাই মনে করে তবে উভয়ে যে চাকুরী হারাবে তাতে সন্দেহ নেই। সকল মানুষ আল্লাহর

গোলাম। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে তারা মুমিন ও মুসলিম আর যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা কোনো কুফরী মতবাদ মেনে চলে তারা কাফির। মুসলিমের স্থান জান্নাত আর কাফিরের স্থান জাহান্নাম। মুসলিম আল্লাহর নিকট সম্মানিত আর কাফির আল্লাহর নিকট অপমানিত। মুসলিম এবং কাফির কখনও সমান হতে পারে না। যারা মুসলিম পরিচয়ের তুলনায় মানুষ পরিচয়কে প্রাধান্য দেয় এবং কাফির-মুশরিক সকলকে নিজের ভাই মনে করে আল্লাহর নিকট তারা ঐ সকল কাফির-মুশরিকদের মতোই কাফির হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}

﴾ হে ঈমানদাররা তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে সে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত হয়। ﴿

[সূরা মায়েদা/৫১]

ইয়াহুদী খৃষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা বলতে সাধারনভাবে তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা নয় বরং তাদের দ্বীনকে মেনে নেওয়া বা নিজের দ্বীনকে বিসর্জন দিয়ে তাদের সাথে সদ্ভাব গড়ে তোলাকে বোঝায়। এ বিষয়ে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যারা নিজেদের মুসলিম পরিচয়ের তুলনায় মানুষ পরিচয়কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে তারা আল্লাহর দ্বীন পরিত্যাগ করে মানবতাবাদের ধর্ম গ্রহণ করার কারণে কাফিরে পরিনত হয়।

শান্তিপ্রতিষ্ঠা বা সহিষ্ণুতার নামে নিজের দ্বীন ঈমান বিসর্জন দিয়ে কাফিরদের সাথে ভ্রাতৃত্বর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, তাদের ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া বা তাদের ধর্মীয় উৎসব ও রীতি-নীতিকে সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি বিষয়াবলী স্পষ্ট কুফরী হিসেবে গণ্য। একইভাবে মানবতা বা স্বাধীনতার কথা বলে, ইসলামের কিছু বিধি-বিধান যেমন, দাসপ্রথা, পর্দাপ্রথা, ইত্যাদি বিষয়কে অস্বীকার করাও কুফরী কর্মকান্ড হিসেবে গণ্য। এই ধরণের মানবতায় যারা বিশ্বাসী তারা নিজেরাই মানুষ নয় বরং জন্তু-জানোয়ার বা তদাপেক্ষা অধম।

{أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ}

﴾ ওরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। ﴿ [আ'রাফ/১৭৯]

কবিতার ভাষায়,

যে বলে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।
তাকে বলি, মানুষ কে কি তার পরিচয়?
যদি সদা বংশ গুনে হয় মানবতা,
তবে সাধু আর অসৎ জনে কি অসমতা?
আর যদি কর্ম মানো তবে নিশ্চিত জেনো ধর্ম তারে কয়।
বিশ্বাসে হয় মানুষের মাঝে বিভেদ নির্ণয়।
সঠিক যার কর্ম হয় সঠিক বিশ্বাসে,
সার্থক জনম তার শেষ নিশ্বাসে।
অন্তর তার, দুখীর দুঃখে করে হাহাকার।
সেবক সেজন দিয়ে দেহ-মন সমগ্র মানবতার।
বিশ্বাস যার বাতিল অসার আল্লাহকে ডরে না মোটে।
মুধুর যতই ছড়াক বুলি কর্মে নাহি তা খাটে।
দু-হাতে তার ঘটে বারবার মানুষের গঞ্জনা।
মানুষ যদি সে, অমানুষ কে? কোথাও পাবে না।
তাই, সত্য ধর্ম সবার উপরে, সবার পরিচয়।
ইসলাম সে, মুসলিম যে মানুষ সেই হয়।

৩.খ.(২) বস্তুবাদ

বস্তুবাদ দর্শনের এমন একটি মতবাদ যাতে বস্তুকে এই সৃষ্টি জগতের মূল বিষয় এবং সৃষ্টিরাজিতে ঘটমান সকল প্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উৎস হিসেবে কল্পণা করা হয়। এটা এমন একটি দর্শন যাতে যে কোনো প্রকার ভাব বা আবেগকে উপেক্ষা করা হয় এবং দৃশ্যমান বস্তু ছাড়া বাস্তবে অন্য কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। সাধারনভাবে আমরা বস্তুবাদ বলতে যা বুঝি তা হলো, আত্মিক ও আদ্ধাত্মিক বিষয়ালীর পরিবর্তে

বৈষয়িক ভোগ-বিলাশ ও ধন সম্পদকে প্রাধান্য দেওয়া। পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়া এবং দুনিয়ার জীবনকেই শেষ মনে করা। আল্লাহ্ বলেন,

{يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ}

তারা কেবল দুনিয়ার দৃশ্যমান বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞান রাখে আর আখিরাতের ব্যাপারে তারা পরিপূর্ণ উদাসীনতা প্রদর্শন করে। [রুম/৭]

এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের মনুষত্বের পরিচয় হারিয়ে ফেলে। অর্থ-সম্পদের নেশায় মাতালের মতো ছুটে বেড়ায়। অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে হালাল-হারাম, নীতি-নৈতিকতা, ধর্ম-কর্ম ইত্যাদি কোনো কিছুর তোয়াক্কা করে না। এদের সম্পর্কেই রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ

অর্থ-সম্পদের পূজারীরা ধ্বংস হোক। তারা যখন পায় খুশি হয়, না পেলে বেজার হয়। [সহীহ্ বুখারী]

এই সকল লোকেরা নিজেদের মনুষত্বের পরিচয় ভুলে যায়। মানুষের সাথে মানবতা, আত্মীয়তা, অতিথির আতিথেয়তা, পিতা-মাতার অধিকার, সন্তানের স্নেহ, আল্লাহর ইবাদত, আখিরাত, জান্নাত ইত্যাদি যাবতীয় নীতি-নৈতিকতা তাদের নিকট মূল্যহীন। তারা চায় কেবল টাকা। টাকা ছাড়া তাদের জীবন ফাঁকা হয়ে যায়। টাকা উপার্জনের জন্য যে কোনো রাস্তা অবলম্বন করা এরা বৈধ মনে করে। এ বিষয়ে কোনো বাধা নিষেধ আরোপ করা হলে তারা বিভিন্ন যুক্তি-প্রামাণ উপস্থাপণ করে সেটার বিরোধিতা করে। যখন সুদ হারাম করা হয় তখন এই প্রকৃতির কিছু লোক বলেছিল- (انما البيع مثل الربا) "বেচা-কেনা তো সুদের মতোই" [বাকারা/২৭৫] অর্থাৎ বেচা কেনা বৈধ হলে সুদ অবৈধ হয় কিভাবে? বর্তমানে দেখা যায় কিছু লোক ব্যাবসা, পেশা, রাজনীতি, রুটি-রুজি ইত্যাদির নামে বিভিন্ন বিষয়কে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে। কেউ বলে, আমি শিল্পী, মূর্তি নির্মাণ করাই আমার কাজ, কেউ বলে আমি গায়ক গান-বাজনাই আমার পেশা। অন্য আরেকদল বলে, আমরা রাজনীতি করি, মসজিদ, মন্দির সব জায়গায় আমাদের যেতে হয়। এভাবে তারা নিজেদের এই সব বিষয়কে বৈধ প্রমানের চেষ্টা করে। তারা দাবী করে, যেহেতু এই সকল কাজ তাদের পেশা তাই এতে লিপ্ত হওয়া তাদের জন্য দোষনীয় নয়।

আখিরাতের জীবন ও জান্নাতের সুখ-শান্তি সম্পর্কে তাদের মন্তব্য হলো,

দূরের বাদ্য কি লাভ শুনে - মাঝখানে তার বেজায় ফাঁক

নগদ যা পাও হাত পেতে নাও - বাকীর খাতায় শূন্য থাক।

সন্দেহ নেই যে, সাধারনভাবে টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত ইত্যাদি দুনিয়াবী বস্তুর সন্ধানে ব্যস্ত হওয়া বা হালাল-হারাম যে কোনো পন্থায় তা হাসিলের জন্য স্বচেষ্ট হওয়া শিরক-কুফর নয় তবে বস্তুর আকর্ষণে আখিরাতকে অস্বীকার করা বা কোনো হারামকে হালাল মনে করা নিশ্চয় কুফরী। বলাবাহুল্য যে, বস্তুবাদের অত্যাধিক প্রচার-প্রসারের ফলে এধরণের কুফরী চিন্তা-চেতনাই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। একারণে সামগ্রিকভাবে বস্তুবাদকে একটি কুফরী মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

৩.খ.(৩) জাতীয়তাবাদ

জাতিগত পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্টিত হয়। সাধারনত ভাষা, এলাকা বা বংশপরিচয়ের ভিত্তিতে জাতীয়তা গড়ে ওঠে। তবে ধর্ম তথা বিশ্বাস বা মতবাদের উপর ভিত্তি করেও জাতি গড়ে উঠতে পারে। এই সকল বিষয়ের যে কোন একটিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজের ধর্ম, এলাকা, ভাষা, বংশ ইত্যাদি বিষয়সমূহের মধ্যে যার নিকট যেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সে তার উপর ভিত্তি করে জাতীয়তা গড়ে তোলে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে এবং বাকিগুলোকে উপেক্ষা করে বা গৌণ সাব্যস্ত করে জাতীয়তার সৃষ্টি হয়। যদি এলাকার উপর ভিত্তি করে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয় তবে উক্ত এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও বংশের লোকেরা নিজেদের এক জাতি হিসেবে মনে করবে এবং উক্ত এলাকার বাইরে সকল মানুষকে তারা বিজাতী মনে করবে যদিও তাদের ধর্ম, ভাষা বা বংশের মিল থাকে। যেমন বাংলাদেশে এমন কিছু উপজাতি রয়েছে যাদের ভাষা বাংলা নয় তবু বাংলাদেশে বসবাস করার কারণে তারা বাংলাদেশী হিসেবে গণ্য হয় এবং এদেশের যাবতীয় নাগরিক সুবিধাদি পেয়ে থাকে। একইভাবে যারা ভাষার উপর ভিত্তি করে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করে তারা একই ভাষার সকলকে এক জাতিভূক্ত মনে করে যদিও তারা দুটি পৃথক দেশে বসবাস করে। যেমন, কেউ কেউ ভাষার মিল থাকার কারণে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের বাঙালিদের একই জাতিভূক্ত মনে করে যদিও উভয়ের ধর্ম, বর্ণ, দেশ ইত্যাদি আলাদা।

বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষ দেশ তথা এলাকাভিত্তিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। প্রায় সকল রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই প্রকারের জাতীয়তাই স্বীকৃত। একারণে বর্তমানে জাতীয়তাবোধ আর দেশত্ববোধ প্রায় একই বিষয়ে পরিনত হয়েছে। দেশের ভালবাসা ও প্রশংসায় এত বেশি অতিরঞ্জন করা হয় যে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় দেশ নিজেই এখন প্রতিমায় পরিনত হয়েছে। দেশত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদের কারণে দ্বিমুখী বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে আল্লাহর দ্বীন ইসলামকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাস করার কারণে হিন্দু, খৃষ্টান, নাস্তিক ইত্যাদি সকল ধর্ম ও মতবাদের লোকদের এক জাতি হিসেবে বিবেচনা করা এবং তাদের পরস্পরের ভাই-ভাই হিসেবে গণ্য করার মাধ্যমে ইসলামকে ছোট করা হয়েছে।

বিপরীত দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের নিজ নিজ দেশের জাতীয়তাবোধের বন্ধনে বেধে ফেলার মাধ্যমে বৃহৎ মুসলিম উম্মাহ্‌কে শতদাবিভক্ত করে ফেলা হয়েছে। এমনকি মুসলিম উম্মার একটি অংশ আরেকটি অংশকে ভিনদেশী হিসেবে গণ্য করার কারণে একে অপরকে শোষন ও নিপিড়ন করছে ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, নিজের দেশ ও জাতির প্রতি অন্তরের টান ও সহজাত ভালবাসা থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইসলাম এটা নিষিদ্ধ করে না। তবে ইসলাম একজন মুসলিমের উপর এটা আবশ্যক করে যে, নিজের দ্বীন ও ঈমানকে নিজের বংশ, ভাষা, দেশ ইত্যাদির চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করতে হবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, “একজন ব্যক্তি মুমিন হবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট বেশি প্রিয় হবো তার পিতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষ হতে।” [সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম] সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতে পিতা, ভ্রাতা, স্বগোত্র, ঘর-বাড়ি, ব্যাবসা-বানিজ্য আল্লাহ্, রসুল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার তুলনায় বেশি প্রিয় মনে করার ব্যাপারে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করা হয়েছে।

একজন মুমিনের দায়িত্ব হলো নিজের জীবন, বংশ-গোত্র, দেশ, ভাষা ইত্যাদি যে কোনো পরিচয়ের তুলনায় আল্লাহর দ্বীনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। নিজের দেশ ও জাতির প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা থাকা দোষের কিছু নয় তবে বিষয়টিকে দ্বীন ও ঈমানের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। বরং দ্বীন-ঈমানকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে নিজের স্বগ্রোত্র ও স্বদেশ ছেড়ে হিজরত করতে হবে এটিই ইসলামের নির্দেশ। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ও তার সাহাবায়ে কিরাম দ্বীন রক্ষার্থে মক্কা হতে মদীনাতে হিজরত করেছিলেন। তারাও নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও বাসস্থানকে ভালবাসতেন। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ মদীনাতে যাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সহীহ্ বুখারীতে আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত আছে তার পিতা আবু বকর رضي الله عنه এবং বিলাল رضي الله عنه মক্কা থেকে মদিনাতে হিজরত করে আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় তারা দুজনেই কবিতার মাধ্যমে নিজ এলাকা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করার কষ্ট বর্ণনা করতেন। নিজের বাসস্থান ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর প্রতি ভালবাসা তাদেরও ছিল কিন্তু তারা আল্লাহর দ্বীনকে অধিক ভালবাসতেন একারণে দ্বীনের প্রয়োজনে নিজের দেশ বা স্বজাতিকে পরিত্যাগ করতে এক মুহুর্ত দ্বিধা করেন নি। তারা কখনই ঈমান-ইসলামের পরিচয় ভিন্ন অন্য কোন পরিচয়কে গুরুত্ব দেন নি। এমনকি তারা যখন নিজের বংশ-গোত্র ইত্যাদি পরিচয় নিয়ে গর্ব অহংকার করতেন ঈমান ও নেক আমলের দিক থেকেই তা করতেন দুনিয়াবী মাল-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক হতে নয়। তিবরানী শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, আওস ও খাজরাজ দুই গোত্রের সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপের সময় নিজ-নিজ গোত্রের আমলদার ও নেককার লোকদের নিয়ে গর্ব করতেন।

আবু বকর ﵁ উহুদ যুদ্ধে দেখেন, একজন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পাশে অবস্থান করে কাফিরদের সাথে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এটা দেখে তিনি বলেন,

كن طلحة حيث فاتني ما فاتني ، فقلت : يكون رجلا من قومي أحب إلي

আমি যখন এ মহৎ কাজ করতেই পারিনি তখন এটা যেনো তালহা হয়। আমার গোত্রের কেউ একাজ করুক এটিই আমার নিকট অধিক প্রিয়। [মুসনাদে তয়ালিসী]

মোট কথা, গোত্রপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও ছিল কিন্তু তারা এটাকে আল্লাহর দ্বীনের পক্ষে ব্যবহার করতেন বিপক্ষে নয়। স্বগোত্রের প্রতি ভালবাসা বলতে তারা বুঝতেন নিজের গোত্রের লোকেরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য ভাল কিছু করুক এটা কামনা করা, আল্লাহর দ্বীনকে উপেক্ষা করে নিজের গোত্রগত পরিচয়কেই প্রধান মনে করা নয়। কিন্তু বর্তমানে গোত্রপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধ বলতে বোঝায়, ঈমান-আক্বীদা ও ধর্ম-কর্মকে উপেক্ষা করে ভাষা বা এলাকাভিত্তিক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করা এবং ধর্ম-কর্মের উর্দ্ধে নিজের জাতিগত পরিচয়কে প্রধান পরিচয় হিসেবে বিবেচনা করা। বৈধ বা অবৈধ যে কোন পন্থায় স্বজাতি ও স্বদেশের পক্ষে অবস্থান করা। জাহেলী যুগে একটি স্লোগাণ ছিল, (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما) "তোমার ভাই (স্বগোত্রের লোক) জালিম হলেও তাকে সাহায্য করো" বর্তমান সময়ে প্রচলিত জাতীয়তাবাদ এই জাহেলী চিন্তাধারাই প্রচার করে। এই জাতীয়বাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো, স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি সহজাত টান থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক একটি বিষয়। ইসলাম এই সহজাত ও স্বাভাবিক ভালবাসাকে স্বীকৃতি দেয় যদি না সেটা ইসলামের বিপরীতে ব্যাবহার করা হয়। যারা বৈধ পন্থায় সদেশপ্রীতি প্রকাশ করে তাদের তিরষ্কার করা হবে না। কিন্তু যারা স্বদেশ প্রেমের কারণে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয় তারা অপরাধী হবে আর যদি কেউ স্বজাতি ও স্বদেশকে আল্লাহর দ্বীনের উপরে স্থান দেয় তবে সেটা হবে সুস্পষ্ট কুফরী। বর্তমানে জাতীয়তাবাদ ধর্মের উপর জাতীয়তাবোধকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে তাই সাধারনভাবে এটাকে কুফরী মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী যে কেউ কাফির হবে। বরং দেখতে হবে তার বিশ্বাস কুফরীর পর্যায়ে পৌছায় কিনা।

৩.খ.(৪) গণতন্ত্র

গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি মতবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতা হলো ধর্মকে অস্বীকার ও স্বীকার

করার মাঝা-মাঝি একটি মতবাদ। এই মতবাদ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সীমীত পরিসরে ধর্ম পালনের অনুমতি দেয় কিন্তু রাষ্ট্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলীতে ধর্মের কোনো প্রভাব স্বীকার করে না। দেশের আইন-কানুন, শাসক ও শাসনপদ্ধতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়কে ধর্মের ধরা-ছোয়ার বাইরে নিয়ে যাওয়াই মূলত ধর্মনিরপেক্ষতা। গণতন্ত্র এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। দুটি দিক থেকে গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করে। সামাজিকভাবে গণতন্ত্র সকল ধর্মের লোকদের সমান অধিকার নিয়ে একত্রে এক জাতি হিসেবে বসবাস করার নির্দেশ প্রদান করে। একে অপরের ধর্ম-কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন এবং নিজেদের ধর্মীয় ভেদা-ভেদ ভুলে মানুষ হিসেবে বা একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার নিয়ে পরস্পরে ভাই-ভাই হিসেবে বাস করার কথা বলে। একজন মুসলিম একজন হিন্দু অপেক্ষা উত্তম নয়। ধর্ম, পেশা, নেক আমল ইত্যাদি কোনো কিছুই শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড নয়। মুসলিম, হিন্দু, নেককার, বদকার সকলকে সমান দৃষ্টিতে বিবেচনা করার নামই গণতন্ত্র।

রাষ্ট্রীয়ভাবে গণতন্ত্র বলতে বোঝায় একটি দেশের বেশিরভাগ লোক যেভাবে চাই সেভাবে সরকার গঠিত হওয়া এবং তাদের ইচ্ছামত আইন-কানুন ও নিয়মনীতিতে দেশ পরিচালনা করা। যদি বেশিরভাগ লোকের ভোটে একজন মদ্যপ, ব্যাভিচারী নির্বাচিত হয় তবু সে-ই বৈধ শাসক হিসেবে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা রাষ্ট্রদ্রোহীতা বলে গণ্য হবে। আর যদি একজন নেককার শাসক নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনোভাবে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে তবে তার কাজ-কর্ম ও নিয়মনীতি যতই উত্তম হোক তাকে অবৈধ শাসক হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তাকে পদচ্যুত করার জন্য আন্দোলন করা বৈধ হবে। দেশের মানুষ যদি গর্ভপাত, জেনা-ব্যাভিচার, সমকামিতা, মদপান ইত্যাদি অশ্লীল কাজ করার পক্ষে রায় দেয় তবে সেটা বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে। মোট কথা গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে ধর্ম-কর্ম, নীতিবাক্য ইত্যাদি কোনো কিছুর মূল্য নেই বরং নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী মানুষ যা করতে চায় তাকে তাই করার সুযোগ দেওয়ার নামই হলো গণতন্ত্র। অনেকে মনে করে, জনগনের কল্যাণ করা এবং তাদের সেবা করার নামই গণতন্ত্র। এই ধারনা সঠিক নয়। কাউকে তার খেয়াল-খুশি মতো চলতে দেওয়া অর্থ তার কল্যান করা নয়। যদি পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে নিজের ইচ্ছামত খেল-তামাশা করার সুযোগ দেয় তবে এটা উক্ত সন্তানের কল্যাণ বয়ে আনবে না বরং তাকে ধ্বংস করবে। আদর-সোহাগের পাশাপশি শাসন করা এবং খেয়াল-খুশি মতো চলার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করাই প্রকৃত কল্যাণ কামনা করা। পিতা-মাতা অপেক্ষা শাসকের দায়িত্ব অনেক বেশি। যেহেতু পিতা-মাতা বড়জোর পাঁচ সাত জন সন্তানের দেখা-শোনা করে আর একজন শাসক রাষ্ট্রের কোটি-কোটি জনতার দেখ-ভাল করেন। সাধারন মানুষের মধ্যে নানা রকম চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের লোক থাকে। যদি এই সুবৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে তাদের ইচ্ছামত চলার সুযোগ দেওয়া হয় তবে

তাতে কিরকম অনিষ্ট ও দুর্যোগের সৃষ্টি হবে তা বর্তমান সময়ের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই অনুমান করা সম্ভব হবে।

গণতন্ত্রের প্রকার প্রকৃতি ও কার্যপ্রাণালী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের পার্থক্য এবং গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা বৈধ কিনা সেসব বিষয়েও এখানে আলোচনা করবো না। [৯১] এখানে আমরা গণতন্ত্রের মধ্যে যতটুকু কুফরী চিন্তাধারা রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

সন্দেহ নেই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান রয়েছে। ব্যাক্তিগত জীবনে একজন মুসলিম যেমন ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও ইসলামী বিধি-বিধানের আনুগত্য করা প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, ইসলামের বিধি-বিধানের যে কোনো অংশ অস্বীকার করা স্পষ্ট কুফরী। যে হিসেবে গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ যেহেতু এ মতবাদ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধানের আনুগত্য স্বীকার করে না। তাছাড়া সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা-সম্মান করা এবং সকল ধর্মের মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখাও একটি কুফরী চিন্তাধারা যে বিষয়ে আমরা মানবতাবাদ সম্পর্কিত আলোচনাতে উল্লেখ করেছি। অতএব, যদি কেউ গণতন্ত্রের এই মূলনীতিটি মেনে নেয় যে, ধর্মীয় পরিচয়কে উপেক্ষা করে সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা উচিৎ এবং কোনো একটি দেশের বেশিরভাগ লোক যেধরণের শাসক ও শাসনব্যাবস্থা চায় উক্ত এলাকাতে ঐ ধরণের শাসনব্যাবস্থা থাকা উচিৎ। এ বিষয়ে ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্ম কি বলল, সেটা দেখার বিষয় নয় বরং জনমত যেদিকে রায় দেবে সেটাই মেনে চলতে হবে। যদি কোনো এলাকার বেশিরভাগ লোক ইসলামের বিপরীত বিধান চায় তবে তাদের সে অধিকার দিতে হবে। তাদের উপর ইসলামের বিধান চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত হবে। তবে এই ব্যক্তি কাফির হবে যেহেতু সে এই সকল মতবাদে বিশ্বাস করার মধ্যমে ইসলামের একাধিক সুস্পষ্ট বিধানকে অস্বীকার করছে।

এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, ইসলাম নিজেকে মহাবিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে দাবী করে। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল বিধি-বিধান ও মতবাদ বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং ইসলামের বিপরীত কোনো ধর্ম বিশ্বাস বা মতবাদকে শ্রদ্ধা করা প্রশ্নই আসতে পারে না। এটা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার মধ্যে একটি যে, মুমিন ও কাফির কখনও সমান হতে পারে না।

---

[৯১] গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়, ইসলামী গণতন্ত্রের স্বরুপ, খেলাফতের সঠিক রুপরেখা ও দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ সম্পর্কে "ভেজালে মেশাল" নামক পৃথক একটি গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আল্লাহ্ বলেন,

{أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ}

মুমিন আর অবাধ্য (কাফির) কি সমান হতে পারে! কখনও নয়। [সাজদা/১৮]

এটাও ইসলামের একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, ইসলামী বিধি-বিধান মহাবিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত একমাত্র সত্য ও সঠিক নিয়মনীতি। রাষ্ট্রীয় বা ব্যাক্তিগত যে কোনো পর্যায়ে কেবলমাত্র ইসলামী নিয়মনীতি কার্যকর করার মাধ্যমেই সফলতা পাওয়া সম্ভব। ইসলাম অন্য কোনো ধর্ম বা মতবাদকে বৈধতা দেয়া না, স্বাধীনভাবে টিকে থাকার অধিকারও দেয় না। বরং অন্য সকল ধর্মের লোকদের হয়তো সম্পূর্ণভাবে ইসলাম মেনে নিতে হবে অর্থাৎ নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে অথবা অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে আংশিকভাবে ইসলামের বিধান মেনে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদের সীমীত পরিসরে নিজের ধর্ম পালনের সুযোগ দেওয়া হবে স্বাধীন ও সম্পূর্ণভাবে নয়। পূর্বে **'জিজিয়া'** সংক্রান্ত আলোচনাতে আমরা বিস্তারিত দলিল প্রমাণ সহ এসব বিষয়ে আলোচনা করেছি। একজন ব্যক্তি যদি নিজের বাড়িতে কিছু দরিদ্র লোককে আশ্রয় দেয় তবে আশ্রিতের সংখ্যা যতই বেশি হোক উক্ত বাড়িতে বাড়ির মালিকের নির্দেশই যে পালিত হবে এটাই স্বাভাবিক। অনুরুপভাবে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক যেহেতু আল্লাহ্ তাই এখানে তারই বিধান মেনে চলতে হবে। যেসব মানুষকে তিনি নিজে হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং দয়া করা এই পৃথিবীতে বসবাস করতে দিয়েছেন তারা সকলে যদি আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচারন করতে চায় তবু তাদের মতামতদের গুরুত্ব দেওয়া হবে না বরং তাদের সকলকে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে বাধ্য করা হবে। স্রষ্টার আদেশের বিপরীতে সৃষ্টির খেয়াল-খুশির কোনোই মূল্য নেই তারা সংখ্যায় যতই হোক। মহান রাব্বুল আলামীন দ্ব্যার্থহীনভাবে বলেন, (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) "নিশ্চয় সৃষ্টি করেছেন তিনি বিধানও তার।" [আ'রাফ/৫৪]

অন্য আয়াতে এসেছে,

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ}

তিনি সৎপথ ও সত্য দ্বীন সহকারে রসুল প্রেরণ করেছেন, যাতে এই দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন যদিও কাফিররা এটা অপছন্দ করে। [তাওবা/৩৩]

সুতরাং যারা আল্লাহর দ্বীনকে অপছন্দ করে তাদের সংখ্যা যাই হোক সৃষ্টির উপর স্রষ্টার আইনই চলবে। এটাই ন্যায়সঙ্গত দাবী। ভাড়াটেদের সংখ্যা বেশি হলেই তারা বাড়ির মালিক হয়ে যায় না। একইভাবে কাফির-মুশরিক ও ইসলামের শত্রুদের সংখ্যা বেশি হলেই তাদের কার্যকলাপ বৈধ হয়ে যায় না।

ইসলামের এই সুস্পষ্ট রায়ের বিপরীতে যারা সকল ধর্ম ও মতবাদকে সমান মনে করে এবং বেশিরভাগ লোক যা বলে সেটির অনুসরণ করা উচিৎ এই চিন্তাধারাতে বিশ্বাস করে তারা আল্লাহর দ্বীনকে অস্বীকার করার কারণে কাফিরে পরিনত হয়।

বর্তমানে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা গণতন্ত্রের এই সকল কুফরী তন্ত্র-মন্ত্রকে স্বীকার করে না তবে কৌশলের দোহায় দিয়ে তারা গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের এই কর্মপন্থার ভ্রান্তি সম্পর্কে আমরা ভিন্ন স্থানে সুবিস্তারে আলোচনা করেছি। এখানে কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট্য যে, গণতন্ত্রের যেসব চিন্তাধারা ইসলামের বিপরীত সেগুলোকে যদি কেউ স্বীকার না করে তবে তাকে কাফির বলা যাবে না। ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতাতে লিপ্ত যে কাউকে কাফির বলা যাবে না যতক্ষণ না সে স্পষ্ট কোনো কুফরী কাজে লিপ্ত হয়।

এই হচ্ছে কুফরী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সময়ের প্রচলিত ও প্রশিদ্ধ কিছু মতবাদ ও চিন্তাধারা। এ ছাড়া আরও অনেক মতবাদ রয়েছে ভবিষ্যতেও নতুন-নতুন কুফরী মতবাদ সৃষ্টি হতে পারে সেগুলোর প্রত্যেকটির উপর পৃথকভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয় তার প্রয়োজনীয়তাও নেই যেহেতু উপরে বর্ণিত ঈমান ভঙ্গের মূলনীতিসমূহের আলোকে যে কোনো কুফরী মতবাদকে চিহ্নিত করা সম্ভব। ইনশা-আল্লাহ।

তৃতীয় অধ্যায়

(৪) উসুলে তাকফীর (أصول التكفير) তাকফীরের নিয়মাবলী

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা ঈমান ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে সুবিস্তারে আলোচনা করেছি। কোন ধরনের আক্বীদা-বিশ্বাস এবং কথা ও কাজ শিরক-কুফর হিসেবে গণ্য সে বিষয়ে উদাহরণসহ বর্ণনা করেছি। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, ঐ সকল কথা বা কাজে লিপ্ত হলেই একজন ব্যক্তিকে কাফির বলা যায় না বরং একজন ব্যক্তিকে কাফির হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়। এই অধ্যায়ে আমরা সেসব নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করবো। এই সব মূলনীতির ভিত্তি হলো একজন মুসলিমকে কাফির বলার পূর্বে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করা।

কোনো মুসলিমকে কাফির বলার ব্যাপারে সতর্ক করে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ

যে কেউ কাউকে কুফরী নামে ডাকে অথবা বলে আল্লাহর শত্রু অথচ উক্ত ব্যাক্তি তেমনটি নয় তবে এ কথা যে বলল, তার দিকেই ফিরে আসবে। [সহীহ মুসলিম]

পূর্বে আমরা এই হাদীসটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছি। সেখানে আমরা বলেছি, আসলে কাফির নয় এমন একজন মুসলিমকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করার বিষয়টি কয়েক রকম হতে পারে- যদি কোন মুসলিমকে কাফির বলার মাধ্যমে খোদ ইসলামকেই নিন্দা-মন্দ করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে কুফরী হিসেবে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি কাফির হবে। আর কেবলমাত্র উক্ত ব্যাক্তিকে অন্যায়ভাবে হেয় করার উদ্দেশ্যে এমন বলা হলে তা কুফরী হবে না বটে কিন্তু নিঃসন্দেহে কবীরা গোনাহ্ হবে। যেহেতু রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (سباب المسلم فسوق) মুসলিমকে গালি দেওয়া ফিসকী (পাপ কাজ)। [বুখারী ও মুসলিম]

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে কাফির বলে গালি দেওয়া সর্বাপেক্ষা বড় অপবাদ যেহেতু একজন প্রকৃত ঈমানদারের নিকট কুফরীতে লিপ্ত হওয়া আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে অধিক ঘৃণিত। তাছাড়া একজন মুসলিমকে কাফির বলার কারণে তাকে হত্যা করা আবশ্যক হয় এবং তার সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া বৈধ হয়। এভাবে একজন মুসলিমের মান-সম্মান, রক্ত-সম্পদ ইত্যাদি যাবতীয় অধিকার বিনষ্ট হয়। একারণে মুসলিম উম্মার ওলামায়ে কিরাম কোনো মুসলিমকে কাফির বলার ব্যাপারে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

কাজি ইয়াদ رحمه الله বর্ণনা করেন,

والخطا في ترك ألف كافر أهون من الخطإ في سفك محجمة من دم مسلم واحد

একজন মুসলিমের এক শিঙা পরিমাণ রক্ত ঝরানোর ব্যাপারে ভুল করার চেয়ে এক হাজার জন কাফিরকে (ভুলক্রমে মুসলিম মনে করে) ছেড়ে দেওয়া উত্তম। [আশ-শিফা]

তাকফিরের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের এই মূলনীতিটিই ওলামায়ে কিরামের নিকট সর্বস্মতিক্রমে গৃহিতী মূলনীতি। পূর্বযুগের খারেজীরা এবং বর্তমান যুগের কিছু আবেগপ্রবন যুবক এই মূলনীতিটি অগ্রাহ্য করে থাকে। তারা অন্য একটি মূলনীতির উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তা হলো, (من لم يكفر الكافر فهو كافر) "যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির মনে করে না সে কাফির"। ওলামায়ে কিরাম এই মূলনীতিটিও বর্ণনা করেছেন। আমরা কাজি ইয়াদ رحمه الله থেকে বর্ণনা করেছি তিনি বলেন,

ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم

একই কারণে আমরা কাফির বলবো যারা ইসলামের বিপরীত অন্য ধর্ম ও মতের লোকদের কাফির বলে না বা তাদের ব্যাপারে নিরাবতা অবলম্বন করে বা সন্দেহ প্রকাশ করে বা তাদের মতকে সঠিক বলে।

[আশ-শিফা]

এই মূলনীতিটি কেবল তখন প্রযোজ্য হবে যখন কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যা কুফরী হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই এবং উক্ত ব্যক্তির কোনো ওযর প্রমাণিত না হয়। সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে কাফির মনে না করার অর্থ হয় শরীয়তের স্পষ্ট বিধানকে অস্বীকার করা। একারণে উক্ত ব্যক্তিকে যে কাফির মনে করে না সেও কাফিরে পরিনত হবে। যেহেতু আল্লাহর দ্বীনের অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিধান অস্বীকার করা কুফরী যেমনটি আমরা ঈমান ভঙ্গের দ্বিতীয় মূলনীতির উপর আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছি। যেমন, ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মের লোকদের কাফির মনে না করা বা কোনো প্রকাশ্য নাস্তিককে কাফির মনে না করা ইত্যাদি। কিন্তু যে কাজ কুফরী হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত আছে বা সন্দেহ আছে উক্ত কাজে লিপ্ত মুসলিমের ব্যাপারে এই মূলনীতি প্রযোজ্য নয় বরং সেক্ষেত্রে একজন মুসলিমকে কাফির বলার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন সংক্রান্ত মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে। এই সতর্কতার দুটি পর্যায় রয়েছে।

১. যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে কাউকে তাকফীর করা হচ্ছে তা স্পষ্ট কুফরী হতে হবে। অস্পষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করে কেনো মুসলিমকে কাফির বলা যাবে না।

২. যদি কোনো মুসলিম স্পষ্ট কুফরীতের লিপ্ত হয় তবে লক্ষ্য করতে হবে সে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তাতে লিপ্ত হয়েছে নাকি তার কোনো গ্রহণযোগ্য ওযর রয়েছে। যদি এ বিষয়ে তার কোনো ওযর থাকে তবে তাকে কাফির বলা যাবে না।

৪.(ক) তাকফীরের ক্ষেত্রে সতর্কতার প্রথম পর্যায়; অস্পষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করে কাউকে তাকফীর না করা।

এই গ্রন্থের শুরুতে একজন ব্যক্তি কিভাবে মুসলিম হিসেবে গণ্য হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, কালেমা পাঠ করা, কোনো মুসলিমের ঔরসে জন্ম লাভ করা বা শৈশবে মুসলিমদের হাতে বন্দি হওয়া এই তিনটি পন্থায় একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে গণ্য হয়। এই তিনটি পন্থার প্রতিটির উপর মুসলিম উম্মার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সকল পন্থার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। এখন উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বলতে হলে অনুরুপ নিশ্চিত প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেবলমাত্র ধারনা ও সন্দেহ-সংশয়ের উপর নির্ভর করে কোনো মুসলিমের ঈমান বতিল করা যেতে পারে না।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان

তোমরা শাসকদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ো না যতক্ষণ না তারা এমন কোনো স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয় যে বিষয়ে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমান রয়েছে। [বুখারী ও মুসলিম]

এই হাদীস প্রমাণ করে সন্দেহজনক ও অস্পষ্ট বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কাউকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না।

অস্পষ্ট বিষয় বলতে আমরা তিনটি বিষয়কে বোঝাচ্ছি।

৪.ক.(১) এমন কিছু কথা ও কাজ যা কুফরীর খুবই নিকটবর্তী কিন্তু স্পষ্ট কুফরী নয়।

কিছু লোকের কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা এমন হয় যে, তার অন্তরে কুফরী থাকার ব্যাপারে প্রবল ধারনা সৃষ্টি হয়। একারণে মুসলিমরা তাকে তিরষ্কার করে এবং এড়িয়ে চলে। কিন্তু সে স্পষ্ট কোনো কুফরী কথা বা কাজে লিপ্ত না হওয়ার কারণে তাকে কফির হিসেবে আখ্যায়িত করা সম্ভব হয় না। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগের মদীনার মুনাফিকদের অবস্থা ছিল এরুপ। তাদের কার্যকলাপ এতটাই নিকৃষ্ট ছিল যে, সমগ্র মুসলিমদের নিকট তারা মুনাফিক হিসেবে পরিচিত ছিল। কা’ব ইবনে মালিক রضي الله عنه তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে মদীনাতে অবস্থান করেন। সে সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন,

أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ

সে সময় মদীনাতে নিফাকীর দোষে দুষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কাউকে আমি দেখতে পায় নি। [সহীহ বুখারী]

এতে প্রমাণিত হয় কিছু লোকের আমল-আখলাক এতটা নিকৃষ্ট ছিল যে, তারা মুসলিম সমাজে মুনাফিক হিসেবে পরিচিত ছিল। মুসলিমরা তাদের ঘৃণা করতো। কিন্তু ঐ সকল কার্যকলাপ স্পষ্ট কুফরী নয় বিধায় এই সকল লোককে কাফির বলা হয় নি। কেননা যদি এদের কাফির বলা হতো তবে ইসলামের বিধান মতে তাদের হত্যা করা আবশ্যক হতো কিন্তু তা করা হয় নি।

হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন ফিকাহ্গ্রন্থে এসেছে,

إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُهُ فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَمِيلَ إِلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ

যদি কোন একটি বিষয় বিভিন্ন দিক থেকে কুফরী বলে মনে হয় কিন্তু একটি দৃষ্টিকোন থেকে কুফরী নয় এমন মনে হয় তবে একজন মুফতীর উচিৎ কুফরী না হওয়ার ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করা।

[রদ্দে মুহ্তার, বাহরে রায়েক]

ইবনে আবেদীন রحمه الله ফাতাওয়ায়ে তাতারখানীয়া থেকে উল্লেখ করেন, (لا يكفر بالمحتمل) যে বিষয়ের

দু'রকম ব্যাখ্যা হয় এমন বিষয়ের উপর নির্ভর করে কাউকে তাকফীর করা যাবে না। [রদ্দে মুহতার]

এধরণের অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যাস্বাপেক্ষ বিষয়ের উপর নির্ভর করে কোনো মুসলিমকে কাফির না বলার ব্যাপারটি ওলামায়ে কিরামের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মূলনীতি। তারা এধরনের কার্যকলাপ সম্পর্কে (يخشي عليه الكفر) “কুফরীর আশঙ্কা আছে” এমন মন্তব্য করেন। কিন্তু স্পষ্টভাষায় কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করেন না। কুফরী কার্যকলাপ সম্পর্কিত আলোচনাতে তারা এই ধরণের কথা-বার্তা সম্পর্কে পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।

৪.ক.(২) মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর নির্ভর করে কাউকে কাফির না বলা।

অস্পষ্ট বিষয়াবলীর মধ্যে ঐ সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত যেসব বিষয় কুফরী হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। উপরে আমরা এই সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যেমন, সলাত ত্যাগ করা, জাদু করা ইত্যাদি কাজ কুফরী কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। এই সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর নির্ভর করে কাউকে কাফির বলা যায় না।

জাদুকরকে কাফির না বলা এবং তাকে হত্যা না করা সম্পর্কিত মতটি উল্লেখের পর ইমাম কুরতুবী ﵀ বলেন,

وهذا صحيح، ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف

এটাই সঠিক কেননা মুসলিমদের রক্ত সুরক্ষিত। নিশ্চিত কারণ ছাড়া তা ঝরানো যাবে না আর যে বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে সে বিষয় নিশ্চিত বিষয় বলে গণ্য হতে পারে না। [তাফসীরে কুরতুবী]

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ ইবনে আবেদিন ﵀ বলেন,

إِذْ لَا يُفْتَى بِكُفْرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ أَوْ فِعْلِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ خِلَافٌ

কোনো মুসলিমকে কাফির হিসেবে ফতোয়া দেওয়া হবে না যদি তার কথা বা কাজকে ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় অথবা সে যা করেছে সেটা কুফরী কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত থাকে। [রদ্দুল মুহ্তার]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ﵀ বলেন,

ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان

আমরা কেবল সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই কাউকে কাফির বলব যে বিষয়ে সমস্ত আলেম একমত হয়েছেন আর তা হলো কালেমার সাক্ষ্য দেওয়া। [আদ দুরার আস সানিয়্যা]

সুতরাং যেসব বিষয় কুফরী হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ওলামায়ে কিরামের মাঝে দ্বিমত আছে সেসব বিষয়ে সঠিক মত কোনটি সেটা নির্ণয় করতে হবে কিন্তু সেগুলোর উপর নির্ভর করে কাউকে কাফির ঘোষণা করা উচিৎ নয়। যেহেতু সেগুলে অস্পষ্ট বিষয় হিসেবে গণ্য।

৪.ক.(৩) কারো কথার ব্যাখ্যা করলে যে অর্থ দাড়ায় তা উক্ত ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করা যাবে না।

কারো কথার উপর সুক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে যে ফলাফল দাড়ায় সেটাকে বলা হয়- 'লাঝিমুল মাজহাব' (لازم المذهب) অর্থাৎ ''কথার অনিবার্য ফলাফল''। তাকফীরের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কিরামের নিকট গৃহীত মূলনীতি হলো, (لازم المذهب ليس بمذهب) ''কোনো একজন ব্যক্তির কথা বিশ্লেষণ করলে যে ফলাফল দাড়ায় তা উক্ত ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।''

শাফেঈ মাজহাবের ফকীহ্ ইবনে হাযার আল-হাইতামী ﷺ তার আল-ই'লাম বিকওয়াতিইল ইসলাম নামক কিতাবে বলেন,

أن الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب لأن القائل بالملزوم قد لا يخطر له القول بلازمه

সঠিক মত হলো, কারো কথার ব্যাখ্যা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না যেহেতু এমন হতে পারে যে উক্ত ব্যক্তি ঐ কথা বলার সময় সেটার যে এমন ব্যাখ্যা হতে পারে তা চিন্তাই করে নি।

হানাফী মাযহাবের ফকীহ্ ইবনে আবেদীন ﷺ বলেন,

وَإِنْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِكُفْرِ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ عِنْدَ الْبَحْثِ مَعَهُمْ فِي رَدِّ مَذْهَبِهِمْ بِأَنَّهُ كُفْرٌ أَيْ يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ بِكَذَا الْكُفْرُ ، وَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ كُفْرَهُمْ ؛ لِأَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبِهِمْ

যদি কখনও আলোচনার সময় মু'তাজিলা বা এই ধরণের বিভ্রান্ত আক্বীদার লোকদের মতামত খন্ডায়নের জন্য স্পষ্টভাবে কুফরীর অভিযোগ উত্থাপন করে বলা হয়, তাদের অমুক কথার ব্যাখ্যা করলে কুফরী প্রমাণিত হয় তবে এর অর্থ তারা কাফির এমন নয়। কেননা একজন ব্যক্তির কথার ব্যাখ্যা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। [রদ্দুল মুহ্তার]

মোল্লাহ্ আলী কারী ইবনে হাযার আল-মাক্কী থেকে উল্লেখ করেন,

بل الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف أنا لا نكفر أهل البدع والأهواء إلا أن أتوا بمكفر صريح لا استلزامي لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بلازم

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরামের মত হলো, বিদয়াতী ফিরকাসমূহকে কাফির না বলা যতক্ষণ না তারা স্পষ্ট কোনো কুফরীতে লিপ্ত হয়। তাদের কথা-বার্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কুফরী প্রমাণিত হলে যথেষ্ট হবে না। যেহেতু সঠিক মতে কারো কথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্গত ফলাফল

তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। [আল-মিরকাত]

মালেকী মাযহাবের বিভিন্ন ফিকাহ্ গ্রন্থেও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অনেক সময় একজন ব্যক্তি এমন কোন কথা বলে যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে কুফরী পর্যন্ত পৌছায়। উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে প্রমাণিত হয়, এধরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে কাউকে কাফির বলা যাবে না।

উদাহরণস্বরুপ, কারো উপর বিপদ-আপদ আপতিত হলে, অনেক সময় গ্রাম্য লোকেরা বলে, সে এটার যোগ্য নয় বা এটা সহ্য করার মতো নয়। এ সম্পর্কে মালেকী মাজহাবের ফিকাহ্গ্রন্থ আল-ফাওয়াকিহ্ আদ-দাওয়ানীতে বলা হয়েছে।

لَوْلَا الْقَوْلُ بِأَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ لَكَانَ قَائِلُ ذَلِكَ يَكْفُرُ لِاسْتِحَالَةِ الْجَوْرِ فِي حَقِّه

যদি কারো কথার ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল তার কথা হিসেবে গণ্য নয় এমন না হতো তবে এধরণের কথা কুফরী হিসেবে গণ্য হতো যেহেতু আল্লাহর পক্ষে জুলুম করা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ বিপদ-আপদে পতিত ব্যাক্তির ব্যাপারে- "সে এটার যোগ্য নয়" এমন মন্তব্য করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাকে বিপদে পতিত করে অযোগ্য ও অযৌক্তিক কাজ করেছেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি সরাসরি এমন মন্তব্য করে নি বরং সে যা বলেছে তার ব্যাখ্যায় এমন ফলাফল দাড়ায়। ওলামায়ে কিরামের নিকট গৃহীত সিদ্ধান্ত হলো, কারো কথার ফলাফল তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। একারণে এই ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না তা না হলে তাকে কাফির বলা হতো। উপরে উল্লেখিত উদ্ধৃতিটির অর্থ এটাই।

একটি আয়াতে আল্লাহ্ ﷻ বলেন, (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) "প্রতিটি জাতির মধ্যে রসুল প্রেরণ করা হয়েছে।" [ফাতির/২৪]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ}

পৃথিবীতে যত পশু-পাখি আছে তারা প্রত্যেকেই তোমাদের মতোই এককেটি জাতি।

[আনয়াম/৩৮]

এই দুটি আয়াতের উপর নির্ভর করে একদল লোক দাবী করতো প্রতিটি প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে রসুল আগমন করেছেন। মালেকী মাজহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ কাজি ইয়াদ رحمه الله এই সকল লোকদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যেহেতু তাদের কথার অর্থ হয়, কুকুর, বানর, শুকর ইত্যাদি সকল জন্তু-

জানোয়ারের মধ্যে রসুল আগমন করেছেন [নাউযু বিল্লাহ্] এভাবে রিসালাতের মর্যাদাকে ছোট করা হয়। [আশ-শিফা]

কাজি ইয়াদের এই মন্তব্যটি উল্লেখ করার পর মালেকী মাযহাবের ফিকাহ্ গ্রন্থ মুখতাসারুল খলীলের ব্যাখ্যা মানহুল জালীলে বলা হয়েছে,

إِلَّا أَنَّهُ تَقَرَّرَ أَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ غَيْرُ الْبَيِّنِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ

তবে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে কারো কথার সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত আক্বীদার মাধ্যমে যদিও নবী-রাসুলদের অসম্মান করা হয় কিন্তু উক্ত আক্বীদার লোকেরা সরসরি এটা করে না বরং তাদের মতামতের উপর চিন্তা-গবেষণা করলে এই ফলাফল দাড়ায়। কিন্তু উক্ত আক্বীদার লোকেরা নবী-রাসুলদের অসম্মান করার উদ্দেশ্যেই এমন বলে কিনা সেটা নিশ্চিত নয়। একারণে এই ফলাফল তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

কারো কথার ব্যাখ্যা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না এই মূলনীতিটির অর্থ এটাই। এর মাধ্যমে আমরা সেই সকল লোকদের সতর্ক করে দিতে চাই যারা মানুষের কথা-বার্তা ও কার্যক্রমকে চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে শিরক-কুফরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কোথাও একই সমান্তরালে আল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ লেখা থাকলে তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়। তারা বলে, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রাসুলকে সমান মনে করা হয়। অথচ যেসব মুসলিমরা এমন লেখে তারা কখনও আল্লাহ্ ও রাসূলকে সমান মনে করে না। সামান্য চিন্তা করলেই এই বাস্তবতা অনুধাবন করা সম্ভব। তাছাড়া স্বয়ং রাব্বুল আলামীন বলেন,

{وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ}

আল্লাহ্ এবং রসুল বেশি যোগ্য যে, তারা তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করবে। [তাওবা/৬২]

এই আয়াতে আল্লাহ্ ও রাসুলকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উভয়ের সন্তুষ্টি অর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এখানে দ্বিবচনের সর্বনাম ব্যাবহার না করে একবচনের সর্বনাম ব্যাবহার করা হয়েছে। এখানে দ্বিবচনের পরিবর্তে একবচন ব্যবহার করার কারণ সম্পর্কে তাফসীরকারকরা দুটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন, এক. রাসুলের সন্তুষ্টিই যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি তাই দুটি বিষয়কে একীভূত করে বর্ণনা করা হয়েছে। দুই. এখানে মূলত রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর সন্তুষ্টি অর্জনই উদ্দেশ্য কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য পথমে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। [কুরতুবী, বায়দাবী ও অন্যান্য]

ঘটনা যাই হোক এই আয়াতে আল্লাহ্ ও রাসুলকে একত্রে উল্লেখ করা এবং উভয়ের সন্তুষ্টি অর্জন করার নির্দেশ দেওয়া আল্লাহ্ ও রাসুলের নাম একত্রে লেখার বিষয়টিকে যারা শিরক-কুফর মনে করে তাদের বোকামীর স্বপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ভারত উপমহাদেশের আলেমরা ওয়াজের মাহ্ফিলে বা বক্তব্যের শুরুতে বালাগাল উলা বিকামালিহি .... পাঠ করে থাকে। কিছু অজ্ঞ লোক মনে করে এই কবিতাটির অর্থ- রাসুলুল্লাহ্ ﷺ নিজ যোগ্যতায় সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছেন। একারণে তারা এই কবিতাটিকে একটি শিরকী কবিতা মনে করে। এ বিষয়ে তারা ভুল বুঝেছে। এরচেয়েও বড় সমস্যা হলো, তারা এই ভুল ব্যাখ্যা অন্য সবার উপর চাপিয়ে দেওয়া চেষ্টা করে। যে কেউ বালাগাল উলা পাঠ করে তারা তাদের কাফির-মুশরিক বা কমপক্ষে বিদয়াতী প্রমাণের চেষ্টা করে। বালাগাল উলা যারা পাঠ করে তাদের কাছে এর অর্থ কি সেটা বুঝার চেষ্টা করে না। এভাবে তারা একইসাথে আরবী ভাষা ও দ্বীনের মুলনীতি উভয় ক্ষেত্রে অজ্ঞতার প্রমান পেশ করে। এই কবিতাটির কোথাও নিজ যোগ্যতা বা নিজ প্রচেষ্টার কথা বলা হয় নি। এখানে বলা হয়েছে কামাল (كمال) বা পরিপূর্ণতার কথা। অতএব, বাক্যটির অর্থ হলো, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উপনিত হয়েছেন। আর সন্দেহ নেই যে, জ্ঞান-বিদ্যা, সম্মান-মর্যাদা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সকল দিক হতে রাসসুলুল্লাহ্ ﷺ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণ ছিলেন। সুতরাং এই চরণটিকে শিরকী বাক্য মনে করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পরিপূর্ণতা অস্বীকার করাই মূলত কুফরী হিসেবে গণ্য।

মোট কথা, কোনো মুসলিমকে কেবল তখন কাফির বলা যাবে যখন সে স্পষ্টভাবে কুফরী কথা বলে বা কুফরী কাজে লিপ্ত হয়। কারো কথা-বার্তা ও কার্যকলাপের উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তাকে কাফির প্রমাণ করা যাবে না। এটি ওলামায়ে কিরামের নিকট একটি গ্রহণযোগ্য মূলনীতি। অনেকে অবশ্য এই মূলনীতিটি অপব্যবহার করে থাকে। কোনো একটি কথা বা কাজের সুস্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ অর্থগুলোকে অস্পষ্ট ব্যাখ্যার মধ্যে গণ্য করে নাস্তিক-মুরতাদদের বাঁচানোর চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরুপ যদি কেউ বলে ইসলামী আইন হলো মধ্যযুগীয় আইন। কেউ কেউ এই ব্যক্তিকে কাফির বলতে চান না যেহেতু সে সরাসরি ইসলামী আইনকে স্পষ্টভাবে নিন্দা করেনি বরং মধ্যযুগীয় হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। এই চিন্তাধারা সঠিক নয়। যেহেতু এখানে কমপক্ষে এতটুকু স্পষ্ট যে, ‘‘মধ্যযুগীয়’’ শব্দটি অপছন্দ, অগ্রহণযোগ্য, অযোগ্য ইত্যাদি অর্থে ব্যাবহৃত হয়। সুতরাং উপরোক্ত মূলনীতি এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। যেহেতু এখানে সে যা বলেছে তা স্পষ্ট ভাবেই কুফরী অর্থ বহন করে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বা অস্পষ্ট অর্থে নয়। কোনো ব্যক্তির কথার ব্যাখ্যা তার উপর প্রয়োগ করা যাবে না এটা কেবল সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন ব্যাখ্যাটি অস্পষ্ট হওয়ার কারণে এমন সম্ভাবনা থাকে যে, তার কথার অর্থ এমন হতে পারে তা

উক্ত ব্যক্তি ভাবে নি। কিন্তু যে কথা বা কাজ স্পষ্ট কুফরী প্রমাণ করে সেক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনা থাকে না তাই বিষয়টি কুফরী বলেই গণ্য হবে। অর্থাৎ কাউকে কাফির বলার ক্ষেত্রে তার কথার স্পষ্ট ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা হবে অস্পষ্ট ব্যাখ্যার উপর নয়। একারণে মুহাক্কিক ওলামায়ে কিরাম কারো কথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) স্পষ্ট ফলাফল- اللازم البين (২) অস্পষ্ট ফলাফল- اللازم الخفي

তারা কারো কথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর নির্ভর করে কাফির বলা বৈধ মনে করেন যদি ফলাফলটি সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট হয় আর যদি ফলাফলটি অস্পষ্ট হয় তবে সেক্ষেত্রে কারো কথার ব্যাখ্যা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না এই মূলনীতি প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ তার উপর নির্ভর করে কাউকে কাফির বলা যাবে না।

উদাহরণস্বরুপ আলেমরা বলেছেন আবু বকর ﵁ যে সাহাবী ছিলেন সেটা অস্বীকার করা কুফরী। যেহেতু আল্লাহ্ ﷻ পবিত্র কুরআনের ভিতর বলেছেন, (إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) "যখন তারা দু'জন গুহাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, যখন তিনি তার সাথীকে বললেন, তুমি চিন্তা করো না। আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। [তাওবা/৪০]

মোল্লাহ্ আলী ক্বারী ﵀ বলেন,

أجمع المفسرون على أن المراد بصاحبه في الآية هو أبو بكر وقد قالوا من أنكر صحبة أبي بكر كفر لأنه أنكر النص الجلي بخلاف إنكار صحبة غيره من عمر أو عثمان أو علي رضوان الله عليهم أجمعين

তাফসীরকারকরা ইজমা করেছেন যে, এই আয়াতে সাথী বলতে হযরত আবু বকর ﵁ কে বোঝানো হয়েছে। আলেমরা বলেছেন, যে ব্যক্তি আবু বকর ﵁ এর সাহাবী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে সে কাফির। যেহেতু সে এর মাধ্যমে স্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করে [মিরকাত]

এখন যদি কেউ আবু বকর ﵁ এর অস্তিত্বই অস্বীকার করে তবে উপরোক্ত মতামতের আলোকে সে কাফিরে পরিনত হয় যেহেতু আবু বকর ﵁ এর অস্তিত্ব অস্বীকার করার স্পষ্ট অর্থ হলো, তার সাহাবী হওয়ার বিষয়টিও অস্বীকার করা। তবে কেউ কেউ এ বিষয়ে উপরোক্ত মূলনীতিটি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। তারা বলেছেন, যেহেতু এই ব্যক্তি সরাসরি আবু বকর ﵁ এর সাহাবী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেনি তাই তাকে কাফির বলা যাবে না। যদিও আবু বকর ﵁ এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা অর্থ তার সাহাবী হওয়ার বিষয়টিকেও অস্বীকার করা। কিন্তু কারো কথার ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে কাউকে কাফির

বলা যাবে না। তাই এই ব্যক্তিকেও কাফির বলা হবে না। এদের মতামত খন্ডায়ন করে মালেকী মাযহাবের ফকীহ্ আদ-দুসুকী ﷺ বলেন,

وَالْحَقُّ أَنَّ إِنْكَارَ وُجُودِ أَبِي بَكْرٍ رِدَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إِنْكَارِ وُجُودِهِ إِنْكَارُ صُحْبَتِهِ لُزُومًا بَيِّنًا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ قَوْلَهُمْ لَازِمُ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ فِي اللَّازِمِ غَيْرُ الْبَيِّنِ

সত্য কথা হলো, আবু বকর ﷺ এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা কুফরী। কেননা এর স্পষ্ট অর্থ হলো তার সাহাবী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা আর পূর্বে বলা হয়েছে যে, ‘‘কারো কথার ব্যাখ্যা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না’’ ওলামায়ে কিরামের এই কথাটি অস্পষ্ট ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

[হাশিয়াতু শারহে কাবীর]

সুতরাং যখন কেউ এমন কোনো কথা বলে যা স্পষ্টভাবে কুফরী অর্থ বহন করে তবে তার ক্ষেত্রে উপরোক্ত মূলনীতি প্রয়োগ করা যাবে না এবং তাকে ওযর প্রাপ্ত বলে মনে করা হবে না। যেহেতু এক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট যে, উক্ত ব্যক্তি তার কথার অর্থ সম্পর্কে অবগত ছিল।

তাকফীরের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের প্রথম পর্যায় তথা অস্পষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করে কাউকে তাকফীর না করা সম্পর্কে আলোচনা এখানেই শেষ করতে চাই। এখন আমরা তাকফীরের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের সতর্কতা সম্পর্কে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

৪.(খ) স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার পরও গ্রহণযোগ্য ওযর থাকলে কাউকে কাফির না বলা।

উপরে আমরা দেখেছি, অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়াবলীর উপর নির্ভর করে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা যাবে না যতক্ষণ না সে এমন কোনো কুফরীতে লিপ্ত হয় যা সুস্পষ্ট এবং সর্বসম্মত। এখন আমরা দেখবো এমন কি এধরণের সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তিও বিভিন্ন কারণে ওযরপ্রাপ্ত বলে গণ্য হতে পারে। ফলে তাকে কাফির বলা যায় না। কোনো একটি কাজকে কুফরী হিসেবে আখ্যায়িত করার অর্থ কখনও এই নয় যে, উক্ত কাজে লিপ্ত প্রতিটি ব্যাক্তি কাফির বরং লক্ষ্য করতে হবে উক্ত ব্যক্তির কোনো গ্রহণযোগ্য ওযর আছে কিনা যে কারণে তাকে কাফির বলা অবৈধ হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন,

كُلَّمَا رَأَوْهُمْ قَالُوا : مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ اعْتَقَدَ الْمُسْتَمِعُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ شَامِلٌ لِكُلِّ مَنْ قَالَهُ وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا أَنَّ التَّكْفِيرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ قَدْ تَنْتَفِي فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ

কোনো একটি ব্যাপারে আলেমরা যখন বলেন, এটা যে বলে (বা করে) সে কাফির এ থেকে কেউ কেউ মনে করে ঐ কাজে লিপ্ত প্রতিটি ব্যক্তি কাফির। তারা এটা চিন্তা করেনি যে, কোনো একজন নির্দিষ্ট

ব্যক্তিকে কাফির বলার বেশ কিছু নিয়মনীতি ও বাধা-বিঘ্ন রয়েছে কখনও কখনও তা (কুফরী কাজে লিপ্ত হওয়ার পরও) নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তিকে কাফির বলার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়ায়। সাধারনভাবে “যে কেউ এ কাজ করে সে কাফির” এমন বলা আর নাম ধরে কাউকে কাফির বলা একই বিষয় নয়।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

এ অনুচ্ছেদে আমরা সেসব ওযর সম্পর্কে আলোচনা করবো যেগুলোর কারণে স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার পরও একজন ব্যক্তিকে কাফির বলা যায় না। যেমন, ঘুমের ঘোরে বা ভুলক্রমে হঠাৎ মুখে কুফরী কথা উচ্চারিত হওয়া, অন্য কারো কুফরী কথা বর্ণনা করা, মস্তিস্ক বিকারগ্রস্ত হওয়া তথা পাগল হওয়ার পর কুফরী কথা উচ্চারণ করা, কোনো আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে ব্যার্থ হওয়ার কারণে ভুল ব্যাখ্যা বা তা'বিল করে কোনো কিছু অস্বীকার করা, বাধ্য হয়ে কুফরী করা, কোনো প্রভাবশালী শত্রুকে খতম করার জন্য কুফরী কথাকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা ইত্যাদি। এই সকল বিষয়কে তাকফীরের ক্ষেত্রে ওযর হিসেবে গণ্য করার স্বপক্ষে কুরআন হাদীসের স্পষ্ট দলিল-প্রমান এবং ওলামায়ে দ্বীনের মতামত রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই সকল বিষয় মূলত দুটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আর তা হলো,

ক. জাহালাত (جهالة) তথা অজ্ঞতার কারণে না জেনে কুফরী কথা উচ্চারণ করা।

খ. ইকরাহ্ (إكراه) তথা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে কুফরী কথা উচ্চারণ করা।

মোট কথা, একজন ব্যক্তি কেবল তখন কাফির হবে যখন সে স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে কুফরীতে লিপ্ত হবে। না জেনে বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুলক্রমে বা বাধ্য হয়ে মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করলে কেউ কাফির হবে না।

ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন,

فإن الردة إنما تصح من كل بالغ عاقل مختار

প্রাপ্ত বয়স্ক, বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কুফরী কথা বললে কাফিরে পরিনত হবে।

[আল-মাজমু]

না-বালেগ ও বোধহীন তথা পাগল অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে। ঘুমের মধ্যে বা বেহুশ অবস্থায় কুফরী কথা উচ্চারণ করার বিষয়টিও অনিচ্ছাকৃত বা অজ্ঞতাপ্রসূত। কোনো শত্রুর হাত হতে নিজেকে বা অন্যান্য মুসলিমকে রক্ষা করার জন্য কৌশল হিসেবে কুফরী কথা উচ্চারণ করা বাধ্য হয়ে কুফরী বলা হিসেবে

গণ্য। একারণে এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কাফির হবে না।

অন্য কারো কুফরী কথা বর্ণনা করা আদৌ কুফরী করা বা কুফরীতে লিপ্ত হওয়া বলে গণ্য নয় সুতরাং সেটা এসব আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। যে কুফরীই করে নি তাকে কাফির বলার প্রশ্ন আসতে পারে না ফলে তার ওযর সম্পর্কে আলোচনার করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

এই বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বলা যায় তাকফীরে ক্ষেত্রে যেসব ওযরের কথা বলা হয়েছে তার সবই উপরোক্ত দুটি মূলনীতির সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং ঐ দুটি মূলনীতির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হলে তাকফীরের ক্ষেত্রে যাবতীয় ওযর ও বাধা-বিপত্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব। নিচে আমরা এই দুটি মূলনীতির উপর পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপণ করবো ইনশাআল্লাহ্।

৪.খ.(১) জাহালাত (جهالة) বা অজ্ঞতা।

আল্লাহ্ ﷻ বলেন, (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) "আমি রসুল প্রেরণ করার আগে কাউকে শাস্তি প্রদান করি না।" [ইসরা/১৫] অর্থাৎ রসুল প্রেরণ করে সত্য সম্পর্কে অবহিত করার পূর্বে কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় না। যার নিকট যে বিষয়ের জ্ঞান পৌছায়নি তাকে সে বিষয়ে অপরাধী করা হবে না। (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) "আল্লাহ্ একজন মানুষের সাধ্যের বাইরে কিছুই তার উপর চাপিয়ে দেবেন না।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}

{ আপনি বলুন, আমার উপর এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যাতে আমি ভয়প্রদর্শন করি তোমাদের (আমার সমসাময়িক লোকদের) এবং (কিয়ামত পর্যন্ত) যে কারো নিকট এ কুরআনের আহ্বান পৌছাবে তাদের। } [আনয়াম/১৯]

এই আয়াত একদিকে যেমন প্রমাণ করে কিয়ামত পর্যন্ত যে কারো নিকট কুরআনের আহ্বান পৌছাবে তার উপর ঈমান আনা ওয়াজিব হবে বিপরীত দিকে এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, যার নিকট এ আহ্বান পৌছাবে না তাকে পাকড়াও করা হবে না [বায়দাবী]।

অন্য একটি হাদীসে অনুরুপ কথা বলা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به

إلا كان من أصحاب النار

যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ সেই সত্ত্বার কসম এই উম্মাতের যে কেউ -সে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান যাই হোক আমার কথা শোনার পরও আমি যা নিয়ে এসেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপণ না করেই মৃত্যুবরণ করে সে জাহান্নামী হবে। [মুসলিম]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

وَفِي مَفْهُومِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَهَذَا جَارٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْأُصُولِ أَنَّهُ لَا حُكْمَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

এই হাদীস হতে বোঝা যায় যার নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌছায় নি সে ওযরপ্রাপ্ত। এটা পূর্বে বর্ণিত মুলনীতির উপর নির্ভর করে যে, শরীয়ত আসার পূর্বে কোনো বিধি-বিধান প্রযোজ্য হয় না। এটিই অধিক সঠিক মত আর আল্লাহই ভাল জানেন। [শারহে মুসলিম]

এই সকল দলীল-প্রমাণের কারণে সাধারনভাবে বেশিরভাগ আলেম অজ্ঞতাকে ওযর হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে বিষয়টির কিছু নির্দিষ্ট নিয়মনীতি ও সীমা-রেখা রয়েছে। উক্ত সীমারেখার বাইরে অজ্ঞতা ওযর হিসেবে গণ্য হবে না। নিচের আলোচনাতে আমরা অজ্ঞতাকে ওযর হিসেবে গণ্য করার মূলনীতিসমূহ তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ্।

⇒ তাওহীদ ও রেসালাতের উপর যে বিশ্বাস স্থাপণ করে নি সে অজ্ঞ হলেও দুনিয়ার বিধানে কাফির হিসেবে গণ্য হবে।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমরা একজন ব্যক্তি কিভাবে মুসলিম হিসেবে গণ্য হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি, একজন প্রাপ্ত বয়ষ্ক পুরুষ বা নারী কেবলমাত্র তখন মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে যখন সে তাওহীদ ও রেসালাতের স্বীকৃতি দেবে। না-বালেগ শিশুরা জন্মসূত্রে বা মুসলিমদের হতে যুদ্ধে বন্দি হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু বালেগ হওয়ার পর যদি যারা তাওহীদ ও রেসালাতের স্বীকৃতি হতে সরে আসে তবে তারা কাফির হিসেবে গণ্য হবে। অতএব, সাধারনভাবে বলা যায় তাওহীদ ও রেসালাতের স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِى وَبِمَا جِئْتُ بِهِ

আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আর আমার উপর ও আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

[সহীহ মুসলিম]

মুখে কি বাক্য উচ্চারণ করলে একজন ব্যক্তি মুসলিম হবে সে ব্যাপারে আলেমদের কিছু দ্বিমত রয়েছে কিন্তু মুসলিম হতে হলে আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর রেসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপণ করতে হবে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ববাদ এবং রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য দ্বীন আনয়ন করেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না সে মুসলিম নয়। যদি এই ব্যক্তি পৃথিবীর কোনো সুদূর প্রান্তে অবস্থান করার কারণে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর আগমন সম্পর্কে জানতে না পারে তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সাথে কি আচরণ করবেন সে সম্পর্কে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে। কেউ কেউ বলেছেন সে মুক্তি পাবে যেহেতু আল্লাহ্ ﷻ বলেন, (وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا) "রাসুল প্রেরণ না করে আমি কাউকে শাস্তি দিই না।" অন্য আরেকদল আলেম বলেছেন, কমপক্ষে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপণ করতে হবে যেহেতু আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল পর্যবেক্ষণ করে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে ধারনা পাওয়া সম্ভব। অন্য আরেকদল আলেম বলেছেন, আল্লাহ্ ﷻ কিয়ামতের দিন তাদের পরীক্ষা নেবেন। সেই পরীক্ষায় যারা সফল হবে তারা মুক্তি পাবে আর যারা ব্যার্থ হবে তারা ধ্বংস হবে। এই সকল মতামতের প্রতিটির স্বপক্ষে বেশ কিছু আলেমের সমর্থন রয়েছে তারা নিজেদের মতের স্বপক্ষে কুরআন-হাদীস হতে বিভিন্ন দলিল প্রমাণ পেশ করেছেন। এই গ্রন্থে আমরা এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতে চাই না যেহেতু বিষয়টি আখিরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট, দুনিয়ার বিধানের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো, যার নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌছায় নি দুনিয়াতে তাকে কাফির হিসেবেই গণ্য করা হবে। জানাযার সলাত, মিরাছ, বিবাহ, পশু যবেহ করা ইত্যাদি যাবতীয় বিধি-বিধানে উক্ত ব্যক্তি কাফির হিসেবেই গণ্য হবে। যদি ধরে নেওয়া হয় পৃথিবীতে এমন একটি এলাকা রয়েছে যেখানে ইসলামের দাওয়ার পৌছায়নি। উক্ত এলাকা থেকে একজন ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার আত্মীয়-স্বজনকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সে কিছু মুসলিমকে সাথে নিয়ে নিজ এলাকায় ফিরে যায়। সেখানে পৌছানোর পর দেখা গেল উক্ত ব্যক্তির বাবা মৃত্যুবরণ করেছে। এখন বিধান হলো, ঐ ব্যক্তির জানাযার সলাত পড়া যাবে না এবং এই মুসলিম সন্তানটি তার পিতার সম্পত্তিতে অংশ পাবে না। এভাবে দুনিয়ার যাবতীয় বিধানে ঐ সকল লোকদের কাফির হিসেবে গণ্য করা হবে এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। পূর্বে কাফিরদের সন্তানকে দুনিয়ার বিধানে কাফির হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে।

রসুলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের সন্তান সম্পর্কে বলেন, (هم منهم) "ওরা ওদের মধ্যেই অন্তভূর্ক্ত"। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে (هم من آباءهم)"তারা তাদের পিতাদের সাথেই"। [মুত্তাফাকুন আলাইহি]

ইমাম নাব্বী ﷀ হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেন,

لِأَنَّ أَحْكَامَ آبَائِهِمْ جَارِيَةٌ عَلَيْهِمْ فِي الْمِيرَاثِ وَفِي النِّكَاحِ وَفِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

উত্তরাধিকার, বিবাহ, কিসাস, রক্তমূল্য ইত্যাদি ব্যপারে তাদের পিতাদের বিধান অনুসারের তাদের বিবেচনা করা হবে। [শারহে মুসলিম]

কাফিরদের সন্তানদের কাফির হিসেবে গণ্য করার বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ইসলাম গ্রহন করেনি এমন প্রতিটি ব্যক্তিকে দুনিয়ার বিধানে কাফির হিসেবে গণ্য করা হবে যদিও তার নিকট ইসলামের দাওয়াত না পৌছিয়ে থাকে। যখন পিতা-মাতার কুফরীর কারণে ছোট শিশুদের দুনিয়ার বিধানে কফির হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে তখন যারা নিজেরাই কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে অজ্ঞতার ওযর থাকলেও তারা দুনিয়ার বিধানে কাফির হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক। একারণে সকল ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। আখিরাতের বিধানে তাদের সাথে কিরুপ আচরণ করা হবে সে বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও দুনিয়ার বিধানে তাদের কাফির হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। ব্যাতিক্রম কেবল এতটুকু যে, যার নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌছায়নি তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দেওয়ার পূর্বে হত্যা করা যাবে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সে কাফির নয়। যেহেতু কাফির হওয়া সত্ত্বেও অনেককে হত্যা করা নিষিদ্ধ হয় যেমন, কাফির নারী ও শিশুরা এবং জিম্মী কাফিররা। এই সকল শ্রেণীর লোকেরা কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাদের হত্যা করা নিষেধ। তবে কোনো মুসলিম যদি এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এদের কাউকে হত্যা করলে কিসাস হিসেবে উক্ত মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। যেহেতু রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (لا يقتل مسلم بكافر) "কোনো মুসলিমকে কোনো কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।" [সহীহ বুখারী]

যার নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌছায় নি এমন কাফিরের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হলেও যদি কোনো মুসলিম তাকে হত্যা করে তবে সে অপরাধী হবে কিন্তু কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা যাবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ ﷀ সিয়ারে কাবীরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দা'ওয়াত পাওয়ার পূর্বেই কোনো কাফিরকে হত্যা করা হলে তার বিধান সম্পর্কে তিনি বলেন,

ثُمَّ لَا يَجِبُ ضَمَانُ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ عِنْدَنَا

তাদের মধ্যে যে কাউকে হত্যা করা হলে আমাদের মতে তার রক্তপণ প্রদান করা হবে না।

[সিয়ারে কাবীর]

এরপর তিনি ইমাম শাফেঈ থেকে উল্লেখ করেন, তিনি তার রক্তমূল্য প্রদান করার মত প্রদান করেছেন। মোট কথা উক্ত ব্যক্তির রক্তমূল্য আদায় করতে হবে কিনা সে বিষয়ে আলেমরা দ্বিমত করেছেন কিন্তু তারা কেউই এখানে কিসাস তথা হত্যার বিনিময়ে হত্যার কথা বলেন নি।

শাফেঈ মাজহাবের বিভিন্ন ফিকাহ্ গ্রন্থে কাফিরের বিনিময়ে মুসলিমকে হত্যা করা হবে না এ সম্পর্কিত আলোচনাতে বলা হয়েছে,

يَعْنِي بِهِ غَيْرَ الْمُسْلِمِ لِيَشْمَلَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَإِنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ كَالْمُسْلِمِ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ كَهُوَ فِي الدُّنْيَا

এখানে কাফির বলতে উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম ছাড়া যে কেউ এমন কি যার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছায় নি সেও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। কেননা যদিও সে আখিরাতের বিধানে মুসলিমের মতো (মুক্তি পাবে) কিন্তু দুনিয়ার বিধানে তেমন নয়। [তুহ্ফাতুল মুহ্তাজ ও অন্যান্য]

ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

قد يحكم بالفوز في الآخرة وإن لم يحكم بأحكام الإسلام في الدنيا كمن لم تبلغه الدعوة

অনেক সময় এমন হয় যে, কোনো ব্যক্তি আখিরাতে মুক্তি পাবে এমন বলা হচ্ছে কিন্তু দুনিয়ার বিধানে তাকে মুসলিম বলে গণ্য করা হবে না। যার নিকট দাওয়াত পৌছায়নি তার বিষয়টি এমন।

[রওদাতুত তালেবীন]

হাম্বালী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ ইবনে কুদামা ﵀ বলেন,

وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ مِنْ الْكُفَّارِ إنْ وُجِدَ ، لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ حَتَّى يُدْعَى ، فَإِنْ قُتِلَ قَبْلَ الدَّعْوَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْطَى أَمَانًا ، فَلَا ضَمَانَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عَهْدَ لَهُ وَلَا أَيْمَانَ ، فَأَشْبَهَ امْرَأَةَ الْحَرْبِيِّ وَابْنَهُ الصَّغِيرَ

যদি এমন লোক থাকে যার নিকট দাওয়াত পৌছায় নি তবে তাকে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু যদি (কোনো মুসলিম) তাকে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বেই হত্যা করে ফেলে এবং তার সাথে কেনো চুক্তি না থাকে এ জন্য রক্তমূল্য দেওয়া লাগবে না। যেহেতু তার সাথে কোনো নিরাপত্তা চুক্তি নেই। তার বিষয়টি কাফিরদের নারী ও শিশুদের মতো (অর্থাৎ তাদের হত্যা করা নিষিদ্ধ কিন্তু হত্যা করে ফেললে কোনো রক্তমূল্য আবশ্যক হয় না)। [আল-মুগনী]

উপরোক্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাওহীদ ও রেসালাতের স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া কেউ মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না। এ বিষয়ে অজ্ঞতা ওযর হিসেবে কাজ করবে না। তাওহীদের স্বীকৃতি বলতে বোঝায় এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপণ করা এবং আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্যকে পরিত্যাগ করা। আর রেসালাতের স্বীকৃতি বলতে দুটি বিষয়কে বোঝায়। মুহাম্মাদ ﷺ কে আল্লাহর রসুল হিসেবে মেনে

নেওয়া এবং তিনি আল্লাহর নিকট হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সত্য হিসেবে বিশ্বাস করা।

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এ বিষয়টিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন এভাবে (ويؤمنوا بي وما جئت به) "এবং আমার উপর আর আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে" [সহীহ্ মুসলিম]।

একজন ব্যক্তির মুসলিম হওয়ার জন্য কুরআন-হাদীসে কি কি বিধান আছে তা বিস্তারিত জানা শর্ত নয় তবে এতটকু বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে সেটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য দ্বীন। এটাই স্বাভাবিক যে, এই ঘোষণা দেওয়ার সময় ইসলামের সকল বিধি-বিধান সম্পর্কে সে জানবে না। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সে ক্রমে ক্রমে ইসলামের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে। সেক্ষেত্রে ইসলামের যে বিধানটি সম্পর্কেই সে জানতে পারবে তার উপর বিশ্বাস স্থাপণ করবে। ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে সুবিস্তারে জানা বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এমনকি আলেম-ওলামাদের পক্ষেও সকল বিষয়ে বিদ্যান হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান যেমন, সলাত-সওম, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি ফরজ ইবাদত এবং মদ-জুয়া, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি হারাম কাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতেও একজন ব্যক্তির বেশ কিছু কাল সময় লেগে যাওয়াই স্বাভাবিক। একারণে যে ব্যক্তি আল্লাহ্-রাসুল ও কুরআন-হাদীসে বিশ্বাস স্থাপণ করে তথা ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু ইসলামের কোনো একটি বিধান অস্বীকার করে তার ক্ষেত্রে আলেমরা অজ্ঞতাকে ওযর হিসেবে গণ্য করেছেন। যে তাওহীদ ও রেসালতকে স্বীকার করেনি তথ আদৌ ইসলাম গ্রহণ করে নি তার ক্ষেত্রে অজ্ঞতাকে ওযর হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

⇒ তাওহীদ ও রেসালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব ব্যাপারে অজ্ঞতা ওযর হিসেবে গণ্য হবে সেখানে অজ্ঞতার সীমারেখা।

উপরের আলোচনাতে আমরা দেখেছি, তাকফীরের ক্ষেত্রে তাওহীদ ও রেসালাতকে অস্বীকার করলে অজ্ঞতার কারণে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। অর্থাৎ দুনিয়ার বিধানে তাকে কাফিরই মনে করা হবে। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে এই ব্যক্তিও দুটি ক্ষেত্রে ছাড় পাবে।

১. আলেমের একাংশের মতে আখিরাতের বিধানে সে মুক্তি পাবে।
২. কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল আলেমের ঐক্যমতে দুনিয়াতে দাওয়াত পৌছানোর পূর্বে তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হবে।

এই দুটি ক্ষেত্রে সাধারন বিধি-বিধানের মতো তাওহীদ ও রেসালাতের ব্যাপারেও অজ্ঞতার কারণে ওযর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারন বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে অজ্ঞতাকে যেভাবে ওযর হিসেবে গণ্য করা হয়

এক্ষেত্রে তা করা হবে না। যে ব্যক্তি তাওহীদ ও রেসালাতের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহন করার পর কোনো একটি বিধান অস্বীকার করে উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বলার পূর্বে ওলামায়ে কিরাম সে নও মুসলিম কিনা বা সে মুসলিম হওয়ার পর জ্ঞানী ব্যক্তিদের সংস্পর্ষে কিছু কাল অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে উক্ত ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে ছাড় পাবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু তাওহীদ ও রেসালাতের ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে যতটুকু ছাড়া দেওয়া হয়েছে তাতে এতটা সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না। বরং শুধুমাত্র ইসলামের দা'ওয়াত তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করার মাধ্যমে সে আখিরাতে ছাড় পাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায় এবং দুনিয়ার বিধানে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়। এ সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস উল্লেখ করেছি যেখানে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার সম্পর্কে শোনার পরও যারা ঈমান আনয়ন করবে না তারা জাহান্নামী হবে। এখানে জাহান্নামী হওয়ার জন্য কেবল রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর সম্পর্কে শোনাকে শর্ত করা হয়েছে। শোনার পর বিস্তারিত গবেষণা করা বা পর্যবেক্ষণ করার সময় পাওয়া শর্ত নয়। একইভাবে কেবলমাত্র ইসলামের দিকে আহ্বান করার মাধ্যমেই কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হয়। তাদের এলাকায় ইসলামের জ্ঞান চর্চা হয় কিনা বা তারা ইসলামী রাষ্ট্রে কিছুকাল অবস্থান করে ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করেছে কিনা সেটা লক্ষ্য করা আবশ্যক নয়। কুরআন-সুন্নার দলিল-প্রমাণ এবং ওলামায়ে কিরামের মতামতের আলোকে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

সহীহ্ মুসলিমের একটি লম্বা হাদীসে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যুদ্ধের পূর্বে কাফির-মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণ করতে আহ্বান করতে হবে যদি তারা তা না করে তবে জিজিয়া কর প্রদান করে ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করতে নির্দেশ দিতে হবে যদি তাও না করে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। এখানে ইসলাম গ্রহণ করতে আহ্বান করার পর কিছুকাল সময় দেওয়ার কথা বলা হয়নি। তবে যদি তারা সময় চায় বা মুসলিমরা স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে তাদের সময় দেয় সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু সাধারণভাবে কেবল ইসলামের আহ্বান পৌছে যাওয়ার মাধ্যমেই তাদের হত্যা করা বৈধ হবে। এমনকি মুসলিমরা বিশেষভাবে আহ্বান করা ছাড়াও সাধারনভাবে লোকমুখে ইসলামের আহ্বান যার নিকট পৌছে যায় তার ক্ষেত্রেও ওযর শেষ হয়ে যায়। এই ব্যাপারে আলেমদের মাঝে উল্লেখযেগ্য কোনা দ্বিমত নেই। একারণে ওলামায়ে কিরাম, ইসলামের দা'ওয়াত পৌছায়নি এমন এলাকা আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। এই মাসয়ালাটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তারা ‘‘যদি এমন থাকে’’ বা ‘‘যদি ধরে নেওয়া হয়’’ ইত্যাদি শব্দ ব্যাবহার করেছেন।

উপরে আমরা ইবনে কুদামা رحمه الله থেকে উল্লেখ করেছি তিনি এধরণের মন্তব্য করেছেন।

ইমাম কুরতুবী ﷺ বলেন, (وهم أهل الفترات الذين قد قدر وجودهم بعض أهل العلم) “ কোনো কোনো আলেম বলেছেন এমন লোকও থাকতে পারে যাদের নিকট কোনো রাসুলের দাওয়াতই পৌছায় নি।”

[তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম শাফেঈ ﷺ বলেন,

وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا لم تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ الْيَوْمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ من وَرَاءِ عَدُوِّنَا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَا أُمَّةً من الْمُشْرِكِينَ فَلَعَلَّ أُولَئِكَ أَنْ لَا تَكُونَ الدَّعْوَةُ بَلَغَتْهُمْ

আমি মনে করি না যে, বর্তমানে এমন কোনো ব্যক্তি আছে যার নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌছায় নি তবে আমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করছি যদি তাদের এলাকা ছাড়িয়ে অন্য কোনো এলাকায় কোনো মুশরিক সম্প্রদায় থাকে তবে এমন হতে পারে যে, তাদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌছায় নি। [আল-উম]

সুতরাং ওলামায়ে কিরাম দা'ওয়াত পৌছানো বলতে কাফিরদের নিকট গমন করে কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন সময় নিয়ে ইসলাম সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপণ করতে হবে এমন মনে করেন নি। বরং যে কোন মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারাকেই তারা দা'ওয়াত পৌছে যাওয়া হিসেবে ধরে নিয়েছেন। একারণে তারা ইসলামের দা'ওয়াত পায় নি এমন কাফিরের অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এটা হচ্ছে সেই সময়কার কথা যখন রেডিও-টিভি, সংবাদপত্র, ইন্টারনেট ইত্যাদি প্রচার মাধ্যম ছিল না। আর বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কারণে পৃথিবী একটি গ্রামে পরিনত হয়েছে। একপ্রান্তের খবর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অন্য প্রান্তে পৌছে যাচ্ছে। ইসলাম সম্পর্কে কিছুই শোনে নি এমন লোক বর্তমানে খুঁজে পাওয়া নিঃসন্দেহে কষ্টকর ব্যাপার। সুতরাং বর্তমানে যারা তাওহীদ ও রেসালাতের স্বীকৃতি দেয় না তাদের ব্যাপারে অজ্ঞতা কোনো অর্থেই ওযর হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে যে ব্যক্তি তাওহীদ বা রেসালাতকে অস্বীকার করে আর যে তাওহীদ ও রেসালাতকে স্বীকার করে কিন্তু ইসলামের অন্য কোনো বিধান অস্বীকার করে এ দুজনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য চিহ্নিত হয়েছে। আর তা হলো,

ক. প্রথম ক্ষেত্রে তাকফীর করার জন্য অজ্ঞতা ওযর হিসেবে গণ্য নয় আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ওযর হিসেবে গণ্য।

খ. প্রথম ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইসলামের দা'ওয়াত শ্রবণ করার মাধ্যমেই যাবতীয়-ওযর আপত্তি নিঃশেষ হবে এবং উক্ত ব্যক্তি আখিরাতে জাহান্নামী হবে আর দুনিয়াতে তার রক্ত বৈধ হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির বলতে হলে বা তার রক্ত ও সম্পদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে নিবিড়ভাবে

পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দেখতে হবে সে জ্ঞানের পরিবেশে আছে কিনা বা সে যে বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রচার-প্রসার আছে কিনা ইত্যাদি।

♦ *ধর্মদ্রোহী নাস্তিকদের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা কোনোভাবেই ওযর হিসেবে গণ্য নয়।*

বর্তমানে এমন কিছু মুসলিম নামধারী কবি-সাহিত্যিক রয়েছে যারা আল্লাহ্-রাসুল ও দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে এবং নাস্তিকতার প্রচার করে। বিপরীত দিকে এমন কিছু নির্বোধ ইসলামী চিন্তাবিদ রয়েছে যারা অজ্ঞতা ও অবিজ্ঞতার অজুহাতে এই সকল ধর্মদ্রোহী নাস্তিকদের কাফির হওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পক্ষে ওকালোতী করেন। তারা বলেন, ঐ সকল লোকেরা না-বুঝে না জেনে এমন করছে তাদের কাফির বলার পূর্বে তাদের সাথে দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাদের ইসলাম সম্পর্কে সুবিস্তারে অবহিত করতে হবে, তাদের সন্দেহ-সংশয় দূর করতে হবে ইত্যাদি। এই সকল চিন্তাবিদদের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। যেহেতু তাওহীদ ও রেসালাত অস্বীকার করলে একজন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে যদিও তার নিকট ইসলামের দা’ওয়াত একেবারেই না পৌঁছে অর্থাৎ সে ইসলাম সম্পর্কে পূরোপূরি অজ্ঞ থাকে। তবে এমন ব্যক্তির নিকট দা’ওয়াত পৌছানোর আগে তাকে হত্যা করা নিষেধ হবে। কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞা ইসলামের দা’ওয়াত উক্ত ব্যক্তির কর্ণগোচর হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে তার সাথে দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা করা বা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপণের আবশ্যকতা নেই। সুতরাং বর্তমানে যারা আল্লাহর অস্তিত্ব, তার একত্ব, মুহাম্মাদ ﷺ এর রেসালাত, আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ দ্বীন ইসলামের আনুগত্য ইত্যাদি ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তাদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। এ বিষয়ে কোনো অবস্থাতেই অজ্ঞতা বা মুর্খতাকে ওযর হিসেবে গণ্য করা হবে না। অজ্ঞতা ওযর হিসেবে গণ্য হবে কেবল তার ক্ষেত্রে যে তাওহীদ ও রেসালাতের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিম হয়েছে কিন্তু না বোঝার কারণে বা না জানার কারণে ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধানসমূহের কোনো অংশ অস্বীকার করেছে। সেক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা হবে উক্ত ব্যক্তি যে বিধান অস্বীকার করছে সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার দাবী গ্রহণযোগ্য কিনা। যদি উক্ত বিধানটির যথেষ্ট প্রচার-প্রসার থাকে এবং উক্ত ব্যক্তি মুসলিমদের সাথে বেশ কিছু সময় মেলা-মেশা করার সুযোগ পায় তবে উক্ত ব্যাপারে তাকে অজ্ঞ হিসেবে ওযর দেওয়া যাবে না। পরবর্তীতে আমরা এ সম্পর্কে পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

মোটকথা, এ সকল নাস্তিকরা এ বিষয়ে মোটেও অজ্ঞ নয় যেহেতু ইসলামের দা’ওয়াত তাদের নিকট পৌঁছে গেছে। সুতরাং তাদের তাকফীর করা বা হত্যা করা ইত্যাদি কোনো ব্যাপারেই কোনো বাধা-বিঘ্ন অবশিষ্ট নেই।

⇒ তাওহীদ ও রেসালাত ছাড়া অন্যান্য বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ওযর হিসেবে গণ্য হওয়ার শর্তসমূহ।

ঈমান ভঙ্গের দ্বিতীয় মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনাতে আমরা বলেছি, কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত এবং উম্মতের ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত যে কোনো বিষয় অস্বীকার করার মাধ্যমে একজন মুসলিম কাফিরে পরিনত হয়। তবে তাওহীদ ও রেসালাত ছাড়া অন্যান্য বিধানাবলী অস্বীকার করার মাধ্যমে একজন মুসলিমকে কাফির বলার পূর্বে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। লক্ষ্য করতে হবে, উক্ত ব্যক্তি না-জানা বা না বুঝার কারণে ওযরপ্রাপ্ত কি না। মোট কথা তাওহীদ ও রেসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপণকারী মুসলিমরা অন্য কোনো বিধি-বিধান অস্বীকার করলে বা অন্য কোনো কুফরীতে লিপ্ত হলে সেখানে অজ্ঞতা শক্ত ওযর হিসেবে গণ্য হয়। এক্ষেত্রে অজ্ঞতা দুরকম হতে পারে।

ক. কোনো একটি বিধান সম্পর্কে না জানা থাকা।

যেমন কেউ হয়তো জানে না যে, আল্লাহ্ পিতার সম্পত্তিতে ছেলেদের মেয়েদের তুলনায় দ্বিগুণ অংশ দিয়েছেন একারণে সে বিষয়টি অস্বীকার করে।

খ. কোনো একটি বিধান সম্পর্কে ভুল বুঝ থাকা। যেমন, কেউ হয়তো জানে যে, আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ছেলেদের মেয়েদের তুলনায় দ্বিগুণ দিয়েছেন কিন্তু আধুনিকতার সাথে তাল মেলানোর জন্য আয়াতটিকে বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। সে হয়তো বলে, এখানে ছেলেদের দ্বিগুণ দেওয়া হয়েছে কারণ তখন ছেলেরা সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতো কিন্তু এখন যেহেতু ছেলে মেয়ে উভয়ে সমান দায়িত্ব পালন করে তাই উভয়কে সমান দেওয়া উচিৎ। অর্থাৎ সে আয়াতটিকে সরাসরি অস্বীকার করে না বরং ভুল ব্যাখ্যা করে। এই প্রকারের লোকদের বলা হয় আহ্লুত্ তা'বীল (أهل التأويل) অর্থাৎ যারা না জানার কারণে নয় বরং সঠিক অর্থ বুঝতে না পারার কারণে কোনো বিধানের ভুল ব্যাখ্যা করে। এভাবে তারা সঠিক বিধানটি অস্বীকার করে।

এই উভয় প্রকারের অজ্ঞতাই ওযর হিসেবে গণ্য। তবে এগুলো ওযর হিসেবে গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নিয়মনীতি রয়েছে। বিষয়টি ব্যক্তি ও বিষয়ভেদে বিভিন্ন রকম হয়। ইসলামের বিধানাবলীর একটি অংশ সাধারন মুসলিমদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রশিদ্ধ ও প্রচলিত। যেমন, সলাত, সওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরজ হওয়া এবং মদ, জিনা, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি হারাম হওয়া। এই সকল বিষয় অস্বীকার করলে একজন ব্যক্তি কাফির হিসেবে গণ্য হবে। এ বিষয়ে যদি সে অজ্ঞতার দাবী করে তবে তা মেনে নেওয়া হবে না। অজ্ঞতার কারণে তাকে ছেড়েও দেওয়া হবে না। এসব ব্যাপারে ভুল ব্যাখ্যা করলেও কেউ ছাড় পাবে না। তবে যদি এমন হয় যে, এই ব্যক্তি কিছু দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে বা মুসলিমদের সাথে মেলা-

মেশা করার সুযোগ কম পেয়েছে ফলে এসব বিধান সম্পর্কে সে অজ্ঞ থাকতে পারে তাহলে তাকে ছাড় দেওয়া হবে। মোট কথা, কেউ অজ্ঞতার দাবী করলেই তা মেনে নেওয়া হবে না বরং পারিপার্শ্বিকর্তার উপর চিন্তা-গবেষণা করে বিষয়টির সত্যতা যাচায় করে দেখতে হবে।

ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

وَكَذَلِكَ الْأَمْر فِي كُلّ مَنْ أَنْكَرَ شَـيْئًا مِمَّا أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَيْهِ مِنْ أُمُور الدِّين إِذَا كَانَ عِلْمه مُنْتَشِـرًا كَالصَّـلَوَاتِ الْخَمْس وَصَـوْم شَـهْر رَمَضَـان وَالِاغْتِسَـال مِنْ الْجَنَابَة وَتَحْرِيم الزِّنَا وَالْخَمْر وَنِكَاح ذَوَات الْمَحَارِم وَنَحْوهَا مِنْ الْأَحْكَام إِلَّا أَنْ يَكُون رَجُلًا حَدِيث عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يَعْرِف حُدُوده فَإِنَّهُ إِذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْهَا جَهْلًا بِهِ لَمْ يَكْفُر

ইসলামের যে সকল বিষয়ে উম্মতের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে যথেষ্ট প্রচার প্রসার রয়েছে ঐ সকল বিধি-বিধান যে অস্বীকার করে সে কাফির হবে। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা, রমজান মাসে রোজা রাখা, জানাবাত অবস্থায় গোসল ফরজ হওয়া, সুদ, মদ, নিকট আত্মীয় মহিলাদের বিবাহ করা হারাম হওয়া ইত্যাদি। তবে যদি উক্ত ব্যক্তি কিছু দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে এসব বিধি-বিধানের কিছু অংশ অস্বীকার করে তবে সে কাফির হবে না। [শারহে মুসলিম]

এরপর তিনি ঐ সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন যেগুলোর ব্যাপারে উম্মতের ইজমা সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু সেগুলোর প্রচার-প্রসার নেই। তিনি বলেন,

فَأَمَّا مَا كَانَ الْإِجْمَاع فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ طَرِيق عِلْم الْخَاصَّـة كَتَحْرِيم نِكَاح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَخَالَتهَا ، وَأَنَّ الْقَاتِل عَمْدًا لَا يَرِث وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ السُّـدُس ، وَمَا أَشْـبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَهَا لَا يَكْفُر ، بَلْ يُعْذَر فِيهَا لِعَدَمِ اِسْتِفَاضَة عِلْمهَا فِي الْعَامَّة

কিন্তু যে বিষয়ে ইজমা রয়েছে তবে তা কেবল বিশিষ্ট আলেমরা জানেন যেমন, কোনো মহিলা এবং তার ফুফুকে বা খালাকে একত্রে বিবাহ করা হারাম হওয়া, পিতাকে হত্যাকারী সন্তান পিতার ওয়ারিশ না হওয়া, দাদি (মায়ের অনুপস্থিতিতে) নাতির সম্পতিতে এক ষষ্টমাংশ পায় ইত্যাদি বিধি-বিধান। যে কেউ এগুলো অস্বীকার করে তাকে অজ্ঞতার কারণে ওযর দেওয়া হবে যেহেতু সাধারন লোকদের মধ্যে এসব বিষয়ের যথেষ্ট প্রচার-প্রসার নেই। [শারহে মুসলিম]

হানাফী মাযহাবের ফকীহ্ ইবনে আবেদীন ﵀ বলেন,

وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَسَائِلَ الْإِجْمَاعِيَّةَ تَارَةً يَصْحَبُهَا التَّوَاتُرُ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ كَوُجُوبِ الْخَمْسِ ، وَقَدْ لَا يَصْحَبُهَا فَالْأَوَّلُ يَكْفُرُ جَاحِدُهُ

সত্য কথা হলো যেসব বিষয়ে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো কখনও কখনও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত। আবার কখনও তা হয় না। প্রথম প্রকারের বিধান যে অস্বীকার

করে সে কাফির হয়। [রদ্দে মুহ্তার]

যে ব্যক্তি সলাত ফরজ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে তার সম্পর্কে হাম্বালী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ্ ইবনে কুদামা ﵀ বলেন,

فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا نُظِرَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ ، وَهُوَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ ، كَالْحَدِيثِ الْإِسْلَامِ ، وَالنَّاشِئِ بِبَادِيَةٍ ، عُرِّفَ وُجُوبَهَا ، وَعُلِّمَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ .وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ ، كَالنَّاشِئِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى ، لَمْ يُعْذَرْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ادِّعَاءُ الْجَهْلِ ، وَحُكِمَ بِكُفْرِهِ ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْوُجُوبِ ظَاهِرَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَالْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهَا عَلَى الدَّوَامِ ، فَلَا يَخْفَى وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ هَذَا حَالُهُ

যদি কেউ সলাত ফরজ এটা অস্বীকার করে তবে লক্ষ্য করতে হবে যে, ঐ ব্যক্তির জন্য এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকা স্বাভাবিক কিনা। যেমন হয়তো কয়েকদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে, বা জ্ঞান-বিদ্যা বিবর্জিত গ্রাম্য এলাকাতে বসবাস করে। তবে তাকে কাফির বলা যাবে না বরং এ বিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে যেহেতু সে ওযরপ্রাপ্ত। আর যদি এমন হয় যে, উক্ত ব্যক্তির নিকট বিষয়টি গোপন থাকার কথা নয় যেমন মুসলিমদের মাঝে বসবাস করে এমন ব্যক্তি তবে তাকে ওযর দেওয়া হবে না। যদি সে বলে আমি অজ্ঞ তবু তার এ দাবী গ্রহণ করা হবে না। বরং তাকে কাফির বলা হবে। কেননা সলাত ফরজ হওয়ার বিষয়টি কুরআন-হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে এবং মুসলিমরা সদা-সর্বদা সলাত আদায় করে থাকে অতএব, মুসলিমদের সাথে বসবাস করছে এমন একজন ব্যক্তি এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে না।

[আল-মুগনী]

মোট কথা, অজ্ঞতা কেবল তখন ওযর হিসেবে গণ্য হবে যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার কথার স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। কি ধরনের ব্যক্তি কোন ধরনের বিধান অস্বীকার করছে তার উপর নির্ভর করে উক্ত ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে ওযরপ্রাপ্ত কিনা।

বিঃদ্রঃ আলেমদের কেউ কেউ সাধারনভাবে অজ্ঞতাকে ওযর হিসেবে গণ্য না করার পক্ষে মত দিয়েছেন। মালেকী মাজহাবের ফকীহ্ কাজি ইয়াদ ﵀ বলেন, (إِذْ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ فِي الْكُفْرِ بِالْجَهَالَةِ) ‘‘কুফরীর ক্ষেত্রে কাউকে অজ্ঞতার কারণে ছাড় দেওয়া হবে না।’’ [আশ-শিফা] মালেকী মাজহাবের ফিকাহ্গ্রন্থ মুখতাসারে খলীল ও শারহে কাবীরে অনুরুপ কথা বলা হয়েছে। হানাফী মাজহাবের কোনো কোনো ফকীহ্ অনরুপ বলেছেন। ফাতাওয়ায়ে কাদী খানে এ বিষয়ে হানাফী ওলামায়ে কিরাম দ্বিমত করেছেন বলে বর্ণিত আছে। মোল্লাহ্ আলী কারী আল-হানাফী বলেন,

قيل لا يكفر لعذره بالجهل وقيل يكفر ولا يعذر بالجهل أقول والأظهر الأول إلا إذا كان من قبيل ما يعلم من الدين بالضرورة حينئذ فإنه حينئذ يكفر ولا يعذر بالجهل

কেউ কেউ বলেছে, অজ্ঞতার কারণে ছাড় দেওয়া হবে অন্যরা বলেছে অজ্ঞতার কারণে ছাড় দেওয়া হবে না। আমি মনে করি, প্রথম মতটিই অধিক সঠিক। তবে যদি এমন কোনো বিধান অস্বীকার করে যা অকাট্য ও সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে তবে তাকে কাফির বলা হবে। এক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে ছাড় দেওয়া হবে না। [শারহে শিফা]

যেসব বিধি-বিধানের উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেগুলোর যথেষ্ট প্রচার-প্রসার রয়েছে এই সব বিধান সম্পর্কে কেউ অজ্ঞ থাকলে বা অজ্ঞতার দাবী করলে সেটা ওযরর হিসেবে গণ্য হবে না এ বিষয়ে সকল আলেম একমত হয়েছেন। কিন্তু যেসব বিধান অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয় বা সাধারন মুসলিমদের নিকট পরিচিত নয় সেগুলোর ব্যাপারে অজ্ঞতা ওযর হিসেবে গণ্য হওয়ার ব্যাপারে বেশিরভাগ আলেম মত দিয়েছেন। যারা অজ্ঞতার কারণে ছাড় দেওয়া হবে না বলেছেন তারাও সম্ভবত প্রথম প্রকারের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ছাড় না দেওয়ার কথা বলেছেন। যেহেতু তারা নিজেরাই বিদয়াতী ফিরকাহ্‌সমূহকে কাফির মনে করেন নি এবং সাধারনভাবে মুসলিমদের তাকফীর করার ক্ষেত্রে অত্যাধিক সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, তাদের কথাকে সাধারন মুসলিমদের ব্যাপকভাবে কাফির ঘোষণার স্বপক্ষে ব্যবহার করা সঠিক নয়। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

♦ *ইকামাতে হুজ্জা (إقامة الحجة) বা অজ্ঞতা দূর করা*

উপরে আমরা অজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরাম যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো, যে বিষয়ে যে ধরণের ব্যক্তি অজ্ঞ থাকতে পারে ঐ বিষয়ে উক্ত ব্যক্তিকে ওযরপ্রাপ্ত বলে গণ্য করা হবে। যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো একটি বিধান অস্বীকার করে উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বলার পূর্বে লক্ষ্য করতে হবে সে যে এলাকায় বসবাস করে যেখানে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচার-প্রসার আছে কিনা বা উক্ত ব্যক্তি নও-মুসলিম হওয়ার কারণে এ বিষয়ে অজ্ঞ কিনা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যেসব শর্তের উপর ভিত্তি করে অজ্ঞতা ওযর হিসেবে গন্য হয় সেগুলো পরিবর্তনশীল। একজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর নও-মুসলিম হিসেবে গণ্য হয় একারণে তাকে ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধানের ব্যাপারে অজ্ঞ হিসেবে ধরে নিয়ে ছাড় দেওয়া হয় কিন্তু যখন তার উপর কিছুকাল অতিক্রান্ত হয় তখন এই অবস্থা পরিবর্তি হয় এবং তার অজ্ঞতা দূরিভূত হয়। একইভাবে যে ব্যক্তি জ্ঞানের সংস্পর্শ থেকে বহু দূরে কোনো এলাকাতে বসবাস করে সে অজ্ঞতার কারণে ছাড় পায়। উক্ত ব্যক্তি যদি ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিমদের মাঝে বসবাস শুরু করে তবে কিছুকাল পরে তার অজ্ঞতা দূরিভুত হবে এবং তার ওযর শেষ হবে। ব্যাপক প্রচার-প্রসার না থাকার কারণে ইসলামের যেসব বিধানের ব্যাপারে অজ্ঞতা ওযর হিসেবে গণ্য হয় ঐ সকল বিধি-বিধান সম্পর্কে যদি ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার করা হয় তবে সে বিষয়ে অজ্ঞতা দূরিভুত হবে এবং

ওযর শেষ হবে। এভাবে কোনো বিষয়ে কারো ওযর শেষ হওয়াকে বলা হয় ইকামাতে হুজ্জাত (اقامة الحجة) তথা হুজ্জাত কায়েম করা বা অজ্ঞতা দূর করা। কারো উপর হুজ্জাত কায়েম হওয়ার পর তাকে অজ্ঞতার কারণে ওযরপ্রাপ্ত বলে গণ্য করা হয় না।

হুজ্জাত কায়েম করা তথা অজ্ঞতা দূরিভূত হওয়া সম্পর্কে বর্তমানে দুটি বিপরীতমুখী ভুলধারনা প্রচলিত আছে।

ক. কেউ কেউ মনে করে কোনো ব্যক্তিকে কাফির বলতে হলে তার সাথে সরাসরি আলোচনা করতে হবে। নানা-রকম যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তার সকল প্রশ্নের অবসান ঘটাতে হবে যাতে করে তার অন্তরের মধ্যে উক্ত বিষয়ে কোনো সন্দেহ-সংশয় বা প্রশ্ন অবশিষ্ট না থাকে।

খ. একদল লোক মনে করে, কারো নিকট গমণ করে তাকে কিছু আয়াত ও হাদীস শুনিয়ে দিলেই তার উপর হুজ্জাত কায়েম হয়ে যায় এবং উক্ত বিষয়ে তার অজ্ঞতা দূর হয় ফলে অজ্ঞতার কারণে তাকে আর ওযরপ্রাপ্ত বলে গণ্য করা যায় না। তারা বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ যেমন গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। এই সকল মতবাদের সাথে জড়িত সকল মুসলিমকে তারা কাফির প্রমাণ করার চেষ্টা করে। যখন বলা হয়, সাধারন মুসলিমরা তো এই সকল বিষয়ে জানে না তাই অজ্ঞতার কারণে তাদের ওযর দেওয়া উচিৎ তারা বলে, অমুক অমুকের নিকট আমরা দা'ওয়াত পৌছে দিয়েছি অতএব, তার ক্ষেত্রে কোনো ওযর নেই। এরা মনে করে, দু'একটি আয়াত বা হাদীস বর্ণনা করে কাউকে শুনিয়ে দিলেই হুজ্জাত কায়েম হয়ে যায় এবং ওযর শেষ হয়।

উপরে আমরা ওলামায়ে কিরামের যে মত বর্ণনা করেছি তা একই সাথে এই দুটি চিন্তাধারাকেই ভ্রান্তি প্রমাণ করে। যেহেতু তারা ইসলামের প্রশিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধানসমূহ অস্বীকার করা বা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা কুফরী হিসেবে গণ্য করেছেন। এব্যাপারে আলেমদের মূলনীতি হলো, কোনো ব্যক্তি যে এলাকায় বসবাস করে সেখানে ইসলামের বিধান ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার পাওয়া এবং প্রশিদ্ধি অর্জন করার পর অজ্ঞতার ওযর আর প্রযোজ্য হবে না। উক্ত ব্যক্তি বুঝতে পেরেছে কিনা সেটা লক্ষ্য করা হবে না। এ সম্পর্কে তার অন্তরের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় দূর করে আল্লাহর বিধানকে সুস্পষ্টভোবে তুলে ধরার নিমিত্তে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাও শর্ত নয়। সুতরাং যারা মনে করে কাফির বলার পূর্বে প্রতিটি মানুষের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে, তার মতামত শুনে সেটাকে সঠিক যুক্তি-প্রমাণের আলোকে খন্ডায়ন করতে হবে ইত্যাদি তাদের কথা সঠিক নয়। সঠিক মত হলো- উক্ত ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিগত আলোচনার প্রয়োজন নেই বরং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে তার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ওযর হিসেবে গণ্য হতে পারে কি না।

একইভাবে যারা মনে করে কোনো একজন ব্যক্তিকে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস শুনিয়ে দিলেই তার অজ্ঞতা দূর হয় তাদের মতও সঠিক নয়। যেহেতু ওলামায়ে কিরাম যে বিষয়টি অস্বীকার করা হচ্ছে সেটির ব্যাপক প্রচার-প্রসার থাকা শর্ত করেছেন। যে বিষয়টির ব্যাপক প্রচার-প্রসার নেই সেটা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ থাকলে বা সে বিষয়ে সমস্ত ওলামায়ে কিরামের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হলেও তা অস্বীকার করা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে না। একইভাবে উক্ত বিষয়ে দু'একজন ব্যক্তি দলিল-প্রমাণ সহকারে আলোচনা করলেই তা যথেষ্ট হবে না যেহেতু এর মাধ্যমে বিষয়টির ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়েছে এমন বলা যায় না। একারণে ওলামায়ে কিরাম তাদের সময়কার বিদয়াতী ফিরকাসমূহকে কাফির বলেন নি। অথচ তারা দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়কে অস্বীকার করতো। মু'তাজিলা ও কাদরিয়ারা তাকদীর অস্বীকার করতো। মুশাব্বিহারা আল্লাহকে সৃষ্টির গুনাবলীতে ভূষিত করতো। কিন্তু তারা যেসব বিষয় অস্বীকার করতো সেগুলোর ব্যাপক প্রচার প্রসার না থাকার কারণে আলেম-ওলামা ছাড়া অন্যান্য সাধারন মুসলিমরা সেসব বিষয়ে অবহিত ছিলনা। তাই তাদের কাফির বলা হয় নি। আলেমরা তাদের সাথে আলোচনা করতেন এবং বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে তাদের সামনে সত্যকে উপস্থাপণ করতেন। এরপরও তাদের কাফির বলতেন না। যদি কারো সামনে দলিল-প্রমাণ সহকারে সত্যকে উপস্থাপণ করার মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর হতো তবে বিদয়াতী ফিরকাহ্সমূহকে কাফির বলা হতো।

মোট কথা, ওলামায়ে কিরামের নিকট হুজ্জাত কায়েম করা তথা অজ্ঞতার ওযর শেষ হওয়ার জন্য কাউকে বিস্তারিত আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে কোনো বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া শর্ত নয়। একইভাবে যথার্থ দলিল-প্রমাণ সহকারে দু'একজন ব্যক্তি কারো নিকট দ'ওয়াত পৌছিয়ে দিলেই তার মাধ্যমে অজ্ঞতার ওযর শেষ হয়ে যায় না। বরং এসকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির যথেষ্ট প্রচার-প্রসার আছে কিনা সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

♦ *অজ্ঞান অবস্থায় বা অবচেতনভাবে কুফরী কথা বলার বিধান*

অজ্ঞান ও অবচেতন অবস্থায় কুফরী করার বিষয়টিও অজ্ঞতার মধ্যে গণ্য। এ অবস্থায় কুফরী করলে তা ধার্তব্য হবে না। যেমন, না-বালেগ শিশু, পাগল বা বেহুশ ব্যক্তি, ঘুমন্ত ব্যক্তি ইত্যাদি। এই প্রকারের অজ্ঞতা তাকফিরের ক্ষেত্রে সর্বাধিক শক্ত ওযর হিসেবে গণ্য। যেহেতু আমরা উপরে অজ্ঞতার যেসব সীমা-পরিসীমা উল্লেখ করেছি এখানে সেগুলো ধার্তব্য নয়। একজন পাগল তাওহীদ রেসালাত বা অন্য যে বিধানই অস্বীকার করুক এর কারণে তাকে কাফির বলা হবে না। একইভাবে বেহুশ অবস্থায় বা ঘুমের

ঘোরে একজন ব্যক্তি যে ধরণের কুফরী কথাই উচ্চারণ করুক সেটা ধার্তব্য হবে না। উক্ত বিধানটির প্রচার-প্রসার থাকা বা না থাকা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন এলাকায় বসবাস করে ইত্যাদি যাবতীয় নিয়ম-নীতি এখানে অকার্যকর। এই সকল বিষয়কে ওযর হিসেবে গণ্য করার দলিল হলো রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীস-

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل

তিন জন ব্যক্তির ব্যাপারে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (তাদেরকোনো পাপ লেখা হয় না)- ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জেগে ওঠে, না-বালেগ শিশু যতদিন না সে বালেগ হয়, বোধহীন ব্যক্তি (পাগল বা বেহুশ) যতদিন না তার সুস্থ বোধ ফিরে আসে। [৯২] [আবু দাউদ ও তিরমিযী]

বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কিছু দ্বিমত থাকলেও সাধারনভাবে সমস্ত ওলামায়ে কিরাম এই হাদীসের উপর আমল করার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তারা ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এই সকল ব্যক্তিদের ওযরপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য করেছেন।

হানাফী মাজহাবের প্রশিদ্ধ ফিকাহ্ গ্রন্থ হেদায়াতে এসেছে,

وَمَنْ لَا يَعْقِلُ مِنْ الصِّبْيَانِ لَا يَصِحُّ ارْتِدَادُهُ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى تَغَيُّرِ الْعَقِيدَةِ ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ وَالسَّكْرَانُ الَّذِي لَا يَعْقِلُ

যেসব শিশুরা কিছুই বোঝেনা তারা কোনো কুফরী করলে তা ধার্তব্য নয়। যেহেতু তার কথা তার আক্বীদা পরিবর্তন বলে গণ্য নয়। পাগল ও মাতালের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। যতক্ষণ না তাদের জ্ঞান ফিরে আসে।

ইবনে হুমাম রহিমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যায় বলেন, (لَا يَصِحُّ ارْتِدَادُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا إسْلَامُهُ) "পাগলের কুফরী করা বা ইসলাম গ্রহণ করা ইত্যাদি কোনো কিছুই ধার্তব্য নয় এ ব্যাপারে ইজমা সম্পাদিত হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

হাম্বালী মাজহাবের ফিকাহ্ গ্রন্থ আল-ইকনাতে বলা হয়েছে।

والطفل الذي لا يعقل والمجنون ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح - لا تصح ردته ولا إسلامه لأنه لا حكم لكلامه

---

[৯২] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরীব। হাকিম মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। ইমাম আজ-জাহাবী বলেছেন, হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ। শায়েখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [মিশকাত/৩২৮৭]

অবুঝ শিশু, পাগল এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি, কোনো বৈধ ঔষধ সেবন করা বা অন্য কোনের কারণে জ্ঞানহারা ব্যক্তি কুফরী কথা বললে তা ধার্তব্য হবে না। এই অবস্থায় কোনো কাফির মুসলিম হলে সেটাও ধার্তব্য হবে না। কেননা এমন ব্যক্তির কথার কোনো মূল্য নেই।

ইবনে কুদামা ﵀ আল-মুগনীতে অনুরুপ কথা বলেছেন। তিনি ইবনে মুনযির থেকে আরো উল্লেখ করেন,

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ الْمَجْنُونَ إذَا ارْتَدَّ فِي حَالِ جُنُونِهِ ، أَنَّهُ مُسْلِمٌ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ عَمْدًا ، كَانَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ ، إذَا طَلَبَ أَوْلِيَاؤُهُ

আমি যেসব আলেমদের কথা জানি তারা সকলে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যদি কোনো মুসলিম পাগল অবস্থায় কুফরী কথা উচ্চারণ করে তবে সে পূর্বের মতোই মুসলিম বলে গণ্য হবে যদি কেউ তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তবে নিহতের অভিভাবকরা হত্যার বিনিময়ে হত্যা দাবী করলে সেটাই করা হবে। [আল-মুগনী]

ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

فأما الصبى والمجنون فلا تصح ردتهما

শিশু ও পাগলের কুফরী কথা ধার্তব্য হবে না। [আল-মাজমু]

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, অজ্ঞতার কারণে না-বালেগ শিশু বা পাগলকে তাকফীরের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে কেবল যখন জন্ম সূত্রে বা মুসলিমদের হাতে বন্দি হওয়ার মাধ্যমে মুসলিম হিসেবে গণ্য হওয়ার পর না-বালেগ অবস্থায় বা পাগল অবস্থায় কুফরীতে লিপ্ত হয়। পাগল ও না বালেগ শিশুর ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণের প্রথম পন্থা তথা মুখে তাওহীদ ও রেসালাতের স্বীকৃতি দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের কুফরী কথা যেমন ধার্তব্য নয় একইভাবে তাদের ইসলাম গ্রহণও ধার্তব্য নয়। তাদের ক্ষেত্রে পরবর্তী দুটি পন্থা প্রযোজ্য তথা পিতা-মাতা মুসলিম হওয়া বা মুসলিমদের হাতে বন্দি হওয়া। যদি উপরোক্ত দুটি পন্থায় তারা মুসলিম হিসেবে গণ্য না হয় তাহলে তারা দুনিয়ার বিধানে কাফির হিসেবেই গণ্য হবে যেমনটি পূর্বে আমরা বলেছি। তবে তাদের হত্যা করা বৈধ হবে না। যেভাবে ইসলামের দাওয়াত যার নিকট পৌছায়নি এমন কাফিরকে হত্যা করা অবৈধ হয়। কিন্তু যদি কোনো মুসলিম ঐ অবস্থায় তাদের হত্যা করে তবে তার কিসাস হবে না।

ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

وأما المجنون والصبي الذي لا يميز فلا يصح إسلامهما مباشرة بلا خلاف ولا يحكم بإسلامهما إلا بالتبعية

পাগল ও অবুঝ শিশু নিজে ইসলাম গ্রহণ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। তারা মুসলিম হবে কেবল অন্য কারো সাথে সম্পর্কিত হয়ে। [রাওদাতুত্ তালেবীন]

♦ *মাতাল অবস্থায় কেউ কুফরী করলে তার বিধান*

উপরে আমরা দেখেছি, যে কোনো প্রকারে জ্ঞান হারিয়ে কুফরী কথা বললে তা ধার্তব্য না করার ব্যাপারে আলেমরা একমত হয়েছেন। তবে কোনো হারাম জিনিস যেমন মদ, গাজা ইত্যাদি সেবন করার মাধ্যমে যদি কেউ মাতাল হয় এবং মাতাল অবস্থায় কুফরীতে লিপ্ত হয় তাকে ওযর দেওয়া হবে কিনা সে ব্যাপারে আলেমদের মাঝে দ্বিমত আছে। হানাফী ও মালেকী মাজহাব মতে উক্ত ব্যক্তিকে ওযর দেওয়া হবে। আর শাফেঈ ও হাম্বালী মাজহাবের গ্রহণযোগ্য মত হলো এই ব্যক্তি কাফির হবে এবং তার উপর কাফিরের যাবতীয় বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে তাকে তখনই হত্যা করা হবে না বরং জ্ঞান ফিরে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ইবনে হুমাম ﵀ বলেন,

(وَالسَّكْرَانُ الَّذِي لَا يَعْقِلُ) كَالْمَجْنُونِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ

যে ব্যক্তি মাতাল হওয়ার কারণে কিছুই বুঝতে সক্ষম নয় সে পাগলের মতো। ইমাম মালেকের মত এটাই। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল হতে একটি রেওয়ায়েত এবং ইমাম শাফেঈর একটি মত এমন।

[ফাতহুল কাদীর]

ইবনে নাজম আল-মিসরী বলেন,

سَائِرُ تَصَرُّفَاتِ السَّكْرَانِ جَائِزَةٌ إِلَّا الرِّدَّةُ

মাতাল ব্যক্তির সকল কার্যকলাপ ধার্তব্য হবে শুধু কুফরীর বিষয়টি ছাড়া। [বাহরুর রায়েকে]

পরবর্তীতে তিনি বলেন,

هَذَا إِذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ الْأَرْضَ مِنْ السَّمَاءُ أَمَّا إِذَا كَانَ يَعْرِفُ فَكُفْرُهُ صَحِيحٌ

এটা সেক্ষেত্রে যখন উক্ত ব্যক্তি এতটা মাতাল হয় যে, সে কোনটি আকাশ আর কোনটি পৃথিবী তা চিনতে না পারে। যদি সে এটা চিনতে পারে তবে তার কুফরী ধার্তব্য হবে। [বাহ্‌রুর রায়েক]

হাম্বালী মাযহাবের ফিকাহ্ গ্রন্থ আল-ইনসাফে বলা হয়েছে,

تَصِحُّ رِدَّةُ السَّكْرَانِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ

হাম্বালী মাযহাবে সঠিক মত হলো, মাতালের কুফরী ধার্তব্য হবে।

ইবনে কুদামা رحمه الله আল-মুগনীতে ইমাম আহমাদ থেকে এ বিষয়ে দুটি রেওয়ায়েত আছে বলে উল্লেখ করেছেন এবং আবুল খাত্তাব رحمه الله থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, মাতালকে কাফির বলার মতটিই অধিক প্রকাশ্য।

ইমাম নাব্বী رحمه الله বলেন, (وتصح ردة السكران على المذهب) "এই মাজহাব (শাফেঈ মাজহাব) অনুযায়ী মাতালের কুফরী ধার্তব্য হবে।" [রাওদাতুত্ তালেবীন]

মোটকথা বেশিরভাগ ওলামায়ে কিরাম মাতাল অবস্থায় যে কুফরী করে তাকে ওযরপ্রাপ্ত মনে করেন নি। এর মূলত দুটি কারণ রয়েছে,

ক) আল্লাহ্ মদ হারাম করেছেন আর উক্ত ব্যক্তি মদ পান করার মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে তাই সে ওযর পাওয়ার যোগ্য নয়। বেশিরভাগ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য মূলনীতি হলো, একজন ব্যক্তির অবাধ্যতা তার জন্য কোনো সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে না। একারণে তারা অবৈধ উদ্দেশ্যে সফরে গমণকারীর ক্ষেত্রে কসরের সলাত প্রযোজ্য নয় এমন মত দিয়েছেন।

খ) সাধারনত মাতাল হওয়ার পরও একজন ব্যক্তির কম-বেশি বোধশক্তি অবশিষ্ট থাকে।

এদুটি কারণের মধ্যে প্রথমটিই প্রধান। দ্বিতীয় কারণটি খুব বেশি শক্ত নয়, যেহেতু ওলামায়ে কিরাম পাগলকে ওযর দেওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন আর বেশিরভাগ পাগলের কম বেশি ভাল-মন্দ বুঝার মতো জ্ঞান থাকে। এখানে পাগলকে ওযর দেওয়ার কারণ পাগল হওয়া কোনো অপরাধ নয়। একইভাবে ঔষধ সেবন করা বা অন্য কোনো বৈধ কারণে যার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে তার ক্ষেত্রেও আলেমরা ওযর দিয়েছেন। যেহেতু সে অপরাধী নয়। সুতরাং পাগল ও বেহুশ ব্যক্তির সাথে মাতালের মাঝে মৌলিক পার্থক্য হলো, মাতাল নিজের দোষে এবং অবৈধ পন্থায় হুশ হারা হয়েছে আর পাগল দৈবভাবে অপ্রকৃতিস্থ হয়েছে।

তাছাড়া সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, হামযা رضي الله عنه একবার মাতাল অবস্থায় রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে বলেন, (هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي) "তোমরা তো আমার পিতার দাস ছাড়া কিছু নও" [সহীহ্ বুখারী] এখানে হামযা رضي الله عنه রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে উদ্দেশ্য করে যা বলেছেন যদি সুস্থ অবস্থায় বলতেন তবে তা কুফরী হিসেবেই গণ্য হতো কিন্তু মাতাল অবস্থায় বলার কারণে তাকে ওযর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু তখন মদ পান করা বৈধ ছিল তাই মাতাল অবস্থায় কুফরী কথা বলার পরও ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন মদ

পান করা বৈধ নয় তাই মাতালকে ওযর দেওয়া হবে না। সুতরাং সাধারন পাগলের সাথে মাতালের বিধানে পার্থক্য করতে হলে সেটা বৈধতা ও অবৈধতার উপর নির্ভর করেই করতে হবে।

যারা মাতাল অবস্থায় কুফরী কথা বললে কোনো ব্যক্তিকে কাফির হিসেবে গণ্য করার পক্ষে রায় দিয়েছেন তারা দুনিয়ার সকল বিধানে তাকে কাফির হিসেবেই গণ্য করেন। তবে সুস্থ বোধ ফিরে পাওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হবে না। যখন তার সুস্থ বোধ ফিরে আসবে তখন তাকে তাওবা করতে বলা হবে যদি সে তাওবা না করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। বেশিরভাগ আলেমের নিকট এটিই সঠিক মত।

♦ *অতিরিক্ত ভয় বা খুশির কারণে বেহুশ হয়ে কুফরী কথা উচ্চারণ করা*

অনেক সময় অত্যাধিক ভয়, ভালবাসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদিতে হতবিহ্বল হয়ে বা সাধারনভাবে ভুলক্রমে মুখে কুফরী কথা উচ্চারিত হয়। যেমন, সে হয়তো বলতে চেয়েছিল, শয়তান জাহান্নামে প্রবেশ করবে কিন্তু হঠাৎ বলে ফেলল, শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করবে। এভাবে কুফরী কথা উচ্চারণ করলে তা ধার্তব্য হবে না। যেহেতু এই ব্যক্তি সজ্ঞানে একথা উচ্চারণ করে নি তাই তাকে অজ্ঞতার কারণে ওযর দেওয়া হবে। এ বিষয়ে দলিল হলো, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীস,

إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

আল্লাহ্ আমার উম্মাতকে ভুলে যাওয়া বা ভুলক্রমে ঘটে যাওয়ার ঘটনার কারণে পাকড়াও করবেন না। যে কাজ তারা বাধ্য হয়ে করে সে বিষয়েও তাদের পাকড়াও করা হবে না। [৯৩] [ইবনে মাযা]

অন্য হাদীসে এসেছে,

لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح

নিঃসন্দেহে কোনো গোনাহগার বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ্ ভীষণ খুশি হন। যেমন তোমাদের কেউ যখন নির্জন প্রান্তরে উটে চড়ে ভ্রমণ করে। এমতাবস্থায় তার উটটি পালিয়ে যায়। ঐ ব্যক্তি খাদ্য-খাবার সবই উটের সাথে বাঁধা ছিল। সে অনেক তালাশ করেও উটটির সন্ধান না পেয়ে নিরাশ হয়ে একটি গাছের

---

[৯৩] ইবনে হাযার আল-আসক্বালানী এই হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, (رجاله ثقات) এর রাবীরা বিশ্বস্ত [ফাতহুল বারী]। ইমাম নাব্বী رحمه الله হাদীসটিকে হাসান বলেছেন [আর-রাওদা]। কিন্তু শায়েখ আলবানী এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন [সহীহু ইবনে মাযা/১৬৬২]।

নিচে শুয়ে পড়ল। এই সময় হঠাৎ দেখতে পেল উটটি তার সামনে রয়েছে সে উটটির লাগাম ধরে ফেলল। এসময় অতিরিক্ত খুশির কারণে সে বলে উঠল, হে আল্লাহ্ তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার রব। সে ভীষণ খুশির কারণে ভুল করে ফেলল। [বুখারী ও মুসলিম]

এই ব্যক্তি আসলে বলতে চেয়েছিল, হে আল্লাহ্ আমি তোমার বান্দা আর তুমি আমার রব। কিন্তু অতিরিক্ত খুশির কারণে হুশ হারিয়ে সে উল্টো বলে ফেলেছে।

অন্য হাদীসে এসেছে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

أَنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ فَفَعَلُوا فَجَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَخَافَتُكَ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ

পূর্বযুগে একজন ব্যক্তি ছিল আল্লাহ্ তাকে সম্পদ দিয়েছিলেন, সে মৃত্যুর সময় তার সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলল, আমি পিতা হিসেবে তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করেছি? তারা বলল, আপনি আমাদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করেছেন। সে বলল, শোনো, আমি জীবনে কোনো ভাল আমল করিনি, অতএব, আমি যখন মারা যাবো তোমরা আমার লাশ পুড়িয়ে ফেলবে তার পর হাড়গুলো গুড়ো করে প্রচন্ত ঝড়ের দিন বাতাসে উড়িয়ে দেবে। তারা তাই করেছিল। পরে আল্লাহ্ ﷻ তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি এমন করেছিলে কেন? সে বলে, আপনার ভয়ে। ফলে আল্লাহ্ তার উপর দয়া করেন। [সহীহ্ বুখারী]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে বলেছিল, (وَإِنْ يَقْدِرْ اللَّهُ عَلَيْهِ يُعَذِّبْهُ) "তোমাদের পিতাকে যদি আল্লাহ ধরতে পারেন তবে ভীষণ শাস্তি দেবেন।" এরপর সে উপরোক্ত পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। [সহীহ্ বুখারী]

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, (لعلي أضل الله) "যাতে করে আমি আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারি"। [শারহে সুন্নাহ্ , মু'জামে কাবীর]

অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি এই পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছিল যাতে আল্লাহ্ তাকে ধরতে না পারেন। সে ভেবেছিল আগুণে পুড়িয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিলে আল্লাহ আর হিসাব গ্রহণ করতে পারবেন না। এটা নিঃসন্দেহে কুফরী আক্বীদা যেহেতু এর মাধ্যমে আল্লাহর অক্ষমতা প্রমান করা হয়। কিন্তু এই ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এর অর্থ আল্লাহ্ তাকে কাফির হিসেবে গণ্য করেন নি। উক্ত ব্যক্তি এধরণের সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার পরও কাফির হিসেবে গণ্য হয়নি কেন সে বিষয়ে ওলামায়ে কিরাম বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাযার আসক্কালানী رحمه الله বলেন,

وَلَعَلَّ هَذَا الرَّجُل قَالَ ذَلِكَ مِنْ شِدَّة جَزَعه وَخَوْفه كَمَا غَلِطَ ذَلِكَ الْآخَر فَقَالَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبّك

সম্ভবত এই ব্যক্তি অতিরিক্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণে ভুলক্রমে একথা বলে ফেলেছে, যেমন আরেকজন

অতিরিক্ত খুশির কারণে বলেছিল, হে আল্লাহ্ তুমি আমার বান্দা আমি তোমার রব।

এরপর তিনি বলেন,

أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُثْبِتًا لِلصَّانِعِ وَكَانَ فِي زَمَنِ الْفَتْرَة فَلَمْ تَبْلَغهُ شَرَائِط الْإِيمَان ، وَأَظْهَر الْأَقْوَال أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي حَال دَهْشَته وَغَلَبَة الْخَوْف عَلَيْهِ حَتَّى ذَهَبَ بِعَقْلِهِ لِمَا يَقُول

এমনও হতে পারে যে, উক্ত ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তাতে বিশ্বাস করতো কিন্তু তার সময় কোনো রসুল ছিল না তাই ঈমানের শর্তসমূহ সম্পর্কে সে বিস্তারিত জানতো না। তবে বেশি গ্রহণযোগ্য কথা হলো, সে একথা বলেছে, অতিরিক্ত ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ও হতবিহ্বল হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারানোর কারণে। সে সজ্ঞানে একথা বলে নি।

তিনি আরো বলেন,

وَأَبْعَد الْأَقْوَال قَوْل مَنْ قَالَ إِنَّهُ كَانَ فِي شَرْعهمْ جَوَاز الْمَغْفِرَة لِلْكَافِرِ

এ বিষয়ে সর্বাধিক অগ্রহণযোগ্য মত হলো তার মত যে বলেছে, হয়তো তাদের শরীয়তে কাফিরের জন্যও ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ ছিল। [ফাতহুল বারী]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷬ বলেন,

فَهَذَا رَجُلٌ شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ وَفِي إعَادَتِهِ إذَا ذُرِّيَ ، بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يُعَادُ ، وَهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، لَكِنْ كَانَ جَاهِلًا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ وَكَانَ مُؤْمِنًا يَخَافُ اللَّهَ أَنْ يُعَاقِبَهُ فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ

এই ব্যক্তি পুড়িয়ে ফেলার পর তার শরীরকে আল্লাহ্ আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছে। সে মনে করেছে আল্লাহ্ এটা করতে সক্ষম নন। সমস্ত মুসলিমদের ঐক্যমতে এটা কুফরী। কিন্তু এই ব্যক্তি অজ্ঞ ছিল সে এ বিষয়ে জানতো না। তবে সে আল্লাহকে বিশ্বাস করতো এবং তার শাস্তিকে ভয় করতো। একারণে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। [মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

মোট কথা স্পষ্ট কুফরী কথা উচ্চারণ করার পরও অজ্ঞতা বা অজ্ঞানতার কারণে এই ব্যক্তিকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। ওলামায়ে কিরাম এধরণের অবস্থায় একজন ব্যক্তি ওযর প্রাপ্ত হয় বলে মত দিয়েছেন। যদি কেউ নিজের অজান্তেই অবচেতনভাবে কুফরী কথা উচ্চারণ করে তবে আল্লাহর নিকট উক্ত ব্যক্তি ওযরপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে দুনিয়ার বিধানে তাকে কেবল তখন ওযরপ্রাপ্ত বলে গণ্য করা হবে যখন পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণিত হবে। শুধুমাত্র কারো মুখের দাবীর মাধ্যমেই ওযর দেওয়া হবে না। উদাহরণস্বরুপ কোনো একজন নেককার ব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ কুফরী কথা উচ্চারণ করে ফেলল এবং সাথে সাথেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হলো। এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিশ্চিত বলা যায় যে, সে কুফরী করে নি। বিপরীত দিকে যদি কোনো ব্যক্তির আমল আখলাক

সন্দেহজনক হয় এবং সে প্রায়ই কুফরী কথা-বার্তা বলে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় তবে উক্ত ব্যক্তি ভুলক্রমে কুফরী করছে এমন ধরে নিয়ে তাকে ওযরপ্রাপ্ত প্রমাণ করা কখনও সঠিক হতে পারে না। ভুলক্রমে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে রক্ত মূল্য আদায় করতে হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে কিসাস তথা হত্যার বিনিময়ে হত্যার বিধান প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু শর্ত হলো, হত্যা যে, ভুলক্রমে হয়েছে সেটার প্রমাণ থাকতে হবে। কেবলমাত্র হত্যাকারী এটা দাবী করলেই গ্রহণযোগ্য হবে না। তার চেয়েও হাস্যকর হবে যদি পেশাদার খুনির ক্ষেত্রে ভুলক্রমে হত্যা করার বিধান প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়। বরং এসব ক্ষেত্রে ভুলক্রমে হয়েছে কিনা সেটা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ধরে নেওয়া হবে বিষয়টি স্বেচ্ছায় সংঘঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে এটাই হলো, অলংঘনীয় মুলনীতি।

এই মূলনীতি অগ্রাহ্য করে কিছু সংখ্যক তাসাউফপন্থী হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজের মতো সুস্পষ্ট শিরক-কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিদের ওযর প্রমাণ করতে চায়। সুফীদের মধ্যে একদল বিভ্রান্ত লোক রয়েছে যারা বিভিন্ন কুফরী আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণ করে এবং কুফরী কথা মুখে উচ্চারণ করে থাকে। ওয়াহ্দাতুল উযুদ তথা সৃষ্টি ও স্রষ্টা আসলে একই জিনিস, ফানা ফিল্লাহ্ তথা আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে মিশে যাওয়া ইত্যাদি ভয়াবহ আক্বীদা বিশ্বাস তাসাউফপন্থীদের মধ্যে ব্যাপক প্রশিদ্ধ ও পরিচিত। এই সব আক্বীদার বশবর্তী হয়ে তাদের কেউ কেউ নিজেকে আল্লাহ্ হিসেবে ঘোষণা করেছে। যেমন হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ বলেছিল, আনাল হক (أنا الحق) বা আমিই আল্লাহ্। আবার কেউ কেউ নিজেকে নবীদের চেয়েও উত্তম বলে দাবী করেছে। যেমন, তাদের কেউ কেউ বলেছে, (خضـنا بحرا الأنبياء بسـاحله) "আমরা এমন এক সমুদ্রের মাঝে আছি নবীরা যার কিনারায় পৌছেছেন মাত্র" [নাউযু বিল্লাহ্]। এধরণের আরো অনেক কুফরী কথা যা মুখে উচ্চারণ করার মতো নয়। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমরা তাদের সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই যারা অজ্ঞতা ও অসচেতনতার অজুহাতে এই সকল বিভ্রান্ত তাসাউফপন্থীদের ওযর প্রমাণের জন্য জান-প্রাণ দিয়ে প্রচেষ্টা করেন।

ঐ সকল লোকদের ওযর প্রমাণ করার জন্য তাসাউফপন্থীরা নানা-রকম যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপণ করে থাকে। তাদের মধ্যকার নির্বোধ প্রকৃতির লোকেরা বলে, "এটা মারেফতের ব্যাপার, শরীয়ত দিয়ে এর বিচার করা চলে না। আল্লাহ্‌র ওলীদের উপর শরীয়ত প্রযোজ্য নয়।" এটা সুস্পষ্ট কুফরী কথা। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর শরীয়ত কোনো একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এমন আক্বীদা স্পষ্ট কুফরী। পবিত্র কুরআনের আয়াত রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর হাদীস এবং উম্মতের ইজমার মাধ্যমে এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর শরীয়ত সকল মানব ও জিনের উপর প্রযোজ্য। আল্লাহ্ ﷻ বলেন, (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

(إِنِّي رَسُـــولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًـا) "বলুন হে মানব সকল আমি তোমাদের সকলের জন্য রাসুল" [আ'রাফ/১৫৮] সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীস পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এই উম্মতের যে কেউ আমার সম্পর্কে জানার পরও আমি যে দ্বীন সহ প্রেরিত হয়েছি তা গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামী হবে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর পর আর কোনো নবী বা রসুল আগমন করবে না এমন বলা হয়েছে। এই সকল সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের আলোকে উম্মতের ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ নবুয়ত পাওয়ার পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে তারা সকলে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর শরয়িত মেনে চলতে বাধ্য। তাদের মধ্যে যে কেউ রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর শরীয়তের কোনো অংশ অস্বীকার করবে সে কাফির হবে। এমন কি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي) "যদি মুসা এখন বেঁচে থাকতো তবে আমার আনুগত্য করা ছাড়া তার কোনো উপায় থাকতো না।" [৯৪] [মুসনাদে আহমাদ]

সুতরাং যারা স্পষ্ট শিরক-কুফরকে মারেফতের নামে বৈধ করতে চায় তারা নিজেরাই কাফিরে পরিনত হয়। যেহেতু রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর শরীয়তের কোনো অংশকে অস্বীকার করা কুফরী।

উপরের যুক্তিটি অত্যন্ত নির্বোধ প্রকৃতির লোকেরা উপস্থাপণ করে। তাসাউফপন্থীদের মধ্যে যারা শরীয়তের মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত তারা ভিন্নভাবে ঐ সকল পথভ্রষ্ট লোকদের পক্ষ অবলম্বন করে। তারা বলে, নিঃসন্দেহে এসব কথা শিরক-কুফর হিসেবেই গণ্য তবে হাল্লাজ বা ইবনে আরাবীর মতো লোকেরা এটা ঐ অর্থে ব্যবহার করে নি বরং তারা ভিন্ন অর্থে এসব কুফরী কথা ব্যবহার করেছে। উপরে আমরা কুফরীর যেসব মূলনীতি বর্ণনা করেছি তার আলোকে এই যুক্তিটি খন্ডায়ন করা কঠিন কাজ নয়। কুফরীর চতুর্থ মূলনীতি রিদা বিল-কুফর তথা কুফরী কথা বা কাজের উপর সন্তোষ প্রকাশ করা সম্পর্কিত আলোচনাতে আমরা বলেছি, যদি কেউ মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করে তবে তার অন্তরের ইচ্ছা যাই হোক তাকে কাফির বলা হবে। এর স্বপক্ষে আমরা বিভন্ন ওলামায়ে কিরামের বক্তব্যও তুলে ধরেছি। সুতরাং কেউ মুখে কুফরী কথা উচ্চারণের পর অন্তরে কি অর্থ লুকিয়ে রেখেছিল সেটা ধার্তব্যের বিষয় নয়।

কেউ কেউ বলে, এই সকল কুফরী কথা তারা বেহুশ অবস্থায় উচ্চারণ করেছিল। আল্লাহর প্রেমে!! মত্ত হয়ে হুশ হারিয়ে তারা এসব কথা বলেছে। তাসাউফপন্থীদের মধ্যে যারা আলেম হিসেবে পরিচিত তারা

[৯৪] শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন [মিশকাত/১৭৭]।

এই যুক্তিটি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যেহেতু বেহুশ অবস্থায় কুফরী করলে তা ধার্তব্য নয় এটা শরীয়তের গ্রহণযোগ্য মুলনীতি যেমনটি আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত সুফীদের ক্ষেত্রে এই যুক্তি ব্যবহার করে ওযর প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ,

১. অতিরিক্ত আনন্দ বা বেদনার কারণে মানুষ হুশ হারিয়ে ভুলক্রমে দু'একটি কুফরী কথা উচ্চারণ করে ফেলতে পারে এটা আমরা স্বীকার করি কিন্তু যে ব্যক্তি সারাটা জীবন ধরে কেবল কুফরী কথায় উচ্চারণ করে গেছে তার ক্ষেত্রে এ দাবী কিভাবে যৌক্তিক হতে পারে! ভুলক্রমে হত্যা করলে কিসাস হয় না কিন্তু দুর্ধর্ষ খুনির ক্ষেত্রে কি এটা বলা সঙ্গত যে, সে হয়তো ভুলক্রমে এতগুলো খুন করেছে? মানুছুরে হাল্লাজের জীবনী পাঠ করলে দেখা যাবে সে ভুলক্রমে দু'একবার নয় বরং স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে বারবার কুফরী কথা উচ্চারণ করেছে। ইবনে কাছির, ইবনে হাযার আল-আসক্কালানী, ইমাম আজ-জাহাবী প্রমুখ ওলামায়ে কিরাম তাদের ইতিহাস গ্রন্থে তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হুসাইন ইবনে মানছুরে হাল্লাজের জীবনী প্রসঙ্গে পৃথক একটি গ্রন্থে আমরা সেসব কাহিনী সুবিস্তারে বর্ণনা করেছি। তার মধ্যে রয়েছে তার বদ অভ্যাস, কুচরিত্র এবং কুফরী আক্বীদা-বিশ্বাসের বহু উদহরণ যেগুলোকে একবাক্যে ভুলক্রমে উচ্চারিত কথা হিসেবে মেনে নেওয়া একজন পাগলের পক্ষেও সম্ভব নয়। মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর ব্যাপার তো আরো ভয়াবহ। সে ফুতুহাত নামে যে বই লিখেছে তা ঈমান বিধ্বংশী আক্বীদাতে পরিপূর্ণ। একজন মানুষ বেহুশ অবস্থায় একটা গ্রন্থ লিখে ফেলতে পারে না। এরপরও এই সকল লোকদের ব্যাপারে ভুলক্রমে বা বেহুশ অবস্থায় কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার বিষয়টিকে কিভাবে ওজর হিসেবে পেশ করা যায়! বেহুশ হওয়ার ওযর এদের উপর প্রযোজ্য হলে, স্বয়ং ইবলীস শয়তানও তো নিজেকে ওযর প্রাপ্ত বলে দাবী করতে পারে।

২. যে ব্যক্তি হঠাৎ বেহুশ হওয়ার কারণে বা ভুলক্রমে কুফরী কথা উচ্চারণ করে পরবর্তীতে তাকে সেটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই সে তওবা করবে। কিন্তু হাল্লাজ, ইবনে আরাবী তাওবা করেছে কি? ইতিহাসের গন্থে তাদের তওবা করার প্রমাণ নেই। বরং তারা মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদের কুফরী কথার উপর টিকে থেকেছে। তাদের মধ্যে একজনকে কুফরী কথা উচ্চারণ করার অপরাধে হত্যা করা হয়েছে তবু সে ভুল স্বীকার করে নি। যে নিজেই নিজের ভুল স্বীকার করে নি তাকে ভুলের কারণে ওযর দেওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

৩. একজন ব্যক্তি সজ্ঞানে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় কুফরী কথা মুখে উচ্চারণ করছে বা কাগজে লিপিবদ্ধ করছে এরপরও যদি তাকে বাঁচানোর জন্য জোর করে তাকে বেহুশ প্রমাণ করা

হয় তবে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, হাল্লাজ ও অন্যান্য সুফী-দরবেশ ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে একই যুক্তি কেনো পেশ করা হয় না? সাধারন মুসলিমরা কুফরী কথা বা কাজে লিপ্ত হলে বেহুশ হওয়ার যুক্তি দেখিয়ে তাদের কেনো ছাড় দেওয়া হয় না। সধারন মানুষের শরীয়ত আর সুফীদের শরীয়ত কি আলাদা?

সুতরাং উপরে বর্ণিত ভুলক্রমে বা বেহুশ অবস্থায় কুফরী করার সাথে সম্পর্কিত মূলনীতিটি এই সকল ধর্মদ্রোহীদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

৪.খ.(২) ইকরাহ্ (الإكراه)

ইকরাহ্ (إكراه) শব্দের অর্থ বাধ্য করা। যদি কেউ বাধ্য হয়ে কুফরী করে তবে সে কাফির হবে না। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

যে কেউ ঈমান আনার পর কুফরী করে, যদি বাধ্য হয়ে কুফরী করে কিন্তু তার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকে তবে ভিন্ন কথা কিন্তু যদি কুফরীর প্রতি তার অন্তর প্রশস্ত হয় তবে সে আল্লাহর ক্রোধ ও ভীষণ শাস্তিতে পতিত হবে। [নাহল/১০৬]

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

আল্লাহ্ আমার উম্মাতকে ভুলে যাওয়া বা ভুলক্রমে ঘটে যাওয়া ঘটনার কারণে পাকড়াও করবেন না। যে কাজ তারা বাধ্য হয়ে করে সে বিষয়েও তাদের পাকড়াও করা হবে না। [ইবনে মাযা]

আবু বকর ইবনে আরাবী আল-মালেকী رحمه الله বলেন,

وَالْخَبَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ سَنَدُهُ ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ بِاتِّفَاقٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، وَلَكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي تَفَاصِيلَ مِنْهَا

এই হাদীসটির সনদ যদিও সহীহ্ নয় তবে এর মূলভাব সঠিক হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন। তবে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় তারা দ্বিমত করেছেন। [আহ্কামুল কুরআন]

ইমাম কুরতুবী رحمه الله ইবনুল আরবীর এই কথা উল্লেখের পর বলেন,

قاله القاضي أبو بكر بن العربي. وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح

কাজি আবু বকর ইবনে আরাবী এমনটি বলেছেন তবে মুহাম্মাদ আব্দুল হক বলেছেন এর সনদ সহীহ্।

[তাফসীরে কুরতুবী]

উপরে আমরা ইবনে হাযার আসক্বালানী, ইমাম নাব্বী প্রমুখ ওলামায়ে কিরাম থেকে উল্লেখ করেছি যে তারা হাদিসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

মোট কথা, হাদীসটির সনদ সহীহ্ কি না সে বিষেয়ে কিছু দ্বিমত থাকলেও উপরোক্ত আয়াত ও অন্যান্য হাদীসের কারণে ওলামায়ে কিরাম যে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে কুফরীতে লিপ্ত হয় তাকে ওযর দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তবে বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তারা দ্বিমত করেছেন। এই সকল মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়াবলী দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক. বাধ্যতা কোন ক্ষেত্রে ওযর হিসেবে গণ্য হবে সে বিষয়ে মতাপার্থক্য এবং দুই. কোন বিষয়কে বাধ্যতা বলে গণ্য করা হবে সে বিষয়ে মতপার্থক্য। আমরা এই সকল মতাপার্থক্য এবং দলিল-প্রমাণ ও ওলামায়ে কিরামের মতামতের আলোকে সঠিক মত কোনটি তা নিম্মোক্ত আলোচনাতে বর্ণনা করবো। ইনশাআল্লাহ।

⇒ কোন ক্ষেত্রে বাধ্যতাকে ওযর হিসেবে গণ্য করা হবে সে বিষয়ে মতাপার্থক্য।

সাধারনভাবে বাধ্যতার কারণে কুফরী করা বৈধ হয় এটা স্বীকার করে নেওয়ার পর এটা কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সে ব্যাপারে কিছু দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে। নিচে এ বিষয়ে আলেমদের মতামত তুলে ধরা হলো।

♦ ***যে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে কুফরীতে লিপ্ত হয় দুনিয়াতে তার বিধান।***

সমস্ত ওলামায়ে দ্বীন একমত হয়েছেন যে, বাধ্য হয়ে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে কেউ কাফির হবে না। আখিরাতে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি কাফির হিসেবে গণ্য না হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম একমত হয়েছেন। একইভাবে দুনিয়ার যাবতীয় বিধানে তাকে কাফির হিসেবে গণ্য না করার ব্যাপারেও আলেমরা একমত হয়েছেন। কেবল ইমাম মুহাম্মাদ رحمه الله থেকে এ বিষয়ে দ্বিমত উল্লেখিত আছে।

ইমাম কুরতুবী رحمه الله বলেন,

أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالايمان، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي، غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدا في الظاهر، وفيما بينه وبين الله تعالى على الاسلام، وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلما وهذا قول يرده الكتاب والسنة، قال الله تعالى: " إلا من أكره " الآية

আলেমরা ইজমা করেছেন যে, যদি মুশরিকরা কাউকে হত্যার ভয় দেখিয়ে কুফরী করতে বাধ্য করার কারণে সে কুফরীতে লিপ্ত হয় কিন্তু তার অন্তর ঈমানের উপর দৃঢ় থাকে তবে তার কোনো পাপ হবে

না। তার স্ত্রী তালাক হবে না এবং তার উপর কুফরীর কোনো বিধান প্রয়োগ করা হবে না। ইমাম মালিক, কুফাবাসী (হানাফী মাজহাবের আলেমগণ), ইমাম শাফেঈ প্রমুখ আলেমদের মত এটাই। কেবল ইমাম মুহাম্মাদ এ বিষয়ে দ্বিমত করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি কেউ (বাধ্য হয়ে) শিরক-কুফরে লিপ্ত হয় তবে আল্লাহর নিকট সে মুসলিম হিসেবেই গণ্য হবে কিন্তু বাহ্যিক ভাবে (দুনিয়ার বিধানে) সে কাফির হিসেবেই গণ্য হবে। তার স্ত্রী তালাক হবে, যদি সে ঐ অবস্থায় মারা যায় তবে তার জানাযার সালাত আদায় করা হবে না তার বাবা যদি মুসলিম অবস্থায় মারা যায় তবে সে তার ওয়ারিস হবে না। এই মতটি কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত। যেহেতু আল্লাহ্ বলেন, যে বাধ্য হয়ে হয় সে (অপরাধী) নয়।

[তাফসীরে কুরতুবী]

মোট কথা, ওলামায়ে কিরাম যে বাধ্য হয়ে কুফরী করে তাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় বিধানে ওযর প্রদান করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ থেকে এ বিষয়ে যে মত বর্ণিত আছে তা একটি বিরল মত। হানাফী মাজহাবের ওলামায়ে কিরামের নিকটেও তার এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। একারণে আলেমরা এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদের মতটি ধার্তব্য করেন নি। এমনকি তাদের কেউ কেউ এই মতটি উল্লেখ না করেই এ বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করেছেন।

ইবনে বাত্তাল ﵀ বলেন,

وأجمع المسلمون على أن المشركين لو أكرهوا رجلا على الكفر بالله بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان وله زوجة حرة مسلمة أنها لا تحرم عليه، ولا يكون مرتدا بذلك

আলেমরা ইজমা করেছেন যে, যদি মুশরিকরা কাউকে মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করে কিন্তু তার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকে এবং তার কোনো মুসলিম স্ত্রী থাকে তবে উক্ত স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না আর সে মুরতাদও হবে না। [শারহে বুখারী]

♦ *বাধ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কথা ও কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা।*

ইমাম কুরতুবী ﵀ বলেন,

ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة

একদল আলেম বলেছেন, বাধ্য হওয়ার ওযর কেবল কথার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কাজের ক্ষেত্রে নয়। যেমন, যদি কাউকে মূর্তির সামনে সাজদা করতে বা কিবলার বিপরীত দিকে মুখ করে সলাত আদায় করতে আদেশ করা হয়।

এরপর তিনি বলেন,

يروى هذا عن الحسن البصري، رضي الله عنه. وهو قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا

এটা হাসান বসরী, আওযাঈ ও আমাদের মাজহাবের আলেমদের মধ্যে সাহ্নুনের মত।

[তাফসীরে কুরতুবী]

ইবনে বাত্তাল ﵀ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় একই কথা বলেছেন।

ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ বলেন,

وَلَا فَرْق بَيْن الْإِكْرَاه عَلَى الْقَوْل وَالْفِعْل عِنْد الْجُمْهُور

বাধ্যতা ওযর হওয়ার ক্ষেত্রে কথা বা কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটিই জমহুর (বেশির ভাগ) আলেমের মত। [ফাতহুল বারী]

এ বিষয়ে ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ বেশিরভাগ আলেম থেকে যে মত বর্ণনা করেছেন সেটিই সঠিক। যেহেতু পবিত্র কুরআনে সাধারনভাবে বাধ্য হয়ে কুফরী করার ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছে, সেখানে কথা বা কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নি। তাছাড়া মুখে কুফরীর স্বীকৃতি দেওয়া আর কুফরী কাজে লিপ্ত হওয়ার মধ্যে এমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় যে কারণে একটিকে অন্যটি হতে আলাদা মনে করা যায়। কিন্তু যদি এখানে কাজ বলতে এমন কাজ বোঝায় যাতে কারো হক চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হয় যেমন কাউকে হত্যা করা, কারো হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা, কোনো নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করা ইত্যাদি তবে সে ক্ষেত্রে ইকরাহ্ প্রযোজ্য না হওয়ার ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন।

ইমাম কুরতুবী ﵀ বলেন,

أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الاقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدى نفسه بغيره

আলেমরা একমত হয়েছেন যে, যদি কাউকে অন্য একজন ব্যক্তিকে হত্যা করতে বাধ্য করা হয় তবে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা বা তাকে প্রহার করা বা অন্য কোনো ভাবে অপদস্ত করা তার জন্য বৈধ হবে না। বরং নিজের উপর আপতিত কষ্টের উপর ধৈর্য্য অবলম্বন করতে হবে। কারো জন্য বৈধ নয় যে, সে অন্য কারো ক্ষতি করে নিজেকে মুক্ত করবে। [তাফসীরে কুরতুবী]

বাধ্য হয়ে অন্যা কারো এমন কোনো ক্ষতি করা যাবে না যার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। এর বিনিময়ে যে কোনো বিপদ-আপদ সহ্য করতে হবে। এ ব্যাপারে আলেমরা একমত।

⇒ কোন ধরনের বাধ্যতাকে ওযর হিসেবে গণ্য করা হবে সে বিষয়ে মতপার্থক্য।

হানাফী মাজহাবের ফিকাহ্গ্রন্থ আল-হেদায়াতে বলা হয়েছে,

وإن أكره على الكفر بالله تعالى والعياذ بالله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه

যদি কাউকে আটক করা বা জেলে বন্দি করার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কুফরী করতে বা রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে গালি দিতে বাধ্য করা হয় তবে এটা ইকরাহ্ বলে গণ্য হবে না। যতক্ষণ না তার জীবন সংহার বা তার কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তনের আশঙ্গা হয়।

মোল্লাহ্ আলী ক্বারী আল-হানাফী বলেন,

لا بد أن يكون الإكراه بقتل أو ضرب مؤلم ويكون المكره قادرا عليه ولا يمكن للمكره دفعه بوجه آخر فتدبر

কেবল তখনই বাধ্য হয়েছে বলে গণ্য হবে যখন কাউকে হত্যা বা ভীষণ প্রহারের ভয় দেখানো হবে এবং যে ভয় দেখাচ্ছে সে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় আর যাকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে এ থেকে বাঁচার অন্য কোনো উপায় খুঁজে না পায়। [শারহে ফিকহে আকবার]

মদ-পান করা বা শুকরের মাংস ভক্ষন করার ক্ষেত্রেও হানাফী ওলামায়ে কিরাম একই শর্ত আরোপ করেছেন।

মালেকী মাজহাবের ফিকাহ্ গ্রন্থ মুখতাসারে খলীলে বলা হয়েছে,

وَأَمَّا الْكُفْرُ وَسَبُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَذْفُ الْمُسْلِمِ فَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلْقَتْلِ

কুফরী করা, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে গালি দেওয়া এবং কোনো মুসলিমকে জেনার অপবাদ দেওয়া কেবল মাত্র তখন বৈধ হয় যখন হত্যার ভয় থাকে।

এর ব্যাখ্যায় মালেকী মাজহাবের ফকীহ্ আল-মুওয়াক, সাহ্নুন ও অন্যান্য আলেম থেকে বর্ণনা করেন,

إِنْ أُكْرِهَ عَلَى كُفْرٍ أَوْ شَتْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَذْفِ مُسْلِمٍ بِقَطْعِ عُضْوٍ أَوْ ضَرْبٍ يَخَافُ مِنْهُ تَلَفُ بَعْضِ أَعْضَائِهِ لَا تَلَفُ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا يَسَعُهُ ذَلِكَ لِخَوْفِ الْقَتْلِ لَا لِغَيْرِهِ وَلَهُ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يُقْتَلَ وَهُوَ أَفْضَلُ

যদি কাউকে অঙ্গ কর্তনের ভয় দেখিয়ে বা প্রাণ নাশ করে না তবে বিকলঙ্গ করে এমন প্রহার করার ভয় দেখিয়ে কুফরী করতে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে গালি দিতে বা কোনো মুসলিমকে জেনার অপবাদ দিতে বাধ্য

করা হয় তবে তার জন্য এটা করা বৈধ হবেনা। এগুলো কেবল হত্যার ভয়ে বৈধ হবে অন্য কিছুর কারণে নয়। [আত-তাজ]

এই সকল বর্ণনায় দেখা যায় ওলামায়ে কিরামের একটি অংশ জীবন হরণ বা অঙ্গ কর্তন ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে ইকরাহ্ বলে গণ্য করেন নি। তাদের কেউ কেউ এমন কি অঙ্গ কর্তনকেও ইকরাহ্ হিসেবে গণ্য করেন নি। তারা হত্যার ভয় ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে কুফরী করার অনুমতি দেন নি।

অন্য কিছু আলেম, এ বিষয়ে অধিক নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন। তারা নিজের সন্তান বা সম্পদ রক্ষার জন্য নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন।

ইবনে কুদামা ﷬ বলেন,

أن يكون مما يستضر به ضررا كالقتل والضرب والشديد والقيد والحبس الطويلين فأما الشتم والسب فليس بإكراه

বড় ধরণের ক্ষতি বাধ্যতা বলে গণ্য হবে যেমন, হত্যা, প্রচন্ড প্রহার, আটক করা বা লম্বা সময় জেলে বন্দি রাখা ইত্যাদি। তবে মুখে বকা-ঝকা বা গালি-গালাজ করা এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়।

তিনি আরো বলেন, (وكذلك أخذ المال اليسير) "একইভাবে কম পরিমান সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ইকরাহ্ বলে গণ্য নয়।" [আল-মুগনী]

এ থেকে বোঝা যায় বেশি পরিমাণ সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ইকরাহ্ হিসেবে গণ্য হবে।

কারো সন্তানকে শাস্তি দেওয়া হলে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য হয়েছে বলে গণ্য হওয়ার স্বপক্ষেও তিনি মত ব্যক্ত করেছেন।

ইবনে তাইমিয়া ﷬ রাজা-বাদশাদের সামনে মাটিতে চুম্বন করা বা সাজদার সাথে সাদৃশ্য রাখে এমনভাবে অবনত হওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর বলেন,

وَأَمَّا إذَا أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ بِحَيْثُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ لَأَفْضَى إلَى ضَرْبِهِ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ قَطْعِ رِزْقِهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّ الْإِكْرَاهَ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ يُبِيحُ الْفِعْلَ الْمُحَرَّمَ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ

যদি কাউকে এ বিষয়ে বাধ্য করা হয়। যেমন, হয়তো এটা না করলে তাকে প্রহার করা হবে বা তার সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হবে বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সে যে রিযিক পায় তা হতে বঞ্চিত হবে তবে বেশিরভাগ আলেমের নিকট তার জন্য এটা করা বৈধ হবে। যেহেতু বেশিরভাগ আলেমের মতে বাধ্য হলে মদ পান করা ও অন্যান্য হারাম কাজ বৈধ হয়ে যায়। [মাজমুয়ে ফাতাওয়া]

সম্পদ ও সন্তান রক্ষার জন্য কুফরী করা বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে একটি হাদীস দলিল হিসেবে ব্যাবহার করা

হয়।

খায়বারে ইয়াহুদীরা পরাজিত হওয়ার পর হাজ্জাজ ইবনে আলাত রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে বলেন,

يارسول الله إن لي بمكه مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقول ما شاء

মক্কাতে আমার সম্পদ ও পরিবার পরিজন রয়েছে। আমি তাদের নিয়ে আসতে চাই। আপনি আমাকে (মুশরিকদের নিকট) আপনার সম্পর্কে যা খুশি বলার অনুমতি দিন। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাকে যা খুশি বলার অনুমতি দেন। [তিবরানী, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে হিব্বান]

যারা সন্তান ও সম্পদ রক্ষার জন্য কুফরী কথা বলার বিপক্ষে মত দিয়েছেন তারা হাতিব ইবনে আবি বালতায়ার ঘটনাকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। হাতিব ইবনে আবি বালতায়া رضي الله عنه মক্কাতে অবস্থিত নিজের স্ত্রী সন্তানদের কাফিরদের অনিষ্ট হতে রক্ষা করার জন্য রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর গোপন খবর কাফিরদের নিকট লিখে পাঠান। পরে এ ঘটনার নিন্দা করে আল্লাহ ﷻ সূরা মুমতাহিনার একটি আয়াত নাযিল করেন। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনায় আবু বকর আল-জাস্‌সাস رحمه الله বলেন,

هذه الآية دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر

এই আয়াত প্রমাণ করে সম্পদ ও সন্তানের অনিষ্ট হওয়ার ভয় থাকলেও কুফরী কথা উচ্চারণ করা বৈধ হবে না। [আহকামুল কুরআন]

তিনি আরো বলেন,

ويدل على أن الخوف على المال والأهل لا يبيح التقية أن الله فرض الهجرة على المؤمنين ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأهلهم

সম্পদ ও সন্তানের অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও সেটা যে বাধ্যতা বলে গণ্য হবে না সে বিষয়ে আরেকটি দলিল হলো, আল্লাহ্ ﷻ মুমিনদের উপর হিজরত করা ফরজ করেছেন। তাদের সম্পদ ও সন্তানের কারণে হিজরত করা হতে বিরত থাকার সুযোগ দেন নি। [আহকামুল কুরআন]

হাম্বালী মাজহাবের কাজি আবুল ইয়ালা رحمه الله হতেও একই কথা বর্ণিত আছে। আব্দুর রহমান আল-জাওজী رحمه الله বর্ণনা করেন, হাতিব ইবনে আবি বালতায়ার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

في هذه القصة دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم

এই ঘটনা প্রমাণ করে, নিজের জীবন সম্পর্কে ভয় থাকলে কুফরী কথা বলা যেমন বৈধ হয় নিজের সম্পদ বা সন্তানের উপর ভয় থাকলে কুফরী কথা বলা বৈধ হয় না। এটা আরো স্পষ্ট হয় যেহেতু আল্লাহ্

হিজরত করা ফরজ করেছেন কিন্তু সম্পদ ও সন্তান হারানোর ভয়ে হিজরত করা হতে বিরত হওয়া বৈধ করেন নি। [যাদুল মুইয়াস্‌সার]

এই সকল ওলামায়ে কিরাম সন্তান ও সম্পদের সুরক্ষার খাতিরে কুফরী কথা উচ্চারণ বৈধ নয় এর প্রমাণে হাতিব ইবনে আবি বালতায়ার ঘটনা এবং হিজরতের বিধানকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। কিন্তু এই দলিল যথার্থ নয়। হাতিব ﵁ এর ঘটনাটি বাধ্যতার সাথে সম্পর্কিত নয়। যেহেতু কাফিররা তার স্ত্রী-সন্তানের ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছিল এটা প্রমাণিত হয় নি এবং তিনি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর গোপন খবর লিখে পাঠালেই তার সন্তানদের মুক্তি দেওয়া হবে এমন ওয়াদাও তারা করে নি। বরং তিনি নিজেই সন্তানদের উপর দয়াপরবশ এটা করেছিলেন। কোনো ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়া জন্য কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার শর্ত হিসেবে আলেমরা কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে উক্ত ক্ষতি ঘটবে এ বিষয়ে প্রকট সম্ভাবনা থাকা এবং উক্ত নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলে ঐ ক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে এ বিষয়ে প্রবল ধারনা থাকা। হাতিব ইবনে আবি বালতায়ার ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ের কোনোটির প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তাই এই ঘটনাকে বাধ্যতার মাসয়াল উল্লেখ করা যথার্থ নয়। এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো হাতিব ﵁ যে খবরটি কাফিরদের নিকট লিখে পাঠিয়েছিলেন সেটা ছিল জিহাদের সাথে সম্পর্কিত। আর জিহাদ এমন একটি ইবাদত যাতে বাধ্যবাধকতার বিধান প্রযোজ্য নয়। যেহেতু হত্যা, অঙ্গ কর্তন, বন্দি হওয়া ইত্যাদির ভয় থাকা সত্ত্বেও জিহাদ করা ফরজ হয়। কারণ জিহাদের সাথে মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত রয়েছে। অতএব, নিজের জীবন বা সন্তান-সন্তদির সুরক্ষার খাতিরে জিহাদকে পন্ড করে দেওয়া বৈধ নয়। এক্ষেত্রে বাধ্যতার বিধান প্রযোজ্য নয়। সুতরাং হাতিব ﵁ এর ঘটনাটি বাধ্যতার ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাবে না যেহেতু এটা বাধ্যতার সাথে সম্পর্কিত নয়।

হিজরতের বিধান সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। পরিবার পরিজন ও সম্পদ পরিত্যাগ করে হলেও হিজরত করা ফরজ হয়। সম্পদ রক্ষার জন্য হিজরত পরিত্যাগ করা বৈধ নয় এর অর্থ এই নয় যে, শরীয়তের সকল বিধানের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রযোজ্য। যেমন হত্যা, অঙ্গ কর্তন বা বন্দি হওয়ার ভয় থাকলেও জিহাদ করা ফরজ হয় এর অর্থ কখনও এমন নয় যে, এসব বিষয় বাধ্যতা হিসেবে গণ্য নয়। যেহেতু হত্যার ভয় থাকলে একজন ব্যক্তি বাধ্য বলে গণ্য হওয়ার ব্যাপারে আলেমরা ইজমা করেছেন। এখানে প্রকৃত কথা হলো, আল্লাহ্ ﷻ বাধ্যতার বিষয়টিকে সকলক্ষেত্রে ওযর হিসেবে গণ্য করেন নি। যেখানে বাধ্যতার বিষয়টিকে ওযর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে সেখানে হত্যা, অঙ্গ কর্তন, বন্দি হওয়া, সম্পদ ও সন্তানের ক্ষতি ইত্যাদি বিষয় বাধ্যতা হিসেবে গণ্য হবে কিন্তু যেখানে এসব বিষয়কে বাধ্যতা হিসেবে গণ্য করা হয় নি যেমন, কোনো মুসলিমকে হত্যা করা বা কারো মান হানি করা, জিহাদ করা

ইত্যাদি ব্যাপারে বাধ্যতা ওযর হিসেবে গণ্য নয়। হিজরতের ক্ষেত্রে সম্পদ রক্ষা করা ওযর হিসেবে গণ্য না হওয়ার বিষয়টিও অনুরুপ। এটা কেবল হিজরতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর মাধ্যমে এমন প্রমাণ করা যাবে না যে, সম্পদের সুরক্ষার খাতিরে শরীয়তের কোনো বিধানই পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।

এপ্রসঙ্গে একটি মাসয়ালা উল্লেখ করা যায়। মাসয়ালাটি আবু বকর আল-জাস্‌সাস ﵀ নিজেই তার আহকামে উল্লেখ করেছেন এবং সমর্থন করেছেন। তায়াম্মুম কখন বৈধ হয় সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

أَوْ لَمْ يَجِدْهُ إِلَّا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ تَيَمَّم

যদি কেউ পানি পায় কিন্তু তার মূল্য অনেক হয় তবে সে তায়াম্মুম করবে।

[আহ্‌কামুল কুরআন]

হানাফী মাজহাবের অন্যান্য আলেমদের মতও এটাই। আবু বকর আল জাস্‌সাস ﵀ নিজেই বলেছেন, আমাদের মাজহাদের ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। অন্যান্য মাজহাবের আলেমগণ এক্ষেত্রে কাছা-কাছি মত ব্যক্ত করেছেন।

আল্লাহ্‌ ﷻ সলাত আদায় করার পূর্বশর্ত হিসেবে ওযু করতে আদেশ করেছেন এবং পানি না পেলে তায়াম্মুম করার সুযোগ রেখেছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে যখন পানি পাওয়া যায় কিন্তু তার মূল্য অত্যাধিক বেশি হয় সেক্ষেত্রে পানি ক্রয় না করে তায়াম্মুম করার বিধান দেওয়া হয়েছে। এখানে সম্পদ সুরক্ষার বিষয়টিকে ওযুর বিধান পরিত্যাগ করার ব্যাপারে ওযর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আবু বকর আল জাস্‌সাস ﵀ নিজেও এই মত গ্রহণ করেছেন। এটা প্রমাণ করে অত্যাধিক পরিমান সম্পদ নষ্ট হওয়া শরিয়তে ওযর হিসেবে গণ্য। সুতরাং হিজরত করার বিধানের মাধ্যমে সম্পদ সুরক্ষার কারণে শরীয়তের কোনো বিধান পরিত্যাগ করা বৈধ নয় এটা প্রমাণ করা যায় না।

তাছাড়া হিজরত না করে স্থায়ীভাবে কাফিরদের ভূখন্ডে বসবাস করা আর বিপদে পড়ে ঘটনাক্রমে কুফরী কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য হওয়া একই বিষয় নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেই মুসলিম সম্পর্কে যে কাফিরদের নিকট বন্দি হয়। তারা তাকে কাফির হয়ে যেতে বাধ্য করে তিনি এ বিষয়টিকে ভীষণভাবে অপছন্দ করেন এবং বলেন,

ما يشبه هذا عندي الذين انزلت فيهم الآية من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أولئك كانوا يرادون على الكلمة ثم يتركون يعملون ما شاءوا وهؤلاء يريدونهم على الاقامة على الكفر وترك دينهم

যেসব সাহাবাদের ব্যাপরে কুফরী করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এ বিষয়টা তাদের মতো নয়। তাদের তো দু’একটি কুফরী কথা বলতে আদেশ করা হতো সেটা বললে তাদের ছেড়ে দেওয়া হতো। তার পর তারা

স্বাধীনভাবে যা খুশি করতে পারতো। কিন্তু এরা তো এই ব্যক্তিকে নিজের দ্বীন পরিত্যগ করে স্থায়ীভাবে কুফরীতে লিপ্ত হতে আদেশ করছে। [আল-মুগনী]

এখানে পার্থক্য হলো, বাধ্য হয়ে কুফরী করার সুযোগ কেবল তার ক্ষেত্রে যে মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করলেও তার অন্তর ঈমানের উপর দৃঢ় থাকে। ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার অর্থ অন্তরে ঈমানকে পছন্দ করা এবং কুফরীকে ঘৃণা করা। যে ব্যক্তি ঘটনাক্রমে একটি কুফরী কথা উচ্চারণ করে এবং তার পর নিজের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে তার অন্তরে কুফরীর কোনো প্রভাব পড়ে না। কিন্তু যে বাধ্যতার অজুহাতে স্থায়ীভাবে শিরক-কুফরে লিপ্ত হয় তার অন্তর ধীরে ধীরে কুফরীর প্রতি সহনশীল হয়ে ওঠে। তাছাড়া মুশরিকরা তার মাধ্যমে বিভিন্ন খারাপ কাজ করিয়ে নেই এবং তার পরিবার ও সন্তান সন্তদি কুফরী আক্বীদা বিশ্বাসের উপর বেড়ে ওঠে। এই সকল ভয়াবহ ক্ষতি অপেক্ষা উক্ত ব্যক্তির নিহত হওয়াই উত্তম। তাই স্থায়ীভাবে শিরক-কুফরে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যতা ওযর হিসেবে গণ্য নয়। ইবনে কুদামা ﷺ আল মুগনীতে আহমাদ ইবনে হাম্বালের উপরোক্ত মতামত উল্লেখ করার পর এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো, সাধারনভাবে ওলামায়ে কিরাম বাধ্য হয়ে কুফরী করার সুযোগ আছে এমন মনে করেছেন তবে বাধ্যতার সীমা কি হবে সে সম্পর্কে তাদের মধ্যে ব্যাপক দ্বিমত রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ ব্যাপারে ভীষণ কড়া-কড়ি করেছেন। হানাফী মাজহাবের আলেমরা বলেছেন, নিহত হওয়া বা বিকলঙ্গ হওয়ার ভয় ছাড়া অন্য কিছু বাধ্যতা বলে গণ্য হবে না। মালেকী মাজহাবের কোনো কোনো আলেম এমনকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তিত হওয়ার ভয় থাকলেও কুফরী কথা বলা বা কোনো মুসলিমকে অপবাদ দেওয়া বৈধ হয় বলে মনে করেন নি। অন্য কিছু আলেম এ ব্যাপারে নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন। ইবনে কুদামা ﷺ নিজের সন্তান বা সম্পদ হারানোর ভয় থাকলেও একজন ব্যক্তি বাধ্য হতে পারে এমন মত দিয়েছেন। ইবনে তাইমিয়াও একই মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বেশিরভাগ আলেমের মত এটিই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাধ্যতার বিষয়টিকে কেবলমাত্র নিহত হওয়া, বিকলঙ্গ হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সঠিক নয়। যেহেতু এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা একজন ব্যক্তির নিকট নিহত হওয়ার তুলনায় বেশি অপছন্দনীয়। উদাহরণস্বরুপ একজন নেককার সম্ভ্রান্ত নারীর নিকট সম্ভ্রম নষ্ট করার হুমকী দেওয়া হত্যা অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। যদি কোনো আত্মমর্যাদা সম্পন্ন পুরুষকে বলা হয় তোমাকে হত্যা করা হবে অথবা তোমার স্ত্রী-কন্যার সম্ভ্রম নষ্ট করা হবে তবে সন্দেহ নেই যে, সে নিহত হওয়াকেই বেছে নেবে। সুতরাং কুফরী কথা উচ্চারণের মাধ্যমে যদি নিজের স্ত্রী-কণ্যার সম্ভ্রম রক্ষা করা সম্ভব হয় তবে সেটা বধ্যতা বলে গণ্য হওয়া উচিৎ।

একইভাবে যদি কাউকে বলা হয় তুমি কুফরী কথা উচ্চারণ না করলে তোমার সন্তানকে হত্যা করা হবে তবে এটা বাধ্যতা বলে গণ্য হবে। যেহেতু মানুষ নিজের জীবন অপেক্ষা নিজের সন্তানকে বেশি ভালবাসে। যদি একজন মুসলিম শিশু সন্তান সহ মুশরিকদের হাতে আটক হয়। আর মুশরিকরা তাকে বলে, তুমি যদি কুফরী কথা উচ্চারণ না করো তবে তোমার ছেলেকে আমরা দাসে পরিনত করবো। তাকে আমাদের ধর্মে দীক্ষীত করবো ইত্যাদি তবে এই পিতা বাধ্য হয়েছে বলে গণ্য হবে। বরং এক্ষেত্রে কুফরী কথা উচ্চারণ করা তার উপর আবশ্যক হবে। নিজের পুত্রকে সারাজীবন কুফরী ধর্মের উপর টিকে থাকা বা কাফিরদের গোলামীতে নিক্ষেপ করা তার জন্য বৈধ হবে না। এই ধরণের আরো অনেক ঘটনা উল্লেখ করা যায়। এই সকল ঘটনাকে যদি বাধ্যতা হিসেবে গণ্য না করা হয় তবে বাধ্য হয়ে কুফরী করার যে সুযোগ আল্লাহ প্রদান করেছেন তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সুতরাং এ বিষয়ে সঠিক মত হলো, অত্যাধিক কষ্টকর ও অসহনীয় যে কোনো শারীরীক ও মানসিক কষ্টে পতিত করা বাধ্যতা বলে গণ্য হবে। এটা ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। সুতরাং কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য হয়ে কুফরী করেছে কিনা সেটা উক্ত ব্যক্তির পারিপার্শ্বির্ক বিষয়াবলীর উপর গবেষণা করে নির্ধারন করতে হবে। সাধারন কিছু নিয়ম-নীতি সবার উপর প্রয়োগ করা যথাযোগ্য হবে না। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

♦ *বাধ্য হয়ে কুফরী করার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব তাওরিয়া (تورية) অবলম্বন করা।*

আরবী তাওরিয়া (تورية) শব্দটি এসেছে, ওয়ারা (وراء) শব্দ হতে যার অর্থ পিছনে রাখা বা গোপন করা। তাওরিয়া অর্থ কোনো মিথ্যা বা ভ্রান্ত কথা সরাসরি উচ্চারণ না করে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা যাতে বক্তার উদ্দেশ্য হয় একরকম আর শ্রোতা ভাবে অন্যরকম। উদহারণস্বরুপ কাফিররা যদি কোনো মুসলিমকে হত্যার ভয় দেখিয়ে আল্লাহর রাসুলের নামে গালি দিতে বাধ্য করে তবে সে মুখে মুহাম্মাদ নাম উচ্চারণ করবে কিন্তু অন্তরে আল্লাহর রাসুলকে উদ্দেশ্য না করে মুহাম্মাদ নামের অন্য কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করবে। ওলামায়ে কিরাম বলেছেন কাউকে কুফরীর উপর বাধ্য করা হলে তার উচিৎ যতদূর সম্ভব তাওরিয়া করা তথা কথার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা অবলম্বন করা।

ইমাম কুরতুবী رحمه الله বলেন,

قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض

মুহাক্কিক ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, যখন কেউ কুফরী কথা বলতে বাধ্য হয় তার জন্য সরাসরি তা উচ্চারণ করা বৈধ নয়। সে মুখে যা উচ্চারণ করবে অন্তরে ভিন্ন অর্থ গোপণ রাখবে। [তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম কুরতুবী ﵀ আরো বলেন,

ومتي لم يكن تفسير كذلك كان كافرا، لان المعاريض لا سلطان للإكراه عليها

যদি সে এমন না করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে কেননা অন্তরের ইচ্ছার উপর কাউকে বাধ্য বলে গণ্য করা যায় না। [তাফসীরে কুরতুবী]

আল-মাওরুদী ﵀ বলেন, (وهذا لعمري أولى الأمرين ، ولم يَصِرِ المكرَه بالتصريح كافر) "এভাবে অস্পষ্ট ভাষায় কুফরী উচ্চারণ করাই উত্তম তবে স্পষ্ট ভাষায় তা উচ্চারণ করলে কেউ কাফির হবে না।

হানাফী মাজহাবের ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে সুন্দর বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছেন। বাহরুর রায়েকে বলা হয়েছে, যে বক্তিকে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে গালি দিতে বাধ্য করা হয় তার ব্যাপারটি তিন রকম হতে পারে।

১. হয়তো সে বলবে, অন্তরে আমি কাউকেই গালি দেওয়ার নিয়ত করিনি। মুখে আমাকে যা বলতে বাধ্য করা হয়েছে কেবল তাই বলেছি। এই ব্যক্তি কাফির হবে না।

২. যদি সে বলে, গালি দেওয়ার সময় মুহাম্মাদ নামের এক ইয়াহুদীর কথা স্মরণ হয়েছিল আমি তাকে গালি দিয়েছি। এই ব্যক্তিও কাফির হবে না।

৩. যদি সে বলে, গালি দেওয়াার সময় মুহাম্মাদ নামের এক ইয়াহুদীর কথা আমার স্মরণ হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কে গালি দিয়েছি তবে এই ব্যক্তি কাফির হবে।

মোট কথা বাধ্য হয়ে কুফরী করা কেবল তখন ওযর হিসেবে গণ্য হবে যখন কারো অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান উপস্থিত থাকবে। তাই মুখে কুফরী উচ্চারণের সময় অন্তরকে সম্পূর্ণভাবে কুফরী থেকে দূরে রাখতে হবে। মুখে যতদূর সম্ভব অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করতে হবে আর অন্তরে কুফরীর পরিবর্তে অন্য কোনো উদ্দেশ্য গোপণ রাখতে হবে। এর বিপরীত করলে, কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ বলে গণ্য হবে এবং কুফরী হবে। কিন্তু যদি পরিস্থিতির ভয়াবহতার কারণে কারো অন্তরে কিছুই উদয় না হয় বা শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে চাতুর্যতা প্রদর্শনে সে অদক্ষ হয় তবে তাকে কাফির বলা যাবে না।

♦ *যুদ্ধে কৌশল হিসেবে কুফরী করা বৈধ কিনা।*

উপরে আমরা নিজের জীবন, সম্পদ ও সন্তান রক্ষার জন্য কুফরী কথা উচ্চারণ করা বৈধ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ এমনকি অন্য মুসলিমের উপর বিপদ আপতিত হওয়ার আশঙ্কাকেও ইকরাহ্ হিসেবে গণ্য করেছেন। ইবনে হিযাম ﵀ বলেন,

أو الْوَعِيدُ فِي مُسَلِّمٍ غَيْرَهُ بِقَتْلٍ، أَوْ ضَـرْبٍ، أَوْ سَـجْنٍ، أَوْ إِفْسَـادِ مَالٍ، لِقَوْلِ رَسُـولِ اللَّهِ صـلى الله عليه وسـلم :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يُسْلِمُهُ

একইভাবে একজন মুসলিম বাধ্য হয়েছে বলে গণ্য হবে যদি কেউ অন্য কোনো মুসলিমকে হত্যা করা, প্রহার করা, বন্দি করা বা তার সম্পদ বিনষ্ট করার হুমকী দেয়। যেহেতু রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই তাকে সে জুলুম করে না, অসহায় অবস্থায় ছেড়েও দেয় না। [আল-মুহাল্লা]

মুসলিমদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কৌশল হিসেবে কুফরী করা এর মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়ে কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়। কা'ব বিন আশরাফ নামে এক ইয়াহুদী, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নিন্দা করে এবং মুসলিম নারীদের নামে অশ্লীল কবিতা লিখতো, এবং কাফিরদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উসকানি দিতো। বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার উপর উক্ত ইয়াহুদীকে হত্যা করার দায়িত্ব অর্পণ করলে তিনি বলেন, (فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا) "তাহলে আপনি আমাকে (আপনার নামে কিছু কথা বলার) অনুমতি দিন"। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অনুমতি দিলে তিনি কা'ব বিন আশরাফের নিকট গিয়ে বলেন, (إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا) "এই ব্যক্তি (আল্লাহর রাসুল) আমাদের নিকট সাদাকা চাচ্ছে সে আমাদের ভীষণ কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।" একথা শুনে কা'ব বলে, (وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ) "আল্লাহর কসম তোমরা আরো বিরক্ত হবে"। এভাবে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাঃ উক্ত ইয়াহুদীর সাথে ভাব জমিয়ে একসময় তাকে বাড়ির বাইরে এনে হত্যা করেন।

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাঃ যে কথা বলেছিলেন স্বাভাবিক অবস্থায় এই ধরণের কথা বলা স্পষ্ট কুফরী হিসেবে গণ্য যেহেতু এতে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়। একারণে আলেমদের একটি অংশ এই হাদীস থেকে অন্যান্য মুসলিমদের জান-মাল হেফাজতের জন্য শত্রুর নিকট কৌশল হিসেবে কুফরী কথা উচ্চারণের পক্ষে মত দিয়েছেন।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আজিম আবাদী বলেন,

قَالَ اِبْن الْمُنِير : هُنَا لَطِيفَة هِيَ أَنَّ النَّيْل مِنْ عِرْضه كُفْر وَلَا يُبَاح إِلَّا بِإِكْرَاهٍ لِمَنْ قَلْبه مُطْمَئِنّ بِالْإِيمَانِ وَأَيْنَ الْإِكْرَاه هُنَا وَأَجَابَ بِأَنَّ كَعْبًا كَانَ يُحَرِّض عَلَى قَتْل الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ فِي قَتْله خَلَاصهمْ فَكَأَنَّهُ أَكْرَهَ النَّاس عَلَى النُّطْق بِهَذَا الْكَلَام بِتَعْرِيضِهِ إِيَّاهُمْ لِلْقَتْلِ فَدَفَعُوا عَنْ أَنْفُسهمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَعَ أَنَّ قُلُوبهمْ مُطْمَئِنَّة بِالْإِيمَانِ

ইবনে মুনীর বলেছেন, এখানে একটি সুক্ষ্ম বিষয় রয়েছে তা হলো, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে অসঙ্গত কথা কুফরী আর কুফরী কথা উচ্চারণ করা কেবল তার জন্য বৈধ হয় যে বাধ্য হয়ে তা করে কিন্তু তার অন্তর ঈমানের উপর দৃঢ় থাকে। প্রশ্ন হলো, এখানে বাধ্যতা কোথায়? এর উত্তরে তিনি বলেন, আসলে কা'ব মুশরিকদের মুসলিমদের হত্যা করতে উৎসাহিত করতো। তাকে হত্যা করার মাধ্যমে মুসলিমদের এ থেকে

রক্ষা করা সম্ভব ছিল। অতএব, অবস্থা যেনো এমন যে, সে মুসলিমদের নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে কুফরী কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করেছে ফলে তারা অন্তরে দৃঢ় ঈমান থাকা অবস্থায় মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করে নিরাপত্তা অর্জন করেছে।

এটা উল্লেখ করার পর আজিম আবাদী বলেন, (وهو حسن نفيس) "এই ব্যাখ্যাটি খুবই চমৎকার" [আওনুল মা'বুদ]

শাফেঈ মাজহাবের ফকীহ্ আস্-সুবাকীও এই ঘটনার অনুরুপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

قد علم أن لبس زي الكفار وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو مصلحة المسلمين إلى ذلك واشتدت حاجتهم إلى من يفعله فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه

এটা জানা কথা যে, বাধ্য হয়ে ছাড়া সাধারন অবস্থায় কাফিরদের পোশাক পরিধান করা এবং কুফরী কথা মুখে উচ্চারণ করা কুফরী। কিন্তু যদি মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কেউ একজন এমন করা অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে দাড়ায় তবে এটা বাধ্য হওয়া বলে গণ্য হবে বলেই মনে হয়।

[আল-আশবাহ্ ওয়ান-নাজায়ির]

এরপর তিনি কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার সংক্রান্ত হাদীসটি এ বিষয়ে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি এ বিষয়ে একটি ঘটনাও উল্লেখ করেন। তিনি বর্ণনা করেন, সুলতান সালাহ্ উদ্দিন আয়্যূবীর সময় একজন বাদশা মুসলিমদের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ালে সালাহ্ উদ্দিন আয়্যূবী দু'জন মুসলিমকে খৃষ্টানদের পোশাক পরিধান করিয়ে উক্ত রাজার দরবারে প্রেরণ করেন। তারা নিজেদের খৃষ্টান ধর্মের পাদ্রী হিসেবে পরিচয় দিয়ে রাজার নিকট গমণ করেন এবং সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করেন। এর মাধ্যমে মুসলিমদের নিরাপত্তা অর্জিত হয়।

ইমাম নাব্বী ﷺ বলেন,

ولو شد على وسطه زناراً ودخل دار الحرب للتجارة كفر وإن دخل لتخليص الأسارى لم يكفر

যদি কেউ মাজায় কাফিরদের মতো ফিতা বাধে এবং কাফিরদের এলাকায় ব্যবসা করার জন্য গমণ করে তবে সে কাফির হবে (যেহেতু এর মাধ্যমে সে নিজেকে কাফির হিসেবে পরিচয় দিতে চাচ্ছে)। কিন্তু যদি সে বন্দি মুক্ত করার জন্য সেখানে যায় তবে কাফির হবে না। [রাওদাতুত্ তালেবীন]

অর্থাৎ সাধারনভাবে যেটা কুফরী মুসলিমদের নিরাপত্তা ও কারামুক্তির জন্য সে ধরণের কাজ করা কুফরী হিসেবে গণ্য হবে না।

কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করা সম্পর্কিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইবনুল কায়্যিম ﷺ বলেন,

استشكل الناس من حديث قتل كعب بن الأشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ينافي الإيمان وقد أذن لهم فيه

এই ঘটনা অনেকের নিকট জটিল মনে হয়েছে, যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট তার সম্পর্কে কিছু অসঙ্গত কথা বলার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন যা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক তবু রাসুলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি দিয়েছেন। [বাদাইউল ফাওয়াইদ]

এর পর তিনি এ বিষয়ে সংশয় নিরসনের জন্য কয়েকটি জবাব উল্লেখ করেছেন। প্রথমেই তিনি বলেন, মুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এখানে বাধ্য হয়ে কুফরী কথা উচ্চারণ করা হয়েছে। এই মতটি বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, (وليس هذا بقوي) ‘‘এই ব্যাখ্যাটি খুব বেশি শক্ত নয়’’। এটা প্রমাণ করে ইবনুল কায়্যিম এই ব্যাখ্যাটি খুব বেশি পছন্দ না করলেও এটি পুরোপুরির অগ্রহণযোগ্য মনে করেন নি এবং উক্ত হাদীসটি এভাবে ব্যাখ্যা করা একেবারে অমূলক মনে করেন নি। যেহেতু হাদীসটিতে এই ব্যাখ্যার স্বপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং ওলামায়ে দ্বীনের একটি অংশ এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন।

নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, কা’ব বিন আশরাফকে হত্যা করা সম্পর্কিত হাদীসটি ঐ সকল ওলামায়ে কিরামের পক্ষে স্পষ্ট দলিল যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ বা অন্যান্য অনিবার্য প্রয়োজনে কুফরী কথা উচ্চারণের পক্ষে কথা বলেছেন। যেহেতু এখানে মুহাম্মাদ ইবনে মাসালামা رضي الله عنه ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم নিজেদের জীবন বা সম্পদের কোনোরুপ ক্ষতির আশঙ্কা ছাড়াই অন্যান্য মুসলিমদের নিরাপত্তার স্বার্থে একজন কাফিরকে হত্যা করার জন্য কৌশল হিসেবে এমন কথা উচ্চারণ করেছেন যা সাধারন অবস্থায় উচ্চারণ করা কুফরী। অনেকে অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তারা এই ঘটনাকে ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা বলেন, এখানে সাহাবায়ে কিরাম যে কথা বলেছেন তা বাহ্যিকভাবে কুফরী মনে হলেও তারা অন্তরে এগুলোর ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন অন্য কথায় তারা আসলে তাওরিয়া হিসেবে এসব কথা বলেছেন। অতএব, এটাকে অনিবার্য কারণে কৌশল হিসেবে কুফরী কথা উচ্চারণের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করা যৌক্তিক নয়। যারা এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন তারা ভুলে যান যে, বাধ্য হয়ে ছাড়া সাধারন অবস্থায় তাওরিয়া হিসেবে কুফরী কথা উচ্চারণ করাও কুফরী। আমরা পূর্বে এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের বক্তব্য পেশ করেছি। তারা বলেছেন বাধ্য হলেও একজন মুসলিম কুফরী কথা উচ্চারণের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব তাওরিয়া অবলম্বন করবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ বিষয়ে এতটাই কড়াকড়ি করেছেন যে, তাওরিয়া ছাড়া সরসরি কুফরী কথা উচ্চারণ করাকে তারা কোনো অবস্থাতেই ওযর হিসেবে গণ্য করেন নি। যুদ্ধ-বিগ্রহ বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে কুফরী কথা উচ্চারণের ক্ষেত্রেও মুসলিমরা একই পন্থা অবলম্বন করবে। তারা মুখে যা উচ্চারণ করছে অন্তরে তার বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য করবে। অতএব এই হাদীসটি তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল হিসেবে গণ্য হবে।

তাছাড়া আমরা ঈমান ভঙ্গের চতুর্থ কারণ তথা কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করা সংক্রান্ত আলোচনাতে এ বিষয়ে ওলামায়ে কিরামে মতামত উল্লেখ করেছি যে, একজন ব্যক্তি বাধ্য হওয়া ছাড়াই স্বেচ্ছায় কুফরী কথা উচ্চারণ করলে সে কাফির হবে। তার অন্তরে কি উদ্দেশ্য আছে তা দেখা হবে না। একারণে ওলামায়ে কিরাম বলেছেন, এই হাদীসে যেসব কথা বলা হয়ছে তা সাধারন অবস্থায় বলা বৈধ নয়।

আজিম আবাদী ﵀ বলেন,

فَإِنَّ التَّلَفُّظ بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْكَلِمَات لَا يَجُوز قَطْعًا فِي غَيْر هَذِهِ الْحَالَة

"এখানে যেসব কথা বলা হয়েছ এই ধরণের অবস্থায় ছাড়া তা উচ্চারণ করা নিশ্চিতভাবেই বৈধ নয়।"

[আওনুল মা'বুদ]

ইবনে বাত্তাল ﵀ বলেন,

لو قاله بغير إذن النبى - - صلى الله عليه وسلم - - وسمع منه لكان دليلا على النفاق

যদি এই সকল সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর অনুমতি না নিয়ে এটা করতো আর পরে তা জানা যেতো তাহলে প্রমাণিত হতো যে,তাদের অন্তরে নিফাকী আছে। [শারহে বুখারী]

ইবনে কায়্যিম ﵀ বলেন,

وذلك ينافي الإيمان

এই সকল কথা-বার্তা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। [বাদায়িউল ফাওয়াইদ]

মোট কথা, সাধারন অবস্থায় এই ধরণের কথা বলা যে কুফরী সে ব্যাপারে দ্বিমত করা যেতে পারে না। সুতরাং এই ঘটনা কৌশলগত কারণে নিরুপায় হলে বাধ্য হয়ে কুফরী করা বৈধ প্রমাণ করে।

কেউ কেউ বলেছেন, এই ঘটনায় রাসুলুল্লাহ্ ﷺ নিজেই তার সম্পর্কে কিছু অসঙ্গত কথা বলার অনুমতি প্রদান করেছেন। যদি কেউ নিজেই নিজের সম্পর্কে কিছু বলার অনুমতি প্রদান করে তবে তাতে কারো কিছু বলার থাকে না। নতুন করে যেহেতু রাসুলুল্লাহ্ ﷺ আর কারো জন্য অনুমতি দেবেন না তাই এখন আর এধরণের কাজ করা বৈধ হবে না। এই যুক্তিটি বিভিন্নভাবে খন্ডায়ন করা যায়। প্রথমত: এই ঘটনায় রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কেবল নিজের সম্পর্কে অসঙ্গত কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন তাই নয় বরং আল্লাহর দ্বীনের যে কোনো বিষয় নিয়ে মন্তব্য করার অনুমতি দিয়েছেন।

ইবনে হাযার আসক্বালানী ﵀ বলেন,

وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ سِيَاق اِبْن سَعْد لِلْقِصَّةِ أَنَّهُمْ اِسْتَأْذَنُوا أَنْ يَشْكُوا مِنْهُ وَيَعِيبُوا رَأْيه

ইবনে সাদ এর বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ তাদের তার সম্পর্কে যে কোনো অভিযোগ করার ও তার মতামতকে ত্রুটিপূর্ণ আখ্যায়িত করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। [ফাতহুল বারী]

সাহাবায়ে কিরাম যেসব মন্তব্য করেছেন সেগুলোও কেবল রাসুলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে নয় বরং তার কিছু অংশ আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে। যেমন তারা বলেছেন, (انه سألنا الصدقة) "তিনি তো আমাদের নিকট সাদাকা (যাকাত) চান" এই কথার মাধ্যমে আল্লাহর বিধান যাকাত সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং রাসুলুল্লাহ্ ﷺ কেবল নিজের সম্পর্কে কিছু বলার অনুমতি প্রদান করেছিলেন এটা সঠিক নয়। বরং আল্লাহর দ্বীনের যে কোনো বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

তাছাড়া রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর অনুমতি নিয়ে এটা করা হয়েছিল এর মাধ্যমে এমন প্রমাণিত হয় না যে, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর ওফাতের পর যেহেতু আর তার পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়া সম্ভব নয় তাই এখন আর এমন করার সুযোগ নেই। কেননা সাধারনভাবে যে কোনো বিষয়ে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ এর অনুমতি কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য শরীয়ত স্বরুপ। প্রতিবার পৃথক পৃথক অনুমতির প্রয়োজন নেই বরং কোনো একটি ঘটনা প্রসঙ্গে একবার অনুমতি প্রদান করা হলে অনুরুপ ঘটনার ক্ষেত্রে উক্ত অনুমতি দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে এটিই সঠিক। সুতরাং যুদ্ধ কৌশল বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে কুফরী কথা বলা বা কুফরী কাজ করা বৈধ হবে এই মতই সঠিক। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

♦ *অর্থ-সম্পদ বা ক্ষমতার লোভে কুফরী করা বৈধ নয়।*

উপরে আমরা বলেছি, নিজের জীবন, সম্পদ বা অন্যান্য মুসলিমদের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য কুফরী কথা উচ্চারণ করা যায়। যে কোনো প্রকার বড় ধরণের ক্ষতির ভয় থাকলে বাধ্যতা প্রমাণিত হবে। এখানে যে বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে তা হলো, ভয় আর লোভ এক জিনিস নয়। তাই নিজের প্রচুর পরিমাণ সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে কুফরী করা বৈধ হলেও প্রচুর পরিমাণ সম্পদ পাওয়ার লোভে কুফরী করা বৈধ নয়। রক্ষা করার জন্য কুফরী করা বৈধ হলেও সম্পদ বা ক্ষমতার লোভে কুফরী করা কখনও বৈধ নয়। যদি কাউকে লক্ষ-কোটি টাকার লোভ দেখানো হয় বা সারা দুনিয়ার বাদশাহ্ হওয়ার স্বপ্ন দেখানো হয় তবু তার জন্য কুফরী করা বৈধ হবে না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া নিজের সম্পদ রক্ষার স্বার্থে রাজা-বাদাশাদের সাজদা করার মতো নিকৃষ্ট কাজ করা বৈধ এমন মত দেওয়ার পর বলেন,

وَأَمَّا فِعْلُ ذَلِكَ لِأَجْلِ فُضُولِ الرِّيَاسَةِ وَالْمَالِ فَلَا

তবে অতিরিক্ত ক্ষমতা ও সম্পদ অর্জনের জন্য এমন করা বৈধ হবে না।

[মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া]

এখানে পার্থক্য হলো, সাধারনভাবে কুফরী করা নিষিদ্ধ করার পর আল্লাহ্ ﷻ বাধ্য হয়ে কুফরী করা বৈধ করেছেন। এখন বাধ্য হওয়া বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে ওলামায়ে কিরাম বিস্তারিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তারা দুটি মূলনীতির উপর নির্ভর করেছেন। [এক] আরবী ভাষায় ইক্‌রাহ্ (إكراه) তথা বাধ্য হওয়া বলতে কি বোঝায় [দুই] হাদীসে কোন বিষয়কে ইক্‌রাহ্ তথা বাধ্য হওয়া বলে গণ্য করার স্বপক্ষে প্রমাণ আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কাউকে লোভ দেখিয়ে কোনো কিছু করার প্রতি উৎসাহিত করাকে ভাষাভিত্তিকভাবে বাধ্য হওয়া বলে গণ্য করা যায় না। যেহেতু বাধ্য হওয়া বলতে বোঝায় কোনো বড় ধরণের ক্ষতির আশঙ্কা অর্থাৎ ভয় থাকা। কিন্তু এখানে কোনো ভয় নেই বরং আছে লোভ ও অহংকার।

একইভাবে কোনো হাদীসে ক্ষমতা ও সম্পদ অর্জনের জন্য কুফরী করার অনুমতি প্রদান করা হয়নি কিন্তু নিজের জীবন, সম্পদ ও সাধারন মুসলিমদের নিরাপত্তার স্বার্থে অনিবার্য প্রয়োজন বশত কুফরী কথা উচ্চারণ করা বৈধ হওয়া সম্পর্কে হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং লোভে পড়ে কিছু করা ভাষাভিত্তিকভাবেও বাধ্য হওয়া বলে গণ্য নয় আর শরীয়তেও তা ওজর হিসেবে স্বীকৃত নয়। যেহেতু ভয় ও লোভের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

কাউকে ভয় দেখিয়ে জেনা করতে বাধ্য করা ওযর যোগ্য। কিন্ত কারো নির্জন ঘরে কোনো এক সুন্দরী মেয়ে প্রবেশ করে বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে জেনার দিকে আকৃষ্ট করার কারণে জেনায় লিপ্ত হলে সেটাকে বাধ্য হয়ে জেনা করা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে না। যদিও অন্তরের উপর আগেরটির চেয়ে পরেরটির প্রভাব অধিক। কারণ প্রথমটিকে আল্লাহ্ ওযর হিসেবে গণ্য করেছেন আর পরেরটি ওযর হিসেবে গণ্য নয়।

তাছাড়া দুনিয়ার অর্থ সম্পদ, মান-সম্মান ও ক্ষমতার লোভে কুফরী করা বৈধ হলে সাধারনভাবে সকল কাফির-ই ছাড়া পেয়ে যাবে কারণ, বেশিরভাগ কাফির ইসলামকে সত্য হিসেবে জানার পরও দুনিয়াবী স্বার্থের লোভে পড়ে কুফরীতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্ ﷻ বলেন,

{وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ}

﴾ কফিরদের জন্য দূর্ভোগ। যারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে বেশি পছন্দ করে। ﴿

[ইব্রাহীম/২,৩]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

{فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى}

যে কেউ সীমালঙ্ঘন করে এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহান্নামই তার স্থান।

[নাযিয়াত/৩৭-৩৯]

দুনিয়ায় যত শিরক-কুফর ও পাপকাজ রয়েছে সেগুলো লোভ, হিংসা অহংকার ইত্যাদির কারণেই হয়ে থাকে। এর মধ্যে কেবলমাত্র যথাযোগ্য কারণবশত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেটা করা হয় সেটা বাধ্যতা হিসেবে গণ্য। সেটা ছাড়া আর কোনো কিছুই ওজরযোগ্য নয়। লোভে পড়ে কুফরী করার ব্যাপারে কুরআন হাদীসে ছাড় দেওয়া হয় নি তাই উম্মতের ওলামায়ে কিরামও কখনই বিষয়টিকে ওযরযোগ্য মনে করেন নি। সুতরাং ক্ষমতা, সম্পদ, বাড়ি, গাড়ি, নারী ইত্যাদি কোনো কিছুর লোভে পড়ে কুফরী করা বাধ্যতা হিসেবে গণ্য নয়। এটা ওযরযোগ্যও নয়।

♦ *কুফরী কাজে বাধ্য হলে সুযোগ গ্রহণ করা উত্তম না কি যে কোনো মূল্যে ঈমানের উপর টিকে থাকাই উত্তম?*

ইবনে বাত্তাল ﷫ বলেন,

أجمع العلماء أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة

আলেমরা ইজমা করেছেন যে, যদি কাউকে কুফরী করতে বাধ্য করা হয় তবু সে কুফরী না করে বরং নিহত হওয়াকেই পছন্দ করে সে আল্লাহর নিকট তারচেয়ে অধিক পুরুষ্কার পাবে যে বাধ্য হয়ে কুফরী করে। [শারহে বুখারী]

ইমাম কুরতুবীও অনুরুপ কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে তারা ইজমা উল্লেখ করেছেন কিন্তু কেউ কেউ এ বিষয়ে কিছু দ্বিমতও উল্লেখ করেছেন। শাফেঈ মাজহাবের আলেম আল-মাওরুদী ﷫ বলেন,

فَإِنْ قِيلَ : فَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى بِهِ ؟ قِيلَ : يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمُكْرَه

যদি প্রশ্ন করা হয় এখানে সবর করা উত্তম না কি সুযোগ গ্রহণ করা উত্তম তবে বলবো, এটা ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন রকম হতে পারে। [হাবিল ফাতওয়া]

এরপর তিনি বলেন, যদি এমন হয় যে, উক্ত ব্যক্তি বেঁচে থাকলে ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে বা শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সক্ষম হবে তবে তার জন্য সুযোগ গ্রহণ করাই উত্তম হবে আর যদি সে এই পর্যায়ের না হয় বা এমন আশঙ্কা থাকে যে, সে কুফরী কথা উচ্চারণ করলে ইসলাম গ্রহণ করতে

চাচ্ছিল এমন অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ থেকে দূরে থাকবে তবে তার জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন করাই উত্তম হবে।

ইমাম নাব্বীও শাফেঈ মাজহাবের কিছু কিছু আলেম এমন মন্তব্য করেছেন বলে উল্লেখ করার পর বলেন, (والمذهب الأول) "তবে শাফেঈ মাজহাবে গ্রহণযোগ্য মত হলো আগেরটি" [আল-মাজমু]

অর্থাৎ কুফরী না করে ধৈর্য্য অবলম্বন করার মতটিকেই তিনি শাফেঈ মাজহাবের গ্রহণযোগ্য মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মোট কথা কিছু দ্বিমত ছাড়া সকল আলেমই একমত যে, হত্যা ও কুফরী করার মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া হলে একজন মুসলিমের উচিৎ নিহত হওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া।

হানাফী মাজহাবের ওলামায়ে কিরামও অনুরুপ মত দিয়েছেন। মালিকুল ওলামা আল-কাসানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَالِامْتِنَاعُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ فَقُتِلَ كَانَ مَأْجُورًا

যদি সে (বাধ্য হওয়ার পরও) কুফরী না করে তবে সেটা উত্তম এমনকি যদি কুফরী না করার কারণে তাকে হত্যা করা হয় তবে সে পুরষ্কার পাবে। [বাদাইউস্ সানায়ি]

হাম্বালী মাজহাবের ফকীহ্ ইবনে কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ ، فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ وَلَا يَقُولَهَا

যাকে কুফরী কথা বলতে বাধ্য করা হয় তার জন্য উত্তম হলো তা উচ্চারণ না করে সবর করা।

[আল-মুগনী]

এরপর তিনি সাহাবায়ে কিরামের ধৈর্য্য অবলম্বন সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন। এবং ঐ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যেখানে রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তিনটি গুন যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে। তার মধ্যে ঐ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন ভয় করে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারেও অনুরুপ ভয় করে।

সন্দেহ নেই যে, সাধারনভাবে কুফরী কথা উচ্চারণের তুলনায় নিহত হওয়াকে প্রাধান্য দেওয়াই অধিক ঈমানের পরিচয়। তবে সর্বাবস্থায় ও সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য না হওয়ার মতটিই অধিক সঙ্গত মনে হয়। একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে যে, তার ক্ষেত্রে কুফরী কথা উচ্চারণ করে হলেও নিজের জীবন বা অন্যান্য মুসলিমদের জীবন রক্ষা করা অধিক উত্তম বলে বিবেচিত হতে পারে। কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করা সংক্রান্ত হাদীসটির দিকে মনযোগ নিবদ্ধ করলেই বিষয়টি অনুধাবন করা সম্ভব। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার

জন্য এমন কথা উচ্চারণ করেছেন যা সাধারন অবস্থায় উচ্চারণ করা কুফরী ছিল। এখন প্রশ্ন হলো, এধরনের কথা উচ্চারণ করে কা'ব বিন আশরাফের মতো লোককে হত্যা করা উত্তম নাকি এসব থেকে বিরত থাকা উত্তম? তবে নিশ্চয় উত্তর হবে এধরনের ব্যক্তিদের হত্যা করাই উত্তম যদিও এ উদ্দেশ্য কৌশল হিসেবে কোনো কুফরী কথা উচ্চারণ করতে হয়। যেহেতু রাসুলুল্লাহ্ ﷺ নিজেই এটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মতো যা খুশি বলার অনুমতি দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ যার নির্দেশ দেন তা অবশ্যই অধিক উত্তম। একইভাবে যদি কোনো মুসলিম মহিলাকে কাফিররা সম্ভ্রম নষ্ট করার ভয় দেখিয়ে কুফরী করতে বাধ্য করে এবং কুফরী করলে তার সম্ভ্রম অক্ষত থাকবে এমন প্রমাণিত হয় তবে উক্ত মহিলার ব্যাপারে সম্ভ্রম নষ্ট করে হলেও কুফরী কথা উচ্চারণ না করার সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে হয় না।

মোট কথা, সাধারনভাবে নিজের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের ক্ষতি হলেও কুফরী কথা উচ্চারণ না করাই উত্তম এটা নিঃসন্দেহে সঠিক কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বাবস্থায় এটা প্রযোজ্য নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ করে নিজের জীবন ও সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা বা মুসলিমদের জীবনকে নিরাপদ করা উত্তম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

◆ ***দ্বীনের দা'ওয়াত বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার নামে কুফরী মতবাদ মেনে নেওয়ার বিধান।***

বর্তমানে একদল লোক রয়েছে যারা বিভিন্ন কুফরী মতবাদকে কুফরী হিসেবে স্বীকার করে নেওয়ার পরও দ্বীনের দা'ওয়াত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কৌশল হিসেবে ঐ সকল মতবাদকে পন্থা হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেন। মুসলিমদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং শত্রুকে ক্ষতম করার জন্য কৌশল হিসেবে কুফরীতে লিপ্ত হওয়া বৈধ হওয়া সম্পর্কে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি তারা এটাকে নিজেদের স্বপক্ষে ব্যবহার করে থাকেন। বিভিন্ন দিক থেকে তাদের এই অপচেষ্টার মূলৎপাটন করা যায়।

[এক] দ্বীন কোনো দৃশ্যমান বিষয় নয় যে, এটাকে রং-চুন করে রাস্তার পাশে বসিয়ে রাখলেই দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলে গণ্য হবে। দ্বীন হচ্ছে কিছু আক্বীদা-বিশ্বাস যা অন্তরে ধারণ করতে হয় এবং কিছু বিধি-বিধান যার উপর আমল করতে হয়। দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলতে বোঝায় এমন কিছু লোক তৈরী করা যারা দুনিয়ার যে কোনো ক্ষতিকে উপেক্ষা করে সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর টিকে থাকবে। কাফিরদের সকল তিরষ্কার ও হুমকী অগ্রাহ্য করে তারা দ্বীনের উপর অবিচল থাকবে। দ্বীনের দা'ওয়াত বলতেও একই বিষয়কে বোঝায়। দ্বীনের দা'ওয়াত অর্থ কুরআন-হাদীসের যতটুকু সহজ বা যতটুকু সমাজের মানুষ মেনে নেই ততটুকু প্রচার করা নয়। বরং এর অর্থ হলো, অত্যাচারী বাদশার সামনেও সত্য কথা উচ্চারণ করা। সুতরাং কুফরী মতবাদ মেনে নিয়ে কাফিরদের সন্তুষ্ট করে বা কাফিরদের সামনে মাথা নত করে

দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বরং কাফিরদের মুখের সামনে তাদের ধর্ম ও মতবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে এবং তাদের সামনে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। কাফিরদের সাথে আপোস করে তাদের কুফরী মতবাদকে বহুলাংশে মেনে নিয়ে এবং তাদের ইচ্ছামত ইসলামের বিধি-বিধানের বিরাট অংশ পরিত্যাগ করে তাদের অনুমতিসাপেক্ষে একটি রাষ্ট্রকে নামকে ওয়াস্তে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত সম্পন্ন হয়ে যায় না। নিজের ঈমান-আক্বীদাকে বিসর্জন দিয়ে সুদভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক বা জুয়ার উপর নির্ভরশীল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠা করলেই ইসলামের খেদমত করা হয় না। এসব দুনিয়াবী জৌলুশ ইসলামের কোনো প্রয়োজন নেই। ইসলামের প্রয়োজন এমন একজন বক্তির যে ইসলামকে বক্ষে ধারণ করবে কাফিরদের রাগ আর অভিমানকে পরওয়া না করে বাতিলের মুকাবিলায় আপোসহীনভাবে টিকে থাকবে। এমন একজন ব্যক্তি একাই একটি রাষ্ট্র, সে একাই একটি জাতি।

আল্লাহ্ বলেন, (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً) "নিঃসন্দেহে ইবরাহীম নিজেই একটি জাতি" [নাহল/১২০]

একপাল গাধার কোনো প্রয়োজন নেই একটি সিংহই যথেষ্ট্য।

সর্বোপরি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতেই দুনিয়াতে এসেছিলেন। তিনি যে পদ্ধতিতে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেটিকেই পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি কাফিরদের সমাজে কুফরী আক্বীদা-বিশ্বাসের বিপরীতে রুখে দাড়িয়েছেন। তাদের ধর্ম বিশ্বাসের ত্রুটি বিচ্যুতি তুলে ধরেছেন এবং আল্লাহর দ্বীন ইসলামের প্রচার করেছেন। সকল মুসলিমকে এই কর্ম পন্থার উপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকতে আদেশ করেছেন। এই অবস্থায় বাধ্য হওয়ার কারণে দু'একজন সাহাবাকে মুখে কুফরী কথা উচ্চারণের অনুমতি প্রদান করেছেন। বাকী সাহাবায়ে কিরাম দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও দ্বীনের দা'ওয়াতের উপর আপোসহীনভাবে টিকে ছিলেন। যখন রাসুলূল্লাহ্ ﷺ সহ সকল মুসলিমই দ্বীনের উপর অবিচল রয়েছেন এবং বাতিল ধর্ম বিশ্বাসের বিপরীতে অনবরত প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন যেখোনে দু'একজন সাহাবী বাধ্য হওয়ার কারণে কুফরীতে লিপ্ত হলে দ্বীনের দা'ওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কোনো ভাটা পড়ে না। তাই বিষয়টির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া যেসব সাহাবায়ে কিরাম বাধ্য হয়ে কুফরী কথা উচ্চারণ করেছেন তারা সারাজীবনের জন্য চিরস্থায়ীভাবে বা সুদীর্ঘ সময়ের জন্য কুফরীতে লিপ্ত হয়েছেন এমন প্রমাণ নেই। বরং তারা পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী সাময়িকভাবে দু'একটি কুফরী কথা উচ্চারণ করেছেন কিছু সময় পরই আবার নিজের স্বাভাবিক জীবন তথা ঈমান ও আমলের পরিবেশে ফিরে এসেছেন। বাধ্য হয়ে ঘটনাক্রমে কুফরীতে লিপ্ত হওয়া আর স্থায়ীভাবে কুফরীর মধ্যে পতিত হওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। পূর্বে আমরা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি এ বিষয়ে পার্থক্য করেছেন এবং

ইবনে কুদামা এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি স্থায়ীভাবে কুফরীতে লিপ্ত হয় তার অন্তর ক্রমেই কুফরী প্রতি সহনশীল হয়ে যায়। একইভাবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ ঈমানের উপর টিকে থাকা অবস্থায় দু'একজন মুসলিম অনিবার্য কারণে বাহ্যিকভাবে কুফরীতে লিপ্ত হলে ইসলামের মৌলিক দা'ওয়াত অটুট ও অক্ষত থাকে কিন্তু সকল মুসলিমরা কৌশলের নামে একত্রে কুফরী মতবাদের স্বীকৃতি দিলে কুফরীর জন্য ময়দান ফাঁকা হয়ে যায় আর আল্লাহ্র ধর্ম ইসলাম সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এভাবে নিজেকে স্থায়ীভাবে কুফরীর পঁচা-ডোবায় নিক্ষেপ করা বা ইসলামকে সম্পূর্ণরুপে পরাজিত করে সকলে মিলে একত্রে বাধ্যতার দোহায় দিয়ে কুফরীতে লিপ্ত হওয়া কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। একারণে আল্লাহ্ ﷻ হিজরত ও জিহাদ ফরজ করেছেন। যে এলাকাতে ইসলাম পরাজিত নিজের সম্পদ, বাসস্থান ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করে সেখান থেকে হিজরত করা ফরজ। এ ব্যাপারে সম্পদ, সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি কোনো কিছু বাধা হিসেবে গণ্য নয়। দুনিয়ার বুকে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য জিহাদ করা ফরজ। এ ব্যাপারে নিজের জীবন, সম্পদ, সন্তান-সন্তদি ইত্যাদি কোনো কিছুর ক্ষয়-ক্ষতি হলেও তা ওজর হিসেবে গণ্য নয়। মোট কথা দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলতে বোঝায় কাফিরদের সাথে আপোসহীন সংগ্রামে লিপ্ত থাকা এবং তাদের বাতিল ধর্মবিশ্বাস ও ভ্রান্ত মতবাদের বিপরীতে বিরামহীন প্রচার প্রসারে নিয়োজিত থাকা। রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة

আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর টিকে থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে। [মুসলিম]

আবু দাউদ শরীফের একটি বর্ণনাতে অনুরুপ বলা হয়েছে সেখানে অতিরিক্ত বলা হয়েছে, (حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ) "এমন কি তাদের শেষ অংশ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে।"

সুতরাং দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা বলতে কাফিরদের সাথে সংগ্রাম করে টিকে থাকা বোঝায়। তাদের মতবাদ মেনে নিয়ে মাথা নত করা নয়। কাফিরদের সাথে সংগ্রামরত অবস্থায় কখনও কখনও বিশেষ প্রয়োজন হেতু দু'একজন মুসলিমকে সাময়িক সময়ের জন্য কুফরী করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এধরনের অনুমতির উদ্দেশ্য হয় বাতিলের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সংগ্রামকে শক্তিশালী করা এবং বিজয়কে ত্বরান্বিত করা। এ বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সংগ্রাম ও সংঘর্ষের পথ পরিত্যাগ করে কাফিরদের সাথে আপোসরফা করা এবং তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য কুফরী ধর্ম মেনে নিয়ে কৌশলের দোহায় দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কৌশল হবে সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করে দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি অর্জন করার জন্য নয়। যুদ্ধে কৌশল করা বৈধ কিন্তু যেখানে যুদ্ধই পরিত্যাগ করা হয়েছে সেখানে কৌশলের দাবী কিভাবে গ্রহণযোগ্য হয়? সুতরাং আল্লাহর

দ্বীন রক্ষার তাগিতে কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার যে ওজর সেটা এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

[দুই] মুসলিম উম্মাহ্‌কে কোনো একটি ভয়াবহ ক্ষতি হতে বাঁচানোর তাগিদে বাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো, যে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা বাস্তবে বিদ্যমান থাকতে হবে। কল্পিত কোনো ভয়াবহ বিপদ থেকে মুসলিম উম্মাহকে বাঁচানো দোহাই দিয়ে কুফরী বা অন্য কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া ওযর যোগ্য নয়। একইভাবে উক্ত নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলেই যে, মুসলিমরা উক্ত বিপদ থেকে বেঁচে যাবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করে শিরক-কুফরে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কা'ব বিন আশরাফ মুসলিমদের মান-সম্মান ও রক্ত-সম্পদের উপর স্পষ্ট হুমকী হয়ে দাড়িয়েছিল এবং তাকে হত্যা করার মাধ্যমে এ থেকে মুসলিমদের মুক্ত করা সম্ভব ছিল তাই দু'একটি কুফরী কথা উচ্চারণ করে হলেও তাকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যারা কৌশলের কারণে বিভিন্ন নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার মতবাদ প্রচার করে তারা সঠিকভাবে জানেই না আসলে বিপদ কোন জায়গায় এবং তার সামাধান কি। তারা নিছক অনুমান ও খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করে ভয়াবহ বিপদের স্লোগান তুলে সাধারন মুসলিমদের শিরক-কুফরসহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ কর্মকান্ডে লিপ্ত করে থাকে। উদাহরণস্বরুপ, বর্তমানে একদল লোক দাবী করে, ইসলামপন্থীরা ভোটে না জিতলে সাধারন মুসলিমরা ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। তাই এখন কুফরী সংবিধানের অধীনে হলেও ভোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে মুসলিমরা বাধ্য। অথচ বাস্তবে দেখা যায় ভোটে কথিত ইসলামপন্থীরাই জয়ী হোক অথবা বামপন্থীরা মুসলিমদের জন্য পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ভোটে জয়ী হওয়ার পরও ইসলামপন্থী এম,পি মন্ত্রীরা নাচ-গানের আসরে গমণ করেন, মন্দির প্রদর্শনে ভ্রমণ করেন আর বলেন, আমরা এগুলো করতে বাধ্য। যদি ভোটে জয়ী হওয়ার পরও কেউ নিষিদ্ধ কাজে বাধ্য হয় তবে সে ধরণের বিজয় অর্জন করে মুসলিমদের সমস্যার কি সমাধান হলো সেটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই ধরণের বিজয় অর্জনের জন্য কুফরী সংবিধানের অধীনে নির্বাচন করা একটি অপরাধ এবং এই বিজয় ধরে রাখার জন্য ইসলামপন্থী এম,পি মন্ত্রীদের গান-বাজনার আসরে বা মন্দিরে গমণ করা আরেকটি অপরাধ এই সকল অপরাধের কোনোটিই ওজরযোগ্য নয়।

⇒ উপসংহার

উপরের আলোচনার সারমর্ম হলো সাধারনভাবে বাধ্য হয়ে কুফরী করা ওজর হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন। তবে বাধ্যতার সীমা কি হবে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ব্যাপক দ্বিমত রয়েছে। বেশিরভাগ আলেম, বড় ধরণের যে কোনো ক্ষতির ভয় থাকলে তাকে বাধ্যতা হিসেবে গণ্য করেছেন। তাদের মতে নিহত হওয়া, অঙ্গ কর্তিত হওয়া, প্রচন্ড প্রহার করা, লম্বা সময় জেলে বন্দি করা

ইত্যাদি বিষয় বাধ্যতা হিসেবে গণ্য। কেউ কেউ বলেছেন, কেবল নিজের জীবন নয় বরং সম্পদ ও সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও বাধ্যতা বলে গণ্য হবে। এমনকি অন্যান্য মুসলিমদের নিরাপত্তার স্বার্থকেও কিছু আলেম বাধ্যতা হিসেবে গণ্য করেছেন। তারা শত্রু নিধনের জন্য কৌশল হিসেবে কুফরী কথা উচ্চারণের অনুমতি দিয়েছেন। এর পাশাপাশি ওলামায়ে কিরাম একমত হয়েছেন যে, সাধারন অবস্থায় নিজের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হলেও কুফরী না করাই উত্তম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় হলো, সাধারন মুসলিমদের কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা। বিনিময়ে নিজের জীবন বা সম্পদ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে তাদের উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু যখন কেউ বাধ্য হয়ে কুফরী করে তার ব্যাপারে নমনীয় আচরণ করা। যেহেতু সে গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে কুফরী করেছে তাই তাকে কাফির বলা যাবে না। যেসব বিষয় বাধ্যতা বলে গণ্য হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত আছে সেগুলোর ব্যাপারেও আমাদের ছাড় দিতে হবে যেহেতু মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর নির্ভর করে মুসলিমদের কাফির বলা যায় না। তবে যে কেউ নিজেকে বাধ্য বলে দাবী করলেই সেটা মেনে নেওয়া হবে না বরং সে বাধ্য হয়েছে কিনা তার প্রমাণ থাকতে হবে বা কমপক্ষে পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে তার বাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে।

ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

فلو قال كنت مكرهاً فيما فعلته نظر إن كانت قرائن الأحوال شهد له بأن كان في أسر الكفار أو كان محفوفاً بجماعة منهم وهو مستشعر صدق بيمينه

যদি কেউ বলে আমি বাধ্য হয়ে এটা করেছি তবে দেখতে হবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার কথার স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে কিনা। যদি এমন হয় যে সে কাফিরদের নিকট বন্দি ছিল বা একদল কাফির তাকে ঘিরে ছিল আর সে এটা বুঝতে পেরেছিল তবে তাকে কসম করতে বলা হবে এবং তার কথা মেনে নেওয়া হবে। [আর-রাওদা]

সুতরাং যে যার মতো বাধ্যতার দাবী করলেই সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং বাধ্যতা সম্পর্কিত মুলনীতির আলোকে এবং পরিবেশ পরিস্থিতির উপর সুক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে একজন ব্যক্তি বাধ্য কিনা।

সমাপ্ত